উদ্বোধন



"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা—৩

৬১তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা
মাঘ, ১৩৬৫

বার্ষিক মূল্য ৫৲
প্রতি সংখ্যা ॥৹

উদ্বোধন

শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্রম্

শ্রীমৎস্বামি-বিবেকানন্দ-বিরচিতম্

সামাথ্যাদ্যৈর্গীতিসুমধুরৈর্মেঘগম্ভীরঘোষৈ-
যজ্ঞধ্বান-ধ্বনিতগগনৈর্ব্রাহ্মণৈর্জ্ঞাতবেদৈঃ ।
বেদান্তাখ্যৈঃ সুবিহিত-মখোদ্ভিন্ন-মোহান্ধকারৈঃ
স্তুতো গীতো য ইহ সততং তং ভজে রামকৃষ্ণম্ ॥

বেদতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞস্থলে মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা আকাশ বাতাস মুখরিত করিতেন,
বিধিপূর্বক যজ্ঞ সম্পাদন করার ফলে তাঁহাদের শুদ্ধ হৃদয় হইতে বেদান্তবাক্যদ্বারা ভ্রম ও
অজ্ঞানের অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছিল,
তাঁহারা মেঘের মতো গম্ভীর সুমধুর স্বরে সামবেদ প্রভৃতি দ্বারা যাঁহার স্তব করিয়াছেন,
—যাঁহার মহিমা কীর্তন করিয়াছেন,
আমি সর্বদা সেই শ্রীরামকৃষ্ণের ভজনা করি।

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের নববর্ষ

দেখিতে দেখিতে 'উদ্বোধনে'র ৬০তম বর্ষটি কাটিয়া গেল। এই সংখ্যা হইতে উদ্বোধনের ৬১তম বর্ষের শুভারম্ভ। শ্রীভগবানের আশীর্বাদ—সুধী লেখক-লেখিকার, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার ও হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণের প্রীতি ও সহযোগিতা সম্বল করিয়া আমরা নূতন বৎসরের যাত্রাপথে অগ্রসর হইতেছি।

৬০তম বৎসর অনেক ক্ষেত্রে হীরকজয়ন্তী-রূপে পালিত হয়, সে ভাবে না হইলেও বিশেষ পূজা-সংখ্যায় 'উদ্বোধনের ষাট বৎসর' প্রবন্ধে আমরা উদ্বোধনের ধারাবাহিক একটি ইতিহাস সংকলন করিয়াছি, তাহাতে পাইয়াছি স্বামীজী কেন—কবে 'উদ্বোধন' পত্রিকা শুরু করিলেন, 'উদ্বোধনের উদ্দেশ্য' নামে স্বামীজী-লিখিত উদ্বোধনের প্রথম প্রবন্ধের বা 'প্রস্তাবনা'র অংশ-বিশেষ পুনর্মুদ্রিত করিয়া আমরা স্মরণ করিয়াছি স্বামীজী কি চাহিয়াছিলেন এই পত্রিকার মাধ্যমে।

প্রতি বৎসরের যাত্রারম্ভে ইহার স্মরণই আমাদের পাথেয়, ইহারই সহায়ে আমরা অনুসরণ করি সেই পথ, যে পথ দেবলোকে বিস্তৃত—যে জ্যোতির্ময় পথ দিয়া মানব সীমাকে অতিক্রম করিয়া অসীমের দিকে যাত্রা করে, সংকীর্ণতার গণ্ডি ভাঙিয়া অনন্ত বিস্তারের মাঝে আত্মহারা হয়। ইহার সহায়ে আমরা ইঙ্গিত পাই কোন্ পথ অবলম্বন করিতে পারিলে মনুষ্যাকার অ-মানুষ 'মানুষ' হয়, আর মানব ধীরে ধীরে মহামানবে রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তরের সাধনাই অন্তরের জাগরণের সাধনা—ইহাই উদ্বোধনের সাধনা।

দেশ কাল-পাত্র অনুসারে ইহার রূপ নিত্য নূতন। কোথাও বা ঘোর তমোগুণ মানুষকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে ভ্রান্তি ও আলস্যের মাঝে, সেখানে প্রয়োজন প্রবল কর্মচঞ্চল রজোগুণ, যাহার সহায়ে মৃত্যুতুল্য মোহনিদ্রা বিদূরিত করিয়া মানব জাগিয়া উঠিবে—প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহার স্বাভাবিক সংগ্রাম-মুখর জিগীষু জীবনের স্বাধিকারে। আবার যেখানে মানুষ রজোগুণের যৌবন-চাঞ্চল্যে জলে স্থলে আকাশে—কোথাও বিরাম বিশ্রাম খুঁজিয়া পাইতেছে না, প্রচণ্ড গতি তাহার দুর্গতিরই কারণ হইতেছে, সেখানে প্রয়োজন শান্ত সত্ত্বগুণ, যাহা জীবনে আনিয়া দিবে সৌম্য শান্তি, সাম্যের পরিপূর্তি, প্রৌঢ় অভিজ্ঞতার পরিপক্বতা!

এ সমস্যা তো শুধু আজিকার সমস্যা নয়, শুধু এই যুগেরই সমস্যা নয়। সৃষ্টির প্রথম বেদনাই শুরু হইয়াছে সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই ত্রিগুণের খেলায়। যুগে যুগে, দেশে দেশে, সৃষ্টির ও কৃষ্টির বৈচিত্র্য দেখা দেয় এক এক গুণের প্রাবল্যে, তাহারই চিহ্ন পড়িয়া থাকে ইতিহাসের পাতায়—পুরাতত্ত্বের প্রস্তরে।

ভারত সত্ত্বের ধুয়া ধরিয়া তমঃসমুদ্রে ডুবিতে বসিয়াছিল—উচ্চ আদর্শের বড়াই করিয়া অবনতির পঙ্কে ডুবিতেছিল। সেখানে আজ দেখা দিয়াছে রজোগুণের প্রবল জোয়ার,—যে কোন উপায়ে শুধুমাত্র ঐহিক উন্নতির প্রচেষ্টা।

ইওরোপ ও আমেরিকায় রজোগুণের আধিক্য, তাহাদের তীব্র তড়িৎসঞ্চারে চন্দ্রমণ্ডল সূর্যমণ্ডল পর্যন্ত বিপর্যস্ত। কোথায় শান্তি, কোথায় সুখ, কোথায় জ্ঞানবিজ্ঞান-তৃপ্তাত্মার সর্বপ্রাপ্তির পূর্ণতা?

সঙ্কুচিত বিশ্বে আজ একান্ত প্রয়োজন সাম্য ও সামঞ্জস্য, তাহা আসিতে পারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পারস্পরিক অভাব পরিপূরণের দ্বারা। এই ইঙ্গিতই দিয়া গিয়াছেন স্বামীজী আজ হইতে ষাট বৎসর পূর্বে। 'উদ্বোধন' তাঁহার সেই নির্দেশিত পথেই চলিয়াছে, এবং চলিতে থাকিবে।

বৈজ্ঞানিক মানবতা

আজকাল দুটি কথা প্রায়ই শোনা যায় 'হিউম্যানিজ্‌ম' ও 'হিউম্যানিটিজ্‌'। সম্প্রতি আবার আর একটি কথার সৃষ্টি হইয়াছে সায়েন্টিফিক্ হিউম্যানিজ্‌ম্ (Scientific Humanism), আমরা তাহারই বাংলা করিতেছি বৈজ্ঞানিক মানবতা বা মানবিকতা। কথাটির মধ্যে Scientific materialism বা বৈজ্ঞানিক জড়বাদের গন্ধ না থাকিলেও ছায়া আছে। আমরা বিচার করিয়া বুঝিতে চাই কথাটির প্রকৃত অর্থ কি।

তৎপূর্বে দেখা উচিত: শব্দটির উৎপত্তি কোথায় ও কবে? অনেকে বলিয়া থাকেন ইওরোপে যে রেনেসাঁ বা সর্বতোমুখী জাগরণ আসিয়াছিল ১৫শ শতাব্দীতে, ভারতে এখনও তাহা আসে নাই, সেদিক দিয়া ভারত এখনও ইওরোপের পাঁচ শতাব্দী পিছনে। ভারতে যে সামান্য জীবন-চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছে তাহা একান্তই পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা এবং ঐ সভ্যতারই শক্তি-সান্নিধ্যে! ভারতের বিরাট জনতা এখনও সেইখানে পড়িয়া রহিয়াছে, যেখানে আসিয়া তাহার স্বাধীন চিন্তা স্তব্ধ হইয়াছিল, স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছিল, জাতি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। অতএব 'প্রকৃত' বিষয় বুঝিবার সুবিধার জন্য আমরা ভারতকে বাদ দিয়া ইওরোপের নব জাগরণ হইতেই শুরু করিতেছি।

ইওরোপও একদিন তমোগুণের প্রভাবে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। স্বধর্ম ভুলিয়া, না বুঝিয়া সে বিশ্বাস করিয়াছিল 'স্বর্গরাজ্য' 'মুক্তি' প্রভৃতির বার্তা। গ্রীকো-রোমান সভ্যতা ভাসিয়া গিয়াছিল উন্নততর নীতি-বিশিষ্ট বৌদ্ধ ও ইহুদীধর্ম-সমুদ্ভূত খৃষ্ট-বাণীর প্রবাহে।

ইওরোপের ঘুম ভাঙিল সহস্র বৎসর পরে। তাহার প্রথম লক্ষণ মানুষের স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠায়—অলৌকিক দৈব শক্তি অস্বীকার করিয়া। মানুষের স্বার্থ-সংরক্ষণ, মানুষের ঐহিক কল্যাণ, মানুষের মহিমাপ্রচার—ইহাই বড় করিয়া দেখা দিল। জাগিয়া উঠিল গ্রীক মনীষা, রোমক মহিমা—নূতন বেশে, নূতন ভাষায়। জাগিয়া উঠিল ইটালী, ফ্রান্স, জার্মানী ও ইংলণ্ড। ধর্মীয় শাসন অস্বীকার করিয়া প্রচারিত হইতে লাগিল প্রত্যক্ষ পরীক্ষা-সহায়ে লব্ধ বিজ্ঞানের নব নব সত্য—দেখা দিল যুক্তিপরায়ণ নূতন দার্শনিক চিন্তাধারা। দেশ বা রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া নব নব ভাব-প্রবাহ ছড়াইয়া পড়িল। ইহাই মানবতা-বাদের সূত্রপাত।

হল্যাণ্ডের হিউম্যানিষ্ট ইরাস্মাস্ গোঁড়ামির মহাশত্রু—প্রচার করিলেন সমাজ-কল্যাণেই আদর্শ চরিত্রের পরীক্ষা। ধর্মের নামে ভণ্ডামির তিনি কঠোর নিষ্ঠুর সমালোচক। তাঁহার ভাবে প্রভাবিত ইংলণ্ডের টমাস মূর লিখিলেন 'ইউ-টোপিয়া' (Utopia)—অর্থাৎ আদর্শ কল্যাণরাষ্ট্র, সামাজিক আর্থনীতিক সাম্যের এক কল্পনা-চিত্র তিনি আঁকিলেন। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে আধুনিক জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের পত্তন হওয়ায় শুধুমাত্র ভাবপ্রবণতার উপর রচিত এই উদার মানবতাবাদ বাধাপ্রাপ্ত হইল।

ইওরোপের রঙ্গমঞ্চে ইহার পরবর্তী বিশেষ ঘটনা বিজ্ঞানের অপ্রতিহত জয়যাত্রা এবং তাহার অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব সাফল্যের পর সাফল্য। মানুষের চিন্তা, কৃষ্টি—সব কিছু বিজ্ঞানের পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল। দর্শনও বিজ্ঞানের ছায়ায় তাহার মতবাদ রচনা করিতে শুরু করিল। এখন আর ধর্ম নয়, বিজ্ঞানই আন্তর্জাতিক মিলনের মঞ্চ। ক্রমে বিজ্ঞান-বলে পুষ্ট ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি নব নব মারণাস্ত্র আবিষ্কার করিয়া দেশে বিদেশে যুদ্ধের পর যুদ্ধ করিয়া শিল্পবাণিজ্যের সহিত নিজ নিজ সাম্রাজ্যের বিস্তার করিল।

বিজ্ঞান-ভিত্তিক শিল্পের উপর খাড়া করিল অর্থনীতির কাঠামো, তারপর শুরু হইল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তাহারই ভয়াবহ পরিণতি বার্লিনের শ্মশানে! এইখানে আসিয়া যেন বর্তমান পৃথিবী থামিয়া গিয়াছে—পৃথিবীর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি যেন মুখোমুখি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

প্রথম শক্তি নিজেকে গণতন্ত্রের সমর্থক বলিয়া দাবি করে, মুক্ত মানবের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতা সহায়ে সকলের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি—তাহার লক্ষ্য। অপর দ্বিতীয় যে মহাশক্তিটির আবির্ভাব হইয়াছে—তাহার ভিত্তি বৈজ্ঞানিক জড়বাদ, উদ্দেশ্য মানব-সমাজে সাম্য স্থাপন, প্রয়োজন হইলে, জনগণ না বুঝিলে—তাহাদের কল্যাণের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে তাহাদের সহযোগিতা আদায় করিতে হইবে।

সাম্যবাদ বা জড়বাদ নূতন কিছু নয়, ভারতের কথা বাদ দিয়াও বলা যায় গ্রীক দার্শনিক প্লেটো সাম্যের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, ডিমোক্রিটাস বলিয়াছিলেন, মন বা অন্য কিছু নয়—জড়বস্তুই সব কিছুর পরম কারণ। মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি সহায়ে বৈজ্ঞানিক জড়বাদ (Scientific materialism) মত স্থাপন করেন, তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া জীবন সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন জনগণের পক্ষে সর্বাধিক কল্যাণকর—ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত। লেনিনই উহার কতকাংশ কার্যে পরিণত করেন।

কিন্তু ইতোমধ্যে বিজ্ঞানের নদীতে অনেক জল গড়াইয়া গিয়াছে। বিজ্ঞান তো একটা মতবাদ নয়—বিজ্ঞান একটা পদ্ধতি। পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত—ইহাই তাহার সোপান-পরম্পরা। যে কোন ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হইবে—তাহাকেই অবশ্য বৈজ্ঞানিক আখ্যা দিতে কাহারও আপত্তি থাকা উচিত নয়।

বৈজ্ঞানিক এই পদ্ধতি, এই যুক্তি-শৃঙ্খলা, এই চিন্তা অবশ্যই বৈজ্ঞানিকের মনে রহিয়াছে। মনের চিন্তা কি কোন জড় বস্তুর উপর নির্ভরশীল না চেতন ব্যক্তির অন্তঃস্ফুরণ? একথার শেষ নিষ্পত্তি কি হইয়াছে? বৈজ্ঞানিকের কোনও যন্ত্রে কি ইহার রহস্য ধরা পড়িয়াছে? বিজ্ঞানের সীমা দিনে দিনে বাড়িয়া চলিয়াছে—জড়-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান পর্যন্ত আমরা আসিয়াছি, তবে শুধু জড়-বিজ্ঞান দিয়া কেন আমরা জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যা করিব? আরও উপরে, আরও ভিতরে কেন আমরা যাইব না? বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করার অর্থ এই নয় যে জড়বাদী হইতেই হইবে, জড়বিজ্ঞানই একমাত্র বিজ্ঞান নয়। জীব-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের যুগে 'বৈজ্ঞানিক জড়বাদ' কথাটি বিচার করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। বৈজ্ঞানিক মনে আবার যেন সেই মধ্যযুগের ধর্মীয় গোঁড়ামি (যাহা একেবারে মরে নাই) আসিয়া না হাজির হয়, সে যেন না বলিয়া বসে: যা বলিতেছি বিশ্বাস কর।

বিচারের এই সংকটময় সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হয় বৈজ্ঞানিক মানবতা। আমরা বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিকতা ছাড়িতে পারি না, আবার মানবতাও আমাদের জন্মগত অধিকার। এই দুইএর মধ্যে তাই একটা সেতুরচনার প্রচেষ্টা চলিয়াছে—যাহার ফলে বিজ্ঞানের বস্তুমাত্রনির্ভর যান্ত্রিকতা হ্রাস পাইবে, ও মানব-সাধারণের মধ্যে দেখা দিবে একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী।

সেদিনের মানবতা ছিল ভাবপ্রবণতার উপর ভাসমান, আজিকার মানবতা যুক্তির উপর—বাস্তবতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সেদিনের মানবতা ছিল রোম্যান্টিক, আজিকার মানবতা প্র্যাগ্‌ম্যাটিক। সেদিন ভাবের আতিশয্যে কবি ও সাহিত্যিকরাই মানবের মহিমা ও একত্ব ঘোষণা করিয়াছিলেন, আজ প্রয়োজনের খাতিরে রাজ-

নীতিকরাও মানবাধিকারের ঐক্য ঘোষণা করিতেছেন। হয়তো সেদিন ভাবের উচ্চতা বেশী ছিল, কিন্তু আজ ভিত্তি দৃঢ় ও প্রশস্ত।

বৈজ্ঞানিক মানবতা বস্তুকে স্বীকার করিলেও তাহার প্রাধান্য স্বীকার করে না, ব্যক্তির জন্যই বস্তু, মানুষের জন্যই বিজ্ঞান। মনকে বাদ দিয়া মনোবিজ্ঞান অসম্ভব, ব্যক্তিকে বাদ দিয়া চিন্তা কল্পনা বা দর্শন অসম্ভব। ব্যক্তিই সব দর্শন-বিজ্ঞান, শিল্প-বাণিজ্য, সমাজ-সংসার, রাষ্ট্র, ধর্ম—সব কিছুর মূল্য নিরূপণের মাপকাঠি। ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের বিচারও করে মানুষ—তাহার ব্যক্তিগত বুদ্ধি দ্বারা। প্রত্যেক সিদ্ধান্তই সত্য বলিয়া উপস্থাপিত হয়। কিন্তু কে বিচার করিবে—ইহা সত্য কিনা? এইখানেই বৈজ্ঞানিক বা প্রত্যক্ষবাদী যুক্তিশীল মানব-মন বিপন্ন।

এই জাতীয় চিন্তায়: সত্যের কোন নিরপেক্ষ সত্তা নাই, দেশকালের অতীত, ইন্দ্রিয়ানুভূতির ঊর্ধ্বে কিছু নাই বা থাকিতে পারে না। সত্য মানবিক, সত্য মানুষের উপর নির্ভরশীল। এই মানবতা মানুষকে বিশ্ব জগৎ বা সংসারের কেন্দ্রে বসাইয়াছে। এইখানেই মানবতাবাদের দুর্বলতা।

মানবতাকে যদি বিশ্বের কেন্দ্রেই বসাইতে হয় তবে অবশ্যই বলিতে হইবে, এই কেন্দ্র এক না বহু? যদি এক হয় তবে এই মানবতা ভাবমূলক, যদি বহু হয় তবে ইহা সংঘর্ষমূলক।

সমস্যা সমাধানের জন্য এইখানেই প্রয়োজন মানব মনেরই আর একটি উর্ধ্বতর অভিব্যক্তি, যাহা দ্বারা মানব খণ্ডজ্ঞানের নয়, এক সমগ্রভাবের—অখণ্ডজ্ঞানের অধিকারী হয়। এই অনুভূতি অতীন্দ্রিয়। এই অনুভূতিতে মানুষ উপলব্ধি করে: সকলের হৃদয়ে আমার নাড়ী স্পন্দিত হইতেছে, সকলের মুখে আমি খাইতেছি, প্রত্যেকের দুঃখে আমি কষ্ট পাইতেছি, প্রত্যেকের সুখে আমি আনন্দিত। এইরূপ অনুভূতিশীল মানুষই বলিতে পারে: যতদিন পৃথিবীতে একটি তৃণকণা রহিয়াছে, ততদিন আমি বাঁচিয়া থাকিব। এই বিশ্বাত্মবোধই মানুষকে অমর করে, জ্ঞানী করে, শোক-দুঃখের অতীত করে।

এই মানবতাকে আমরা 'আধ্যাত্মিক মানবতা' (Spiritual humanism) বলিতে পারি। ইহা অপর দুই মানবতাবোধেরই ক্রম-পরিণতি। ইহারই প্রায়োগিক রূপ যখন সমাজে সংসারে প্রতিফলিত হইবে, তখনই রাষ্ট্রে যথার্থ সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে—তৎপূর্বে নয়।

Look at the 'ocean' and not the 'wave', see no difference between ant and angel. Every worm is the brother of the Nazarene How say one is greater and one less? Each is great in his own place We are in the sun and in the stars as much as here Spirit is beyond space and time, and is everywhere. Every mouth praising the Lord is my mouth, every eye seeing is my eye. We are confined no-where, we are not body, the Universe is our body.

* * *

Know you are the Infinite, then fear must die Say ever, 'I and my Father are one.'

—*Inspired Talks,* **Swami Vivekananda**

চলার পথে

'যাত্রী'

সম্পূর্ণরূপে পরিপাক করাই খাদ্য গ্রহণের সার্থকতা। যেখানে ইহার ব্যতিক্রম সেইখানেই ব্যাধি, সেইখানেই পূতিগন্ধময় উদ্গার। অন্ন গ্রহণের এই কার্যকরী রীতিটি উদর সম্বন্ধে যতদূর প্রযোজ্য, মহাজনের বাক্য বা বাণীসম্বন্ধে আমাদের মনের গ্রহণ-ক্ষমতাও ততদূরই প্রয়োগযোগ্য। সেই কারণেই আমাদের অজীর্ণগ্রস্ত মন, অগ্নিগর্ভ বাণীকে যথার্থরূপে গ্রহণ করিতেই পারে না, তাহাকে সঠিক পরিপাক করিয়া স্বাস্থ্যবান হওয়া তো দূরের কথা। ফলে, স্বামীজীকে যখন বলিতে শুনি: আজ জগতে কিসের অভাব জান? জগৎ চায় এমন বিশজন নরনারী যারা নির্ভীকভাবে ঐ রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে বলতে পারে, আমাদের ঈশ্বর ভিন্ন আপনার বল্‌তে কিছুই নেই। কে কে যেতে প্রস্তুত?—তখন তাঁহার ঐ অগ্নিময় বাণীতে প্রবুদ্ধ হই বটে, কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত করিতে সদা-বর্জনীয় 'ভয়'ই আমাদের অভিভূত করে বেশী। অথচ আজিকার জগতে, বিশেষতঃ এই হানাহানি কাটাকাটির দিনে, ঐ জাগরণী বাণী অপেক্ষা পরিপূর্ণ পথনির্দেশক আর কি থাকিতে পারে?

মনের গভীরে যে বাণীকে অবারিত সত্য বলিয়া বুঝি, তাহা পালন করিতে এত ভীত হই কেন? ইহার উত্তর খুঁজিতে গিয়া বর্তমান সমাজের এক কুৎসিত ব্যাধির—সামাজিক চরিত্র-হীনতার—জঘন্য স্বরূপই উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়ে, এবং ঐ ব্যাধি নিরাময় করিতে হইলে স্বামীজীর 'ঈশ্বর'বাদে পূর্ণাহুতি দিয়াই আমাদের প্রাণ-প্রাচুর্য লাভ করিতে হইবে—এ কথা বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়। স্বামীজীর এই 'ঈশ্বর' অবশ্য ব্যক্তিগত জীবনের পলায়নী মনের আত্মকেন্দ্রিক পূজার প্রতীক নয়, এই 'ঈশ্বর' স্বার্থসংঘাতশূন্য সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণের প্রতিভূ। এই 'ঈশ্বর'কে পূজা করিতে পুষ্পপাত্র সাজাইবার বা প্রতিমা আনয়ন করিবার প্রয়োজন নাই—ইহার জন্য প্রয়োজন জীবন্ত চরিত্র। এবং ইহা সেই প্রাণবন্ত চরিত্র যাহা মানুষকে স্থির থাকিতে দেয় না, আপন স্বার্থের কথা ক্ষণমাত্রও চিন্তা করিতে দেয় না, বরং ইহা সেই চরিত্র যাহা অন্ধকারে রক্ষিত নিস্তেজ সবুজ কণাহীন লতাগুল্মকে সূর্যালোকস্পর্শে প্রাণোচ্ছলতায় উজ্জীবিত করিয়া তোলে। এই শক্তি থাকিলে সর্বনিম্নে থাকিয়াও সর্বোচ্চ শিখরে উঠা যায়, সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াও সর্বসম্পদের অধিকারী হওয়া যায়, নিজেকে সম্পূর্ণ বিলাইয়া দিয়াও সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ হওয়া চলে। এই প্রসঙ্গেই স্বামীজী বলিয়াছিলেন: জগৎ আজ চরিত্রবলকেই চায়। জগৎ এমন সব মানবদের চাচ্ছে যাদের জীবন প্রেম তপস্যার হোমাগ্নিতে উদ্দীপিত। ঐ স্বার্থহীন প্রেমের অমোঘ শক্তিতে উৎসারিত প্রতি কথাটি বজ্রের সুদৃঢ় শক্তিতে রূপায়িত হয়ে কার্য করবে। জগৎ যে আজ দুঃখ জ্বালায় দগ্ধ হতে চলেছে। জাগো জাগো, ওগো মহাপ্রাণ। তোমাদের ঘুমের আর কি অবসর আছে?

কেবলমাত্র স্বামীজী নহেন, সে-যুগের যীশুও একদিন উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন: যে নিজের জীবন রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইবে, সে তাহার জীবনকেই হারাইবে, কিন্তু যে-মানুষ জীবন উৎসর্গ করিবে সে প্রকৃত জীবনকেই রক্ষা করিবে।

যশোলিপ্সু বা প্রতিদানাকাঙ্ক্ষী হইয়া এই কাজ করিতে অগ্রসর হইলে চলিবে না। ইহা হইবে স্বতঃস্ফূর্ত। ধূপের মত জ্বলিলেও ইহা গন্ধ বিকীরণ করিতে থাকিবে, পুষ্পের মত বিচ্ছিন্ন হইলেও সুগন্ধ ছড়াইতে থাকিবে, এসেন্সের শিশির মত ভাঙিয়া যাইলেও সৌরভে সকল দিক আমোদিত করিয়া তুলিবে। সর্বমানবের সুকৃতির জন্য এই সর্বগ্রাসী প্রেমই বলিতে পারে—'এমনকি কোন অপরাধ করিয়াও যদি একটি মাত্র মানব-সন্তানের উপকার করিতে পারি তাহা হইলে আমি ঐরূপ অপরাধ করিয়া অনন্ত নরক ভোগ করিতেও প্রস্তুত।' স্বামীজীর এইরূপ দৃঢ় প্রত্যয় ছিল বলিয়াই তাঁহার সম্বন্ধে নিবেদিতাকে বলিতে শুনি : ভারতের চতুঃসীমার মধ্যে যে কোন কাতরধ্বনিই উঠুক না কেন তাহা তাঁহার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিরূপে উত্তর পাইত। ভারতের প্রত্যেক ভয়ার্ত চীৎকার, প্রতিটি দুর্বলতাপ্রসূত শিহরণ ও অপমানজনিত সঙ্কোচবোধ তিনি জানিতেন এবং বুঝিতেন।

আজিকার পৃথিবীতে নব বিশ্বামিত্রের গ্রহ-সৃজনের যুগে মানব ঐ মহাজাগতিক প্রেমের পূজারীকেই 'জাগৃহি'-মন্ত্রের উদ্গাতারূপে গ্রহণ করুক, তাঁহার ঋতবচনের প্রসন্ন আশীর্বাদে উদ্বেলিত হইয়া উঠুক—ইহাই প্রার্থনা। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

আবির্ভাব

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী

বিভেদ-পূর্ণ এ মহাভুবনে সাধিতে সমন্বয়,
হে মহাসূর্য, তোমার অভ্যুদয়।
মানুষে মানুষে হেথা গরমিল, দিকে দিকে হানাহানি,
হৃদয়ের প্রেম হেথা লাঞ্ছিত, জাগে হিংসার গ্লানি!
ধাতার আসনে হেথায় অসুর বসিয়াছে দৃঢ় বলে,
ধরণীর প্রাণ হ'ল বিগলিত আর্ত-অশ্রু-জলে।
এ মহাযুগের সব ভেদাভেদ করিবারে অবসান,
আসিয়াছ তুমি হে যুগপুরুষ, হে মহাবিশ্বপ্রাণ!

তব প্রদীপ্ত কিরণ প্রসারি' এ বিশ্বে চারিধারে,—
উদিয়াছ তুমি যুগের সিংহদ্বারে!
এসেছিলে যবে, কেহ ত' জানেনি কিছু তব পরিচয়,
আড়ালে আড়ালে ক'রে গেলে লীলা, দিয়া গেলে বরাভয়!

যতদিন যায় প্রকাশ তোমার হতেছে সমুজ্জ্বল,
চির চেতনার দ্যোতনা জাগিছে বিথারি' গগনতল !
সকল আড়াল দূর ক'রি আজ হয়েছ দীপ্তিমান্,
আসিয়াছ তুমি হে যুগপুরুষ, হে মহাবিশ্বপ্রাণ !

আজিকার এই লক্ষ্যবিহীন শ্রীহীন বিশ্বমাঝে
তব উদাত্ত আহ্বান-ধ্বনি বাজে !
ভ্রান্তি-মায়ায় মুগ্ধ মানব মরীচিকা-পিছে ছুটে,
অমৃত ভুলিয়া কালকূট-বিষ ভরিছে হৃদয়-পুটে
আলোক ত্যজিয়া তিমিরের মাঝে হয় তারা পথ-হারা,
প্রসারতা-হীন কীর্ণ জীবনে সতত বন্দী তারা !
সত্যেরে ভুলি' মিথ্যার মোহে করে তারা অভিযান,
আসিয়াছ তুমি তাহাদের লাগি' হে মহাবিশ্বপ্রাণ !

বক্ষে বহিয়া এ মহাযুগের সকল বেদনা-ভার,
জাগিয়াছ তুমি করুণার অবতার !
যেথা যত ব্যথা আছে সঞ্চিত, আছে যত হা-হুতাশ,
তার নিরসনে তোমার মাঝারে জাগে মহা আশ্বাস !
অসতের মাঝে সত্য জাগিছে, তমসার মাঝে আলো,
অমৃত জাগিছে মৃত্যুর মাঝে—তুলি' যবনিকা কালো !
মহাজীবনের নভ-অঙ্গনে আজি নব উত্থান !
আসিয়াছ তাই হে যুগপুরুষ, হে মহাবিশ্বপ্রাণ !

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-যুগ

নৃত্যগোপাল রায

কথিত আছে—১৯২১ খৃঃ যখন অসহযোগ আন্দোলনের বন্যা সমগ্র দেশকে প্লাবিত করিতেছিল তখন একদল মুক্তিকামী বিপ্লবী স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বের জন্য শ্রীঅরবিন্দের পানে তাকাইলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'না, এ আমার যুগ নয়—এ গান্ধীর যুগ।'

১৯২১ খৃঃ ভারতবর্ষে গান্ধীজীর যুগই শুরু হইয়াছিল। কিন্তু গান্ধীজীর যুগ ইতিমধ্যেই অতীতের ইতিহাসে পর্যবসিত হইতে চলিয়াছে। এই রূপ ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমরা অনেকগুলি যুগের পরিচয় পাই—যেমন বৈদিক যুগ, উপনিষদের যুগ, রামায়ণ-মহাভারতের—তথা রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের যুগ, বুদ্ধের যুগ, শঙ্করের যুগ ও শ্রীচৈতন্যের যুগ। পৃথিবীর অন্যত্রও এইরূপ কত যুগ চলিয়া গিয়াছে। মিশরীয়, গ্রীক্ ও রোমীয় সভ্যতার পর ইওরোপে যে যুগ আসিল তাহার কেন্দ্রে রহিয়াছেন যীশুখৃষ্ট। তারপর সেখানে আসিল রেনেসাঁ যুগ। আধুনিক শিল্প ও বিজ্ঞানের যুগকে অনেকে কার্ল মার্কসের যুগও বলিয়া থাকেন। কথাটা উড়াইয়া দিলে চলিবে না।

ডায়ালেকটিকস-এর ব্যাখ্যায় ইতিহাসের জড়বাদমূলক বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া একদল পণ্ডিত যাহাই বলুন, একথা অনস্বীকার্য যে এক-একজন মহামানবকে কেন্দ্র করিয়াই এক-একটা যুগ চলিয়াছে এবং তাঁহারা মানুষের ভাবরাজ্যে বিপ্লব আনিয়া সভ্যতার ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। রাজা বা রাষ্ট্রের প্রভাবই বলি, অর্থনীতি বা বিজ্ঞানের প্রভাবই বলি—সবই সত্য হইলেও সেই ভাব বিপ্লবকে কেন্দ্র করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ভগবান বুদ্ধকে বাদ দিলে মহারাজ অশোক কোথায় বিলীন হইয়া যান—কোথায়ই বা থাকে তাঁহার সাম্রাজ্য বা বহির্ভারতে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব? যীশুখৃষ্টকে বাদ দিয়া ইওরোপীয় সভ্যতার যাহা বাকী থাকে তাহার মূল্য কতটুকু? বস্তুতঃ মানবজাতির সভ্যতার ইতিহাস বুদ্ধ ও খৃষ্টকে বাদ দিয়া রচিত হয় নাই। হজরত মহম্মদ না আসিলে ইসলাম-কৃষ্টি কোথায় থাকিত? পরিশেষে—কার্ল মার্কস্ না আসিলে রাশিয়ার বর্তমান রূপান্তর ঘটিত কি?

বুদ্ধ হইতে মার্কস্ পর্যন্ত পৃথিবীতে অনেক মহামানবের অভ্যুদয় হইল—সভ্যতার অগ্রগতিতে অনেকগুলি যুগ আসিয়াছে ও গিয়াছে, কিন্তু এখনও তো মানুষের সমস্যার সমাধান হইল না। যে দেশেই হউক, বা যে ধর্মেই হউক—মহামানব যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা প্রত্যেকেই চাহিয়াছেন মানুষে মানুষে ভেদবুদ্ধি দূর করিতে, তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রেমের এবং সাম্যের বাণী শুনাইয়াছেন। কিন্তু তবু তো আজও মানব সমাজে প্রেম ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইল না। প্রকৃত পক্ষে মানুষে মানুষে দ্বন্দ্বই আজ পর্যন্ত মানব জাতির প্রধানতম সমস্যা। ভগবান বুদ্ধ অহিংসার কথা বলিলেন, তাঁহার প্রভাবে মনে হয় যেন অহিংসানীতি হিংসাবৃত্তিকে জয় করিল,

কিন্তু তাহাও কালের স্রোতে ভাসিয়া গেল। কেন? হয়তো বা ভগবান বুদ্ধের নেতিবাচক (negative) দর্শনের জন্য। বুদ্ধ যে মুক্তির সন্ধান দিলেন তাহার পরিণতি নির্বাণে, নেতিবাচক শূন্যতায়। কিন্তু মানুষের মন শূন্যতায় তৃপ্ত হয় না। সে চায় পূর্ণতার সন্ধান। সে চায় রূপের আশ্রয়—'পজিটিভ' কিছু। তাই বোধ হয় নিরাকার ব্রহ্মও মানুষের কল্পনায় রূপের সীমানায় ধরা পড়িয়াছেন, এবং উপনিষদ্ দিয়াছেন সেই পূর্ণতার সন্ধান—সচ্চিদানন্দের পূর্ণতা। তারপর—বুদ্ধ অহিংসার কথা ও মানব-দরদের কথা বলিলেন সত্য, কিন্তু কেন আমি অপরের প্রতি দরদী হইব, কেন হিংসা করিব না—এই প্রশ্নের উত্তর তিনি দেন নাই। মানুষ যখন এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর খুঁজিয়া পাইল না, তখন আর সে ঐ অহিংসা-মন্ত্রে নিষ্ঠা রাখিতে পারিল না।

আসিলেন যীশুখৃষ্ট। খৃষ্টধর্মের মূলমন্ত্র তিনি দিলেন: প্রতিবেশীকে ভালবাসো, শত্রুকেও ভালবাসো। কিন্তু তিনিও ঐ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। কেন আমি আমার প্রতিবেশীকে এবং আমার শত্রুকে ভালবাসিব? তাহাদের সঙ্গে আমার কোথায় প্রেমের সম্পর্ক? তাই খৃষ্টধর্ম অর্ধেক পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িলেও সেই ধর্মের কাঠামো-টুকুই শুধু আজ বজায় রহিয়াছে। যীশুখৃষ্ট সত্য-সত্যই আজ ইওরোপ হইতে নির্বাসিত। অন্যান্য মহামানব—যাঁহারা অতীতে প্রেমের কথা বলিয়াছিলেন তাঁহারাও ঐ 'কেন' প্রশ্নের উত্তর দেন নাই।

কার্ল মার্কস্ সাম্যের বাণী শুনাইলেন। তিনি জড়বাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন তাঁহার নীতি—বৈজ্ঞানিক জড়বাদ। কিন্তু তথা-কথিত বৈজ্ঞানিক জড়বাদীয় বিশ্লেষণে মানুষের পরিচয় কি? জড় বিজ্ঞান বলে, মানুষে আর পশুতে প্রবৃত্তিগত কোনও পার্থক্য নাই। কি মানুষ, কি পশু—যে আদিম প্রবৃত্তিদ্বারা চালিত তাহা হইল: জীবনধারণ ও বংশবৃদ্ধি। সবাই বাঁচিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে এবং বাঁচিয়া থাকিতে হইলে সংগ্রাম করিতেই হইবে, যোগ্যতমই টিকিয়া থাকিবে—(Survival of the fittest). তাই যদি হয় তবে এই বৈজ্ঞানিক জড়বাদ-ভিত্তিক সাম্য কোথায় থাকে? মানুষকে যদি বাঁচিয়া থাকিবার জন্য সংগ্রাম করিতেই হইবে এবং যদি একমাত্র যোগ্যতমই বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারী হয়, তবে মানুষ অপর মানুষকে ভালবাসিবে কেন? সে প্রতিবেশীর সঙ্গে বাঁচিয়া থাকার সংগ্রামে লিপ্ত থাকিবে না কেন—যেমন পশুরা করিয়া থাকে? পশুপ্রবৃত্তিই যদি মানুষের প্রধানতম দুর্দমনীয় প্রেরণা হয়, তবে মানুষও পশুর মতোই বাঁচিবার জন্য পরস্পরের সহিত সংগ্রাম করিবে না কেন? এই তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মত অনুসরণ করিলে বলিতে হয়: প্রেম ও সাম্য কখনও মানুষের ধর্ম হইতে পারে না, হিংসাত্মক দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম।

মার্কস্ এই সংগ্রামের উপর অত্যধিক জোর দিয়াছেন। তাঁহার সাম্যবাদের মূলকথা সংগ্রাম, শ্রেণীসংগ্রাম (struggle and class struggle) আবার বিশেষভাবে প্রণিধান করিবার বিষয় এই যে মার্কস্ নিজেই স্পষ্ট বলিয়াছেন যে সত্যিকার সাম্য হয়তো পৃথিবীতে কোনদিনই আসিবে না—কিন্তু সংগ্রাম চিরকালই চলিবে। তাঁহার মতে মানুষে মানুষে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম করিতে করিতে মনুষ্য-সমাজ সাম্যের দিকে গতিবেগ অর্জন করিবে, কিন্তু পথিমধ্যে যে নূতন সমাজ-ব্যবস্থার উদ্ভব হইবে তাহার সংঘাতে তাহার গতির নিশানা ক্রমাগতই পরিবর্তিত হইতে থাকিবে। কথাটিকে

তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন হেগেল (Hegel)-এর ডায়ালেকটিক মতবাদের সহায়ে,—অর্থাৎ থিসিস এন্টিথিসিস ও সিন্থেসিস (Thesis, Antithesis and Synthesis) নামক ফরমুলার সহায়ে।

মতবাদটি এইরূপ: একটি অবস্থার (বা Thesis-এর) সঙ্গে সংঘর্ষ হইবে তাহার প্রতিকূল অবস্থার (বা Antithesis-এর), এবং এই সংঘাতের ফলে সংশ্লেষণ বা Synthesis আসিবে, কিন্তু সেই সমন্বয় (Synthesis)ই তখন হইয়া দাঁড়াইবে নূতন অবস্থা—Thesis. আসিবে আবার তাহার প্রতিকূল বা বিপরীত—Antithesis, পরস্পর সংঘর্ষ-ফলে দেখা দিবে আবার নূতন সমন্বয় (Synthesis)। ক্রমাগতই এইরূপ সংঘাত ও সমন্বয় চলিতে থাকিবে। কাজেই আজ যে সাম্য বা Synthesis লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য হইতে সমাজ ক্রমাগতই দূরে সরিয়া যাইতে থাকিবে সংগ্রাম ও সংঘাতের মধ্য দিয়া।

এইতো সংগ্রামের চিত্র। সংগ্রাম যদি অনিবার্য সত্য হয়, তবে এই মতবাদ অনুসারেই সাম্য আসিতে পারে না। সংগ্রাম যদি সত্য হয় তবে প্রেম থাকিতে পারে না—যেমন থাকিতে পারে না একই সময়ে দিন ও রাত্রি। পশুপ্রবৃত্তি যদি মানুষের মূল প্রেরণা হয়, তবে মানুষকে অহিংস হইতে বলা আর হিংস্র ব্যাঘ্রকে হিংসা বর্জন করিতে বলা—একই কথা। মার্কসীয় সাম্যবাদের মূলে যে দর্শন রহিয়াছে সেই দর্শন সংগ্রামের—তথা হিংসার দর্শন। সেই দার্শনিক তত্ত্ব অনুযায়ী প্রেরণার ক্ষেত্রে মানুষে আর পশুতে কোনও তফাৎ নাই। তাই মার্কস্-পন্থী সাম্যবাদের দেশ রাশিয়ায় ৪০ বৎসরেও প্রেম আসে নাই—হিংসা বর্জিত হয় নাই। রুশদেশে সাম্যবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে (সরকারী স্বীকৃতি) সহস্র সহস্র লোকের জীবন বলি দেওয়া হইয়াছে। কাহাদের জীবন লওয়া হইয়াছে?—একদিন যাহারা ছিল কর্মের সাথী, দুর্দিনের বন্ধু, সংগ্রামের সহচর—একদিন যাহারা প্রাণে প্রাণ মিলাইয়া, হাতে হাত মিলাইয়া, পাশে দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করিয়াছিল। আবার দেখি সাম্যবাদী রাষ্ট্র প্রতিবেশী রাজ্যের অসহায় নরনারীর প্রাণ তোপের মুখে উড়াইয়া দিতেও দ্বিধা করিল না। তোপের খাদ্য এই হতভাগ্য কাহারা?—আদরের 'জনগণ'ই।

এখন প্রশ্ন জাগে যুগ যুগ ধরিয়া এত প্রেম ও সাম্যের বাণী বিঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও আজও কেন সাম্য আসিল না—প্রেম আসিল না—হিংসা বর্জিত হইল না? উত্তরে বলা যায় বুদ্ধ ও খৃষ্ট হইতে মার্কস্ পর্যন্ত অনেকে অহিংসা বা প্রেম বা সাম্যের মন্ত্র দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা কেহই এই প্রশ্নের উত্তর দেন নাই যে কেন মানুষ হিংসা বর্জন করিবে—প্রেম বিলাইবে, সাম্য স্থাপন করিবে, কেন একে অপরকে ভালবাসিবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন উপনিষৎ —'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্' —এই সকলই ব্রহ্ম, সকলই আত্মস্বরূপ। তারপর আবার কত যুগ পরে এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। সহজ সরল ভাষায় রামকৃষ্ণ বলিলেন: জীব যে শিব, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করতে হবে। ঠাকুরের কাছে এই শাশ্বত সত্য চাক্ষুষ হইয়া ধরা দিল। তাই তিনি বলিতেছেন: দেখি কি ঐ মানুষ, গরু, ঘাস, জল, সব খোলগুলির ভিতরেই সেই এক সচ্চিদানন্দ রয়েছেন। ঠিক ঠিক দেখতে পাই—মা যেন নানা রকমের চাদর মুড়ি দিয়ে নানা রকম সেজে ভেতর থেকে উঁকি মারছেন। কালীঘরে পূজা করতাম—হঠাৎ দেখিয়ে দিলে সব চিন্ময়—কোশাকুশী, বেদী, ঘরের চৌকাঠ—সব চিন্ময়। মানুষ, জীবজন্তু—সব চিন্ময়। তখন উন্মত্তের ন্যায় চতুর্দিকে পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলাম।

এতদিনে প্রশ্নের উত্তর মিলিল—কেন আমি প্রতিবেশীকে ভালবাসিব—কেন আমি শত্রুকে ভালবাসিব ?—সকলেই যে আত্মস্বরূপ। তুমি ও আমি যে এক। সকলেই যে একই মহাসাগরের ঊর্মি-মালা। "Christs and Buddhas are waves on the boundless ocean, which *I am*" ('আমি' সেই অসীম সমুদ্র, খৃষ্ট বুদ্ধ যাহার তরঙ্গমাত্র)—বলিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। যে সত্য উপনিষদের ঋষিদের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল—সেই সত্য আবার ধরা দিল শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যদৃষ্টিতে, সেই সত্যই মন্ত্রাকারে ধ্বনিত হইল স্বামীজীর কণ্ঠে :

ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়।

রচিত হইল নূতন করিয়া মানবজাতির জীবনবেদ—বিরাটের উপাসনার মহামন্ত্র। স্বামীজীর এই জীবনবেদের মূলমন্ত্র নেতিবাচক অহিংসা নয়—তাঁহার মূলমন্ত্র অস্তিবাচক প্রেম। স্বামীজী বলিলেন, "তিনি সমষ্টিরূপে সকলের প্রত্যক্ষ। অতএব যখন জীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ অভিন্ন, তখন জীবের সেবা ও ঈশ্বরে প্রেম দুইই এক।" তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে, 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব', স্বামীজী বলিলেন, 'দরিদ্র-দেবো ভব, মূর্খদেবো ভব'। এইরূপে উদ্‌গীত হইল নরনারায়ণ-গীতা।

মানুষের পশুবৃত্তিকে স্বামীজী একেবারে অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু তাহাই মানুষের চরম পরিচয় নয়। স্বামীজী বলিলেন, প্রত্যেকের মধ্যে অনন্ত দেবত্ব লুক্কায়িত রহিয়াছে—"Each soul is potentially divine."

'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'—উপনিষদের এই বাণী পুনরাবৃত্তি করিয়া মানুষের দেবত্বের যে জীবনবেদ, যে দর্শন স্বামীজী ঘোষণা করিলেন তাহাই স্বামীজীর মতে সাম্যবাদের ভিত্তি। যতদিন না মানুষ এই জীবনবেদ গ্রহণ করিতে পারিবে ততদিন পৃথিবীতে প্রকৃত সাম্য আসিবে না। কিন্তু প্রশ্ন হইল—এই জীবনবেদ কি মানুষ কখনও গ্রহণ করিতে পারিবে? আজিকার পরিস্থিতি দেখিয়া ইহা অসম্ভব মনে হইলেও একথা নিশ্চিত যে মনুষ্যজাতিকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে সাম্যের এই দার্শনিক ভিত্তি গ্রহণ করিতেই হইবে। বিজ্ঞান একা মনুষ্যজাতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না, বরং ধ্বংসের মুখেই ঠেলিয়া দেয়, তাহা বারে-বারেই প্রমাণিত হইয়াছে ও হইতেছে। এই ধ্বংসলীলা রোধ করিতে পারে একমাত্র বৈদান্তিক সাম্যদৃষ্টিমূলক জীবনদর্শন এবং জগৎকে সেই জীবনবেদ দান করিতেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব। মনুষ্যজাতিকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে এই জীবনবেদ গ্রহণ করা ছাড়া তাহার গত্যন্তর নাই। একথা কল্পনা করিতে কোনও দিব্যদৃষ্টির প্রয়োজন হয় না যে মানুষ একদিন হিংসা দ্বেষ ও দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠিবেই, এবং আরও একটি ভবিষ্যদ্বাণীও খুব সহজেই করা যায় যে বিবর্তনের পথে মানুষ নিশ্চিতই এতখানি অগ্রসর হইবে যে একদিন—হয়তো হাজার বৎসর পরে—আমাদের বর্তমানের গর্বের বৈজ্ঞানিক যুগ, এই বিংশ শতাব্দী ইতিহাসের পাতায় 'প্রধানতম বর্বর যুগ' বলিয়া অভিহিত হইবে, এবং সেদিনের বিচারে হিরোসিমা ও নাগাসাকির ধ্বংসলীলার এই বিজ্ঞানাভিমানী যুগ 'বর্বর যুগ' বলিয়া ইতিহাসের পাতায় কলঙ্কের অক্ষরে অঙ্কিত হইবে। মনুষ্যজাতি যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া হিংসার পথে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে না, একথা অবধারিত সত্য। মানবজাতি অবশ্যই বাঁচিয়া থাকিবে এবং বাঁচিয়া থাকিবে বলিয়াই স্বামীজীর বৈদান্তিক সাম্যের বাণী এই আণবিক যুগের অব্যবহিত পূর্বেই বিজ্ঞানাভিমানী দেশেই ধ্বনিত হইয়াছে। এই বাণী মানুষকে শুনিতেই হইবে,

'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব শুধু ভারতের কল্যাণের জন্যই নয়, সমগ্র মানবজাতির মুক্তির জন্য, তাই স্বামীজীকে জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিতে হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁহাকে এই মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই ইঙ্গিতে—ইঙ্গিতে কেন, অমোঘ নির্দেশে স্বামীজীকে আমেরিকা ও ইওরোপ যাইতে হইয়াছিল। পাশ্চাত্যে চৈতন্যের বাণী—বৈদান্তিক সাম্যের বাণী বহন করিয়া তিনি নূতন যুগের সূচনা করিয়া গিয়াছেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যুগ অতীতের ইতিহাস নয়, পিছনে নয়—সম্মুখে রহিয়াছে, তাহার সূচনামাত্র হইয়াছে। সম্মুখে আগতপ্রায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-যুগ ঝুটা সাম্যের যুগ নয়, জগতে প্রকৃত সাম্যের যুগ। আমাদের নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে যে কার্ল মার্কসের যুগ অস্তমিতপ্রায় এবং সারা পৃথিবীতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-যুগ সমাসন্ন। স্বামীজী ঘোষণা করিয়াছিলেন: "জগৎ রামকৃষ্ণের হইয়া গিয়াছে"—একথা স্তুতিবাচক উক্তি নয়। জগৎকে বাঁচিতে হইলে রামকৃষ্ণকে ধরিতেই হইবে এবং মানুষ বাঁচিবে বলিয়াই রামকৃষ্ণকে ধরিবে।

এই অনাগত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-যুগের মূলমন্ত্র 'প্রেম ও সাম্য'। এই সাম্য জড়বাদভিত্তিক নয়—চৈতন্যবাদভিত্তিক। মানুষ যে সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছে তাহার মাপকাঠি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নয়, চৈতন্যের আবিষ্কার। "জড়ের মধ্যেও তিলে তিলে চৈতন্যের আবিষ্কারই সভ্যতার ইতিহাস"—স্বামীজীর এই কথাই সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা।

জগতে নবযুগের প্রবর্তন করিতে স্বামীজী যে সাম্যের মন্ত্র দিলেন, তাহার ভিত্তি আধ্যাত্মিক হইলেও তাহার বাস্তব দিক রহিয়াছে। আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ হইয়াও স্বামীজী ছিলেন বাস্তববাদী এবং তাঁহার ধ্যানের সাম্যবাদে জীবনের বাস্তব দিকও ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাই তিনি চাহিয়াছিলেন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। একথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই যে স্বামী বিবেকানন্দই ভারতের সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্রী। তিনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র স্বীকার করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষে তিনিই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন: I am a socialist—(আমি একজন সমাজতন্ত্রী)। তখন এদেশে কেহ সমাজতন্ত্রের নামও শোনে নাই। স্বামীজীর এই ঘোষণা শুধু কথার কথা নয়। তিনি শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুত্থানকে কলকণ্ঠে স্বাগত জানাইয়াছিলেন। তিনি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে পৃথিবীতে ব্রাহ্মণের ও ক্ষত্রিয়ের আধিপত্য-যুগ চলিয়া গিয়াছে, *এখন* চলিতেছে বৈশ্যের বা *capitalist* ব্যবসায়ীদের যুগ, এই যুগও শেষ হইতে চলিয়াছে। ইহার পরে অনিবার্যরূপে আসিতেছে শূদ্রের বা শ্রমিকদের (proletariat) যুগ। সেই যুগকে তিনি অভিনন্দিত করিতেছেন। কেন? এই কারণে যে সেই ব্যবস্থায় ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও অনেকখানি অর্থনৈতিক সাম্য আসিবে। বহুর কল্যাণের জন্যই তিনি শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুদয় ও সমাজতন্ত্র চাহিয়াছেন। তিনি যে বিরাটের উপাসনা করিতে দেশবাসীকে আহ্বান জানাইয়াছিলেন তাহাতেও এই সাম্যের কথা স্পষ্ট ধ্বনিত হইয়াছে।

এই সাম্যবাদের মূলে যে জীবনবেদ রহিয়াছে তাহা ভারতের শাশ্বত বাণী। ভারতের এই শাশ্বত বাণী পুনরাবিষ্কার করিয়া স্বামীজী যেদিন গাহিলেন, 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?'—সেইদিন হইতেই ভারতের বুকে স্বামীজীর যুগ আসিয়াছে এবং সেই যুগই চলিতেছে। গান্ধীজীর যুগ সেই যুগেরই অন্তর্যুগ, একটি ঢেউ-বিশেষ। জাতীয় জাগরণ—রাজ-

নৈতিক চেতনা, জনকল্যাণ-আন্দোলন এ-সবও স্বামীজীর যুগেরই বিভিন্ন স্রোতোধারা। ভারতের প্রাণ-বহ্নি স্তিমিতপ্রায় হইয়াছিল, সেই বহ্নি-শিখা স্বামীজী আবার প্রদীপ্ত করিলেন, পূর্ণ-দ্যুতিতে সেই প্রাণবহ্নি আবার জ্বলিয়া উঠিল। তাহারই ফলে দেখা দিল ভারতের সর্বক্ষেত্রে নব-জাগরণ।

ভারত আবিষ্কার করিয়াছিল মানুষের দেবত্ব, পাশ্চাত্য আবিষ্কার করিয়াছে মানুষের পশুত্ব। পাশ্চাত্যের আবিষ্কারের বিভ্রম ভারতমানসকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেই মেঘাচ্ছন্ন মোহাচ্ছন্ন ভারতমানসকে মুক্ত করিলেন, ভারত তাহার অন্তরের আলোক ফিরিয়া পাইল। তারপর যেদিন স্বামীজী ভারতের জীবনবেদের বাণী লইয়া প্রতীচ্য অভিযানে বাহির হইলেন সেইদিন হইতে জগতে নূতন যুগের—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-যুগের সূচনা। কেননা, সেইদিন হইতে ভারতবর্ষ সমগ্র জগৎকে মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিতে শুরু করিয়াছে।

আজ যুগসন্ধিক্ষণে চলিয়াছে ভারতের ও *প্রতীচ্যের মধ্যে আদর্শের প্রচণ্ড সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষে* জয় হইবে মানুষের, জয় হইবে মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের। প্রেমের উদয় হইবেই—সত্যিকার সাম্যও আসিবে, কেননা মানুষের বিবর্তন বন্ধ হইতে পারে না। একদিন সে উপলব্ধি করিবেই যে সকলেই আত্মস্বরূপ—মানুষে মানুষে কোনও ভেদ নাই, প্রেম তাহার শাশ্বত ধর্ম, সাম্য তাহার অনাদিকালের জীবনদর্শন।*

এই মহাযুগের প্রত্যূষে সর্বভাবের সমন্বয় প্রচারিত হইতেছে এবং এই অসীম অনন্তভাব—যাহা সনাতন শাস্ত্র ও ধর্মে নিহিত থাকিয়া এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা পুনরাবিষ্কৃত হইয়া উচ্চ নিনাদে জনসমাজে ঘোষিত হইতেছে। এই নব যুগধর্ম সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান …।

—**স্বামী বিবেকানন্দ**

*[বালককাল হইতেই স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত নৃত্যগোপাল ১৯২১ খৃঃ অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালেই অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন, ১৯২২ খৃঃ নিজ গ্রামে সমাজ-সেবার উদ্দেশ্যে 'বিবেকানন্দ কর্মমন্দির' স্থাপন করেন। ১৯৩০খৃঃ এম.এ পড়ার সময় তিনি বেঙ্গল অর্ডিনান্সে ধৃত হন, এবং ছয় বৎসর বিভিন্ন বন্দী-নিবাসে আটক থাকার পর মুক্তি পান। নৃত্যগোপাল মেধাবী ছাত্র ও শক্তিমান্ লেখক ছিলেন, বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও উদ্বোধনে তাঁহার বহু প্রবন্ধ ও অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৫৭ খৃঃ আগষ্ট মাসে ছয় বৎসর কঠিন রোগভোগের পর মাত্র ৫০ বৎসর বয়সে এই অমূল্য জীবনদীপ নির্বাপিত হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধটি দুই বৎসর পূর্বে স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে রচিত ও লেখক কর্তৃক পঠিত।—উঃ সঃ]

গীতায় জীবন-সাধনা

শ্রীমতী ঋতা চক্রবর্তী

অগ্রহায়ণের শুক্লা একাদশী তিথি ভারতের ইতিহাসে এক বড় শুভদিন। প্রায় তিন হাজার বৎসর আগে আমাদের এই ভারতভূমিতে এক মহাসমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে পাণ্ডব ও কৌরববাহিনীর সিংহনাদ ও কলরবে দিগন্ত মুখরিত হইতেছিল, এমন সময়ে অর্জুন-সারথি কৃষ্ণ উভয় সেনার মাঝখানে রথখানি রাখিলে স্বজনদিগকে বধ করিতে হইবে ভাবিয়া অর্জুন যুদ্ধ হইতে নিরস্ত হইতে চাহিলেন। এমন সময়ে সারথি শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কর্তব্য কর্মে প্রবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে গীতায় বর্ণিত চরম জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছিলেন।

নানাদিক দিয়া গীতাগ্রন্থের নূতনত্ব দেখা যায়। শ্রীভগবান স্বয়ং উপদেষ্টা—ইহা নূতন, শ্রীভগবান স্বয়ং সারথি—ইহাও নূতন। বস্তুতঃ গীতায় অর্জুনের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে সম্বন্ধ দেখানো হইয়াছে, তাহাই মানুষের সহিত ভগবানের সম্পর্কের আদর্শ। কিন্তু একথা পূর্বে কেহ জানিত না। ইহাতে দেখানো হইয়াছে যে ভগবান বিশ্বব্যাপী, বিশ্বাতীত, অনাদি, অনন্ত হইয়াও মানুষের সহিত সরল সম্বন্ধ স্থাপন করেন, মানুষ সাজিয়া মানুষের মত ব্যবহার করেন। গীতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গী। নানা মতের সমন্বয়ের চেষ্টা অন্যত্রও দেখা যায়, কিন্তু গীতার সমন্বয় স্বাভাবিক, যৌক্তিক এবং হৃদয়স্পর্শী। ভারতের প্রাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের বাণীই ভারতের মর্মবাণী। ইহার আলোকেই ভারত চিরদিন সকল সমস্যার সমাধান করিয়া আসিতেছে।

একদিন ছিল, যখন যজ্ঞই ছিল ধর্ম। কিন্তু যখন উপনিষদের ঋষি জ্ঞানের আদর্শ উপস্থাপিত করিলেন, তখন অনেকেরই মনে হইল যে জ্ঞানের পথই পথ, কর্মের পথ পথ নহে। তারপর প্রশ্ন উঠিল: ব্রহ্ম কি নির্গুণ না সগুণ? অনেকে নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণা কঠিন মনে করিয়া সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাকেই প্রকৃত ধর্ম বলিয়া বরণ করিলেন। আর এক মতানুসারে ভক্তিপথই ঈশ্বরলাভের পথ।

এইরূপ ভাব-সংকটে শ্রীভগবান ছাড়া আর কে পথ নির্দেশ করিবেন? ভারতাত্মা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, সংকট উপস্থিত হইলে যতবার প্রয়োজন ততবারই তিনি অবতীর্ণ হইবেন। বস্তুতঃ তাঁহার গীতার বাণীতেই এই সকল সমস্যার চিরন্তন সমাধান সম্ভব হইয়াছে। গীতা মীমাংসকের কর্মবাদ গ্রহণ করেন নাই, উপনিষদের কর্মত্যাগ-নীতিও গ্রহণ করিতে বলেন নাই। গীতা মতে কর্মের ফলত্যাগই ত্যাগ। গীতা বহুদেবতাবাদী নহেন, কিন্তু পুরাণে যে সকল দেবদেবীর কথা বলা হইয়াছে তাহাদিগকেও অস্বীকার করেন নাই—সকল দেবদেবীই এক ভগবানের বিভিন্ন প্রকাশমাত্র।

গীতা উপনিষদের সার। গীতার প্রত্যেকটি অধ্যায় একটি যোগ, গীতার সার কথা 'যোগ': 'হে অর্জুন তুমি যোগী হও'। কিন্তু এই যোগ পতঞ্জলির যোগ নহে। ইহা সকল যোগের সমন্বয়—জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগের সমন্বয়। ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য পরমাত্মার সহিত যুক্ত হওয়া আত্মকেন্দ্রিক জীবনকে শ্রীকৃষ্ণ-কেন্দ্রিক জীবনে পরিণত করা, মানবজীবনকে ভাগবত জীবনে পরিণত করার চেষ্টাই সাধনা। ইহাই গীতার শিক্ষার সার। গীতার ভক্তিযোগে যে গুণাতীত সগুণ ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে তাহাই প্রকৃত ঈশ্বরবাদ। শ্রীভগবান বলিয়াছেন, যিনি যে ভাবেই যাহা কিছুর উপাসনা করুন না কেন, তাহার আরাধনার বস্তু আমিই।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।

—শ্রীমুখের এই মহাবাক্য সর্বকালের ও সর্বযুগের মহাবাক্য। জগতের কোন ধর্মাবলম্বীর সহিত ইহার বিরোধ নাই। একমাত্র গীতাশ্রয়েই সর্বধর্মের সমন্বয় হইতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখেও এই বাণীই পুনরায় ধ্বনিত হইয়াছে।

পরমহংসদেবের ভাষা সহজ বাংলা, ঘরোয়া কথা: একই পুকুরের চার ঘাটে চারজন স্নান করে, জল তোলে, বাসন মাজে, কাপড় কাচে। সকলের একই জল, কিন্তু কেউ বলে 'জল', কেউ বলে ওয়াটার, কেউ 'আপ', কেউ 'পানি'—যার যেমন ভাষা। এ যেন বেদের ঋষিরই কথা—'একং সদ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। আর সেই বহুরূপী গিরগিটির কথা: গিরগিটির রং কখনও লাল, কখনও নীল, কখনও বা হলুদ, কখনও বা কোন রঙই নেই—কিন্তু একই গিরগিটি। উপনিষদের অরূপ ব্রহ্মের নানারূপ ধারণের এমন সহজ দৃষ্টান্ত খুব কমই আছে। উপনিষদ বলিয়াছেন, 'যো একো হবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি' এ যেন সেই অরূপের রূপ দর্শনেরই কথা। ঠাকুরের উপদেশের মধ্যে সগুণ নির্গুণের সমন্বয়ের বাণীরও অভাব নাই। যিনি সাকার তিনিই নিরাকার। সচ্চিদানন্দ-সমুদ্রের জল ভক্তিহিমে জমিয়া বরফ হয়। ভক্ত ভগবানকে সগুণ এবং সাকার দেখেন।

ঠাকুর বলিতেন, বারবার গীতা কথাটি উচ্চারণ করিলে গীতার অর্থ বোঝা যায়—ত্যাগী, ত্যাগী। সাধনার দিক দিয়া দেখিতে গেলে আসক্তি ত্যাগের সাধনাই গীতার সাধনা। ঠাকুর অবশ্য সাত্ত্বিক ত্যাগের কথাই বারবার বলিয়াছেন। *আগে ঈশ্বর, তারপর সংসারের কাজ।* যে বুড়ি ছুঁইয়াছে, তাহার আর ভয় নাই। যাহার ঘাড় ঠিক হইয়া গিয়াছে, সে কলসী মাথায় নিয়াও নাচিতে পারে। আর এক সঙ্গে পাঁচ সাতটা কাজ করিলেও মনটি রাখিতে হয় ঈশ্বরে। আসক্তির শেষ রাখিতে নাই, যদি নাচিতেই হয়, তাহা হইলে দুই হাত তুলিয়া নাচাই ভাল। এক বগলে অহংকারের রেশমী সুতো লুকাইয়া রাখিয়া আর এক হাত তুলিয়া নাচিলে তেমন আনন্দ হয় না। ঠাকুর বলিতেন, 'কলিতে নারদীয়া ভক্তি'। বানর-ছানার মত মাকে আঁকড়াইয়া থাকার শক্তি সকলের নাই, কিন্তু বিড়াল-ছানার মত মায়ের উপর নির্ভর করিয়া পড়িয়া থাকার চেয়ে সহজ স্বাভাবিক পথ আর কি হইতে পারে? ইহাই গীতার শরণাগতি বা প্রপত্তির কথা।

জীবনের সকল রকম সমস্যা—সে সব সমস্যা সর্বদাই মানব সমাজে দেখা দিয়াছে, কেবল সমাজে নয়—আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যেও যে সব সমস্যার উদয় হয়, তাহাদের সমাধান আমরা গীতার ভিতর পাই। মোহগ্রস্ত অবস্থাতে অর্জুন যে ধর্মসংকটের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, সেইরূপ সংকটের সম্মুখীন আমাদেরও হইতে হয়।

আমাদের জীবনেও অনেক সময় আমরা কর্তব্যকে মোহবশে উপেক্ষা করিতে চাই, বুঝিতে পারি না। নির্ধারিত কর্মের ফলাফল বিবেচনা করিতে গেলে প্রকৃত কর্তব্য সাধন করা চলে না। নিরভিমান কর্মীর কর্মফলের বাসনা ত্যাগের নামই যথার্থ ত্যাগ। এই ভাব কি করিয়া লাভ করা যায়, সংসারভয়ে ভীত ব্যক্তি কি করিয়া সংসারের কঠোর কর্তব্যের সম্মুখীন হইবেন, তাহারই সমাধান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের প্রাঙ্গণে আত্মীয়-নিধনে কাতর অর্জুনকে উপদেশ দিবার ছলে জগৎকে শুনাইলেন:

যাহা কিছু করিবে সমস্তই আমাতে অর্থাৎ ঈশ্বরে অর্পণ করিবে। আরও বলিলেন:

তোমার কেবল কর্তব্য সম্পাদন করিবার অধিকার আছে। কিন্তু ফল প্রত্যাশা করিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই, কর্মের ফল-কামনায় তোমার যেন প্রবৃত্তি না জন্মে এবং কর্ম ত্যাগ করিতেও যেন তোমার আগ্রহ না হয়। এইরূপে গীতার মাধ্যমে আমরা কর্মময় জীবনের সমস্যার মূল সমাধান খুঁজিয়া পাই। দুঃখ দৈন্য দুর্বলতা দূর করিয়া সুখ শান্তির সন্ধান পাই। সমগ্র *জীবন হইয়া ওঠে এক অবিরাম সাধনা।**

* যোগপুর গীতা-জয়ন্তী-উৎসবে পঠিত।

স্বামী তুরীয়ানন্দের কথাসংগ্রহ

স্বামী রাঘবানন্দ-লিপিবদ্ধ

[পূর্বানুবৃত্তি]

আলমোড়া, ৪ঠা নভেম্বর, ১৯১৫

স্বামী তুরীয়ানন্দ : স্বামীজী বলতেন, 'মনটাকে একেবারে কাদার মত করতে হবে।' কাদা যেমন যেখানে মারবে সেখানে থেকে যাবে, মনটা তেমনি যে বিষয়ে দেবে সে বিষয়ে লেগে থাকবে, উঠাবার কি জো আছে?

কারো শরীর কাজের জন্য তৈরী, কারো বা ভজনের জন্য। কাজের জন্য একটা hankering (বাসনা) না হ'লে কাজ হবে না, তামসিকতা যাবে না, স্বামীজীর কাজ এলে তাতে পেছ-পা হবে না, খুব করবে। আবার যখন ধ্যানে বসবে, তখন কাজের কথা ভুলে যাবে। শরৎ প্রভৃতি খুব কাজ করতে পারে, আবার ধ্যান-ধারণাও পারে। আমারও ঐ রকম ছিল।

মনে কিছু গ্রহণ করাও পরিগ্রহ। যেমন তুমি বলছ, এখন ছ'মাস তো চলুক এ টাকায়, এটা পরিগ্রহ। মনে মনে একটা ঠিক ক'রে রেখেছ যে, এই রকম। এই পরিগ্রহ থেকেই জন্ম-টন্ম (দেহপরিগ্রহ) যা কিছু। তোমার মন যেখানে রয়েছে সেখানে তুমি রয়েছ।

পরিগ্রহ না করলে তোমায় কোথায় থাকতে হবে? তোমাকে আত্মায় থাকতে হবে। একটা practice (অভ্যাস) তোমায় highest (সর্বোচ্চ) স্তরে নিয়ে যাবে। মহাপুরুষরা মনে কিছু মতলব রাখেন না। যেখানে রয়েছেন সেখানেই থাকেন। কেউ নিয়ে গেল তো গেলেন। তাঁদের কোন আঁট থাকে না, তাঁদের মন যেন এলিয়ে গেছে।

এই ঝগড়া হ'ল তো এই ভাব, মহাপুরুষদের যেন ছোট ছেলের স্বভাব। সাংসারিক লোকের কারো সঙ্গে ঝগড়া হ'ল তো জন্মে আর তার সঙ্গে কথা হবে না, সে দিক দিয়ে যাবে না।

আমার কতগুলো সুবিধা হয়ে গিয়েছিল। শরীর ভাল পেয়েছিলাম, মনও তিনি দিয়েছিলেন ভাল এবং সহও হয়ে গিয়েছিল। পরিগ্রহ করতাম না। ঠাকুর বলতেন, 'খুব সরল উদার হবে'। মন open (খোলা) হবে। যত গোপন করবে, চাপবে—যত প্যাঁচ মারবে তত প্যাঁচ লেগে যাবে, তত বসে যাবে। অনেক তপস্যার ফলে মন সরল উদার হয়। যদি মনে করলাম, বাড়ী না গেলে নয়, তবে আমার যেতেই হবে—এ পরিগ্রহ।

আমি টাকাকড়ি লোকের কাছে চাইতে পারি না, আর চাইতে কখনও হয়নি। কারণ এ সাহস মা সব সময় রেখেছেন যে, 'নারায়ণ হরি' বলে লোকের বাড়ী ভিক্ষা ক'রে খেতে পারি। এ সাহস এখনও আছে, এখনও ভিক্ষা ক'রে খেতে পারি। তবে তা হ'লে পাতাল-দেবীতে* থাকতে হবে। যার যেটা শোভা পায়। তা না ক'রে ট্রাঙ্ক সঙ্গে রাখা ও রেঁধে বেড়ে খাওয়া—এ সব সাধুর ঠিক নয়। সর্বদা হুঁশিয়ার থাকতে হয়। উপনিষদে আছে, 'যুক্তেন মনসা সদা সমনস্ক সদশ্বা ইব সারথেঃ।' তা কি সোজা ব্যাপার? তোমরা ভাল আশ্রয়ে এসে পড়েছ। তোমাদের সাত খুন মাপ। তবে

* আলমোড়া শহরের একপ্রান্তে অবস্থিত মন্দির

অকপট হতে হবে। যীশু বলেছিলেন : যে মুখে শুধু 'প্রভু' 'প্রভু' বলে সে নয়, যে প্রভুর ইচ্ছানুসারে কাজ করে—সেই তাঁকে পাবে।

ঠাকুর কামিনী কাঞ্চন স্পর্শ করতে পারতেন না। এ দুটো থেকে বাঁচতে হবে। আমরা কত দিন পয়সা ছুঁইনি। রসনার, জিভের সেবা করেই কি দিন যাবে? জিভকে চোখ রাঙিয়ে রাখতে হবে। এই দিচ্ছি, খুব। পাঁচ ব্যঞ্জন খাওয়া ভারি রাজসিক। ডাল চচ্চড়ি অম্বল, যথেষ্ট। আমার শরীর খুব ভাল ছিল, কিছুতেই পেছ-পা নয়। মনটা খুব strong (শক্ত) ছিল, শরীর তাই সব মেনে নিত। আর একটু একটু ক'রে করতে পারতাম না। করতে হবে তো একেবারে। এমন মনে হ'ত না যে, এত করলে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়বে কিনা। ঐ ভাব মনে পড়তই না। আমার বন্ধুরা বলত, তুই মরে যাবি। আমি বলতাম, যা শালারা, তোরা বড় বেঁচে যাবি। পাঁচ-শ বৈঠক ও এক-শ ডন দিতাম। সাধু হয়ে বেশী হিসাব বুদ্ধি ভাল নয়, দু আনার জন্য মিনমিন করা ঠিক নয়।

১২ই নভেম্বর

ঠাকুর বলতেন, সংসারটা খালি কামের ব্যাপার। সংসার থেকে চলে আসা চারটিখানি কথা নাকি? কটা লোক আছে যারা স্ত্রী-সঙ্গ করেনি। ঠাকুর excited (উত্তেজিত) হয়ে বলতেন, 'কি বলছ? মা এই কটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তাই বেঁচে আছি।'

সংসারকে ঠাকুর বলতেন কূপ। এতে পড়লে আর উঠবার জো নেই। চৈতন্যদেব রঘুনাথকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন, তুমি সংসার-কূপ হ'তে বেঁচে গেলে।

১৩ই নভেম্বর

একবার বুড়ী ছুঁতে হবে। বুড়ী না ছুঁলে বড় ভয়ের কারণ, নাম যশ, বিষয় ইত্যাদি এসে পড়বে। শেষকালে চোর হয়ে বাড়ী ফিরতে না হয়। বুড়ীর কাছে থাকবো—বলাতে ঠাকুরের ধমক। জগৎটাকে মিথ্যা বোধ হওয়া চাই। তা না হ'লে অত ধ্যান-ভজনে কি হ'ল?

কিছুদিন কোমর বেঁধে লেগে বুড়ীটা ছুঁয়ে ফেল না? খালি আশীর্বাদে কিছু হবে না।

* * *

লোককে জব্দ করা মহা সংসারী বুদ্ধি। তুমি জব্দ করছ, কিন্তু তোমার উপর একজন আছেন। তিনি যখন তোমাকে জব্দ করবেন, তখন পালাবার পথ থাকবে না। দিনে যে সব ভ্রম হয়েছে, রোজ রাত্রে তা খতাবে। তবে তো ভ্রম সংশোধন হবে। যেখানেই যাও সেখানেই তুমি যা তাই। তোমার ভিতর যেমন, বাহিরটা সেই রকমই দেখবে—তা স্বর্গেই যাও না কেন। নতুন অবস্থায় পড়লে প্রথমে একটু উদ্বেগ হয়, যেমন জলে ঢিল ফেললে হয়। তারপর তুমি যে রকম তদনুরূপ অবস্থা হবে। তাঁর চরণ ছাড়া আর কোন গতি নেই। আমরা এখানে সেখানে comfort (স্বাচ্ছন্দ্য) খুঁজছি। কিন্তু তাঁর চরণ ছাড়া আর কোন জায়গায় শান্তি নেই। এক রাজা বলেছিল, চামড়া দিয়ে জগৎ মুড়ে দেবে, পায়ে ধুলো লাগবে না। মন্ত্রী এক জোড়া জুতো তৈরী ক'রে দিল, তাইতেই সমস্ত জগৎ চামড়া-মোড়া হয়ে গেল।

যতদিন তোমার আসক্তি রয়েছে—তুমি অনাসক্ত নও, ততদিন তুমি কুত্তা—খড়কুটো; তোমার কোন পদার্থ নেই। খুব ত্যাগ বৈরাগ্য, থাকা চাই, আর পাণ্ডিত্য। আজকাল যারা আসছে তাদের না আছে ত্যাগ, না বৈরাগ্য, না পাণ্ডিত্য,—হট্টগোল করছে, কোনও রকমে দিন গুজরান। দোষ-ত্রুটি খালি নিজের দেখতে হবে, পরের দিকে তাকালেই ভুল করবে। যাক

শালা শরীর। একটু পরিশ্রম ক'রে মনটাকে উপরে তুলে দাও। তারপর শরীর চুরমার হয়ে যাবে।

তাঁর উপর সব ছেড়ে দিতে হবে। একেবারে তাঁতে ঝাঁপ দিতে হবে। নইলে হবে না, হবে না। তারপর তিনি যেমন রাখেন। লোকে কেবল দেহের সুখ চাচ্ছে। কিসে ভাল থাকবে, ভাল খাবে—এই চিন্তা। কেউ কি তাঁকে চায়? এই তো সব এরা বিএ পাস ক'রে এসেছে, কেউ কিছু করছে না। তাঁর জন্য প্রাণ বার করতে হবে, তাঁকে দিতে হবে ষোল আনা মন, তারো উপর কিছু থাকে, 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা' মনপ্রাণ তাঁতে অর্পণ করতে হবে। তিনি যখন যে কাজ দেবেন এই রকম 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা' মন দিয়ে তা ক'রে ফেলতে হবে। সে কাজ ফুরুলে তিনি আবার অন্য কাজ দেবেন। সেটিও প্রাণ দিয়ে করতে হবে। তা এইরূপে তাঁর কাজে প্রাণ বের করতে হবে। তা হলেই দু চারটা কাজ করলে তিনি ছুটি দেবেন। ফকির হতে হ'লে ফিকির ছাড়তে হবে, মতলব ছাড়তে হবে। সম্পূর্ণ তাঁর উপর নির্ভর করতে হবে, তাঁতে ঝাঁপ দিতে হবে ঝুপ ক'রে। নিজের হাতে কিছু রাখলে চলবে না। দেহ মন প্রাণ আত্মা—সব তাঁর হাতে ছেড়ে দিতে হবে, তিনি যা করেন—এই বলে। শরীরকে দেখতে হয় তিনি দেখবেন। লাক্সলে* যখন ছিলাম খুব অসুখ। গঙ্গারাম বললে, মঠে খবর দেব। আমি বললাম, 'খবরদার। চিঠি লিখেছ যদি শুনি তো এই অবস্থায় এখান থেকে চলে যাব। ঐখানেই বলেছিলাম, 'ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং বৈদ্যো নারায়ণো হরিঃ'। সে কি ঢং ক'রে বলেছিলাম? তা নয়। ভিতর থেকে ঠিক ঠিক জানতাম।

* * *

প্রশ্ন—মনে অন্য চিন্তা আসে, কি ক'রে তাড়ানো যায়?

উত্তর—যতই তাঁর চিন্তা করবে ততই অন্য চিন্তা চলে যাবে।

ঠাকুর বলতেন, যতই পূব দিকে এগোবে ততই পশ্চিম দিক পেছিয়ে পড়বে। গঙ্গার স্রোত যেমন তরতর ক'রে বইছে তেমনি মনও তাঁর দিকে তরতর ক'রে বইবে। কিছু দিন এমনি চালাতে পারলেই ব্যস্। তারপর আপনি চলবে।

মনের উপর বড় বড় অক্ষরে লিখে দাও, 'NO ADMISSION'—(প্রবেশ নিষেধ)। তারপর এমন এক সময় আসবে যখন বলতে পারবে, Come one and all—(সকলে এসো)। আমি ঘরের দোয়ার খুলে রাখি বলেই তো লোক আসে, নতুবা বন্ধ ক'রে রাখলে লোক কি ক'রে আসবে? মনে কেন অন্য চিন্তা আসতে দেবে? তুমি দাও বলেই তো আসে।

প্রথম প্রথম শুধু ধ্যান জপ করতে পারবে না। তাই ঝালে ঝোলে অম্বলে খেতে হবে। মাছেরই ঝাল ঝোল অম্বল, অন্য কিছুর নয়। খানিকটা জপ, খানিকটা ধ্যান, খানিকটা পাঠ, খানিকটা গান—এই ভাবে নানা রকমে তাঁরই চিন্তা করতে হবে। কিছুদিন ঐরূপ করবার পর 'এক' চিন্তা করতে পারবে। শুধু জানলে হবে না, করা চাই। আমরা জানি সব, করি না কিছু। স্বামীজী বলতেন, 'আমরা এত বেশী জানি যে, আর একটু কম জানলে ভাল হ'ত।' কিছু কর, কর, কর। কেউ কিছু করে না। তোমাকেই খাটতে হবে, অপর কেউ তো তোমার হয়ে ক'রে দিতে পারবে না। একটা শ্লোকে আছে: তোমার বোঝা অপরে নামিয়ে নিতে পারে, কিন্তু খিদে পেলে তোমাকে নিজেই খেতে হবে, অপরে খেলে হবে না। ঠাকুর গাইতেন:

জলে কি রত্ন মিলে? মন কর প্রাণ অবধি,
ডুব দাও অগাধ জলে সহজ মানুষ ধরবে যদি।

* কনখলের নিকট গঙ্গাতীরে অবস্থিত।

আমরা এক সময়ে খুব করেছি। এখনও এমন অভ্যাস আছে যে, একটু মন দিলেই সেটা আবার ফিরে আসে।

১৭ই নভেম্বর

প্রশ্ন—ইন্দ্রিয়ের মোড ফিরানো যায় কি ক'রে?

উত্তরে প্রথমে বললেন, আমি কি জানি? এই বলে চুপ ক'রে রইলেন। পরে এই তিনটি গান গাইলেন:

(১) নামেরি ভরসা কেবল শ্যামা গো তোমার

(২) শ্রীদুর্গা নাম ভুল না

(৩) কেন মন ভোল, শ্রীদুর্গা বল।

মালিশ শেষ হইলে স্বামী তুরীয়ানন্দ উঠিয়া বসিলেন এবং বলিতে লাগিলেন:

কখনো কখনো কথাবার্তা বন্ধ ক'রে খুব তাঁর জপ করতে পার? দেখ কিছু না থাকলে কিছু জমে না। যে দিন আনে দিন খায়, সে কিছু জমাতে পারে না। কিন্তু একবার খেটেখুটে কিছু জম'লে তারপর হু হু ক'রে বাড়তে থাকে। ধর্মজগতেও তাই। দিন কতক খুব খেটে কিছু জমিয়ে নাও। সদা সর্বদা খেতে শুতে বসতে তাঁর নাম কর। কথাবার্তা বন্ধ ক'রে এই নিয়ে লেগে থাক। ঠাকুর কম্পাসের কাঁটার কথা বলতেন। কাঁটা সর্বদাই উত্তর দিকে থাকে। কেউ যদি হাত দিয়ে সরিয়ে দেয়, তবে যাই ছেড়ে দেয় অমনি আবার উত্তরে গিয়ে দাঁড়ায়। তোমার মনও সেই রকম হবে। কেউ এসে যদি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়, তবে যাই সে ছেড়ে দেবে অমনি আবার তাঁর নাম জপ চলতে থাকবে। এই দেখ না, এতক্ষণ তোমার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। যাই চুপ করেছি অমনি মনে মনে গান চলছে—'কেন মন ভোল, শ্রীদুর্গা বল'—যা আগে চলছিল। তোমাকে বোঝাবার জন্যে নিজের একটা কথা বললাম। আর খুব গোপনে জপ করবে, যেন কেউ জানতে না পারে।

লোকে বলে তাঁর যা ইচ্ছা তাই হবে। আরে, তাঁর ইচ্ছা কি অমনি হয়? আগে তোমার খানিকটা ডানা ব্যথা হোক, তবে মাস্তুলে এসে বসবে।

প্রশ্ন—কিভাবে নাম করব?

উত্তর—ভাব আর কি? আমি ছেলে, তুমি মা। তাঁর নাম করছি, যেমন আমার সঙ্গে কথা কইছ, এমনিভাবে তাঁর সঙ্গে কথা কইবে। তিনি অন্তর্যামী ভিতরেই রয়েছেন।

প্রশ্ন—প্রার্থনাও কি করব?

উত্তর—হাঁ, প্রার্থনাও খুব করবে। প্রার্থনা আর তো কিছু নয়, শুধু তাঁতে যাতে মন থাকে, তাঁকে যাতে না ভুলি, এই প্রার্থনা। তা বলবে বই কি? খুব বলবে, কেন তোমাকে ভুলব? তোমাকে ডাকব বলেই তো সব ছেড়েছি। তুমি কৃপা ক'রে তোমাকে ভুলতে দিও না।

প্রশ্ন—ভজনও করব?

উত্তর—হাঁ, এই রকমের ভজন। নইলে এক-ঘেয়ে বোধ হতে পারে। তবে প্রথম জপটার দিকেই বেশী লক্ষ্য দিবে। এক-একটা ক'রে অভ্যাস করতে হবে।

খুব লেগে যাও। মনটাকে একবার বাগিয়ে নিতে পারলে আর ভাবনা কি? মন ব্যাটাই তো যত গোল করে। হাতে কাজ করবে, মনে সর্বদাই তাঁর নাম জপ করবে। শুধু জিহ্বা নাম উচ্চারণ করছে, কিন্তু মন বেগুন পাড়ছে, তা হ'লে হবে না। জিহ্বা ও মন একসঙ্গে তাঁর নাম করবে। এরি নাম—মন মুখ এক করা। মানস জপই ভাল।

প্রশ্ন—লোকসঙ্গে মিশলে সব গোল হয়ে যায়।

উত্তর—যতদিন ঠিক না হয় ততদিন লোকসঙ্গ করবে না। তারপর অভ্যাস হয়ে গেলে লোক-সঙ্গ করলেও ক্ষতি নেই।

আমরা যা করবার খুব করেছি, এখন তোমরা কর তো। আমরা আরও কিছুদিন বেঁচে

থেকে দেখি। তখন ঐ একভাবে ছিলাম। এখনও বেশ আছি, তোমাদের সঙ্গ হচ্ছে।

তাঁকে ডাকা তো একটা কাজ। পাঁচ সিকে পাঁচ আনা মন দিয়ে তাঁকে ডাকতে হবে। ডেকে ডেকে তাঁকে অস্থির ক'রে ফেল। ছেলে যখন একটু একটু কাঁদে, তখন মা আসে না। যখন চীৎকার ক'রে কাঁদতে থাকে, কিছুতেই থামে না তখন মা এসে কোলে নেয়।

সব তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে।

"যশ অপযশ সুযশ কুযশ সকলই মা তোমারি।
রসে থেকে রস ভঙ্গ কর কেন রসেশ্বরী॥"

আমার অসুখের কথায় রামদয়ালবাবু* বললেন, কর্মফল। তৎক্ষণাৎ আমি বললাম, 'তুমি কর্ম ধর্মাধর্ম '। চণ্ডীতে আছে, 'কর্ম টর্ম যা কিছু সব তাঁ থেকেই হচ্ছে। তিনিই এক অনাদি অনন্ত। আর কিছু অনাদি আছে কি? লোককে বোঝাবার জন্য ও-সব বলতে হবে যে, কর্ম অনাদি—ইত্যাদি। অসুখ বিসুখ ভাল মন্দ—সব তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে যাচ্ছে। এই হ'ল সিদ্ধান্ত। তিনি যাকে বোঝান সেই বোঝে। তুমি 'না' করলে আমার সাধ্য নেই যে, বোঝাই।

কিছু ইচ্ছা করতে নেই। কিছুদিন থেকে দেখছি, যা ইচ্ছা করছি তাই হয়ে যাচ্ছে। তিন-বার scraping (ক্ষতস্থান চাঁচা) হয়েও কিছু ফল হ'ল না দেখে মনে হয়েছিল, সুরেশ ভট্টাচার্য এলে বেশ হয়। অমনি মন বললে, আসবে। তা দেখ, এসে গেল। আরও কয়টা কি কি দেখেছি। সব তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে। এটা একবার উপলব্ধি করা চাই। শুধু বিচারে কিছু হয় না। ঐটে হ'ল আমাদের resting place (বিশ্রামের স্থান)। কোন ধাক্কা টাক্কা খেলে আমরা ঐখানে গিয়ে শান্তি পাই।

সাধন ভজন আর কি? একটা জিনিস রয়েছে তার সঙ্গে নিজেকে identify ক'রে দেওয়া। দুটো তো নেই, একটাই রয়েছে। এক জানাই জ্ঞান, বহু জানাই অজ্ঞান। আমরা তাঁ থেকে নিজেকে আলাদা করেই যত গোলে পড়েছি। তাঁর হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলেই শান্তি। শান্তি আর কোথাও নেই। তাঁর দিকে যতই এগিয়ে যাবে ততই শান্তি। শেষে তাঁতেই rest (বিশ্রাম) করতে হবে। তুমি কি আর আলাদা? আলাদা ভাবলেই আলাদা। নইলে তুমি তো তিনিই। হার জিত সব তাঁর হাতে।

* * *

একজনের স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছিল। তাঁকে খুব সান্ত্বনা দিয়ে স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন:

তাঁকে চিন্তা করুন। ঠাকুরের একটা গল্প শুনুন। একজনের ছেলে কলেরায় মরে গেল, তখন সে রাত জাগার পর একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। স্ত্রী এসে জাগালে। বললে 'তুমি কি নিষ্ঠুর! একটু কাঁদলে না? নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুলে?' ঘুমিয়ে সে একটা স্বপ্ন দেখছিল: সে রাজা হয়েছে, তার রাণী ও দশ ছেলে আছে ইত্যাদি। তাই সে বললে, 'একটু থামো ভেবে দেখি, কার জন্য কাঁদব—তোমার ঐ এক ছেলের জন্য, কি আমার এই দশ ছেলের জন্য?'

পরে মহারাজ বলছেন: শয়তান ও ভগবানের ঝগড়ার কথা শোন। ভক্তকে প্রলুব্ধ করতে ভগবান শয়তানকে পাঠালেন। শয়তান বড় বড়াই করছিল। শয়তান ভক্তের কাছে গিয়ে বললে, 'আমাকে ভজ। আমি তোমায় আরও ধন দৌলত দেবো।' ভক্তটি বললে 'শয়তান, এখান থেকে দূর হও।' তাতে শয়তান একে একে তার সব নষ্ট করলে। ছেলেগুলোকে মারলে। শেষে ভক্তের কুষ্ঠ হ'ল। তখনও শয়তান তাকে প্রলুব্ধ করতে লাগল। তাতে ভক্ত বললে, 'ভগ-

* 'উৎসব' পত্রিকার সম্পাদক রামদয়াল মজুমদার।

বানাই দেন, আবার নিয়ে নেন। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।'

কারো অঙ্গুলি-নির্দেশের মধ্যে যেতে নাই। খুব গোপনে তাঁকে ডাকতে হয়, যেন কেউ জানতে না পারে। দশজন জানলেই তোমার পেছনে লেগে তোমাকে নষ্ট ক'রে দেবে। আর স্বাধীনতা চলে যায়।

২৭শে ডিসেম্বর

স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিতেছেন :

'সন্ত ওহি হ্যায় যো রাম-রস চাখে।'

তুলসীদাস বলেছেন : জগতে চারটি জিনিস সার, 'সাধুসঙ্গ, হরিকথা, দয়া, দীন-উপকার।'

সঙ্গ থেকেইতো সব। 'সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ' Tell me what company he keeps and I will tell you what he is' (আমাকে যদি বল তার সঙ্গী কারা, আমি বলে দেব সে কিরূপ লোক)। সাধু-সঙ্গে মন শুদ্ধ হয়। অবশ্য ঠিক ঠিক সাধু চাই, ভেকধারী হলেই সাধু হয় না। সাধু সেই যে ভগবানকে আপনার করেছে। ভগবান লাভ হ'লে 'জগদিদং নন্দনবনং সর্বেঽপি কল্পদ্রুমাঃ'—(এই জগৎ নন্দনবন, সকল বৃক্ষই কল্পবৃক্ষ)।

স্বামী তুরীয়ানন্দ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'বৈজ্ঞানিক জগৎ' বইখানি পড়িতেছিলেন, সেই প্রসঙ্গে বলিতেছেন :

'Survival of the fittest' theory (যোগ্যতমের উদ্বর্তন মতবাদ) অনুসারে সকলে বৃদ্ধি পাচ্ছে—ইনি এইটি দেখিয়েছেন। হ্যা amoeba (এমিবা) থেকে মানুষ হওয়া পর্যন্ত ঐ theory true (মত সত্য) বটে, কেননা এতদিন স্বার্থটাই ছিল প্রধান লক্ষ্য, কিন্তু মানুষ হওয়ার পর আর এক theory (মতবাদ) হয়, এখন লক্ষ্য ভগবান। এখন স্বার্থকে যে যত ভুলতে পারবে, সে তত তাঁর দিকে এগোবে।

স্বামীজী আমাকে বলেছিলেন, একে তো জগতের কিছু বুঝা যায় না। তাও যদি আজীবন প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে মনে হ'ল যেন কিছু বুঝেছি, এবং যাই জগৎকে সেটা দেব ভাবছি—অমনি বললেন, "চলে আয়, চলে আয়। আর দিতে হবে না।" খেলাটা ফুরিয়ে যায়, এটা বুড়ীর ইচ্ছে নয়।

সারদা (স্বামী ত্রিগুণাতীত) মঠ ছেড়ে বাড়ী যেতে চাইলে মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) তাকে বুঝাচ্ছেন, "কেন যাবি? নরেনকে ছেড়ে কোথায় যাবি? এত ভালবাসা আর কোথায় পেয়েছিস? আমিও তো ইচ্ছা করলে বাড়ী গিয়ে থাকতে পারি। আমি তবে কেন পড়ে রয়েছি? ঐ এক নরেনের ভালবাসার জন্যে।"

সাপ ডিম পেড়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ফণা ধরে বসে থাকে। কিন্তু যেই ডিম ফুটতে থাকে অমনি এক একটি ক'রে খেয়ে ফেলে। যেটি ছুট্‌কে বেড়িয়ে যায় সেইটেই বেঁচে থাকে। সেইরূপ মহামায়াও জগৎপ্রসব ক'রে ফণা ধরে বসে আছেন। যে তার নিকট থেকে ছুট্‌কে পালাতে পারে সেই বেঁচে যায়।

ব্রহ্মানন্দ-প্রেমানন্দ-স্মৃতি

অধ্যাপক শ্রীবাণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

"ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।"

প্রথম দর্শন

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনায় বিদগাঁ গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিরাট জন্মোৎসব। ঐ গ্রামের কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যদর্শন ও কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে এবং কলমা গ্রামের ভক্ত শ্রীভূপতি দাশগুপ্তের উদ্যোগে বিদগাঁর নীলখোলার মাঠে উক্ত উৎসব ১৩২০ সনের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ রবিবার (ইং ১৯১৩) মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। উৎসব ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই শুনিতে পাই যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ বেলুড় মঠ হইতে শুভাগমন করিয়া উৎসবের আনন্দ সহস্রগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শিষ্যের বিক্রমপুরে প্রথম শুভ পদার্পণ।

উৎসব-ক্ষেত্রটি নানাভাবে সুসজ্জিত হইয়াছিল। মন্দিরের সম্মুখে কীর্তনমণ্ডপে পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ যথাস্থানে সমাসীন। কীর্তন শেষ হইলে সমবেত ভক্তমণ্ডলীর বিশেষ অনুরোধে স্বামী প্রেমানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশামৃত ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে মোহিত করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে তিনি ভাবে বিভোর হইয়া গিয়াছিলেন ভক্তমণ্ডলী সব কিছু দেখিয়া ও শুনিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় অবাক্ হইয়া রহিলেন। সেই অতুলনীয় পুণ্যকথা উপস্থিত দর্শক ও শ্রোতাদের মন অন্ততঃ কিছুকালের জন্য ধর্মের উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করাইতে সমর্থ হইয়াছিল এবং মনে গভীর রেখাপাত করিয়া অনেককে শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

দ্বিতীয় দর্শন

মার্চ, ১৯১৪—বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব। যথাসময়ে কলেজ হোষ্টেল হইতে কয়েক দিনের ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিলাম এবং উৎসবের পূর্বদিনই বেলুড় মঠে পৌঁছিয়া দেখিতে পাই বিরাট উৎসবের আয়োজন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। নানা দিক হইতে ভক্ত ও কর্মিগণ আসিয়া জুটিতেছে এবং বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত হইতেছে। আমি মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিয়া অন্য দিকে মন না দিয়া উৎসবের কাজে ব্যাপৃত হইলাম। সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারীর মধ্যে প্রসাদবিতরণের আয়োজন যে কি ব্যাপার—তাহা যাঁহারা একবার বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবে উপস্থিত থাকিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারাই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য পার্ষদকে সেদিন দর্শন করিতে না পারিলেও প্রেমমূর্তি স্বামী প্রেমানন্দকে দেখিলাম, তিনি তত্ত্বাবধানের কার্যে অনেক রাত্রি পর্যন্ত সারা মঠপ্রাঙ্গণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন এবং যেখানে যেমন প্রয়োজন তেমনি উপদেশ দ্বারা কর্মিগণকে খুব উৎসাহ দিতেছিলেন। উৎসবের কাজ ও রাত্রি-জাগরণ আমাদিগকে মোটেই ক্লিষ্ট করিতে পারে নাই এবং স্বামী প্রেমানন্দের বার বার উপস্থিতি,

সান্নিধ্য ও প্রেমবাক্য আমাদিগকে অসীম আনন্দ সাগরে ভাসাইতেছিল।

উৎসবের দিন সকাল হইতে ভক্ত-সমাগমে মঠ আনন্দমুখর হইল। প্রাতঃকাল হইতে দুপুর পর্যন্ত সংখ্যাতীত ভক্ত মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের দর্শন পাইয়া ধন্য হইল। আমিও শ্রীশ্রীরাজা মহারাজকে এই প্রথম দর্শন করিলাম। অপরাহ্ণে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাও মঠে শুভাগমন করিলেন। মা শকটারোহণে মঠের দক্ষিণ প্রান্তের ফটক দিয়া মঠে প্রবেশ করিতেই তাঁহার সম্মানার্থে তোপধ্বনি করা হইল, আমরা শ্রীশ্রীমার পুণ্য শ্রীচরণ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিলাম।

তৃতীয় দর্শন

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কয়েক দিন অবকাশের মধ্যে বেলুড় মঠ দর্শনমানসে খুব আগ্রহান্বিত হইলাম। আমার এক বাল্যবন্ধু তখন মঠে আছেন জানিয়া আগ্রহ আরও বাড়িল। ফলে বেলুড় মঠে যাইয়া (ইং ১৯১৫) দর্শনাদি ও প্রসাদগ্রহণের পর বন্ধু ২।১ দিন মঠে থাকিয়া যাইতে বলায় অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম এবং নিজকে পরম ভাগ্যবান মনে করিলাম।

রাত্রি প্রভাত হইলে শুনিলাম, আজ ১লা বৈশাখ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ও স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছেন, ১০।১৫ জন সাধু ব্রহ্মচারী ও ভক্ত তাঁহার সঙ্গে যাইবেন। কি করিয়া এই সুবর্ণ-সুযোগে শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র ও অন্য একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদের সান্নিধ্যে থাকা যায় এবং তাঁহাদেরই সঙ্গে তপঃক্ষেত্র পুণ্যতীর্থ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী দর্শন করিয়া নিজেকে ধন্য করা যায়—সে চিন্তায় মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। সে সময় মঠের নিজস্ব ২।১ খানা নৌকা ছিল। ঐ নৌকাযোগেই মহারাজদের যাওয়া হইবে এবং সেবকগণই নৌকা বাহিবেন, জানিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। কারণ পূর্ববঙ্গের ছেলে বলিয়া আমার নৌকাচালনার অভ্যাস ও দক্ষতার একটু গর্ব ছিল। অবশ্যই বন্ধুবরের উৎসাহ ব্যতীত উক্ত নৌকায় আরোহণ করিবার সাহস আমার কখনও হইত না। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ ও অন্যান্য সাধু-ব্রহ্মচারিগণ নৌকারোহণ করিলে আমিও দাঁড় বাহিবার জায়গায় একটি স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলাম।

আমরা গঙ্গার পশ্চিম উপকূল ধরিয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলাম। একটু পরেই বেলুড় মঠের নিকটবর্তী গঙ্গার উপকূলে এক শিবমন্দিরের ঘাটে নৌকা লাগানো হইল। আমরা সকলেই নৌকা হইতে নামিয়া রাজা মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলাম। তাঁহারা ✓শিবের মস্তকে পুষ্প-বিল্বপত্র অর্পণ করিয়া, শিবকে ডাব-চিনি নিবেদন করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। আমরাও সকলে দর্শন-প্রণামাদি করিয়া পুনরায় নৌকায় আরোহণ করিলাম। পরে শুনিলাম এই শিবই '৺কল্যাণেশ্বর শিব' নামে সুপরিচিত।

নৌকা উত্তরাভিমুখে চলিয়া কিছুকালের মধ্যেই দক্ষিণেশ্বর পৌঁছিল। ঘাটে অবতরণ করিয়া সকলে মন্দিরাদি দর্শন করিতে লাগিলেন। তৎপর শ্রীশ্রীঠাকুরের বাসগৃহ, পঞ্চবটীমূল, বিল্ববৃক্ষ-তল, শ্রীশ্রীমার বাসস্থান, নহবৎখানা প্রভৃতি দর্শন করা হইল। অবশেষে কালীবাড়ীর অনতিদূরে লক্ষ্মীদিদির বাড়ী গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া জলযোগের পর সকলে নৌকায় উঠিলাম।

বেলুড় মঠে ফিরিয়া রাখাল মহারাজ ঠাকুরঘরের নীচে দক্ষিণের রোয়াকে বৃক্ষচ্ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে বসিলেন। আমরাও

তাঁহার খুব নিকটেই বসিয়া পড়িলাম। বৈশাখের মধ্যাহ্ন-সূর্যের প্রখরতায় মাঝে মাঝে গঙ্গাবক্ষ হইতে শীতল বাতাস ক্লান্ত দেহ স্পর্শ করিতেছিল। ইহাতে শ্রীশ্রীমহারাজ বলিলেন, "দেখছিস্, ভগবানের কি দয়া। সকলই পরমকারুণিক ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে।" পরে নীচের হল-ঘরে শ্রীশ্রীমহারাজের সেবার আয়োজন হইল। স্বামী প্রেমানন্দ স্বয়ং তাঁহার সেবার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন এবং একখানা বড় পাখা হাতে লইয়া মহারাজকে বাতাস করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের পরস্পরের প্রতি গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা দর্শনীয়। যাঁহারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন তাঁহারাই সেই অপার্থিব প্রেম কিঞ্চিৎ আস্বাদন করিতে পারিয়াছেন। মহারাজের সেবার পর আমরাও প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম করিলাম।

চতুর্থ দর্শন

খৃঃ ১৯১৬ মার্চ-এপ্রিলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে ঢাকায় আগমন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদদ্বয় অন্যান্য সাধু-ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে লইয়া ঢাকার নিকটবর্তী কাশীমপুরের জমিদার-বাড়ীতে কিছুদিন এবং নারায়ণগঞ্জের ভক্ত নিবারণ চৌধুরীর বাড়ীতে কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময় ঢাকায় ও নারায়ণগঞ্জে অনেকবার তাঁহাদের পুণ্যদর্শন ও সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল। একদিন ভক্ত যতীন্দ্র গুহের আগ্রহাতিশয্যে নারায়ণগঞ্জের শীতললক্ষ্যা পল্লীতে মহারাজদ্বয়ের সম্মানার্থে একটি অভ্যর্থনা-সভা আহূত হইয়াছিল। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী কিছু ধর্ম উপদেশ শুনিবার আগ্রহ প্রকাশ করায় স্বামী ব্রহ্মানন্দজী স্বামী মাধবানন্দকে (শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক) কিছু বলিবার জন্য আদেশ করিলে তিনি সংক্ষেপে প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ বুঝাইয়া দিলেন।

এই সময়ের আর একটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা—শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ গৃহী-ভক্ত সাধু নাগমহাশয়ের জন্মস্থান-দর্শন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ অন্যান্য সাধু ব্রহ্মচারি-গণ সহ দ্বিপ্রহরের পর নারায়ণগঞ্জের অতি নিকটবর্তী দেওভোগ গ্রামে যাত্রা করিলেন। শকট হইতে নামিয়া তাঁহারা প্রায় এক মাইল গ্রাম্য পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া নাগমহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইলেন। আমরাও তাঁহাদের অনুসরণ করিলাম। দেখিতে দেখিতে নাগ-মহাশয়ের বাড়ীতে কয়েক শত ভক্তের সমাগম হইল। বাড়ীর দক্ষিণ দিকের পুষ্করিণীর তীরে মহারাজগণ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদ্বয় মাঝে মাঝে বলিতেছিলেন, "আহা! কি চৈতন্যময় স্থান! কি চৈতন্যময় স্থান!" ইতোমধ্যে বাড়ীর প্রাঙ্গণে উচ্চ কীর্তন শুরু হইল। বাবুরাম মহারাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লইয়া কীর্তনে যোগদান করিলেন এবং দেখিতে দেখিতে কীর্তন বেশ জমিয়া উঠিল। রাখাল মহারাজ নৃত্য করিতে করিতে ভাব-সমাধিতে মগ্ন হইলেন। ইহাতে এক অপূর্ব ভাবের সৃষ্টি হইল। যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই হরিনামের দিব্য মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধন্য হইলেন।

পঞ্চম দর্শন

কিছুদিন কলিকাতায় আছি। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বাগবাজারে ভক্ত বলরাম বসুর গৃহে (বলরাম-মন্দিরে) অবস্থান করিতেছেন জানিয়া তাঁহার দর্শন-মানসে ১৯১৮ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে সেখানে উপস্থিত হই। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ হরি মহারাজ তখন অসুস্থ হইয়া তথায় আছেন। অপ্রত্যাশিত-ভাবে এই মহাপুরুষকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইল। রাখাল মহারাজের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় উপরে গিয়া দেখিলাম তিনি দোতলার দক্ষিণের বারা-

ন্দায় পায়চারি করিতেছেন এবং কয়েকজন ভক্ত দর্শনের জন্য হল-ঘরে বসিয়া আছেন। সন্ধ্যার পর স্বামী ব্রহ্মানন্দ সংলগ্ন পশ্চিমের ঘরে গিয়া উপবেশন করিলে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী একে একে তাঁহাকে দর্শন করিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। ইতোমধ্যে মঠের একজন সাধু রাজসাহী জেলায় নওগাঁ মহকুমার বন্যাক্লিষ্টদের সেবার জন্য মিশন হইতে কর্মী প্রেরণের কথা শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট নিবেদন করিলেন। মহারাজ সেবাকার্যে খুব উৎসাহ দিলেন। তাঁহার আশীর্বাদ লইয়া আমিও মাসাধিক কাল নওগাঁ সেবাকেন্দ্রে স্বামী গঙ্গেশানন্দের তত্ত্বাবধানে সেবার কাজে যোগদান করিলাম।

ষষ্ঠ দর্শন

প্রায় এক বৎসর পরে বলরাম-মন্দিরে কয়েক দিন রাজা মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। একদিন সন্ধ্যার পর তথায় যাইয়া দেখি, মহারাজ তাঁহার নির্দিষ্ট ঘরে আছেন এবং ভক্ত-সমাগমও একটু বেশী। ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবামাত্র হস্তস্থিত একটি বড় শিশি হইতে তিনি একটু জল দিলেন। তাঁহাকে ভাবে গর্গর মাতোয়ারা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তিনি মাতালের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন এবং ঐ বোতল হইতে একটু একটু পবিত্র জল প্রত্যেক ভক্তকে দিতেছেন এবং বলিতেছেন, "তোমাদিগকে baptise (পবিত্র জল দ্বারা অভিষিক্ত বা দীক্ষিত) ক'রে দিচ্ছি।" পরে জানিলাম, সেদিন স্নানযাত্রার তিথি। ভারতের পুণ্য নদনদীর—গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, নর্মদা, গোদাবরী প্রভৃতির পূত বারি সংগ্রহ করিয়া তিনি উক্ত বোতলে রাখিয়াছেন এবং যে আসিতেছে তাহাকেই একটু দিতেছেন। সেদিন তাঁহার আনন্দময় ভাবমূর্তি দর্শনে আমরা সকলেই মুগ্ধ হইলাম। এবারে পূর্ববঙ্গে ঘূর্ণিবাত্যার (cyclone) হৃদয়বিদারক সংবাদ মহারাজকে জানাইয়া সেবাকার্যে মিশনের কর্মী পাঠানো হইল। সৌভাগ্যক্রমে আমিও রাজা মহারাজের আশীর্বাদ লইয়া স্বামী অরূপানন্দের তত্ত্বাবধানে বিক্রমপুরের এক পল্লীকেন্দ্রে সেবাকার্যে যোগ দিতে যাত্রা করিলাম। এই আমার শ্রীশ্রীমহারাজকে শেষ দর্শন।

* * *

বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কলিকাতায় বাগবাজার বলরাম-মন্দির প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন অবস্থায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দের সান্নিধ্যে থাকিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। যাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের কৃপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন তাঁহারা জানেন যে শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন একঘেয়ে ছিলেন না, তেমনি তাঁহার পার্ষদগণ।

স্বামী প্রেমানন্দ সত্যসত্যই প্রেমমূর্তি ছিলেন। কি বেলুড় মঠে, কি অন্য স্থানে ভক্তেরা তাঁহার অকৃত্রিম ভালবাসা ও মধুর ব্যবহারে সর্বদাই আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইতেন। তিনি ভক্তদের কোন কষ্ট বা অসুবিধা সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার অমায়িক আচরণে এবং প্রেমমূর্তি দর্শনে বহু ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণসংঘে আকৃষ্ট হইয়াছেন। আগন্তুক ভক্তদিগকে তিনিই প্রথম আপ্যায়িত করিতেন। অনেক সময় জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের দু'একটি সরল উপদেশের উপর ভিত্তি করিয়া সংক্ষেপে ও প্রাঞ্জল ভাষায় ধর্মের গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্ত আকর্ষণ করিতেন এবং ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে নিজেই বিভোর হইয়া পড়িতেন। সংঘগুরু স্বামী ব্রহ্মানন্দ উপস্থিত থাকিলে অবসরমত ও অতি সাবধানে তাঁহার দর্শন করাইয়া দিতেন। স্বামী প্রেমানন্দ প্রায়

দীর্ঘ বিশ বৎসর বেলুড় মঠের যাবতীয় কর্মের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। মঠে তাঁহার অনুপস্থিতিতে ভক্তেরা, এমনকি সাধু-ব্রহ্মচারীরাও একটা বিশেষ অভাব বোধ করিতেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, 'বাবুরাম আমার প্রাণের জিনিস ছিল। মঠের শক্তি, ভক্তি, মুক্তি—সব আমার বাবুরাম-রূপে গঙ্গাতীর আলো ক'রে বেড়াত।'

পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বল্পভাষী ছিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে দর্শন করিবার সুযোগ পাইয়া মানবজীবন ধন্য করিয়াছেন, তাঁহারা সেই দিব্যমূর্তি অপলক নেত্রে দর্শন করিয়াই পরিপূর্ণ হৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তথায় বাক্যালাপ বা ধর্মালোচনার বিশেষ অবকাশ থাকিত না। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী কোনও প্রশ্ন উত্থাপন করিতে সাহস পাইতেন না, হয়তো উহার কোন প্রয়োজন বোধ করিতেন না। রাজা মহারাজ সর্বদাই এক উচ্চ আধ্যাত্মিক রাজ্যে বিচরণ করিতেন এবং নিজের ভাবে ভরপুর হইয়া থাকিতেন। তাঁহার উপস্থিতি এবং সান্নিধ্যমাত্রই ভক্তহৃদয়ে ধর্মভাব উদ্দীপিত করিতে যথেষ্ট ছিল। তিনি যে-স্থানে অবস্থান করিতেন সে-স্থান আনন্দোৎসবে ও ভক্ত-সমাগমে পূর্ণ হইত। মহারাজের অলৌকিক আকর্ষণ ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিকে অচিরাৎ বিস্ময়ান্বিত করিত। অপর দিকে তিনি সদানন্দ, বালক-স্বভাব, অসীম ক্ষমাশীল, ও প্রেমময় পুরুষ ছিলেন। একদিকে স্বামী ব্রহ্মানন্দের নির্বাক নিস্পন্দ গভীর আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার, অপরদিকে স্বামী প্রেমানন্দের শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও উপদেশের সরল অথচ উদ্দীপনাপূর্ণ আলোচনা সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে একটা উচ্চ আধ্যাত্মিক রাজ্যে আরূঢ় করাইতে সমর্থ হইত। এই মহাপুরুষদ্বয়ের সংযুক্ত সফর পূর্ববঙ্গকে ধন্য করিয়াছিল, এবং যুবকদিগকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে স্থূল শরীরে দর্শন করিবার পরম সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র রাখাল মহারাজ ও প্রেমমূর্তি স্বামী প্রেমানন্দকে দর্শন করিয়াছি। যতই দিন যাইতেছে ততই হৃদয়ে এই কথাটি বারংবার বাজিতেছে: I have not seen the Father but I have seen the Son. —অর্থাৎ আমি পিতাকে দেখি নাই, কিন্তু পুত্রকে দেখিয়াছি।

প্রার্থনা

শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়

দুখের বোঝা বইবো আমি সারা জীবন ভোর ?
এমনি করেই কাটবে বুঝি কঠিন মায়াডোর ?
দুঃখ ব্যথা অপমানের গভীর অতলে
ডুবিয়ে আমায় দিচ্ছ প্রভু কতনা কৌশলে ;
বিষিয়ে দিয়ে সারাটা মন, জীর্ণ ক'রে দেহ
তবেই লবে তোমার কাছে, তবেই পাব স্নেহ ?
নিঠুর দয়াল। লীলা তোমার এ কী চমৎকার
আঘাত দিয়ে ভাঙতে কি চাও আমার অহংকার ?
চরম ব্যথায় বিবশ মনে জানাই নিবেদন :
আঁধার মাঝে পাই যেন গো তোমার দরশন।
সকল আঘাত সইতে পারি, শক্তি যেন রয় ,
তোমার মাঝে আমার "আমি" লভুক তবে লয় ॥

গুরুগোবিন্দ সিংহ

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

বুদ্ধিমান কিন্তু ধর্মান্ধ ঔরঙ্গজেবের হঠকারিতা মোগল সাম্রাজ্যের মজ্জার মধ্যে তখন ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছে। আকবরের দূরদর্শিতার এবং উদারতার ফলে হিন্দু এবং মুসলমান অনেকটা কাছাকাছি এসেছিল। সন্দিগ্ধমনা ঔরঙ্গজেবের অনুদারতার ফলে হিন্দুরা তাঁকে ঘৃণার চোখে দেখতে লাগলো। ধূমায়মান অসন্তোষের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন মহারাষ্ট্রের শিবাজী, হস্তে উড্ডীয়মান গৈরিক পতাকা, অন্তরে দুর্জয় সংকল্প: 'এক ধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি।'

মোগল সাম্রাজ্যের বিলীয়মান মহিমাকে চরম আঘাত হানবার জন্যে দাক্ষিণাত্যের পার্বত্য প্রদেশে মহারাষ্ট্রকুলতিলক শিবাজী যখন গড়ে তুলছিলেন এক দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী উত্তর ভারতের আর এক বীর তখন লোকচক্ষুর অন্তরালে যমুনার তীরে নিজেকে তৈরী করছিলেন একই কার্য সমাধা করবার জন্যে। এই পুরুষসিংহ শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ। গোবিন্দের বয়স যখন মাত্র পনেরো, তখন ধর্মান্ধ ঔরঙ্গজেব তাঁর পিতা তেগ বাহাদুরকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলেন। দিল্লীর প্রকাশ্য রাজপথে গুরু তেগবাহাদুরের দেহ টাঙিয়ে রাখা হ'ল কাফের এবং বিদ্রোহীদের শিক্ষা দেবার জন্যে। দিল্লীর পথে পিতা কিশোর পুত্র গোবিন্দের হাতে অর্পণ ক'রে গেলেন গুরু হরগোবিন্দের তরবারি, আর তাকে অভিষিক্ত ক'রে গেলেন নূতন গুরুর আসনে। যাবার আগে পিতা পুত্রকে নির্দেশ দিয়ে গেলেন—তাঁর মৃতদেহ যেন শৃগালকুকুরের ভক্ষ্য না হয় এবং পুত্র যেন পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়।

পিতার এই অপমৃত্যুর এবং অন্তিম নির্দেশের কথা পুত্র কিছুতেই ভুলতে পারল না। কী ক'রে এর প্রতিশোধ নেবেন—দিন রাত্রি সেই কথাই ভাবতে লাগলেন। ভাবনার কোন কূল কিনারা নেই। শুধু প্রতিশোধ-কামনা নয়, কী ক'রে নিপীড়িত এবং ভগ্নোদ্যম হিন্দুদের মনে একটা নূতনতর ভবিষ্যৎ গড়বার প্রেরণা আনা যায়—এই চিন্তাও গুরুগোবিন্দের তরুণ চিত্তকে ব্যাকুল ক'রে তুলল। বাধার অন্ত নেই, বাধা—ভিতরে এবং বাহিরে উভয়তঃ। বাহিরে ভারত-সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের রক্তচক্ষু, ভিতরে শিখদের নিজেদের মধ্যে আত্মঘাতী দলাদলি। আর গোবিন্দের বয়সই বা তখন কত?

কিন্তু এই পর্বতপ্রমাণ বাধার সামনে গোবিন্দ একটুও দমলেন না। জীবনের পথ যখন বিঘ্ন বিপদে দুর্গম হয়ে ওঠে দুর্বলচেতা মানুষেরা তখন সহজেই ভেঙে পড়ে, বাধা-বিঘ্নকে পৌরুষের দ্বারা জয় করবার চেষ্টা না করে জীবনযুদ্ধে তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, আর পালাতে না পারলে ধূলায় গুঁড়িয়ে যায়। পুরুষসিংহদের কথা কিন্তু স্বতন্ত্র। বিপদ-বাধাকে তাঁরা গণনার মধ্যে আনেন না। চরম দুঃখের মধ্যেও মাথা তাঁদের উঁচুই থাকে, হৃদয় থাকে অকম্পিত। জীবন তো একটা বড়ো রকমের খেলা, আর এ খেলায় বাহাদুর সেই, যে দুঃখের অনলকুণ্ডের মধ্যে ব'সে আমাদিগকে নির্ভীক কণ্ঠে শোনাতে পারে আশার বাণী, যার দৃষ্টিতে প্রভাতের আলো। তার প্রাণের প্রদীপ্ত শিখায় জ্বলে ওঠে বহু জীবনের আলোহীন দীপ, তার একার সঙ্কল্প আমাদের সকলের সঙ্কল্প হয়ে দাঁড়ায়, তার অন্তরের সাহস

এবং বিশ্বাস লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবনে যাদুমন্ত্রের কাজ করে।

পঞ্চদশ-বর্ষীয় গোবিন্দের চোখে হিন্দুজাতির জীবন-প্রভাতের স্বপ্ন। কিন্তু স্বপ্ন দেখা এবং স্বপ্নকে দুর্জয় সংকল্পের দ্বারা ফলবান করা—ঠিক এক কথা নয়। একটি বিশাল কল্পনাকে কার্যে পরিণত করতে হ'লে সর্বাগ্রে চাই প্রস্তুতি। নিজেকে তৈরী করতে হবে সমস্ত দিক দিয়ে। চরিত্রে থাকা চাই সততা, মগজে জ্ঞানের দীপ্তি, হৃদয়ে বিপুল সাহস, আদর্শে অবিচলিত নিষ্ঠা। এইসব গুণ থাকলে তবেই ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠে দুর্বার, আর সেই দুর্বার ব্যক্তিত্বের সম্মোহন শক্তি অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে তোলে।

কিশোর গোবিন্দ মোগল সাম্রাজ্যের ঔদ্ধত্যকে ধূলিসাৎ করবার জন্যে তপস্যায় মগ্ন হলেন। হিমাচলের পার্বত্য অঞ্চলের নিভৃতে যমুনার তীরে নিজেকে সকল দিক দিয়ে তৈরী করতে লাগলেন তিনি। দিন কাটতে লাগল বন্যবরাহ এবং ব্যাঘ্র শিকারে। কষ্টসহিষ্ণু কর্মঠ দেহ না হ'লে একজন নেতা কেমন ক'রে একটা শক্তিমান জাতি গঠনের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবে? মোগল সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানো তো একটুখানি কথা নয়। উৎপীড়িত জনসাধারণ ভয়ে বশ্যতা স্বীকার করে বলেই না অত্যাচারীদের এত স্পর্ধা। তাই ইতিহাস খুললে দেখতে পাই সকল যুগে সকল দেশে গর্বান্ধ রাজশক্তিকে যাঁরা ধূলায় লুটিয়ে দিতে চেয়েছেন, নিপীড়িত মানবতার মুক্তির জন্যে তাঁদের সকলকেই একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, আর এই সমস্যা হ'ল ভয়ার্ত জনসাধারণের মধ্যে শক্তির উদ্বোধন।

গুরুগোবিন্দকেও এই একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হ'ল। হাজার হাজার মানুষকে একসূত্রে বাঁধা, তাদের শান্তিপ্রিয় মনকে বিপ্লবমুখী ক'রে তোলা এবং সেই বিপ্লবী জনসাধারণের হৃদয়ে এমন একটা উৎসাহের আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া যাতে তারা উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে সর্বস্ব বিসর্জন দিতে পারে। এর জন্যে কেবল মজবুত শরীরই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন—মজবুত শরীরের মধ্যে এমন একটা মনকে গড়ে তোলা যে-মন বুদ্ধিকে সহায় ক'রে জেনেছে কোন্ পথ সত্য পথ, বুঝেছে কি তার কর্তব্য, মুক্তি পেয়েছে সংশয়ের সমস্ত অন্ধকার থেকে। সত্য সম্পর্কে মন নিঃসংশয় হ'লে তবেই আসে অজানা সমুদ্রে তরী ভাসাবার দুর্জয় সাহস, সব পাওয়ার জন্যে সব হারাবার বজ্রকঠোর সংকল্প, শত ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যেও অদম্য উৎসাহে কাজ ক'রে যাওয়ার অপরাজেয় শক্তি। ভাবাবেগেরও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে—কাজে প্রথম প্রেরণা দেবার জন্যে, কিন্তু হৃদয়ের আবেগ তো সারাক্ষণ প্রবল থাকতে পারে না, তাই আবেগের জোরে কর্তব্যে অবিচলিত থাকা কঠিন। কিন্তু বুদ্ধির প্রদীপ্ত আলোতে একটি আদর্শকে একবার সত্য ব'লে নিঃসন্দেহে বুঝলে তার জন্যে সহস্র জীবন যাপন করা যায়, সহস্র জীবন আনন্দে উৎসর্গও করা যায়। তখনই এ কথা জোরের সঙ্গে বলবার সাহস আসে:

তোমরা সকলে এস মোর পিছে
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
　　জাগো রে সকল দেশ।
নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়,
　　নাহি আর আগুপিছু।
পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ,
সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ,
নাহি তার কাছে জীবন মরণ,
　　নাই নাই আর কিছু।

তাই কর্মসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে গুরুগোবিন্দ তাঁর জীবন গড়ে তুলবার জন্যে

সাধনায় ব্রতী হলেন। পার্সী ভাষা শিখতে লাগলেন নিষ্ঠার সঙ্গে, হিন্দু শাস্ত্রের সমুদ্রে ডুব দিয়ে আহরণ করতে লাগলেন জ্ঞানের মণিমুক্তা। অরণ্যের নির্জনে গুরুগোবিন্দের এই মানসিক প্রস্তুতির কথা কী অনবদ্য ভাষায় বর্ণিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'গুরগোবিন্দ' কবিতায়:

এখনো বিহার কল্পজগতে
অরণ্য রাজধানী—
এখনো কেবল নীরব ভাবনা,
কর্মবিহীন বিজন সাধনা,
দিবানিশি শুধু বসে বসে শোনা
আপন মর্মবাণী।
একা ফিরি তাই যমুনার তীরে
দুর্গম গিরিমাঝে।
মানুষ হতেছি পাষাণের কোলে,
মিশাতেছি গান নদী-কলরোলে,
গড়িতেছি মন আপনার মনে,
যোগ্য হতেছি কাজে।
এমনি কেটেছে দ্বাদশ বরষ,
আরো কত দিন হবে—
চারিদিক হ'তে অমর জীবন
বিন্দু বিন্দু করি আহরণ
আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ দেখিব কবে?

অবশেষে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের নিভৃতে গুরু-গোবিন্দের অজ্ঞাতবাসের মেয়াদ একদিন ফুরালো। এবারে জীবন-রঙ্গভূমিতে কোলাহল-মুখর ভীষ্মপর্ব। যমুনার তীরে নির্জনে অরণ্যে পর্বতে কত দিন স্বপ্ন দেখেছেন তিনি:

হায়, সে কী সুখ, এ গহন ত্যজি
হাতে লয়ে জয়তূরী
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে—
রাজ্য ও রাজা ভাঙিতে গড়িতে,
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া
হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি।
তুরঙ্গসম অন্ধ নিয়তি—
বন্ধন করি তায়
রশ্মি পাকড়ি আপনার করে
বিঘ্ন বিপদ লঙ্ঘন ক'রে
আপনার পথে ছুটাই তাহারে
প্রতিকূল ঘটনায়।

কিন্তু স্বপ্ন দেখার আর সময় কোথায়? এখন কাজের পালা। গোবিন্দের শরীর মজবুত, মনও প্রস্তুত। আর কেন? ঐ জীবন ডাকছে রুদ্রবীণা বাজিয়ে। গুরুগোবিন্দের মনশ্চক্ষে সে কী দীপ্ত মুক্ত মহাজীবনের জ্যোতির্ময় ছবি। শতেক যুগের জড়তাকে সুদূরে নিক্ষেপ ক'রে পরাজিত হিন্দুরা রূপান্তরিত হয়েছে একটা নূতন শক্তিমান জাতিতে, সামাজিক দুর্নীতির জালকে ছিন্ন ক'রে তারা বেরিয়ে পড়েছে নব জীবনের পথে, তার দুর্বার অভিযানের সম্মুখে ধূলায় লুটিয়ে পড়েছে মোগল সাম্রাজ্যের আকাশস্পর্শী স্পর্ধা। লাঙ্গল আর তাঁত নিয়ে গার্হস্থ্যজীবনের ক্ষুদ্র শান্তিকে একান্ত ভাবে আঁকড়ে ছিল যারা, অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোকে যারা কোন দিন কর্তব্য বলে মনে করেনি, তারা এখন সুখ-সম্পদ মায়া-মমতার বন্ধন ছিন্ন ক'রে গুরুর আহ্বানে বেরিয়ে এসেছে বিপ্লবের মুক্ত পথে।

'আয়, আয়, আয়' ডাকিতেছি সবে,
আসিতেছে সবে ছুটে।
বেগে খুলে যায় সব গৃহদ্বার,
ভেঙে বাহিরায় সব পরিবার,
সুখ-সম্পদ মায়া-মমতার
বন্ধন যায় টুটে।
সিন্ধু মাঝারে মিশিছে যেমন
পঞ্চ নদীর জল—
আহ্বান শুনে কে কারে থামায়,
ভক্তহৃদয় মিলিছে আমায়,
পঞ্জাব জুড়ি উঠিছে জাগিয়া
উন্মাদ কোলাহল।

যত আগে চলি বেড়ে যায় লোক,
ভরে যায় ঘাটবাট।
ভুলে যায় সবে জাতি-অভিমান,
অবহেলে দেয় আপনার প্রাণ,
এক হয়ে যায় মান অপমান
ব্রাহ্মণ আর জাঠ।

কত দিন কত রাত্রি এই বিশাল সুন্দর কল্পনায় নিমগ্ন থেকেছে গুরুগোবিন্দের মন। এখন স্বপ্নকে ফলবান করবার জন্যে দরকার আদর্শে অবিচলিত নিষ্ঠা, দুর্জয় সাহস, চিত্তের অনমনীয় দৃঢ়তা, কঠিনতম দুঃখকে সহ্য করবার অনন্ত ধৈর্য। এসব গুণ গুরুগোবিন্দের চরিত্রে প্রচুর পরিমাণেই ছিল। দেখতে দেখতে ভেদ-বুদ্ধিতে যারা ছিল শতধাছিন্ন, তাদের মধ্যে এল একতা। সর্দার হবার যোগ্যতা সকলের থাকতে পারে না। সর্দারকে গড়ে পিঠে তৈরী করা যায় না। যাঁর নেতৃত্বে লক্ষ লক্ষ মানুষ চলতে আরম্ভ করবে নবজীবনের পথে জন্ম থেকেই তিনি সর্দার, আর সর্দারের প্রধান গুণ হচ্ছে নানা মতের নানা রুচির মানুষকে এক সঙ্গে ধরে রাখা। গুরু গোবিন্দ নেতা হবার এই গুণটি জন্মের সঙ্গে নিয়েই ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন।

গুরুগোবিন্দ একদিকে যেমন শান্তিপ্রিয় নিরীহ প্রকৃতির জাঠদের রক্তের মধ্যে জ্বালিয়ে দিলেন ক্ষাত্রতেজের বহ্নিশিখা, আর একদিকে তাদের মধ্যে জাগিয়ে দিলেন ধর্মজীবন যাপনের প্রবল উদ্দীপনা। ডাক দিয়ে সবাইকে বললেন:

কেবল কোরাণ আর পুরাণ পাঠ নিরর্থক। শাস্ত্র অধ্যয়ন ঈশ্বর লাভের পক্ষে যথেষ্ট নয়। ঈশ্বর লাভ করতে হলে দরকার নম্রতা, সত্যনিষ্ঠা, আন্তরিকতা। আরও বললেন, ঈশ্বরকে দেখা যায় শুধু বিশ্বাসের চোখ দিয়ে। সবাইকে পরস্পরের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে যেতে হবে। ভুলতে হবে জাতির অভিমান। সমস্ত মানুষ সমান। কে ছোট, কে বড়ো?

গুরুগোবিন্দের কণ্ঠে সাম্যের বাণী শুনে ব্রাহ্মণেরা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না, কিন্তু গুরুর কণ্ঠে শোনা গেল—ওঠাতে হবে তাদের, যারা তথাকথিত নিম্ন জাতি, যারা পড়ে আছে সকলের নীচে, সকলের পিছে—সেই অবহেলিত সম্প্রদায় এখন থেকে বসবে তাঁর দক্ষিণে, গণ্য হবে তাঁর প্রিয়তম ব'লে। গোবিন্দ এই ব'লে একটি পাত্রে ঢাললেন জল, তার মধ্যে ডুবিয়ে দিলেন পবিত্র অসি, এবং সেই জল ছিটিয়ে দিলেন তাঁর বিশ্বস্ত পাঁচজন অনুচরের মাথায়। তারপর তাদের সম্বোধন করলেন, সিংহ ব'লে, ঘোষণা করলেন: আজ থেকে তোমরা হ'লে খালসা, তোমরা পরস্পরকে সম্বোধন করবে 'গুরুজীর জয়' ব'লে, তোমরা মাথায় রাখবে কেশ, অঙ্গে ধারণ করবে কৃপাণ, তোমরা লড়াই করবে শত্রুর বিরুদ্ধে; তোমাদের মধ্যে ধন্য সেই, যে বাহিনীর পুরো-ভাগে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবে।

গুরুর একটা স্বপ্ন সফল হ'ল। তাঁর অনুচরেরা তাঁকে হৃদয়-আসনে বরণ ক'রে নিল। কিন্তু আরও একটা কাজ বাকী আছে: অত্যাচারীর সাম্রাজ্যকে ধূলিসাৎ ক'রে দেবার কঠিনতর কাজ। শুরু হ'ল মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী গুরুর রণ-পর্ব। ঔরঙ্গজেব হুকুম করলেন লাহোরের শাসনকর্তাকে—গুরুকে সমুচিত শাস্তি দাও। আনন্দপুরে মোগল সৈন্যবাহিনীর দ্বারা গুরু পরিবেষ্টিত হলেন। মাতা এবং স্ত্রী পালিয়ে কোন রকমে রক্ষা পেলেন। দুই পুত্র নিহত হ'ল মোগলের হস্তে। চল্লিশ জন মাত্র অনুচর সহ গুরু রাত্রির অন্ধকারে অন্যত্র আশ্রয় নিলেন। এর পরে চললো বিপ্লবীর বিঘ্নসঙ্কুল পথে দুঃখের জীবন। কিন্তু দুঃখ গুরুর সঙ্কল্পকে একটুও টলাতে পারল না। সিংহ যখন আহত হয় তখনই তার গর্জন হয় ভীষণতম। মাথায় আঘাত লাগলে বিষধর ফণা তুলে দাঁড়ায় আর গভীরতম দুঃখের অন্ধকারে পুরুষসিংহের আত্মা বিকীরণ করে তার মহিমা। গোবিন্দসিংহের সমস্ত সুখ যখন পুড়ে ছাই হয়ে গেল তখনও তিনি পর্বতের মতো অটল এবং অচল। গোবিন্দ জীবদ্দশায় তাঁর সকল স্বপ্ন সফল দেখে যেতে পারেননি। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে পাঠানদের হাতে তিনি নিহত হন, পুত্রদের মধ্যেও কেউ জীবিত ছিল না। শিষ্যেরা অশ্রু-গদ্‌গদকণ্ঠে জিজ্ঞাসা ক'রল মৃত্যু-পথযাত্রী গুরুকে: এখন থেকে কে তাদের পরিচালিত করবে? কে তাদের প্রেরণা দেবে সত্যানুসরণে? গুরু উত্তর দিলেন: খালসাদের মধ্যে আমি বেঁচে থাকব। যেখানে পাঁচজন শিখ সমবেত হবে সেখানেই তোমরা আমাকে পাবে।

* আকাশবাণী (All India Radio)-র সৌজন্যে। (১৫ই নভেম্বর, ১৯৫৮ পঠিত)।

রাজধানী কলিকাতা

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

"তখন কলিকাতার গঙ্গা ও গঙ্গার ধার বণিক সভ্যতার লাভ লোলুপ কুশ্রীতায় জলে স্থলে আক্রান্ত হইয়া তীরে রেলের লাইন ও নীরে ব্রিজের বেড়ি পরে নাই। তখনকার শীতসন্ধ্যায় নগরের নিশ্বাস-কালিমা আকাশকে এমন নিবিড় করিয়া আচ্ছন্ন করিত না। নদী তখন বহুদূর হিমালয়ের নির্জন গিরিশৃঙ্গ হইতে কলিকাতার ধূলিলিপ্ত ব্যস্ততার মাঝখানে শান্তির বার্তা বহন করিয়া আনিত।"

এই উদ্ধৃতিটি রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' পুস্তক হইতে গৃহীত। ইহা উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের—সম্ভবতঃ ১৮৮০ ৮১ সালের কথা, কেননা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন তখন বাঁচিয়া আছেন (মৃত্যু-১৮৮৪ সাল)। কবির চোখে সেই সময়কার কলিকাতা ইট-সুরকি-পাথর-সিমেন্টের হর্ম্যরাজি দ্বারা বিকীর্ণ হইলেও একটি নিজস্ব সৌন্দর্য বজায় রাখিতে পারিয়াছে। কিন্তু পঁচিশ বৎসর পরে ('গোরা' লিখিবার কাল—১৯০৭ সাল) 'বণিক-সভ্যতা'র অভিঘাত আসিয়া পৌছিয়াছে, তখন গঙ্গার ধারে রেলের লাইন এবং গঙ্গার জলে 'ব্রিজের বেড়ি'—শুধু এইটুকুই কবির চোখে রাজধানী কলিকাতার শ্রী হরণ করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত। ইহার পর কবি আরও প্রায় ৩৪ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন এবং বণিক-সভ্যতার পরবর্তী কীর্তিকলাপ আরও অনেক দেখিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহার পরম সৌভাগ্য স্বাধীনতার পরবর্তী কলিকাতাকে দেখিতে হয় নাই। অনেক কারখানা, অনেক রাস্তা, অনেক বাড়ী ঘর দোকানপাট স্কুলকলেজ হাসপাতাল এই কলিকাতায় বাড়িয়াছে—আনন্দের কথা, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহার বীভৎস 'কুশ্রীতা' আজ তিনি বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার সূক্ষ্ম সংবেদনশীল মনকে কি পরিমাণে স্তম্ভিত এবং বেদনাহত করিত তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ যে 'বণিক-সভ্যতা'র উল্লেখ করিয়াছেন তাহা তখনকার ইংরেজ বণিকের প্রতি প্রযুক্ত। সে বণিকদের অনেকেই এখন দেশে ফিরিয়া গিয়াছে—রাজধানী কলিকাতার প্রাণকেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত করিবার ভার কিন্তু বাঙালীরা পায় নাই (বা নেয় নাই)—পাইয়াছে অপর ধনিককুল। এখনকার কুশ্রীতার জন্যও দায়ী 'বণিক-সভ্যতা'ই। কিন্তু ইংরেজদের যেটুকু চোখের পর্দা ছিল এখনকার বণিকদের তাহা নাই। এখনকার বণিক-সভ্যতার মূলমন্ত্র—টাকা টাকা—যে কোন উপায়ে টাকা। নীতি, সত্য, স্বাদেশিকতা, সামাজিক দায়িত্ব, জনস্বাস্থ্য—এ সবই অবান্তর প্রসঙ্গ। মাটির উপর টান, মানুষের কল্যাণ, ন্যায়পরতা—এ সকল প্রশ্নের কোনও বালাই নাই। টাকা যখন চাইই তখন নিজের পরিবার এবং গোষ্ঠীর নিরাপত্তা এবং স্বার্থটুকু বজায় রাখিয়া বেপরোয়াভাবে টাকার আবাহন করিব—ইহাই এখনকার বণিক-সভ্যতার কর্মনীতি। যদি হাজার হাজার মানুষকে গৃহচ্যুত বা জীবিকাভ্রষ্ট হইতে হয়—উপায় নাই, যদি হাজার হাজার মানুষকে ছাগল ভেড়া গরুর মতো বাস করিতে হয়, খাদ্য এবং চিকিৎসার অভাবে শিয়াল কুকুরের মতো মরিতে হয়—আমাদের মাথা ব্যথা কিসের? 'লাভ' যেখানে একমাত্র লক্ষ্য, সেখানে মানবিকতাকে ঘুম পাড়াইয়া না রাখিলে চলিবে কেন?

মাস ছয়েক আগে আমেরিকার 'টাইম' (Time) সাপ্তাহিক পত্রিকায় বর্তমান কলিকাতা শহরের একটি বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটির নাম 'ঠাসা মড়কপুরী' (Packed and

Pestilential Town)। কলিকাতাবাসী বাঙালীদের—যাঁহারা প্রবন্ধটি পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের রাগ এবং মন খারাপ হইবার কথা, হইয়াও ছিল। ব্যক্তিগত সমষ্টিগত কিছু কিছু প্রতিবাদের কথাও শোনা গিয়াছিল। কলিকাতার ভাগ্য বাঙালীদের হাতে না থাকিলেও ইহার নিন্দা-স্তুতি—বিশেষ করিয়া নিন্দা তো বাঙালীদের প্রাপ্য। নিজের নিন্দা অপরের মুখে শুনিতে কাহার ভাল লাগে? ঐ প্রবন্ধে ঐতিহাসিক কয়েকটি ভুল তথ্য ছাড়া নিছক বানানো মিথ্যা কথা বোধ করি একটাও ছিল না, কিন্তু তথাপি 'ন বদেৎ সত্যমপ্রিয়ম্' নীতির দিক দিয়া স্বাধীন ভারতের বৃহত্তম শহরের কু দিকটা অমন ফলাও করিয়া সারা বিশ্ববাসীর কাছে বর্ণনা করা সমীচীন হয় নাই।

কিন্তু আজকালকার যুগে মানুষের মুখ চাপিয়া রাখাও মুস্কিল। মানুষের চোখই বা বন্ধ করিয়া রাখা যায় কি উপায়ে? আন্তর্জাতিক আসরে ভারতের এখন একটা বিশিষ্ট স্থান হইয়াছে, ভারত সম্বন্ধে দেশ-বিদেশে কৌতূহল জাগিতেছে, বিদেশী মুসাফিররা দলে দলে সময়ে অসময়ে ভারত সফরে আসিতেছেন। তাঁহারা শুধু নয়াদিল্লীর রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর সমাধিস্থানে ফুল-মালা দিয়া এবং ভাকরা নাঙল তিলাইয়া বাঁধ, চিত্তরঞ্জনের কারখানা বা সিন্ধ্রী জামসেদপুরের কারখানা দেখিয়া ভারতবর্ষের প্রগতির সার্টিফিকেট দিবেন—এমন কড়ার করিয়া তো আসেন না। দিল্লীর রাজপুরুষদের কলিকাতায় যখন নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হয় তখন তাঁহাদের গতাগতির রাস্তা আগে হইতে ঠিক করিয়া রাখা চলে, তাঁহাদের চোখে যাহাতে কুদৃশ্য না পড়ে—সে ব্যবস্থা করা কঠিন হয় না। কিন্তু বিদেশী মুসাফিররা অনেক বেশী চতুর। তাঁহারা ভারতবর্ষের বৃহত্তম শহর না দেখিয়া ছাড়িবেন কেন? এবং এই শহরের 'স্বাভাবিক' রূপটি তাঁহাদের দৃষ্টি হইতে ঢাকিয়া রাখাই বা কি করিয়া সম্ভবপর? তাই রাজধানী কলিকাতার প্রতি বর্গ মাইলে লোকসংখ্যার অকল্পনীয় ঘনত্ব, রাস্তায় স্তূপীকৃত নোংরা, রাজপথে গো-জাতির অবাধ গতি, ফুটপাথের ধুলাবালির মধ্যে তেলেভাজা ও কাটা ফলের দোকান, সর্বত্র ভিখারীর ভিড়, মোটর-গাড়ীর সামনে ঠেলা-গাড়ীর অভিযান, অট্টালিকার পাশাপাশি দীর্ণ বস্তির সারি এবং তুচ্ছ কারণে জনগণের হৈ-হুল্লড় হুজুগ ধর্মঘট এ সবই তাঁহাদের চোখে পড়িয়া যায়।

আরও একটি জিনিস অতি সহজেই তাঁহাদের চোখে ঠেকে—বাঙালী চরিত্র এবং বাঙালীর ভাগ্যের একটি সুস্পষ্ট দিক,—অপ্রিয় সত্য, কিন্তু অপ্রত্যাখ্যেয় সত্য। 'টাইম' পত্রিকার পূর্বোক্ত প্রবন্ধ হইতে কয়েকটি লাইন:

"কলিকাতার বাসিন্দারা অধিকাংশই বাঙালী। যখন হৈ-হাঙ্গামা থাকে না তখন এরা অতি অমায়িক স্বাচ্ছন্দ্যপ্রিয় লোক। নিজেদের শহরের হুজুক হুল্লোড় এরা পছন্দ করেন এবং খাওয়ার চেয়ে বরং আড্ডা দেওয়াটাই বেশী ভালবাসেন। অন্য যা কিছু এঁরা যরতে রাজী, কিন্তু শারীরিক শ্রমসাধ্য কাজের কথা এঁদের বোলো না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এঁরা ভিড় করেন, কিন্তু শিল্পাঞ্চলে অধিকাংশ কাজ বিহারীদের হাতে। শহরের প্রয়োজনীয় কায়িক পরিশ্রমের কাজের অনেকটাই করে ওড়িষ্যাবাসীরা। চতুর মারোয়াড়ীদের দখলে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ব্যাঙ্ক। উচ্চশিক্ষিত বাঙালীদের কেউ কেউ সরকারী বড় বড় চাকরিতে আছেন বটে—এবং অনেকে আইন, ডাক্তারি প্রভৃতি পেশাও গ্রহণ করেন, কিন্তু অধিকাংশের ভাগ্যে সামান্য কেরাণীগিরি ও বেকার অবস্থা ছাড়া আর কিছু জুটে না।"

স্বয়ং পণ্ডিত জহরলাল নেহরু তাঁহার Discovery of India পুস্তকে (প্রথম প্রকাশ—১৯৪৩) লিখিয়াছিলেন:

"এমন এক সময় ছিল যখন বাঙালীরা সরকারী চাকরি এবং আরও অন্যান্য কাজ লইয়া তাঁদের প্রদেশের বাহিরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু শিল্প বাণিজ্য বাড়িবার সঙ্গে

এই ধারা উল্টাইয়া গেল। অন্যান্য প্রদেশ হইতে লোকেরা বাংলা দেশ চড়াও করিল; এবং শিল্প ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ঢুকিয়া পড়িল। ব্রিটিশ মূলধন ও বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল কলিকাতা। এখনও তাই, তবে মারোয়াড়ী ও গুজরাটীরা তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিতেছে। সামান্য সামান্য ব্যবসায়ও কলিকাতায় প্রায়শই অবাঙালীর হাতে। কলিকাতার হাজার হাজার ট্যাক্সিচালক শিখ।"

দুই বৎসর আগে জনৈক সাংবাদিক আমেরিকার একটি বিখ্যাত পত্রিকায় (Saturday Evening Post) তাঁহার কলিকাতা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছিলেন। বাঙালীদের তিনি অনেক প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারও চোখ এড়ায় নাই যে—

"কায়িক শ্রমের প্রতি বিরূপতার জন্যে বাঙালীরা তাদের নিজেদের জন্মভূমিতে পরদেশীর পর্যায়ে নেমে আসতে বাধ্য হয়েছে। কলিকাতায় বড় বড় ব্যবসায় ও শিল্পের মালিক হয় ব্রিটিশ, নয় মারোয়াড়ীরা। সমস্ত পার্ক ষ্ট্রীটে কিংবা বড়বাজারে একটিও বাঙালীর দোকান নেই বললেও চলে। পাটের কলের মজুর সব বিহারী, শহরের জল আলো প্রভৃতি ব্যবস্থার কাজ সবই প্রায় ওড়িয়াদের দখলে। কলকাতার সমগ্র জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশেরও বেশী বাংলার বাহির থেকে আগত অবাঙালীরা।

রাজধানী কলিকাতার কুশ্রীতা এবং বাংলা দেশের রাজধানীতে বাঙালীর অসহায়তার জন্য দায়ী যাহারা বা যে ঘটনাচক্র হউক, দুর্নাম সবটাই বাঙালীকে লইতে হইতেছে। এই দুর্নাম এবং দুর্ভাগ্য মোচনের দায়িত্বও বাঙালীর হইয়া অপর কেহ লইবে না। বাঙালীকেই বুকে বল বাঁধিয়া পর্বতপ্রমাণ বাধার সম্মুখে দাঁড়াইতে হইবে। রাজধানী জাতীয় জীবনের প্রাণকেন্দ্র। সাহিত্য বল, সঙ্গীত বল, শিক্ষা সংস্কৃতি ধর্ম সমাজ বল—জাতির এই সকল দিকের প্রসার রাজধানীর সুসংহতির উপর নির্ভর করে। এই সুসংহতির জন্যে তাহারাই ভাবে এবং কষ্ট স্বীকার করে—যাহাদের বাংলার মাটির উপর দরদ আছে, বাংলার সংস্কৃতির উপর ভালবাসা আছে। যাহারা শুধু টাকার জন্য রাজধানীতে বাস করিতেছে, রাজধানীর যশ নিন্দার দিকে তাহাদের মাথায় ভাবনা না থাকিবারই কথা। কলিকাতা তাহাদের নিকট বেওয়ারিশ কামধেনু। যতটা পাবা যায়, যতক্ষণ পারা যায়, যে ভাবে পারা যায় দুহিয়া লইয়াই তাহারা খালাস।

কিন্তু বাঙালীর চিত্তে কলিকাতা নগরী অন্য ভাব বহন করিয়া আনে। কলিকাতার মাটি বাঙালীর কাছে অতি পবিত্র। এই কলিকাতায় বাঙালীর রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র পাদচারণ করিয়া গিয়াছেন, এই নগরীর সুখ-দুঃখের সহিত তাদাত্ম্য অনুভব করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের চিন্তা ও কর্ম এখানে বিকাশ করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতার গৌরব, কলিকাতার ঐতিহ্য বাঙালী ভুলিতে পারে কি? কলিকাতার অপমান বাঙালীর বুকে শেলের মতো বাজা স্বাভাবিক নয় কি?

কলিকাতার প্রাণকেন্দ্র বাঙালীর হাতে—বাঙালীর পুরা দখলে লইয়া না আসিলে এই অবস্থার প্রতিকার সম্ভবপর নয়। প্রশ্ন জাগে—রাজধানী কলিকাতার পৌর প্রতিষ্ঠান, শান্তি-শৃঙ্খলা এবং শাসন প্রধানতঃ বাঙালীর হাতে তো এখনই রহিয়াছে, তবু প্রতিকার হয় না কেন? ইহার অতি বেদনাদায়ক উত্তর এই যে, কলিকাতার এবং তথায় বাঙালীর ভাগ্য পৌর প্রতিষ্ঠান, পুলিস-সংস্থা এবং শাসন-যন্ত্রের মুঠার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। অতি আশ্চর্য, কিন্তু অতি স্পষ্ট সত্য! কলিকাতার কলকাঠি নড়িতেছে বণিক-সভ্যতার অঙ্গুলি-হেলনে। উহারই স্বার্থে কলিকাতায় এত লোক-ঠাসাঠাসি, বাসগৃহের অপ্রাতুল্য, বস্তির বীভৎসতা, খাদ্যে

এবং ঔষধেও ভেজাল, বাঙালীর এত দীনতা, অসহায়তা, জীবন্মৃত অবস্থা। এই 'বণিক-সভ্যতা'র পরিচালক ও পৃষ্ঠপোষক বাঙালী ও অবাঙালী দুইই।

প্রতিকার করিতে পারে শুধু বাঙলা-দরদী, বাঙলার দুঃখ দূর করিতে বদ্ধপরিকর একলক্ষ্য একপ্রাণ একতাবদ্ধ আদর্শনিষ্ঠ চরিত্রবান উৎসাহী বাঙালী,—হৈ-হুজুগ মাতাইয়া নয়, রাজদ্বারে প্রায়োবেশন করিয়া নয়, নিজেদের শক্তি সংহত করিয়া নিজেদের চিন্তা ও কর্মকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া নিজেদের চরিত্রকে দৃঢ় ও নির্ভীক করিয়া, বাংলা ও বাঙালীর গৌরব ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রকৃত স্বার্থত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকিয়া।

কলিকাতার কল কারখানা পরিবহণ, নাগরিক ব্যবস্থা চালু রাখিবার জন্য বাহির হইতে শ্রমিক আমদানি করিতে হয় কেন? বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, বোম্বাই, রাজস্থান, মহীশূর, মাদ্রাজ, অন্ধ্র কোথাও তো এরূপ দেখা যায় না। যে যে রাজ্য—সেই সেই রাজ্যের লোক রাজ্যের সব কাজ করিয়া আসিতেছে—মসনদের কাজ, স্কুল-কলেজের কাজ, দোকান-পাটের কাজ, আবার মিস্ত্রীগিরি মুটেগিরি ফিরিওয়ালার কাজ। সমস্ত পৃথিবী আজ মানুষের মর্যাদার নূতন মান নির্ণয় করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। কোনও মানুষই ছোট নয়, জীবিকার দ্বারা মানুষের সম্মান নিরূপিত হয় না। কোনও কাজই ছোট নয়—আমেরিকা বল, জাপান চীন বল, রাশিয়া বল, ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ বল সকল দেশের মানুষ এই সত্য বুঝিয়াছে ভারত-বর্ষের অন্যান্য রাজ্যেও এই চেতনা পরিস্ফুট—শুধু বাংলা দেশেই দৃষ্টিভঙ্গী এখনও সেই সাবেক কালের ভ্রান্ত আত্মসম্মানকে ঘিরিয়া বাঙালী জাতিকে মরণের পথে আগাইয়া দিতেছে। এই অলস পচা মোহগ্রস্ত দৃষ্টিভঙ্গীকে এখনই, এই মুহূর্তেই চিরদিনের জন্য কবর দিতে হইবে। কায়িক শ্রমের প্রতি অবজ্ঞাসূচক সমস্ত শব্দ বাংলা ভাষা হইতে ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—ইহা না বাংলারই অমর কবির ঘোষণা? রিক্স টানিলে, মোট বহিলে, জলের কল সারিলে, রাজধানী কলিকাতা পথে পথে বাসন গামছা মনোহারী দ্রব্য ফিরি করিলে, মানুষের চুলদাড়ি কামাইলে, রাস্তা মেরামত করিলে, ফ্যাক্টরির মজুর মিস্ত্রী হইলে বাঙালীর মনুষ্যত্ব খর্ব হইবে না। কাজের সময় কাজ, বাড়ী ফিরিয়া যে সংস্কৃতিমান্ বাবু নিশীথ নাথ ভাদুড়ী—এই দ্বৈত-সমন্বয় তো অসম্ভব নয়। আমেরিকায় জাপানে চীনে দেখিয়া এস—কি করিয়া কাজের সহিত সংস্কৃতির সমন্বয় হয়।

কলিকাতার বাজারে সবজির দোকান, ডিমের দোকান, মিঠাইএর দোকান বাঙালীর হাতছাড়া হইয়া যাইবে কেন? মনোহারীর দোকান, ঔষধালয়, হোটেল, ডাইংক্লিনিং এগুলিও ক্রমান্বয়ে অবাঙালীর হাতে চলিয়া যাইবে কেন? কারণ যাহাই হউক সেই কারণকে বাঙালীর জাগ্রত সংহত শক্তি দ্বারা প্রতিরোধ করিতে হইবে। বাংলার রাজধানী কলিকাতা নগরীতে বাঙালীর প্রাণস্পন্দন দেখিবার জন্য শুধু বেলা ৯টা হইতে ১০টা এবং বিকাল ৫টা হইতে ৬টায় শুধু ট্রাম বাসের দিকে, আর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের প্রেক্ষা-গৃহগুলির দরজায় তাকাইয়া থাকিতে হইবে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

অবশ্য জীবন-সংগ্রামের নিষ্ঠুর চাপে বাঙালীর ছেলেরা কিছু কিছু আত্মসচেতন হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কায়িক শ্রমের কাজে বাংলার নওজোয়ানরা ক্রমশঃ নামিয়া আসিতেছে, কিন্তু ইহা পর্যাপ্ত নয়। আরও চাই, ব্যাপক ভাবে চাই। সমগ্র বাঙালী-মানস হইতে ছোট কাজের প্রতি নাক সিঁটকানো মনোবৃত্তিটিকে একেবারেই বিসর্জন

দিতে হইবে। সেই নয়ন-জুড়ানো দৃশ্যটি কবে রাজধানী কলিকাতায় বাস্তব হইয়া উঠিবে—বাঙালী মোট বহন করিতেছে। হকার, মিস্ত্রী, ধোপা, নাপিত, পানওয়ালা, মিঠাইওয়ালা, সবজিওয়ালা—এ সব পেশা কি বাঙালী সানন্দে সোৎসাহে গ্রহণ করিয়াছে?

মুষ্টিমেয়ের উৎসাহ ও সদিচ্ছা এই আকাঙ্ক্ষিত ছবিকে বাস্তব করিতে পারে না। সমগ্র বাঙালী জাতির মনে একটি বলিষ্ঠ সহানুভূতি, একটি নূতন জাতীয়তা উদ্বুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। ইহা প্রাদেশিকতা নয়, আত্মবিশ্বাস—আত্মসম্বিৎ। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ঘর গুছাইতেছে, বাঙালীর ঘর কোন্ নিশ্চিন্তিপুরের পিসিমা আসিয়া গুছাইয়া দিয়া যাইবেন? ভাষাভিত্তিক রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্য কি? এক এক রাজ্যের লোক ভারতের বৃহৎ স্বার্থের সহিত সংঘর্ষ না বাধাইয়া নিজ নিজ অর্থনীতি, সমাজ-ব্যবস্থা, জীবিকা, শিক্ষা-সংস্কৃতি নিজেদের মনীষা ও শক্তিতে সম্পন্ন করিয়া যাইবে—ইহাই নয় কি? কলিকাতা শহরের যদি বর্তমানের এই অবস্থাই হইবে—বাংলার রাজধানীতে বাঙালীকে যদি এত অসহায়তা, দীনতা ও দুর্বলতার মধ্যে বাস করিতে হইবে, তাহা হইলে বাঙালী বঙ্গ-বিহার-সংযুক্তির বিরুদ্ধে এত হাত-পা ছুঁড়িয়াছিল কেন? বাঙালী যদি বাংলার মাটি, বাংলা ভাষা, বাংলার জীবনধারা, বাংলার অনুভূতি-আবেগ, বাংলার সমাজ-পরিবার, বাংলার সংস্কৃতি ভালবাসে তাহা হইলে দুর্জয় সাহস, উৎসাহ, কর্মোদ্যম ও সর্বোপরি স্বার্থত্যাগের দ্বারা উহা প্রমাণ করিতে হইবে। বাঙালীর সামগ্রিক জীবনে বল সঞ্চার না হইলে উহাদের কোনটিকেই রক্ষা করা যায় কি?

এমন শত শত সহৃদয় বিত্তবান বাঙালী ভদ্রলোক চাই, যাঁহারা আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও সদর রাস্তার উপরে নিজেদের বাড়ীর একটি অংশ বাঙালীর ছেলেকে ছাড়িয়া দিবেন পানের দোকান করিতে, ড্রাইং-ক্লিনিংএর দোকান করিতে। বাঙালীর ব্যবসাবাণিজ্যকে উৎসাহ দিতে ও দাঁড় করাইতে বাঙালী ক্রেতা-সাধারণের তরফে প্রচুর স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন হইবে। বাঙালী মজুরের শারীরিক বল কম, বাঙালী কর্মীর দলাদলি বুদ্ধি বেশী, এ সব তো জানা কথা। এ সব জানিয়াও বাঙালীকেই ডাকিতে হইবে। উৎসাহ দিয়া, ভালবাসিয়া তাহার কর্ম-দক্ষতা, নৈতিক বুদ্ধি বাড়াইতে হইবে। একই টাকা খরচ করিয়া অবাঙালী কর্মীর নিকট বেশী কাজ পাওয়া যায়, বেশী বাধ্যতা পাওয়া যায়, অনেক বেশী নিশ্চিন্ত থাকা যায়, ইহা হয়তো সত্য কথা—কিন্তু তবুও বাঙালীর এই সামগ্রিক বিপত্তির দিনে এই ধরনের বিচার-প্রণালী বাঙালীকে ত্যাগ করিতে হইবে। স্নেহময়ী জননী যেমন তাঁহার দুর্বল রুগ্ণ সন্তানকে বিরক্তির চোখে দেখেন না, অকুণ্ঠিত ভালবাসা, সহানুভূতি ও সেবা দিয়া তাহার স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করেন, আজ বাংলার ভাগ্যবান এবং সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের ভাগ্য-বিড়ম্বিত দরিদ্র দেশবাসি-গণের প্রতি অনুরূপ মমতা বোধ আনিতে হইবে। 'আমি তো নিরাপদে আছি, আমি যদু মধু মালতী মাধবীর কথা ভাবিব কেন?' বাংলার সৌভাগ্যের দিনে এই চিন্তাকে সহ্য করিলেও করা যাইত, কিন্তু আজ বাংলার ব্যাপক সর্বনাশের দিনে এই চিন্তা সর্বতোভাবে বর্জনীয়।

বাঙালীর ছেলেদের জন্য কায়িক পরিশ্রমের মান নূতনভাবে নির্ণীত হউক। ভূখন সিং এক-মণ বোঝা বহিতে পারে, সুজিত মিত্র তাহা পারে না। সুজিত মিত্র ১৫ সের মোট বহিতে পারে, বেশ, বাংলা দেশে সুজিত মিত্ররা যাহাতে ১৫ সের মোট বহিয়া অন্ন সংস্থান করিতে পারে এমন ব্যবস্থা কেন হইবে না? সুজিত মিত্ররা

কলিকাতার রাজপথে ছোট রিক্সায় একজন সওয়ারী টানিয়া কেন রুটি রোজগার করিতে পারিবে না? ভূখন সিংদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার কথা তুলিও না। ভূখন সিংদের সহিত প্রতিযোগিতা হইতে বাংলার শ্রমিককে রক্ষা কর। কত রকমের 'সংরক্ষণ' ব্যবস্থা হইতেছে। বাঙালীর জন্য 'শ্রম-সংরক্ষণ' কি এমনই একটি অসম্ভব ও আজগুবী কল্পনা? বাংলায় ট্রামে বাসে ও প্রেক্ষাগৃহে ধূমপান নিষিদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষের বহু অঞ্চলে এই আইন প্রচলিত হয় নাই, কিন্তু তাই বলিয়া ঐ অঞ্চলের লোক বাংলার এই আইনকে কটাক্ষ করে না, করিলেও বাংলার কিছু আসিয়া যায় না, কেননা বাংলাকে নিজস্ব প্রয়োজনে উহা করিতে হইয়াছে। বাঙালী শ্রমিকরা যাহাতে না মরিয়া, খাটিয়া খাইতে পারে, তাহার জন্য বাংলায় শ্রমের মান নূতনভাবে চালু করা কি অন্যায়?

ভূখন সিংদের কি হইবে? কেন, বিশাল ভারতবর্ষে একমণ মোট বহিবার কি অপর জায়গা নাই? 'ঠাসা মড়কপুরী' ছাড়া আর কি কোন আশ্রয় নাই? বাংলা তো বহু বৎসর ধরিয়া হাসিমুখে অতিথি সৎকার করিয়াছে কিন্তু এখন যে তাহার নাভিশ্বাস উপস্থিত। এখন যদি সে একটু বাঁচিবার চেষ্টা করে, তাহা ভারতীয় সংবিধানে বাধা উচিত নয়, অপর রাজ্যবাসীদেরও মুখ ভার করা সঙ্গত নয়।

কিন্তু তথাপি একটি সূক্ষ্ম প্রশ্ন থাকিয়া যায়। বাংলা দেশের রাজধানীতে যদি বাঙালীর প্রাধান্য হয়, বাঙালীর হাসিমুখ দেখা যায়, বাঙালীর মেধা, বীর্য, শক্তি, সংহতি জাগিয়া ওঠে—তাহা হইলে বাংলার রাজনীতির কি হইবে? বাংলার কীটদষ্ট রাজনীতির স্বার্থ যে পুরাপুরিই হাজার হাজার বহিরাগতের উপর নির্ভর করে!

এই প্রশ্নের সহজ সরল সবল উত্তর এই—বাংলার রাজনীতি অপেক্ষা বাংলা ও বাঙালী অনেক বড এবং বাংলার রাজধানী কলিকাতার কল্যাণও অনুরূপই বড়।

অঙ্গীকার

শ্রীদিলীপ কুমার রায়

কী বলিব বলো আমি? জানো তো সকলি স্বামী!
চরণে লহ প্রণামী—তনু মন প্রাণ অন্তর।
ছায়া যত হৃদে বাজে, বাঁধা পড়ি মিছে কাজে,
সকলি তোমারি মাঝে লীন হোক, ওগো সুন্দর!

তোমার মধুর বাণী জীবনে অমৃত মানি,
তোমারেই শুধু জানি—অন্তরঙ্গ, বন্ধু!
তুমি ডাক দাও যারে কে তারে রুধিতে পারে?
ধায় নদী অভিসারে তোমারি পানে, হে সিন্ধু!

তোমার প্রেমের আলো উদিলে মিলায় কালো,
তোমারে যে বাসে ভালো পারানি পায় অপারে।
জনম-মরণ-সাথী! জপিয়া তব প্রভাতী
পোহায় বেদনা-রাতি বিধুর অন্ধকারে।

শিখাও গাহিতে নির্মল কীর্তন তব উছল,
ফুটাও প্রেমের উৎপল অপ্রেমের মৃণালে।
জানি না তো তব সাধনা—জপ তপ পূজারাধনা
জানি শুধু উন্মাদনা নূপুর-মুরলী-তালে।

রবীন্দ্রকাব্যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

রবীন্দ্রনাথের কাব্য যেমনই বিপুল তেমনই গভীর। প্রতিভার এত বৈচিত্র্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সমপর্যায়ের আর কোন কবি জন্ম গ্রহণ করেছেন কি না—সন্দেহ। মানবহৃদয়-তন্ত্রীর অপরূপত্বের যত বিচিত্র ঝঙ্কার সবই তাঁর হৃদয়বীণায় নানা সুরে, নানা মূর্ছনায়, নানা ব্যঞ্জনায় যে কাব্য-মাধুর্যে উৎসারিত তা অতুলনীয়। তাঁর কাব্য-প্রতিভার ব্যাপ্তি আমাদের হৃদয় মনকে আচ্ছন্ন করে, মহাসাগরের কূলে দাঁড়িয়ে তার সীমাহীন বিস্তৃতির বোধ যেমন আচ্ছন্ন করে আমাদের চিত্তকে।

ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথও কবি রবীন্দ্রনাথের মতই দুরবগাহী। মানবজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর বিচিত্র প্রকাশ। কবি রবীন্দ্রনাথ, ধর্মপ্রচারক রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ, সমাজ-সংস্কারক রবীন্দ্রনাথ, দেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ, কর্মী রবীন্দ্রনাথ, জ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ,—রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্বের কত বিভিন্ন প্রকাশই না দেখা যায়। রবীন্দ্র-জীবনের এই উত্তুঙ্গতা আমাদের বিচারবুদ্ধিকে অতিক্রম করে এবং মনে জাগিয়ে তোলে বিস্ময়, স্তব্ধতা।

সেইজন্যই যখন রবীন্দ্রজীবনের আধ্যাত্মিক অনুভূতি সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে তখন তার সম্পূর্ণায়তন বিচার সম্ভব নয়। কেননা, অধ্যাত্মচেতনা মানুষের সমগ্র সত্তাকে বিধৃত করেই প্রকাশিত হয়। যে স্বর্গীয় সারমেয় পলায়মান মানবাত্মাকে চিররাত্রি, চিরদিন অতন্দ্রিত ধৈর্যে অনুসরণ ক'রে চলেছে তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া তো অসম্ভব। 'এষাঽস্য পরমা গতিরেষাঽস্য পরমা সম্পদেষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দঃ।' সুতরাং জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ মানুষের সমগ্র চেতনার গতিপথের সংক্রমণ চলেছে একটি বিশেষ কেন্দ্রকে ঘিরে। সেই কেন্দ্রই মানবজীবনের ধ্রুবতারা

'——যাব অভিসারে

তার কাছে—জীবন সর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি। কে সে? জানি না কে,
চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তরপ্রদীপখানি।'

রবীন্দ্রজীবন এতই বহুমুখী যে তার মধ্যে ধর্মের প্রকাশ হয়েছে বহু বিচিত্র ভঙ্গীতে। ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিশ্বমানবতা-প্রচারক রবীন্দ্রনাথের যে ব্যবধান, তা যে কেবল কালিক প্রভেদ মাত্র তা নয়—এ বিভিন্নতা যেন সমগ্র অনুভূতিরই রূপান্তর। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনের পটভূমিকায় ধর্মানুভূতির ঐতিহাসিক আলোচনা একটি মাত্র সভায় সম্ভব নয়। তাই আমাদের আলোচনাকে সীমায়িত করা ছাড়া উপায় নাই।

রবীন্দ্রকাব্যে অধ্যাত্ম-অনুভূতির যে প্রকাশ আমরা দেখি—আজ সেইটিই আমাদের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু প্রারম্ভেই বলেছি যে রবীন্দ্রনাথের কবিমানসও একটি বিরাট মহাকাশ। তার মধ্যেও মানবহৃদয়ের বর্ণবৈচিত্র্যের ইন্দ্রধনুর দ্যুতিময় প্রকাশ-গরিমা আমাদের চিত্তাকাশকে রাঙিয়ে তোলে অনির্বচনীয় ভাবমাধুর্যে। তাই তার

মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলি— বিচারবুদ্ধি হয় পরাভূত।

তবু বিচারের প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রকাব্য অনুভূতির বেগ-প্রাখর্যে গতিময়, তাঁর বুদ্ধির এবং মননশীলতার বিস্তারই রবীন্দ্র কাব্যকে শান্তগম্ভীর-রসাস্পদ করেছে। উপনিষদে পরমপুরুষকে বলা হয়েছে 'কবি'—'মনীষী'। কবি রবীন্দ্রনাথে এই মনীষারও কিছু প্রতিফলিত হয়েছে। তাই এই মননধর্মী কবিকে কেবল ভাবালুতার সাহায্যে বোঝা সম্ভব নয়। বিচারের প্রয়োজন আছে—তাঁর যথার্থ পরিচিতি লাভ করতে হ'লে।

সাধারণতঃ মানুষের জীবন কক্ষীকৃত (Compartmentalised)। তাই সে কখনও ডক্টর জেকীল কখনও মিষ্টার হাইড হতে পারে। রবীন্দ্রজীবনে এবং কাব্যে অনুভূতির বিভিন্ন কক্ষের দর্শন খুবই মেলে। কিন্তু তা হলেও তাঁর অনুভূতির বিভিন্ন প্রকাশকে এক সূত্রে গ্রথিত করার একটি প্রচেষ্টা তাঁর কাব্যের মধ্যে দেখা যায়। সেই প্রকাশের আকুতিকেই আমরা অধ্যাত্ম-চেতনা বলব। 'কড়ি ও কোমল' রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের রচনাবলীর মধ্যে অন্যতম। এই কাব্যে রবীন্দ্রনাথের এমন কতকগুলি কবিতা আছে, যা মানবের ইন্দ্রিয়গত জীবনের অভিব্যক্তি। এইরূপ কবিতারই একটি—'পূর্ণমিলন'। এই কবিতায় কবি বলছেন :

'নিশিদিন কাঁদি সখী মিলনের তরে,
যে মিলন ক্ষুধাতুর মৃত্যুর মতন।
লও লও বেঁধে লও, কেড়ে লও মোরে,
লও লজ্জা, লও বস্ত্র, লও আবরণ॥

এই ভাব জৈব জীবনের আকর্ষণ-বিকর্ষণের ব্যাপার—প্রাকৃত জীবনের ঐন্দ্রিয়িক লীলার কথাই এতে অভিব্যঞ্জিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনীষা এই ইন্দ্রিয়ানুগ জীবনের আহ্বানকে অতিক্রম করেছে এবং জৈব আকর্ষণের ঊর্ধ্বে যে মহাকর্ষ মানব-সত্তাকে চিরন্তন কাল ধরে ডাক দিয়েছে তার অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে এই কবিতার শেষ চরণে,

'একি দুরাশার স্বপ্ন হায় গো ঈশ্বর।
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোনখানে ?'

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সকল প্রচেষ্টার অন্তরালে এই মহাকর্ষের আকর্ষণ বিরাজিত। রবীন্দ্র-কাব্যের অখণ্ডতা ও একতানতা নিয়ে এসেছে এই মহাকর্ষই। রবীন্দ্রনাথ একস্থানে এর কথা বলেছেন :

'যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি।

'আমার অন্তর্নিহিত যে সৃজনী শক্তি আমার জীবনের সমস্ত সুখ, দুঃখকে সমস্ত ঘটনাকে ঐক্যদান, তাৎপর্যদান করিতেছে। আমার রূপ, রূপান্তর, জন্মজন্মান্তরকে ঐক্যসূত্রে গাঁথিতেছে। যাহার মধ্য দিয়া বিশ্বচরাচরের মধ্যে ঐক্য অনুভব করিতেছে, তাহাকেই জীবনদেবতা নাম দিয়া লিখিয়াছিলাম, 'ওহে অন্তরতম'।'

রবীন্দ্রকাব্যে এই দেবতার প্রকাশ হয়েছে নানাবর্ণাশ্রয়ে। কাব্যের মূলকথাই অবশ্য রস। 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্' এবং পরমদেবতা—তিনি রসস্বরূপ—'রসো বৈ সঃ'। এই রসকে লাভ করেই জীব আনন্দ পায়। এই আনন্দই পরমানন্দ থেকে উদ্ভূত। 'এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি'—এই আনন্দের অংশ গ্রহণ করেই জীবগণ দেহধারণ করে। 'কো হোবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ'—কেই বা নিশ্বাস প্রশ্বাস নিত, যদি এই আকাশ 'আনন্দ' না হ'ত।

এই যে রস বা আনন্দের অনুভূতি, এই-ই রবীন্দ্র কাব্যের মূলাশ্রয়—পরম আনন্দের মাত্রার উপজীবন। নানাভাব বৈচিত্র্যের মাঝে কবিচিত্ত এরই প্রকাশ করেছে :

'যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।'

এই বৈচিত্র্য রূপের প্রকাশ নয়, অরূপের প্রকাশ নয়—এ অপরূপের প্রকাশ।

'বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে
অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে।'

—রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টি তত্বজ্ঞের দৃষ্টি নয়—কবির দৃষ্টি। যিনি তত্বজ্ঞ তিনি জানেন 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন—মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।' তিনি 'সলিল একো দ্রষ্টাঽদ্বৈতো ভবতি'—তিনি স্বচ্ছ, এক, দ্রষ্টা ও অদ্বৈত হন। ভাব ঋষি যখন জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন 'কোঽয়মাত্মা নাম' তখন তিনি নিরুত্তর ছিলেন—কেননা 'উপশান্তোঽয়মাত্মা।' সমাধিমান্ তত্বজ্ঞ পুরুষের যে অনুভূতি সে অনুভূতি কবির আধ্যাত্মিক অনুভূতি থেকে পৃথক্। একটি জ্ঞান—বস্তু-তান্ত্রিক, অপরটি শিল্প—পুরুষতান্ত্রিক। একটি উদাহরণ দিলে এটি পরিস্ফুট হবে। শিশুর মৃত্যুতে মায়ের যে শোক সেটি কঠোর সত্য—কিন্তু সেই শোক কবির মনে যে অনুরণন তোলে তা পুরুষতান্ত্রিক—সেইটিই কাব্য, শিল্প।

ধর্ম সম্বন্ধেও সেই একই কথা। যে ভাবাবেগ মানুষের চিত্তে ধর্মবোধকে জাগ্রত করে তাই কবিচিত্তে কাব্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় বিচিত্র সৃষ্টিতে রবীন্দ্রকাব্যেও, তাই দেখি তাঁর সহজাত ধর্মভাব পরিবেশের শিক্ষাদীক্ষা তাঁর মননশক্তি যে ধর্মবোধকে তাঁর মাঝে জাগ্রত করেছে তাই শতধারে তাঁর কাব্যগোমুখী থেকে উৎসারিত হয়ে জীবনের ক্ষেত্রকে বিচিত্র শস্যপর্যায়ে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তাঁর অধ্যাত্ম-অনুভূতি ধর্মরাজ্যের নায়কদের সমতুল্য। তাঁর ধর্মানুভূতি প্রকৃতির রাজ্যকে অতিক্রম করেনি। তাঁর অনুভূতি অধ্যাত্মচেতনা সম্বন্ধে মানসিক ও বৌদ্ধিক সমাচার মাত্র—report of the senses তাঁর জীবনের প্রকাশ তিনি কবি, এবং কবির ধর্মই হচ্ছে জীবনের বিচিত্র রূপকে গ্রহণ করা এবং তা থেকে ভাবাদর্শের (idea) সৃষ্টি করা। এই কাজই তিনি করেছেন। এমন কি যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি কিশোর বয়সে তাঁর চৈতন্যকে একদিন আপ্লুত করেছিল তাও এসেছিল ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়েই এবং সেইজন্যই এই অনুভূতি তাঁকে 'মুক্ত' করেনি। সেই অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছিল কাব্যের প্রবাহাকারে :

জীবন আজি মোর কেমনে খুলি,
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

কিংবা—আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর ?

ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কবির জীবনে এইরূপই হয়। শেলীর কাব্যে দেখি বেদান্তের কথা আছে অতি অপূর্ব ভাষায় :

The one remains, the many change and pass
Heavens light forever shines,
Earths shadows fly,
Life like a dome of many-coloured glass,
Stains the white radiance Eternity

শেলী এই ভাব পেয়েছিলেন Neo-Platonism থেকে—এ তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ অনুভূতি নয়। তবুও তাঁর সংবেদনশীল মন অতি অপূর্ব ভাবে এই চিন্তাধারাকে প্রকাশ করেছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মাঝে অধ্যাত্ম-অনুভূতি যে বিচিত্র প্রকাশ দেখতে পাই তা শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত অপরোক্ষানুভূতি না হলেও—'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' তিনি এমন অপূর্ব ভাব সৃষ্টি করেছেন তার তুলনা জগতের সাহিত্যে

বিরল। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক অনুভূতি বিশেষভাবে যে সকল কবিতার মধ্যে ধরা পড়েছে তাদের সংখ্যাও বিপুল। এর মাঝে উপনিষদের ভাব আছে, বৈষ্ণব কবির আকৃতি আছে, কর্মীর কর্মপ্রেরণার উৎসের কথা আছে, ব্রাহ্মধর্মের সগুণ নিরাকারের ভজন আছে এবং পরিশেষে আছে 'মানুষের ধর্মে'র জয়গান। স্পর্শাতুর কবি-মনে মানবের সকল হর্ষশোক প্রেম বিরাগ, প্রভৃতি ধরা পড়েছে তেমনি ধরা পড়েছে বিভিন্ন মানুষের ধর্মের অনুভূতি এবং এই সকল ভাবই কবি-মনের মাধুরীর সঙ্গে মিশে সার্থক সৌন্দর্য-সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ একটি কবিতা গ্রহণ করছি। কবিতাটির নাম 'ধ্যান':

নিত্য তোমারে চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া বরণ করি,
তুমি আছ মোর জীবন মরণ হরণ করি,
তোমার পাইনে কূল,
আপনার মাঝে আপনার প্রেম
তাহারও পাইনে তুল।
উদয়শিখরে সূর্যের মত সমস্ত প্রাণ মম
চাহিয়া রয়েছে নিমেষ-নিহত একটি নয়ন সম,
অগাধ অপার উদার দৃষ্টি
নাহিক তাহার সীমা।
তুমি যেন ওই আকাশ উদার,
আমি যেন এই অসীম পাথার,
আকুল করেছে মাঝখানে তার
আনন্দ পূর্ণিমা।
তুমি প্রশান্ত চিরনিশিদিন,
আমি অশান্ত বিরামবিহীন—
চঞ্চল অনিবার।
যতদূর হেরি দিগ্ দিগন্তে
তুমি আমি একাকার।

এই কবিতাটির মধ্য দিয়ে ধ্যানতত্ত্বের যে রূপ প্রস্ফুটিত হয়েছে তা সত্যই অতুলনীয়। যোগী যাকে চিত্তবৃত্তিনিরোধ ব'লে বর্ণনা করেই শেষ করেছেন কবি তারই রূপটি ভাষায়, ব্যঞ্জনায় একটি মূর্তির মত আমাদের সামনে সাজিয়ে ধরেছেন।

কবি যে তাঁর অধ্যাত্মচিন্তায় জীবনের সকল সমস্যার সমাধান পাননি, এটি আমরা তাঁর কাব্য পাঠে বুঝতে পারি। তিনি একদিন প্রশ্ন করেছিলেন:

এত বড় এ ধরণী মহাসিন্ধু ঘেরা
দুলিতেছে আকাশ সাগরে,
দিন দুই হেথা রহি মোরা মানবেরা
শুধু কি মা যাব খেলা ক'রে?

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি বলেছেন:

প্রথম দিনের সূর্য প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে,
কে তুমি? মেলেনি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল—
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগরতীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—কে তুমি?
পেল না উত্তর।

কবি-মনের এই যে প্রকাশ তা 'বেদাহমেতম্' এই ঔপনিষদিক বাণীর প্রকাশের মতো সুদৃঢ় ও বলশালী নয়। সর্বসংশয় ছিন্ন হ'লে মানব-কণ্ঠে তত্ত্ব যে অবিসংবাদিতার রূপ নেয় তা কবি-কণ্ঠে নেই। কিন্তু তা হলেও ধর্মজীবনের বিচিত্র অনুভূতি প্রকাশ-ভঙ্গীর মাধুর্যে এমন অপূর্ব হয়ে ফুটে উঠেছে যা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে একটা বিশিষ্ট রূপ ও মূর্তি রচনা করে।

এই প্রবন্ধের ভিতর দিয়ে এইটুকুই বলতে চেয়েছি যে রবীন্দ্রনাথের সংবেদনশীল মন সকল মানুষের অধ্যাত্মচিন্তাকেই রূপ দিয়েছে তাঁর কাব্যের মাঝে। তাঁর অধ্যাত্ম-অনুভূতি হয় তো বুদ্ধ, যিশু প্রভৃতির সমগোত্রীয় নয়, কিন্তু তবুও তাঁর হৃদয়বীণায় এই সকলের অধ্যাত্ম-চিন্তা ভাষার এবং ভাবের মাধুর্যে অনবদ্যভাবে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নিজের আধ্যাত্মিক অনুভূতি কি এবং কত গভীর—সেটা তাঁর কাব্য-বিচারে জানার প্রয়োজন ততটা নাই। তাঁর কাব্য যে সকলের অধ্যাত্ম-চিন্তার সার্থক রূপায়ণ এইটিই তাঁর কাব্য-প্রতিভার বিরাটত্বের এবং মহিমার প্রধান সাক্ষ্য।*

* গত ৭ই সেপ্টেম্বর পুরুলিয়া রবীন্দ্র পরিষদে পঠিত।

সমাজ-শিক্ষা ও স্বামীজী

শ্রীসুবোধকুমার প্রামাণিক

বাংলাদেশের তথা সমগ্র ভারতবর্ষের সমাজ-জীবন যখন বিভিন্ন দিক থেকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে চলেছে, তখন তার প্রাচীন ঐতিহ্য অবলুপ্তির চরম সীমায় এসে একেবারে আত্মবিসর্জন করতে বসেছে, ঠিক সেই সময়েই ভারতবর্ষের সমাজ-জীবনে এক অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব প্রয়োজন হয়েছিল। সমাজের যত সংকীর্ণতা, নীচতা, বিরোধ প্রভৃতির বিরুদ্ধে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াবার জন্য যেন আবির্ভূত হলেন মহান্ যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ। সমাজ-জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন নতুন আদর্শের, প্রচার ক'রে গেলেন যুগোপযোগী নতুন চিন্তা ও ভাবধারা। বিংশ শতকের প্রথমে সমাজ-জীবন সেই আদর্শ ও চিন্তাধারার আস্বাদ পেয়ে সমাজকে নতুন ভাবে গঠন করবার সংকল্প ও দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। সমাজগঠনের সংকল্প সেদিন যাঁরা নিলেন, তাঁরা চিন্তা করলেন, সমাজকে নতুনভাবে আদর্শের পথে গঠন করতে হ'লে সর্বাগ্রে প্রয়োজন হবে শিক্ষার এবং এই শিক্ষার মর্যাদাকে সমাজের সকল স্তরে বিস্তৃত ক'রে দিতে হবে। সমাজের সকল মানুষ যখন উপযুক্ত শিক্ষার আলোক চোখের সামনে উপলব্ধি করতে পারবে, তখন তারা নিজেরাই সমাজ-গঠনের দায়িত্বকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারবে। অশিক্ষা কিংবা কুশিক্ষার মধ্য দিয়ে কখনই সুশিক্ষিত কিংবা সুসভ্য সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হ'তে পারে না।

শিক্ষাকে স্বামীজী এক বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন এবং সেই বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ভারতীয় জীবনে শিক্ষার একটি বিশিষ্ট মান নির্ধারণ করেছেন। প্রচলিত শিক্ষার ভুল-ত্রুটি দেখিয়ে শিক্ষার মধ্যে কি ক'রে শাশ্বত আদর্শের অনুবর্তন করা যায়, সেই ইঙ্গিতই তিনি দিয়ে গেলেন শিক্ষাব্রতীদের সামনে এবং শিক্ষার্থী তরুণ সম্প্রদায়ের মনে।

আমাদের দেশে যে শিক্ষার প্রচলন রয়েছে, তা সমাজের সকল স্তরে গিয়ে প্রসার লাভ করতে পারেনি। কেবলমাত্র কয়েকটি বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে যে শিক্ষা সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে, তা দিয়ে কখনই দেশের সর্বজনীন মহৎ কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। তাই সর্বাগ্রে চাই ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র সকল শ্রেণীর মধ্যেই শিক্ষার ব্যাপক প্রসার। এখানেই সমাজ-শিক্ষার অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা। যেদিন সমাজের সকল মানুষ সমাজ-শিক্ষার সাহায্যে উপযুক্ত জ্ঞানের দ্বারা সমৃদ্ধ হতে পারবে, সেদিনই সূচিত হবে ভারতবর্ষের সমাজ-জীবনের নতুন অধ্যায়। স্বামীজীর ধ্যানী দৃষ্টিতে ছিল সেই সমাজ-জীবনেরই কল্পনা।

স্বামীজী চেয়েছিলেন সমাজ-জীবনে পূর্ণতা, ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসে প্রচুর পরিমাণেই এই পূর্ণতার সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু সমাজ-জীবনে যখনই অসুস্থ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে তখনই বিনষ্ট হয়েছে পূর্ণতা এবং তার স্থান অধিকার করেছে বিকৃতি ও অনাচার। সমাজ-জীবনকে সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ ক'রে গড়ে তুলতে হ'লে সমস্ত প্রকার বিকৃতির মূলোৎপাটন ক'রে সেখানে পূর্ণতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এই পূর্ণতার প্রয়োজনেই সমাজ-শিক্ষা। অজ্ঞ,

দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে সমাজ-শিক্ষার প্রচলন করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এই সমাজ-শিক্ষার মধ্য দিয়ে সকল মানুষের আত্মোপলব্ধির বোধ ধীরে ধীরে জাগ্রত হবে এবং এইভাবে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। সমাজবোধের মাধ্যমে মানুষের মনে সূচিত হবে কল্যাণের পথে আত্ম-নিয়োগের প্রচেষ্টা—এই ছিল স্বামীজীর স্বপ্ন। স্বামীজীর মানব-কল্যাণের আদর্শের সঙ্গে সমাজ-শিক্ষার নিবিড় সম্পর্ক এইখানেই।

স্বামীজী স্পষ্টভাবেই বুঝেছিলেন যে ভারতের সমাজ-জীবনে অশিক্ষা ও দারিদ্র্য জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে রয়েছে। একদিকে অশিক্ষা যেমন মানুষের মনকে সংকীর্ণ ক'রে তোলে, অপরদিকে তেমনি দারিদ্র্যও মানুষের জীবনযাত্রাকে ব্যাহত ও পঙ্গু ক'রে দেয়। তাঁর একটি চিঠিতে একস্থানে লিখেছেন, "বিশেষ, দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না।" মানব-দরদী স্বামীজীর চোখের সামনে ঐ দুটি বিষয়ের চিত্র সব সময়ই যেন বিরাজমান ছিল। এই দুটি সমস্যাকে এক সঙ্গে নিয়ে দূরীকরণের উপায় অনুসন্ধান করতে হবে, এই ইঙ্গিত স্বামীজী তাঁর বিভিন্ন আলোচনায় প্রকাশ করেছেন। সমাজ-শিক্ষার মধ্য দিয়ে এই দুটি জিনিসকে একসঙ্গে দূরীকরণ করা সম্ভব হতে পারে। প্রকৃত সমাজ-শিক্ষা কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যাদান ক'রে ক্ষান্ত হবে না, সেই সঙ্গে আর্থনীতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি সকল দিক দিয়ে আত্ম প্রতিষ্ঠার আদর্শের সন্ধান দেবে।

সমাজের যারা তথাকথিত নিম্নসম্প্রদায়ের, তাদিগকে চিরকালই বঞ্চিত রাখা হয়েছে। অথচ তাদের মধ্যে কতই না প্রতিভা সুপ্ত হয়ে রয়েছে এবং প্রয়োজনীয় প্রেরণার অভাবে তা দিন দিন লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যদি সমাজ-জীবনে পূর্ণতার প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তবে এই নিম্নশ্রেণীর লোকদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা চলবে না, উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষার দ্বারা তাদিগকে আদর্শ নাগরিক ক'রে গড়ে তুলতে হবে। সমাজের উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র সকলেই যদি না শিক্ষার আলোক পায়, তবে সমাজ-জীবনের সর্বাত্মক উন্নতি কখনই সম্ভব নয়। স্বামীজীর বিভিন্ন বক্তৃতায় এবং বিভিন্ন আলোচনায় এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর মনে সকল সময়েই ছিল বঞ্চিত সম্প্রদায়ের প্রতি অপরিসীম সহানুভূতি। তাই তিনি এদের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি এই সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একস্থানে বলেছেন, "এখন 'ইতর' জাতিদের ন্যায্য অধিকার পাইতে সাহায্য করিলেই 'ভদ্র'জাতির কল্যাণ। তাই তো বলি তোমরা এই জনসাধারণের (mass) ভিতর বিদ্যার উন্মেষ যাহাতে হয়, তাহাই কর। ··এই সব নীচ জাতির ভিতর বিদ্যাদান, জ্ঞানদান করিয়া ইহাদের চৈতন্য সম্পাদন করিতে যত্নশীল হও।"

নিম্ন সম্প্রদায়ের লোক ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে সমাজশিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন, সে সম্বন্ধেও স্বামীজী বিশেষভাবে সজাগ ছিলেন। দেশের জনসাধারণ যতদিন অজ্ঞানতার অন্ধকারে রয়েছে, ততদিন আর কোন দিক দিয়েই এই দেশের উন্নতি সম্ভব নয়.—একথা তিনি স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন।

সাধারণ মানুষ তার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞ ও উদাসীন। তাই প্রতিটি মানুষকে তার প্রকৃত অবস্থার কথা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে হবে। যখন সে তার প্রকৃত অবস্থার কথা উপলব্ধি করতে পারবে, তখনই সে অধীর আগ্রহে নিজের উন্নতির পথ অন্বেষণ করতে চাইবে এবং

তার ফলে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জন্মাবে। স্বামীজীর একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি বলছেন, "Your duty, at present, is to go from one part of the country to the other, from village to village, and make the people understand that mere sitting about idly won't do any more" আরও বলছেন:

উহাদের প্রকৃত দুরবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া বলিতে হইবে, 'ভাই সব, উঠ জাগ, আর কতকাল ঘুমাইয়া থাকিবে? তারপর উহাদের নিজ নিজ ঐহিক অবস্থার উন্নতির উপায় বলিয়া দিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রের গভীর সত্যগুলি প্রাঞ্জল ভাষায় এমন ভাবে পরিবেশন করিতে হইবে যাহাতে ঐগুলির মর্ম তাহারা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে।

আমাদের সমাজের এই নিরক্ষর শ্রেণীর লোকদের মধ্যে শাস্ত্রের বিষয়সমূহ সহজভাবে আলোচনা করবার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ছোট ছোট গল্প, মহাপুরুষ-জীবনী প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তাদের সামনে আদর্শ জীবনের নীতি এবং প্রেরণা প্রভৃতি পরিস্ফুট ক'রে তুলতে হবে। তবেই তো তারা সমাজ-জীবনে আদর্শের সন্ধান পেতে পারবে। কথক-ঠাকুরগণ ঠিক এইভাবেই শাস্ত্রের বিভিন্ন স্থান থেকে গল্পের মাধ্যমে আলোচনা ক'রে লোকশিক্ষার কাজ ক'রে থাকেন। সমাজের নিরক্ষর শ্রেণীর মানুষের কাছে এই ধরনের আলোচনার আবেদন যতখানি, অন্য ধরনের আলোচনার ততখানি নয়।

এই সম্পর্কে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেন: We have to give them secular education. We have to follow the plan laid down by our ancestors, that is, to bring all the ideals slowly down among the masses. Raise them slowly up, raise them to equality. Impart even secular knowledge through religion

সমাজ-শিক্ষায় এই বিষয়গুলি যে একেবারে অপরিহার্য এ সম্পর্কে স্বামীজী বারবার তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন। সমাজের মানুষ যে স্তরে এসে পৌঁছেছে, তাকে শিক্ষার আলোক দিয়ে নতুন পথের সন্ধান দেবার জন্য এগুলির বিশেষ প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের জনসমাজে ধর্মের আবেদন চিরকালই একটু বেশী। তাই এই বিষয়ের সহায়তা গ্রহণ ক'রে তাদের মধ্যে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হ'তে পারে এবং এই আদর্শের দ্বারাই আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতি অনেকটা পরিমাণে পরিলক্ষিত হ'তে পারে। স্বামীজী চেয়েছিলেন জাতির সর্বাত্মক উন্নতি সাধন—সমাজশিক্ষা তার প্রধানতম উপায়।

স্বামীজী সমাজ-শিক্ষার উপায়ের সম্বন্ধেও বিভিন্ন জায়গায় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর একটি চিঠিতে বলেছেন, 'ঐ যে গরীবগুলো পশুর মত জীবন যাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা। মনে কর কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিত-চিকীর্ষু যুবক গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ ক'রে বেড়ায়, নানা উপায়ে নানা কথা, ম্যাপ ক্যামেরা গ্লোব ইত্যাদি সহায়ে আচণ্ডালের উন্নতিকল্পে বেড়ায়, তাহলে কালে মঙ্গল হ'তে পারে কিনা?' সমাজের নিরক্ষর মানুষদের মনে হয়তো শিক্ষার সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে ঔদাসীন্য থাকতে পারে, কিন্তু তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় বলা এবং পারিপার্শ্বিক জগতের বিভিন্ন ধারণা দেওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের মনে শিক্ষার প্রতি আগ্রহের সঞ্চার করা যেতে পারে। এইসব

কাজের জন্য আসলে চাই নিঃস্বার্থ কল্যাণব্রতী সমাজকর্মী। সমাজ-শিক্ষার মধ্যে স্বার্থের প্রয়োজন থাকলে তা যে কখনই সার্থক এবং সম্পূর্ণ হ'তে পারে না, একথা স্বামীজী তাঁর দূর-দৃষ্টিতে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন।

এই মহান্ কর্মে ব্রতী হওয়ার জন্য তিনি সকলকেই আহ্বান করেছেন। বিশেষ ক'রে শিক্ষিত সম্প্রদায় যাঁরা শিক্ষার মর্যাদা উপলব্ধি করেছেন, তাঁরা যদি অজ্ঞ নিরক্ষরদের মধ্যে শিক্ষাদানের চেষ্টা করেন, তবে হয়তো এ বিষয়ে যথেষ্ট ফল আশা করা যায়। কিন্তু যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যস্ত এবং অজ্ঞ জনসাধারণের উন্নতির প্রতি একেবারে উদাসীন, তাঁদেরও লক্ষ্য ক'রে স্বামীজী তাঁর কঠোর মন্তব্যটি একাধিক বার প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন: যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র্যে ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে, ততদিন তাহাদের পয়সায় শিক্ষিত, অথচ তাহাদের দিকে চাহিয়াও দেখে না, এরূপ প্রত্যেককে আমি দেশদ্রোহী বলিয়া মনে করি।

যে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশের জনসাধারণের অজ্ঞতা ও অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে নিজ নিজ স্বার্থ সাধনে তৎপর হয়ে রয়েছে এবং তার দ্বারা তারা দেশের কত অনিষ্ট সাধন ক'রে চলেছে। তাদেরকে দেশদ্রোহী (traitor) ছাড়া আর কিছু আখ্যা দেওয়া চলে না।

সমাজ-শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজী বিভিন্ন স্থানে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ব্যাপকভাবে করতে হ'লে একদিকে যেমন সহজ শিক্ষা-পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়, অপরদিকে তেমনি শিক্ষার্থীর প্রতি অপরিসীম সহানুভূতি পোষণ করা একান্তই প্রয়োজন। সমাজ-শিক্ষার ক্ষেত্রে আন্তরিকতার প্রয়োজন সবং সর্বাগ্রে, কারণ, আন্তরিকতা ব্যতিরেকে কখনই কোন কাজ স্থায়ী এবং স্বাভাবিক হতে পারে না। স্বামীজী এই বিষয়ে সমাজ শিক্ষকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ ক'রে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন।

স্বামীজী গভীর দরদ দিয়ে সমাজের মানুষের উন্নতি চেয়েছিলেন। তাঁর ধ্যানী দৃষ্টিতে ছিল মানব-কল্যাণের সুমহান্ আদর্শ। তিনি কল্পনা করেছিলেন নতুন এক সমাজের রূপকে—যে সমাজের মানুষ হবে আত্মনির্ভরশীল, নীতিপরায়ণ, সেবাধর্মে দীক্ষিত এবং আদর্শ সামাজিক। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে যদি এই দেশের সর্বাত্মক উন্নতি সাধন করতে হয়, যদি এই দেশে মানব-কল্যাণের আদর্শকে যথার্থভাবে রূপদান করতে হয়, তবে দেশের জনসাধারণের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষার বিস্তার ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। তাই তিনি উদাত্ত কণ্ঠে পুনঃপুনঃ ঘোষণা ক'রে গিয়েছেন, "If we are to rise again, we shall have to do it by spreading education among the masses . . . —যে জাতির জনসাধারণের ভিতর শিক্ষার বিস্তার এবং মনীষার বিকাশ যত বেশী সেই জাতি তত উন্নত।

প্রভাতের উদয়নে

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

সংসারের রঙ্গশালা কবে মোরে দিবে গো বিদায় ?
বহু ভূমিকায় মোর অভিনয় হ'ল নাক শেষ ,
পার্থিব-সম্পদ-মোহে প্রতিদিন মিথ্যা-মমতায়
নানা জনতার মাঝে রচিতেছে মায়া-পরিবেশ।
চিৎ-প্রকর্ষের লাগি তেজোরস করি নাই পান,
দেবতারে নিবেদন করি নাই হৃদয়ের গান।

কে যেন অলক্ষ্যে মোর ইন্দ্রধনু করিছে বয়ন।
কাম-মন্থ ঊর্মিদলে প্রতিবিম্ব পড়ে বুঝি তার ঃ
কল্পনার তরী যত, আশা-পণ্য লয়ে অনুক্ষণ
অন্তরের ঘাটে ঘাটে ফেলে যায় আলো-অন্ধকার।
দৃষ্টির সম্মুখে মম রহস্যের জাল বুনে বুনে
প্রকৃতির একি লীলা। চলিতেছে কাল গুনে গুনে ?

জীবন-করঙ্ক লয়ে যারা করে মুক্তি মাধুকরী,
তারা যে আমারে ডাকে নিঃশ্রেয়স্ লভিবার তরে।
বস্তু-বিশ্ব পিছে রেখে চিদানন্দ-রসে চিত্ত ভরি
তারা যেন নদী সম বহমান অসীম সাগরে।
তাদের পরশ পেয়ে শস্য ভরা হোলো বন্ধ্যা চর,
উর্বর করেছে তারা নিখিলের প্রাণের প্রান্তর।

পল্লব-স্তবকে হেরি প্রস্ফুটিত অসংখ্য কুসুম,
নিঃশ্বাস-স্ফুরিত রন্ধ্রে অনুভূত সুস্নিগ্ধ সৌরভ।
প্রভাতের উদয়নে প্রাণীদের ভাঙিল কি ঘুম !
বিহঙ্গেরা বনে বনে করে এবে স্তুতি-কলরব।
ভক্তের ভজন-গানে আনন্দের বহে সমীরণ,
বস্তুর বন্ধন-ডোরে কেন বন্দী রহে মোর মন ?

অতিথি

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী

বিধাতার অলঙ্ঘ্য আদেশে
একদিন মৃত্যুদূত এসে
দুয়ারে দাঁড়াবে মোর আমন্ত্রণ জানায়ে প্রভুর
সেদিন হয়তো কাছে, হয়তো বা আছে কিছু দূর।
হোক কাছে, হোক দূরে,
কিছু লাভ নেই সে চিন্তায়,
'যেতে হবে' এইটুকু জানি সত্য ধ্রুবতারা প্রায়।

সেদিন মৃত্যুর তরে নিয়ে যাবো কোন উপহার?
মাটির মায়ায় ঘেরা নিরুপায় অশ্রুজল ভার?
অনিচ্ছুক দীর্ণ প্রাণে পশ্চাতের শত আকর্ষণে,
করুণ বিমর্ষ মুখে দাঁড়াবে কি উৎসব-প্রাঙ্গণে?

এমনি তো একদিন এসেছিনু পৃথিবীর দ্বারে,
বিস্মৃতির যবনিকা ঢাকা ছিল তার পূর্ব-পারে।
বিগত জন্মের ছায়া কোনদিন পড়েনি স্মরণে,
অস্পষ্ট স্বপ্নের রেশ বাজেনিকো অস্ফুট চেতনে।

পেয়েছি মাটির স্নেহ, পেয়েছি আকাশ-ভরা আলো,
সমস্ত জীবন দিয়ে এ ধরারে বাসিয়াছি ভালো।
তবু যে "অতিথি আমি" বিস্মরণ হয়নি সে কথা,
'ছেড়ে যেতে হবে' বলে কেন তবে রবে আকুলতা?

শেষ হয়ে যাবে যবে পৃথিবীর আতিথ্যের দিন,
'অতিথিবৎসল' বলি স্বীকার করিয়া যাবো ঋণ।
'এ মাটিরে ভালবেসে সার্থক হয়েছি বারে বারে',
এই বার্তা উপহার নিয়ে যাবো মৃত্যুর দুয়ারে।

সমালোচনা

The Soul of India—প্রণেতা ডাঃ মতিলাল দাস, এম্, এ, বি, এল, পি. এইচ ডি। শ্রীযুক্তা প্রীতিরাণী দাস কর্তৃক প্রকাশিত, আলোক-তীর্থ, প্লট ৪৬৭, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৩৩। পৃঃ ৩৪১। মূল্য ১২৲ টাকা।

এই পুস্তকে গ্রন্থকারের কয়েকটি প্রবন্ধ ও বক্তৃতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। বৈদিক যুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ভারতীয় কৃষ্টির ধারা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকখানির প্রথম খণ্ডে বৈদিক কৃষ্টি, দ্বিতীয়ে বুদ্ধ ও বৌদ্ধযুগ, তৃতীয়ে বৈষ্ণবধর্ম, চতুর্থে বর্তমান ভারত ও তাহার সমস্যানিচয় আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার এই সকল বিষয়ে ধারাবাহিক ভারতীয় কৃষ্টির ইতিহাস বা তাহার ক্রমবিকাশ প্রদর্শন করেন নাই। সারাজীবন ভারতীয় দর্শন ও কৃষ্টি আলোচনা করিয়া তাঁহার মনে যে সকল রেখা অঙ্কিত হইয়াছে, তিনি তাহারই আভাস বিভিন্ন প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তকখানির ভাষা প্রাঞ্জল এবং ইহাতে গ্রন্থকার দার্শনিক জটিলতা না আনিয়া সহজভাবে ও নিজের ভাবে ভারতীয় কৃষ্টির দিগ্দর্শন করিয়াছেন। যাঁহারা ভারতীয় দর্শন ও কৃষ্টির গভীর অনুধ্যান করিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে এই পুস্তকখানি যথেষ্ট নয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টি বা চিন্তার ক্রমবিকাশ হিসাবে এই পুস্তকখানি রচিত হয় নাই। সাধারণ পাঠক ও পাঠিকা বিভিন্ন প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় গ্রন্থকারের নিজস্ব ধারণা ও অনুভূতির পরিচয় পাইবেন। পুস্তকখানি সুখপাঠ্য এবং সহজবোধ্য বলিয়া অনেকে উপকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই।

—মৈথিল্যানন্দ

অণুব্রত ঃ (সংযম অঙ্ক)—শ্রীসত্যনারায়ণ মিশ্র কর্তৃক সম্পাদিত, শ্রীপ্রতাপসিংহ বৈদ কর্তৃক অণুব্রত সমিতির পক্ষ হইতে ৩, পোর্তুগীজ চার্চ স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা—২৬৯।

বর্তমান হিন্দী সাময়িক পত্র হিসাবে 'অণুব্রত' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতেছে। এই সংখ্যাটির 'সংযম অঙ্ক' নামকরণ সার্থক মনে করি। অণুব্রত-আন্দোলনের মহান্ লক্ষ্যের সঙ্গে ইহার বিভিন্ন রচনার সামঞ্জস্য লক্ষণীয়। অহিন্দী ভাষীরাও সংস্কৃতাশ্রয়ী হিন্দী অল্পাধিক পড়িতে ও বুঝিতে পারেন। সরল হিন্দীর পরিচয় সর্ব-ভারতীয় সংহতির পরিপোষক।

বর্তমান 'সংযম অঙ্কে' ১২০টি ধর্ম, সংস্কৃতি ও সাহিত্যমূলক প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। অণুব্রত-আন্দোলনের উদ্দেশ্য মানুষকে উদার ধর্মাদর্শে উদ্বুদ্ধ করা। এই আদর্শের রূপায়ণে সংযম অপরিহার্য। সংযম কেবল ব্যক্তির জীবনে আবশ্যক নয়, সমষ্টির জীবনেও ইহাকে স্পষ্ট রূপ দিতে হইবে। রাষ্ট্র, সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্প সংযমের সুদৃঢ় ভিত্তিতেই গড়িয়া উঠে—সংযম অঙ্কের বিভিন্ন রচনার এই এক সুর। অসংখ্য মনীষীর উদ্ধৃতির সমাবেশ বর্তমান অঙ্কের একটি মনোরম বৈশিষ্ট্য। 'অণুব্রতে'র এই সুদৃশ্য, সযত্ন-প্রকাশিত এই সংখ্যা তথ্যবহুল অথচ অনুপ্রেরণা-পূর্ণ।

—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত

শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয় পত্রিকা (একাদশ বর্ষ, ১৩৬৯) সম্পাদক শ্রীহৃষীকেশ চক্রবর্তী। ১০৬, নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭৮।

বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে ছাত্রগণের লেখা প্রবন্ধ গল্প ও কবিতাগুলি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। 'কবি মধুসূদন', 'প্রাচীন ভারতে নারী-জাতির আদর্শ', 'স্বামী বিবেকানন্দ ও সমাজ-গঠনে তাঁহার দান' প্রভৃতি প্রবন্ধে চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'পরিক্রমা'য় এই বহুমুখী শিক্ষালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়ন ও সারা বৎসরের আনন্দমুখর বিচিত্র কর্মসূচী প্রতিফলিত। ১৭খানি ছবি দ্বারা পত্রিকাখানি সৌন্দর্যমণ্ডিত।

মঠ ও মিশনের নবপ্রকাশিত পুস্তক

সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ ঃ (সটীক অনুবাদ)—অনুবাদক স্বামী গম্ভীরানন্দ ; উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা-সংখ্যা—২৭১, মূল্য তিন টাকা।

শ্রীমদপ্পয়দীক্ষিত-বিরচিত 'সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহঃ' অদ্বৈত-মতবাদের একখানি অতি উপাদেয় সংস্কৃত সংগ্রহ-গ্রন্থ। ভগবান্ শঙ্করাচার্যের পরবর্তী আচার্যগণ মূল অদ্বৈত সিদ্ধান্তে একমত হইলেও বিবিধ বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদেব সৃষ্টি করিয়াছেন। মূল তত্ত্বেব উপর আলোক সম্পাত করে বলিয়া ইহাদের বহুল আলোচনা হইয়া থাকে। দুর্লভ গ্রন্থাদি হইতে এই সকল মতবাদ সংগৃহীত, ও এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ। বেদান্ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার পক্ষে ইহা অত্যাবশ্যক নিবন্ধ-গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত। এই গ্রন্থেব বঙ্গানুবাদ এই প্রথম।

পুস্তকখানি চাবিটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে বিধিবাদ, ব্রহ্মলক্ষণ, জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ. সাক্ষীব স্বরূপ, জ্ঞান ও অজ্ঞান প্রভৃতি, দ্বিতীয়ে—প্রত্যক্ষ ও অদ্বৈত শ্রুতির বিরোধ, বিম্ব ও প্রতিবিম্বের ভেদ ও অভেদ, মূলাজ্ঞান উপাদান, স্বপ্ন-প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর স্মৃতি, সৃষ্টিদৃষ্টিবাদ প্রভৃতি, তৃতীয়ে—কর্ম ও জ্ঞানের ক্রমিক সমুচ্চয়, শাব্দাপরোক্ষতা, মহাবাক্য-জনিত জ্ঞান, মূলাজ্ঞানের নিবর্তক প্রভৃতি, এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে অবিদ্যালেশ-নিরূপণ, মোক্ষের স্বতঃপুরুষার্থতা, মুক্তেব স্বরূপ-বিচার প্রভৃতি বিশদভাবে আলোচিত।

স্বামী প্রবোধানন্দজীর দেহত্যাগ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত ৪ঠা জানুআরি অপরাহ্ণ ৩টা ৩০মিঃ সময় মস্তিষ্ক হইতে রক্তক্ষরণ দরুন বেলুড় মঠে ৬৯ বৎসর বয়সে স্বামী প্রবোধানন্দ (সনৎ মহারাজ) দেহত্যাগ করিয়াছেন। বহুদিন যাবৎ তিনি বহুমূত্র ও হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছিলেন, কিন্তু কঠিন কোন রোগেব লক্ষণ বাহিবে প্রকাশ পায় নাই। দেহত্যাগের দিনও সকালে তিনি বাহির হইয়াছিলেন, এবং ১-৪৫মিঃ সময় ফিরিয়া আসেন। বেলা ৩টাব সময় হঠাৎ বমির পর ডাক্তারকে সংবাদ দেওয়া হয়, কিন্তু ডাক্তাব আসিবার পূর্বেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য সনৎ মহারাজ ১৯১১ খৃঃ বেলুড় মঠে যোগদান করিয়া ১৯২১ খৃঃ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজের সেবকরূপে থাকিয়া দীর্ঘকাল তিনি অক্লান্তভাবে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন, ১৯৩৫-৩৮ খৃঃ বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির নির্মাণকার্যে তিনি আত্মনিয়োগ করেন, সেজন্য তাঁহাকে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয়। ১৯৩১-৩২ খৃঃ তিনি রেঙ্গুন কেন্দ্রের কর্ম পরিচালনা করেন এবং ১৯৪২-৪৪ খৃঃ কনখল সেবাশ্রমের সম্পাদকরূপে কাজ করার পর হইতে তিনি বেলুড় মঠে ছিলেন। ১৯৩০ খৃঃ হইতে তিনি বেলুড় মঠের একজন ট্রাস্টি ও মিশন গভর্নিং বডির সদস্য ছিলেন এবং নিয়মিতভাবে সভায় যোগদান করিতেন। স্বামী প্রবোধানন্দজীব দেহত্যাগে সংঘ একজন অভিজ্ঞ প্রাচীন সন্ন্যাসী হারাইল। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা শ্রীগুরুপাদপদ্মে চির শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব

বেলুড় মঠে: গত ১৬ই পৌষ, বৃহস্পতিবার (১লা জানুআরি) শুভ কৃষ্ণাসপ্তমীতে জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ১০৬তম জন্মতিথি উপলক্ষে সমস্ত দিনব্যাপী আনন্দোৎসব হইয়াছিল। প্রত্যূষে মঙ্গলারতি, তৎপরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে ষোড়শোপচারে পূজাহোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৭ হাজার নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে আয়োজিত সভায় শ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী জপানন্দ (সভাপতি), স্বামী তেজসানন্দ এবং স্বামী নিরাময়ানন্দ। এই পুণ্য তিথিতে মঠে সারা দিনে বহু সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। এই উপলক্ষে শ্রীসারদামঠের সাতজন ব্রহ্মচারিণী সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে: কলিকাতা বাগবাজার পল্লীর যে বাটীতে (১নং উদ্বোধন লেন) শ্রীশ্রীমা জীবনের শেষ একাদশ বৎসর অতিবাহিত করেন সুদীর্ঘ কালের বহুপুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত সেই ভবনে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মোৎসব মহা উৎসাহে ও আনন্দে অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতির পর সমবেতকণ্ঠে বেদপাঠ দ্বারা উৎসবের শুভারম্ভ হইলে বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'-পাঠ, ভোগরাগ, আরাত্রিক, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে দিবসব্যাপী উৎসব চলে। সহস্র সহস্র ভক্ত শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিয়া ধন্য হন। ১১০০ নরনারী বসিয়া এবং সহস্রাধিক ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যার পরও বহু ভক্ত মাতৃসন্দর্শনে আসেন।

জয়রামবাটী: শ্রীশ্রীমায়ের জন্মস্থান জয়রামবাটীতে গত ১লা জানুআরি মাতাঠাকুরাণীর ১০৬তম জন্মতিথি মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়।

মঙ্গলারাত্রিক, পূজা, ভোগারতি, হোম এবং শ্রীশ্রীচণ্ডী ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি পাঠ এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। দ্বিপ্রহরে প্রায় দুই হাজার ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

এই দিন বেলা প্রায় ১১টার সময় মায়ের মন্দিরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত দীঘিতে 'মায়ের ঘাট' উদ্বোধন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ।

সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর সমাগত ভক্তমণ্ডলীর নিকট শ্রীশ্রীমায়ের অমৃতময়ী জীবনী পাঠ করা হয় ও ভজনান্তে উৎসব পরিসমাপ্ত হয়।

শ্রীসারদা-মঠ, দক্ষিণেশ্বর: গত ১৬ই পৌষ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীসারদা-মঠে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা হোম চণ্ডীপাঠ এবং প্রসাদ-বিতরণ হয়। ভোরে মঙ্গলারতির পর দেবীসূক্ত পাঠ এবং ভজনাদি দ্বারা উৎসবের সূচনা হয়, সকালে শ্রীশ্রীমায়ের পূজা, চণ্ডীপাঠ এবং নিবেদিতা বিদ্যালয়ের বালিকাগণ কর্তৃক ভজন একটি ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করে। বেলা ৭॥টা হইতে ভক্তসমাগম আরম্ভ হয়। মঠ-প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত চন্দ্রাতপতলে শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি পত্র-পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করা হইয়াছিল। ব্রহ্মচারিণী ইলা এবং শ্রীমতী বীণা শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন এবং 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' হইতে পাঠ করিয়া শোনান। প্রায় ১৮০০ ভক্ত মহিলাকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়।

কল্পতরু উৎসব

কাশীপুর উদ্যানবাটী : যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ১৮৮৬ খৃঃ ১লা জানুআরি ভক্তবৃন্দকে দিব্যভাবাবেশে স্পর্শ করিয়া 'তোমাদের চৈতন্য হোক' বলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, সেখানে সেই ঘটনার পুণ্যস্মৃতিতে গত ১লা জানুআরি 'কল্পতরু দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। ঐ দিন শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পূজা হোম ও ভজনাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রায় ১০ হাজার ভক্ত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে আয়োজিত সভায় স্বামী জীবানন্দ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'ভক্তিযোগ' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। বক্তা ছিলেন স্বামী বিমুক্তানন্দ (সভাপতি), স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী কৈলাসানন্দ এবং অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী। রাত্রে প্রসিদ্ধ রামায়ণ-গায়ক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী 'নাগপাশ' পালা কথকতা করেন।

২রা জানুআরি অপরাহ্নে স্বামী নিরাময়ানন্দ বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ হইতে 'যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদ' ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যাকালে স্বামী সন্তোষানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তৃতা দেন স্বামী মহানন্দ, ডক্টর রমা চৌধুরী এবং স্বামী জীবানন্দ। রাত্রে শ্রীতারাপদ লাহিড়ীর পরিচালনায় 'বাংলার লোক-সঙ্গীত' অনুষ্ঠানটি সকলকে মুগ্ধ করে।

৪ঠা জানুআরি রবিবার অপরাহ্নে স্বামী বোধাত্মানন্দ মহারাজের 'শ্রীমদ্ভাগবত' ব্যাখ্যার পর হাওড়া সমাজ কর্তৃক 'নদের নিমাই' (নদীয়া লীলা) অভিনীত হয়।

উৎসবের কয়েক দিন উদ্যানবাটী সহস্র সহস্র ভক্তের সমাগমে আনন্দ-মুখর হইয়া উঠে।

কার্য-বিবরণী

জামসেদপুর : বিবেকানন্দ সোসাইটির ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের (৩৭তম) কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই কেন্দ্র কর্তৃক ৪টি হাই স্কুল (২টি বালিকাদের), ৪টি মিডল স্কুল, ৩টি উচ্চ প্রাথমিক, ২টি নিম্ন প্রাথমিক—মোট ১৩টি বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে খেলাধূলা ও স্বাস্থ্যচর্চার সুব্যবস্থা আছে।

গত ৫ বৎসরের ছাত্র-ছাত্রী-সংখ্যার তালিকা :

বর্ষ	সংখ্যা
১৯৫৩	৩,৭০২
১৯৫৪	৪,০২০
১৯৫৫	৪,৩১৪
১৯৫৬	৪ ৬৩৯
১৯৫৭	৬,০২০

[বালক—৩,৩৭৫ , বালিকা—২,৬৪৫]

গত বৎসর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা-বৃদ্ধি উল্লেখ-যোগ্য। ছাত্রাবাস দুইটিতে আলোচ্য বর্ষে মোট ৩১ জন ছাত্র ছিল। সর্বসাধারণের ব্যবহার্য প্রধান গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ২৮৭৮, পাঠাগারে ২টি দৈনিক, ১০টি মাসিক ও ৩টি সাপ্তাহিক পত্রিকা লওয়া হইয়াছে। ১১টি স্কুল-লাইব্রেরির মোট পুস্তক-সংখ্যা ১০,৪৭৪। সাপ্তাহিক ক্লাস এবং সভার মাধ্যমে ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনা করা হয়।

আলোচ্য বর্ষে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা ও শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

বৃন্দাবন : সেবাশ্রমটি—ইহার প্রতিষ্ঠাকাল ১৯০৭ খৃঃ হইতে আর্ত-নারায়ণের সেবারত। এই কেন্দ্র-কর্তৃক বর্তমানে ৫৫টি স্থায়ী শয্যা-সমন্বিত একটি অন্তর্বিভাগীয় হাসপাতাল, একটি বহির্বিভাগীয় চিকিৎসালয় এবং একটি চক্ষু-চিকিৎসালয় পরিচালিত হইতেছে। ১৯৫৭

খৃষ্টাব্দের কার্য-বিবরণীতে প্রকাশ : অন্তর্বিভাগে ২,৮০৯ জন (চক্ষু-রোগী সমেত) এবং বহির্বিভাগে নূতন ৪৯,২৩০ জন চিকিৎসিত হইয়াছেন , ১৬৬৬ জনের অস্ত্রচিকিৎসা করা হয়, গড়ে দৈনিক রোগী-সংখ্যা ৬৮৩। হোমিওপ্যাথি ও এক্স-রে বিভাগের এবং ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরির কাজও উল্লেখযোগ্য।

বৃন্দাবন সেবাশ্রম শীঘ্রই বৃন্দাবন-মথুরা রোডের পার্শ্বে ২৩ একর জমির উপর কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মাণ নূতন ভবনে স্থানান্তরিত হইবে। গত আগস্ট মাসে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল এই ভবনের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন।

কনখল : হরিদ্বারের পবিত্র ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ১৯০১ খৃঃ মিশনের এই সেবা-কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া এই কেন্দ্র আর্তসেবায় নিরত। মঠের সাধু ব্রহ্মচারিগণ রোগীদের সেবা করেন এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

১৯৫৭ খৃঃ কার্য-বিবরণীতে প্রকাশ : আলোচ্য বর্ষে অন্তর্বিভাগে ও বহির্বিভাগে রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ১,৪৬০ ও ৮৫,৫০৭। অস্ত্র-চিকিৎসা লাভ করে ৬,১৮৯ জন। বহির্বিভাগে গড়ে দৈনিক রোগী-সংখ্যা ২০৭।

গত ১৩ই এপ্রিল '৫৭ উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর সম্পূর্ণানন্দ নূতন এক্স-রে ব্লকের উদ্বোধন করেন।

আশ্রমের কর্মিবৃন্দ ও হাসপাতালের রোগীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারটিতে আলোচ্য বর্ষে ৬৭টি পুস্তক সংযোজিত হইয়াছে। ১৭ খানি সাময়িকী এবং ৬টি দৈনিক পত্রিকা লওয়া হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে দরিদ্রনারায়ণ-সেবা, পুরস্কার-বিতরণ এবং বক্তৃতা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

মালদহ : শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ১৯৫৭ খৃঃ সংক্ষিপ্ত কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। মঠকেন্দ্র প্রথম স্থাপিত হয় ১৯২৪ খৃঃ, জনহিতকর কার্যের প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪২ খৃঃ একটি মিশন-শাখাও খোলা হয়। মঠ-বিভাগে নিত্য পূজার্চনা, আরাত্রিক ও ধর্মালোচনার ব্যবস্থা আছে। প্রতি একাদশীতে শ্রীরামনাম কীর্তন এবং ধর্মাচার্যগণের জন্মতিথিতে উৎসবাদি হয়। গ্রামে গ্রামে ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে সৎশিক্ষা প্রচারিত হয়।

মিশন-বিভাগে শিক্ষাদানের কাজই এখানে প্রধান। আশ্রম-প্রাঙ্গণে (১) ৭৫টি শিশু লইয়া একটি নার্সারী বিদ্যালয় (২) ২১২ ছাত্রছাত্রী-সমন্বিত একটি প্রাথমিক বুনিয়াদী স্কুল, (৩) ৩৬০ ছাত্র-সমন্বিত একটি উচ্চ বিদ্যালয়, (৪) বয়স্কদের শিক্ষার জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয়, (৫) মিশন-প্রতিষ্ঠিত বাস্তুহারা কলোনীতে ১৯৮ ছাত্রছাত্রীযুক্ত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, এবং (৬) গ্রামে গ্রামে আদিবাসী সাঁওতাল ও অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের ২১২ ছাত্রছাত্রীর জন্য তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৭) বয়স্কদের জন্য ৪টি সামাজিক ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। (৮) মহিলাদের জন্য কুটির-শিল্প—সেলাই, রেশমের ঝুট কাটা, ধূপকাটি তৈয়ারী, মেশিনে ফটো কাটা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য 'সারদা শিল্প নিকেতন' নামে শহরে দুইটি স্কুল আছে। (৯) বিবেকানন্দ শিশুসংঘ নামে ছোট ছেলেমেয়েদের শারীরিক মানসিক ও সর্ববিধ উন্নতির জন্য একটি সমিতি আছে, উহার সদস্য-সংখ্যা ২২৭। উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি ছাত্রাবাসে বর্তমানে ১৭ জন ছাত্র আছে।

মেধাবী দরিদ্র ছাত্রগণ বিনা ব্যয়ে এখানে আহার ও বাসস্থানের সুযোগ পাইয়া থাকে।

আশ্রম-প্রাঙ্গণে একটি এবং গ্রামে দুইটি, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণের কেন্দ্রে ১৯৫৭ খৃঃ মোট ৫১,৬৫৩ জনকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে ৮৩৭৬ জন নূতন রোগী। প্রত্যহ ১২টি বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালযের ৬২০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে সরকার-প্রদত্ত দুগ্ধ পান করানো হয়। এই বৎসর একটি শিক্ষা-শিল্প-স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী এবং একটি শিশু-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

আশ্রমে গ্রন্থাগার হইতে পাঠকগণ আলোচ্য বর্ষে ১২২১ খানি বই বাডীতে লইয়া পডিয়াছেন। পাঠাগাবের পাঠক-সংখ্যা প্রত্যহ গডে ২৫ জন। এই বৎসর শীতকালে ১৫০ খানা কম্বল বিভিন্ন পল্লীতে দরিদ্র নবনারীদেব মধ্যে বিতরিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অনেককে সাময়িক ভাবে চাউল সাহায্য দেওয়া হয়।

এই কেন্দ্রেব তত্ত্বাবধানে শহরেব এক সুদৃশ্য অঞ্চলে ১০৫টি মধ্যবিত্ত পরিবার-সমন্বিত একটি উদ্বাস্তু কলোনী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কোয়েম্বাতুর ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালযের ১৯৫৬-৫৭ খৃষ্টাব্দেব কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। মিশনের এই শিক্ষা-কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহ: হাইস্কুল, বেসিক ট্রেনিং স্কুল, কলা-নিলয়, শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ, গবেষণা-ভবন, শারীর শিক্ষা কলেজ, গ্রামোন্নতি-ভবন, সমাজকর্মী শিক্ষণ-কেন্দ্র, প্রকাশন-বিভাগ, গ্রাম্য চিকিৎসালয়, গ্রাম-সেবা, গ্রন্থাগার, কর্মী-শিক্ষালয়।

হাইস্কুলে আলোচ্য বর্ষে ১৭৩ জন ছাত্র ছিল, স্কুলটি বহুমুখী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে। বেসিক ট্রেনিং স্কুল হইতে ১২৩ জন ছাত্র ও ২৬ জন ছাত্রী শিক্ষা লাভ করিয়াছে। কলানিলয়ের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৪৯১ (বালিকা ১৭৪)। অন্যান্য শিক্ষায়তন, সেবাব কাজ এবং গ্রন্থাগার ও পাঠাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে।

সিংহল ঃ রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের ১৯৫৬ ও '৫৭ খৃষ্টাব্দের কার্য-বিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত। এই কেন্দ্রের কার্য প্রধানতঃ শিক্ষা-বিস্তার। বাটিকালোয়া, বাদুল্লা, জাফনা, ত্রিঙ্কোমালি ও ভাবুনিযা জেলাতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৪টি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়-সমেত মোট ২৫টি বিদ্যালয়ে ২৬৭ জন শিক্ষাদানকার্যে নিযুক্ত আছেন। আলোচ্য বর্ষে বিদ্যালয়গুলিতে সর্বসমেত প্রায় ৮ হাজার অধ্যয়ন-রত ছাত্র-ছাত্রী ছিল। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যচর্চা ও ধর্মানু-শীলনেব প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। ৩টি অনাথ-ভবন ও ২টি ছাত্রাবাস সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে।

কলম্বো আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্য পূজা হয় এবং আশ্রমের বাহিরে নিয়মিত ধর্মালোচনার ব্যবস্থা আছে। স্থানীয় জনসাধারণ তাঁহাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের সদ্ব্যবহার করিতেছেন।

ভগবান বুদ্ধের ২৫০০তম মহাপরিনির্বাণোৎ-সব সাডম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সম্বুদ্ধ-জয়ন্তীর সমাপ্তি-উৎসবে ভারতের প্রধান মন্ত্রী ভাষণ প্রদান করেন, এই সভায় ২০ হাজারের অধিক লোক যোগ দান করে।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে ডক্টর তারকনাথ দাস

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডক্টর তারকনাথ দাস গত ২২শে ডিসেম্বর হৃদ্‌রোগে নিউ ইয়র্কে দেহত্যাগ করিয়াছেন। অন্যদেশের নাগরিকতা অর্জন করিয়া যাঁহারা জন্মভূমির স্বাধীনতার ও উন্নতির জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে তারকনাথ দাসের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

১৮৮৪ খৃঃ কাঁচরাপাড়ার নিকট জন্মগ্রহণ করিয়া তারকনাথ প্রথমে কলিকাতায় (জেনারেল এসেম্বলি ইনষ্টিটিউশনে) পরে টাঙ্গাইলে লেখাপড়া শেখেন। সেখানেই অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে আসিয়া স্বদেশজননীর শৃঙ্খল-মুক্তির সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। এই প্রচেষ্টায় ১৯০৫-৬ খৃঃ মাত্র ২২ বৎসর বয়সে তিনি জাপান হইয়া আমেরিকা যান। ১৯০৭ খৃঃ স্যানফ্রান্সিস্কো হইতে 'ফ্রী হিন্দুস্থান' নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে তিনি ভারতের জন্য সামরিক সাহায্য প্রেরণের ষড়যন্ত্রে জড়িত হন।

১৯২৪ খৃঃ জনৈকা মার্কিন মহিলাকে বিবাহ করিয়া তিনি আমেরিকাতেই বসবাস করিতে থাকেন। ১৯৩৫ খৃঃ বিশ্ববাসীর মধ্যে কৃষ্টিগত সহযোগিতা স্থাপনের জন্য 'তারকনাথ ফাউণ্ডেশন' নাম দিয়া তিনি একটি অর্থভাণ্ডার খোলেন। ১৯৫২ খৃঃ ৪৭ বৎসর পরে তারকনাথ পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত জন্মভূমি দর্শন করিয়া যান। ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় সম্বন্ধে ডক্টর দাসের কয়েকখানি পুস্তক আছে, তন্মধ্যে কয়েকটি ব্রিটিশ ভারতে নিষিদ্ধ ছিল।

ভারতে ও আমেরিকায় ডক্টর দাস রামকৃষ্ণ মিশনের একজন অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরে তাঁহার দান উল্লেখযোগ্য: 'Mary K Das and Tarak Das Foundation' হইতে বিদ্যামন্দিরের দুইটি মেধাবী ছাত্রকে নিয়মিত সাহায্য দিবার ব্যবস্থা তিনি করিয়া গিয়াছেন।

সিদ্ধি (শহরপুরা): শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের পঞ্চম বার্ষিক (১৯৫৭-৫৮) কার্য-বিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত। ধর্মালোচনা, শিক্ষাবিস্তার ও জনসেবা—প্রধানতঃ এই তিন বিভাগেই আশ্রমের কাজকর্ম পরিচালিত হয়।

আশ্রমে প্রতিদিন বহু ভক্ত আসেন। আরতি ভজনের পর প্রতিদিন কিছু পাঠ করা হয়, মাঝে মাঝে কীর্তন ও বক্তৃতার ব্যবস্থাও হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে বেলুড় মঠের স্বামী প্রণবাত্মানন্দ চারদিন ছায়াচিত্র যোগে সমাজ, ধর্ম, পুরাণ ও শিক্ষা বিষয়ক বক্তৃতা দেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে বেলুড় মঠ হইতে স্বামী অচিন্ত্যানন্দ আসিয়া একদিন ইংরেজীতে ও একদিন বাংলায় বক্তৃতা দেন।

আশ্রমের পাঠাগারে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পাঠকের সংখ্যা বাড়িতেছে। ইংরেজী বাংলা ও হিন্দী পুস্তক ও পত্রিকা রাখা হয়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিভাগ হইতে প্রায় ১৪,৪০০ জনকে ঔষধ দেওয়া হয়। প্রয়োজন হইলে দুঃস্থ পরিবারের সংকার-কার্যেও আশ্রমের যুবকগণ আগাইয়া যান।

কটকে কল্পতরু উৎসব

রামকৃষ্ণ কুটির, কটক: জানুআরির প্রথম দিবসে এখানে কল্পতরু উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্বদিন সন্ধ্যায় অধিবাস কীর্তনের

পর হরির লুট হয়। ১লা জানুআরি প্রাতঃকালে কীর্তন,পূজাহোম এবং মধ্যাহ্নে ভোগারতির পর দরিদ্রনারায়ণদের ভোজন করানো হয়। সান্ধ্য সভায় ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অসঙ্গানন্দ সভাপতিত্ব করেন। সরকারী কর্মচারীদের অনেকে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী বিভিন্ন দিক দিয়া আলোচিত হইলে পর সভাপতি বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কেবল এই একদিনের জন্যই কল্পতরু হন নাই, তিনি চিরদিনই কল্পতরু।

বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

জব্বলপুরে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে তিনদিন-ব্যাপী নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ৩৪তম অধিবেশন হয়। এই সম্মেলনের মূল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন বৈজ্ঞানিক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, তাঁহার বক্তব্যের মূল সুর—সাহিত্যিকগণ অতি মাত্রায় কল্পনাপ্রবণ না হইয়া একটু বাস্তববাদী হইলে ভাল হয়। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিশিষ্ট চিন্তানায়কগণ সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ শ্রীসত্যেশ্বর ঘোষ বলেন: আণবিক শক্তির ধ্বংসাত্মক প্রয়োগই বর্তমান জগৎকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। বিজ্ঞানের সাধনাকে আজ প্রকৃতির গূঢ় তত্ত্বসমূহ ও সৃষ্টির আদি রহস্য আবিষ্কারের জন্য নিয়োজিত করিতে হইবে।

অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী সমাজ ও সংস্কৃতি শাখার সভাপতিরূপে নূতন যুগের নূতন সমাজের সংস্কৃতি রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য দেশ-প্রেমিকগণকে আহ্বান জানান।

সংস্থার সভাপতি শ্রীদেবেশচন্দ্র দাস তাঁহার ভাষণে বলেন: নর্মদা উপত্যকায় যে রূপ কঠিন প্রস্তরে ফোটানো হয়েছে, গঙ্গার বুকে তাই রূপায়িত হয়েছে কোমল মৃত্তিকায়। আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সমন্বয়-সৃষ্টির অপূর্ব উদাহরণ আমরা পাই বাংলায় ও মধ্যপ্রদেশে। এই নর্মদা সভ্যতা আর গাঙ্গেয় সভ্যতা থেকেই দুই শ্রেষ্ঠ বিশ্বসাহিত্যিকের উদ্ভব, বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রে ভারত যে সম্মানের অধিকারী—তার কারণ কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ।

সম্মেলন বাংলার বাহিরে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলিকে তথাকার বাঙালী ছাত্রদের উপকারার্থ এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারের জন্য শিক্ষার সর্ব স্তরে বাংলা ভাষার প্রবর্তন করিতে অনুরোধ জানান।

বিজ্ঞান-সংবাদ

আন্তর্জাতিক 'ভূ-বিজ্ঞান বর্ষে'র (International Geophysical Year) ১৮ মাস-ব্যাপী পর্যবেক্ষণ গত ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত হইয়াছে। সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে আগামী অক্টোবর পর্যন্ত লাগিবে।

৬৪টি দেশে ৪,০০০ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে ১৪টি বৈজ্ঞানিক বিষয়ের তথ্যসংগ্রহের এই বিরাট আয়োজনে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের বিজ্ঞানীরা সহযোগিতা করেন। মোট অর্থ কত ব্যয়িত হইয়াছে তাহা হিসাব করা এক প্রকার অসম্ভব, তবে মোটামুটি আন্দাজ করা হইতেছে, দশ কোটি পাউণ্ডের কাছাকাছি।

আন্তর্জাতিক ভূ-বিজ্ঞান বর্ষ শেষ হইয়া গেলেও এই জাতীয় পর্যবেক্ষণ ও তথ্যসংগ্রহের কাজ চালাইয়া যাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন আন্তর্জাতিক ভূ-বিজ্ঞান সমবায় (International Geophysical Co-operation). I G. Y. বৈজ্ঞানিকগণ এখন হইতে ইহারই মাধ্যমে কাজ করিবেন। তাঁহাদের মতে গত ১৮ মাসের কাজের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য:

(১) ১১টি জাতির সমবেত অভিযানে

দক্ষিণমেরু মহাদেশ আবিষ্কার ও মেরুর তুষার-গলা সম্বন্ধে নানা তথ্যসংগ্রহ।

(২) মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ ও রকেট প্রেরণ, এবং এ পর্যন্ত অজ্ঞাত 'রেডিয়েশন বেষ্টনী' সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ।

(৩) ভূ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে শতাব্দীব্যাপী গবেষণা চালাইবার মতো তথ্যসংগ্রহ, ভূকম্প ও আবহাওয়ার সম্বন্ধে ব্যাপক জ্ঞান।

(৪) প্রশান্ত মহাসমুদ্রে প্রবল অন্তঃস্রোতের ও তলদেশে ম্যাঙ্গানিজ, লৌহ, তাম্র ও কোবাল্ট প্রভৃতি ধাতুর কর্দম-স্তরের সন্ধান, এবং ইওরোপের জলবায়ুর জন্য দায়ী উপসাগরীয় স্রোত (Gulf Stream) সম্বন্ধে পূর্ণতর জ্ঞান।

সমুদ্র হইতে মিষ্ট জল

তেল আভিভে রাশিয়ায় শিক্ষিত ইহুদী বৈজ্ঞানিক জারিন একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন যাহা দ্বারা সমুদ্র-জল হইতে লবণ দূরীভূত করা যায়। ব্যাপকভাবে ইহার উৎপাদন লাভজনক হইলে ও পরীক্ষাটি সফল হইলে সমুদ্র-তীরে বা সমুদ্র-মধ্যে সুপেয় জলের অভাব হইবে না, সমুদ্রের নিকটবর্তী মরুভূমি-গুলিতেও শস্য উৎপন্ন করা সম্ভব হইবে এবং জাহাজে জল বহন করিবার প্রয়োজন হইবে না।

পৃথিবীর বহু বৈজ্ঞানিক এই বিষয়টি লইয়া বহুদিন অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন, রাসায়নিক, বৈদ্যুতিক নানা পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে, কিন্তু কোনটি দ্বারাই ব্যাপক উৎপাদন লাভজনক হয় নাই। ৬১ বৎসর বয়সের জারিনও এই পরীক্ষায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। জারিন-পদ্ধতির মূলসূত্রঃ জল যখন বরফ হয় তখন তাহাতে লবণ থাকে না, লবণ অবশিষ্ট জলে ঘনীভূত হইতে থাকে। বরফ আবার গলাইয়া লইলে শুদ্ধ জলই পাওয়া যায়। জল জমানো ও বরফ গলানোর জন্য জলেরই বাষ্পকে ব্যবহার করা হয়, কিভাবে হয় তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তবে যাঁহারা বাহির হইতে প্ল্যাণ্টটি দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যন্ত্রটি অনেকটা লণ্ড্রী (কাপড়-ধোলাই) যন্ত্রের মতো, একটি ব্যারেলের চারিধারে কতক-গুলি পাইপ আছে, ভিতরের ব্যাপার এখনও গোপন রাখা হইয়াছে।

অতিরিক্ত ফসল ও ক্ষুধার্ত মানব

ইংলণ্ডের জাতীয় কৃষক-সংঘের সভাপতি সার জেমস টার্নার বলেনঃ পৃথিবীর যে কোন স্থানের অতিরিক্ত ফসল অন্যত্র ক্ষুধার্ত মানবকে সরবরাহ করিতে হইবে, ব্যাপারটি আন্তর্জাতিক ভাবে সমাধান করিতে হইবে।

কোন বৎসর কোথাও বেশী ফসল হইবে, কোথাও বা কম হইবে। আর্থনীতিক সংকট না ঘটাইয়া ক্ষুধার্ত মানবের মুখের কাছে এই অন্ন পৌছাইয়া দিতে হইবে। মানুষের প্রয়োজন মিটিলে তবেই উৎপাদনকে অতিরিক্ত বলা যায়, নতুবা অতিরিক্ত কিছু নাই। বর্তমানে যেভাবে আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্য চলিতেছে, তাহাতে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, কারণ খাদ্য যাহাদের যখন প্রয়োজন, তখন হয়তো খাদ্য কিনিবার মতো অর্থ তাহাদের হাতে নাই। [রয়টার হইতে]

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১৭ই মাঘ (৩১.১.৫৯) শনিবার শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের ৯৭তম জন্মতিথি বেলুড় মঠে ও সর্বত্র অনুষ্ঠিত হইবে।

উদ্বোধন

আবির্ভাব

স্বামী বিবেকানন্দ

'সত্য' দুই প্রকার। এক—যাহা মানব-সাধারণ-পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গ্রাহ্য। দুই—যাহা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তির গ্রাহ্য।

প্রথম উপায় দ্বারা সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বেদ' বলা যায়। 'বেদ'-নামধেয় অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি সদা বিদ্যমান; সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং যাহার সহায়তায় এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতেছেন।

এই অতীন্দ্রিয় শক্তি যে পুরুষে আবির্ভূত হন, তাঁহার নাম ঋষি ও সেই শক্তির দ্বারা তিনি যে অলৌকিক সত্য উপলব্ধি করেন, তাহার নাম 'বেদ'।

সার্বজনীন ধর্মের ব্যাখ্যাতা একমাত্র 'বেদ'। এই বেদরাশি জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত। কর্মকাণ্ডের ক্রিয়া ও ফল মায়াধিকৃত জগতের মধ্যে বলিয়া দেশ-কাল-পাত্রাদি-নিয়মাধীনে তাহার পরিবর্তন হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। সামাজিক রীতিনীতিও এই কর্মকাণ্ডের উপর উপস্থাপিত বলিয়া কালে কালে পরিবর্তিত হইতেছে ও হইবে।

জ্ঞানকাণ্ড অথবা বেদান্ত ভাগই—নিষ্কাম কর্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের সহায়তায় মুক্তিপ্রদ এবং মায়া-পার নেতৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশ-কাল-পাত্রাদির দ্বারা অপ্রতিহত বিধায়—সার্বলৌকিক, সার্বভৌম, সার্বকালিক ধর্মের একমাত্র উপদেষ্টা।

মন্বাদি তন্ত্র কর্মকাণ্ডকে আশ্রয় করিয়া দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে অধিকভাবে সামাজিক কল্যাণকর কর্মের শিক্ষা দিয়াছেন। পুরাণাদি তন্ত্র বেদান্তনিহিত তত্ত্ব উদ্ধার করিয়া অবতারাদির মহান্ চরিত-বর্ণনমুখে ঐ সকল তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যান করিতেছেন এবং অনন্তভাবময় প্রভু ভগবানের কোন কোন ভাবকে প্রধান করিয়া সেই ভাবের উপদেশ করিয়াছেন।

কিন্তু কালবশে সদাচারভ্রষ্ট বৈরাগ্যবিহীন একমাত্র লোকাচারনিষ্ঠ ও ক্ষীণবুদ্ধি আর্যসন্তান এই সকল ভাববিশেষের বিশেষ শিক্ষার জন্য আপাত-প্রতিযোগীর ন্যায় অবস্থিত ও অল্পবুদ্ধি মানবের জন্য স্থূল ও বহুবিস্তৃত ভাষায় স্থূলভাবে বৈদান্তিক সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রচারকারী পুরাণাদি তন্ত্রেরও মর্মগ্রহে অসমর্থ হইয়া, অনন্তভাবসমষ্টি অখণ্ড সনাতন ধর্মকে বহুখণ্ডে বিভক্ত করিয়া, সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়া তন্মধ্যে পরস্পরকে আহুতি দিবার জন্য সতত চেষ্টিত থাকিয়া যখন এই ধর্মভূমি ভারতবর্ষকে প্রায় নরকভূমিতে পরিণত করিয়াছেন—

তখন আর্যজাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং সতত-বিবদমান, আপাত-প্রতীয়মান বহুধা বিভক্ত, সর্বথা প্রতিযোগী আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম নামক যুগ যুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকাল-যোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্মখণ্ডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায়—এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক, সার্বকালিক ও সার্বদেশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া লোকসমক্ষে সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোকহিতের জন্য শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। —[সঙ্কলিত]

কথাপ্রসঙ্গে

'সমন্বয়'—কি ও কি নয়

শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য নামের সহিত 'সমন্বয়' কথাটি চিরতরে জড়িত হইয়া গিয়াছে। যদিচ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে একাধিক আধ্যাত্মিক আদর্শ পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, যথা—ব্যাকুলতা-মাত্র সহায়ে ঈশ্বরদর্শন, শাস্ত্রবিধি অনুসারে বিবিধ সাধন ও তাহাতে সিদ্ধি, পরম অনুভূতি লাভের জন্য—উচ্চতম আধ্যাত্মিক আদর্শ স্থাপনের জন্য চরম ত্যাগ, তথাপি তাঁহার সমন্বয়ের শিক্ষাই সর্বত্র আলোচিত হইয়া থাকে, সমাজে তাহার প্রভাব বাড়িতেছে, এবং ভবিষ্যতে ধর্মজগতে ইহা যুগান্তর আনিবে—এইরূপই অনেকের বিশ্বাস।

ব্যাকুলতা ও বিশ্বাসের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত—ধ্রুব-প্রহ্লাদের কথা পুরাণের পাতায় রহিয়াছে, দেবহিতে দধীচির তনুত্যাগ, বিশ্বহিতে সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ চিরদিন ভারতবাসীর মনে উদ্দীপনা জাগাইবে। তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে ব্যাকুলতার ও ত্যাগের বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা পড়ে।

যে শিশু অনেকক্ষণ মা ছাড়া হইয়া আছে সে যেমন ক্ষুধা-পিপাসায় শুধু কাঁদিতেই থাকে, কাঁদিয়া কাঁদিয়াই সে মাকে কাছে ডাকিয়া আনে—শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম সাধনা তাহারই অনুরূপ। 'মা, আমি শাস্ত্র জানি না, মন্ত্র জানি না, তোকে না দেখে আমি থাকতে পারছি না, দেখা দিবি কিনা বল্' এই তাঁহার আকুল ক্রন্দনের ভাষা! দেখিতে অতি সহজ অতি সরল—এই পথেই তিনি জগজ্জননীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়া সংশয়বাদী প্রত্যক্ষবাদী বর্তমান মানবের সম্মুখে এই সাক্ষ্যই দিলেন: ঈশ্বর আছেন, তাঁহাকে দেখা যায়, এবং ব্যাকুলতা সহায়ে দেখা যায়। সে ব্যাকুলতার পরিমাণ কি? পুত্রের উপর মাতার টান, পতির উপর সতীর টান, বিষয়ের উপর বিষয়ীর টান, এই তিন টান একত্র করিলে যতখানি হয় ততখানি আবেগ ও আগ্রহ চাই, তবে ঈশ্বরের দর্শন মিলিবে। এ পথ সরল হইলেও যত সহজ মনে করা গিয়াছিল, তত সহজ নয়। তথাকথিত যুক্তিবাদী প্রত্যক্ষবাদী বর্তমান মানবের জন্য স্বীয় জীবন দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ এই অভিজ্ঞানই রাখিয়া গিয়াছেন: ব্যাকুলতাই ঈশ্বরদর্শনের প্রথম ও প্রধান সাধন। সরল পবিত্র হৃদয়ই ভগবানের বৈঠকখানা, সেইখানেই তিনি সৃষ্টিস্থিতিলয়কারী ঈশ্বরের ঐশ্বর্য ছাড়িয়া একান্ত অন্তরঙ্গরূপে মাধুর্যের লীলা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ সম্বন্ধে কিছু ধারণা করাও সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির সাহায্যে অসম্ভব। সত্যই তো তিনি কি ত্যাগ করিয়াছিলেন? বাহ্যতঃ দেখিতে গেলে তিনি তো গৃহ পরিজন সহধর্মিণী—কিছুই ত্যাগ করেন নাই। সারা জীবন মন্দিরের পূজারীরূপে প্রাপ্য মাহিয়ানাও লইয়াছেন। দৈনিক বরাদ্দ প্রসাদের থালাটি ঘরে দিয়া যাইতে ভুল করিলে বা দেরী করিলে, খোঁজ করিয়া আনাইয়া লইতেন, জমানো টাকা দিয়া 'পরিবারে'র গহনাও গড়াইয়া দিয়াছেন। অনেকেরই মনে প্রশ্ন জাগিবে, এ আবার কোন্ দেশী ত্যাগ? আর স্বামী বিবেকানন্দই বা কেন বলিলেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ ত্যাগীর বাদশা।'?

শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ বুঝিতে গেলে—শুধু ত্যাগ কেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য, সাধনার প্রকৃত রহস্য বুঝিতে গেলে—মনকে তাহার জন্য কিছু পরিমাণে প্রস্তুত করিতে হইবে এবং

যাঁহারা তাঁহার নিকটতম লীলাসহচর, তাঁহাদের সাক্ষ্য বিশ্বাস করিতে হইবে। এ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষ্য পূর্বেই আমরা পাইয়াছি। শ্রীশ্রীমা কি বলেন?—"দেখ, তোমরা ঠাকুরের 'সমন্বয়, সমন্বয়' বল—তার ত্যাগই ছিল আসল।" তথাকথিত আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা-বিহীনা একটি 'পল্লীবালা'র মুখের এত বড় কথার গভীর তাৎপর্য না বুঝিলে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অনেকটুকুই না-বোঝা থাকিয়া যাইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ স্তরে স্তরে সুউচ্চ শিখরে উঠিয়াছে, তাঁহার ত্যাগ—দেহসুখ-ত্যাগে, কামকাঞ্চন ত্যাগে, নামযশ-ত্যাগে, 'মতুয়ার বুদ্ধি'-ত্যাগে,—এ সকলই বর্তমান দেহসুখকাতর, কাম-কাঞ্চনাসক্ত, নামযশের কাঙাল, 'মতুয়ার বুদ্ধি'-সম্পন্ন (dogmatic) মানবের সম্মুখে এক পরিপূর্ণ আদর্শ দেখাইবার জন্য। 'আমি ষোল টাং করেছি, তোরা এক টাং (ভাগ) কর্।'—লীলাসহচরদের প্রতি এই তাঁহার উক্তি। তিনি জানেন, সকলে এ কঠিন আদর্শ জীবনে রূপায়িত করিতে পারিবে না, তাহার প্রয়োজনও নাই। গীতায় কি শ্রীভগবান্ বলেন নাই—'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'? এই ত্যাগের ধর্ম অল্প এতটুকু আচরণ করিলে মহামৃত্যুভয় হইতে, ঘোরতর অশান্তি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

আমরা 'মতুয়ার-বুদ্ধি'-ত্যাগের আলোচনা করিয়া দেখিব—শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয় সাধনা ও ঐ আদর্শ-স্থাপন এই শেষোক্ত ত্যাগের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত :

সাধারণ সাধক যদি একটি কোন মতে বা পথে সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁহার আর সাধনার প্রয়োজন হয় না, তিনি সিদ্ধপুরুষ—জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে আমরা দেখি এক অপূর্ব ব্যাপার। তাঁহার সাধনার পর সাধনা শুরু হইতেছে সিদ্ধিলাভের পর। ইহা দ্বারা কি প্রমাণিত হয় না যে এই সকল সাধনার উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত সিদ্ধিলাভ ছাড়া অন্য কিছু? প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ ইচ্ছায় বা কাহারও সহিত যুক্তি করিয়া একের পর এক সাধনা-সকল করেন নাই, তিনি করিয়াছিলেন জগন্মাতার ইচ্ছায়, তাঁহার নির্দেশে, তাঁহারই ব্যবস্থাপনায়—'লীলাপ্রসঙ্গ'-কার তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন 'সাধক-ভাবে'র পাতায় পাতায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ কোন মতে বা পথেই আসক্ত হন নাই, তবে মাতৃভাবে তাহার বিশেষ নিষ্ঠা—হয়তো যুগ-প্রয়োজনে। সংস্কারমুক্ত মনে প্রত্যেকটি মত পথ ও প্রচলিত সাধনা যখন তিনি করিয়াছেন, তখন একেবারে তাহাতে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন—একাগ্র মনে তাহাতেই ডুবিয়া গিয়াছেন, তাইতো প্রতিটি সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন অতি অল্পকালে। যাহার সুরজ্ঞান আয়ত্ত হইয়াছে—বিভিন্ন রাগরাগিণী রূপায়িত করিতে তাহার বিলম্ব হয় কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে সাধনা দ্বারা জীবনে অনুভব করিয়াছেন, তারপর নানা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়াছেন, মত—পথ মাত্র, লক্ষ্য নয়। তাঁহার মুখের কথা: মত কিছু ঈশ্বর নয়। সিঁড়ি দিয়া ছাদে উঠা যায়। তা বলিয়া সিঁড়ি ছাদ নয়। মই দিয়াও ছাদে উঠা যায়, দড়ি দিয়া, বাঁশ দিয়া—আরও কত উপায়ে উঠা যায়। যে নানা উপায়ে ছাদে উঠিয়াছে—শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে, সে-ই জোর করিয়া বলিতে পারে: একই সত্য—নানা ভাবে প্রতিভাত, নানা উপায়ে লভ্য!

অনন্ত সত্যে যাইবার শুধু একটি মাত্র পথ—এরূপ বলা ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যাঙের পক্ষে সমুদ্রের ধারণা করিতে যাওয়ার মতো। ঈশ্বর যখন

অনন্ত, তখন তাঁহাকে পাইবার পথও অনন্ত। অনন্ত দেশে কালে—কত পথ কত মত হইয়াছে ও হইবে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? শ্রীভগবানের 'ইতি' করিতে যাওয়া শুধু মূর্খতা নয়—মহাপাপ।

প্রতিমা পূজা করিলেই ভগবানকে সীমাবদ্ধ করা হয় না, 'আমি যাহা বুঝিয়াছি, আমি যাহা বলিতেছি, আমার কাছে ভগবানের যে ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, ভগবান তাহাই, আর কিছু তিনি হইতে পাবেন না, এখানেই শ্রীভগবানের বিকাশের শেষ হইয়া গেল'—এরূপ বলা বক্তার নিজ মস্তিষ্কের মধ্যে ভগবানকে আবদ্ধ করা ছাড়া আর কি? প্রতিমা পূজা করা অপেক্ষা ইহা অধিকতর পাপ। প্রতিমা-পূজকেরা শ্রীভগবানের অনন্ত বিকাশ স্বীকার করে, সর্বত্র তাঁহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বর্তমান যুগকে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা হইতে অনেকটা মুক্ত করিয়াছেন তাঁহার জীবনে সাধন সহায়ে রূপায়িত সমন্বয়ের আদর্শ দ্বারা।

পৃথিবীর সর্বত্র বিভিন্ন ধর্মের পাশাপাশি বাস করিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে চিরকালই, এ সমস্যা আজিকার নূতন নয়। প্রাচীন ভারতে বৈদিক (ব্রাহ্মণ্য), বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম বহুদিন পাশাপাশি বাস করিয়াছে। পরবর্তীকালেও হিন্দুধর্মের অন্তর্গত পঞ্চদেবতা-উপাসক শাক্ত শৈব বৈষ্ণবাদি সাধকদের মধ্যে বিদ্বেষ দেখা যায় না, আরও পরে হিন্দু ইসলাম ও শিখ ধর্ম নানা সংঘর্ষ ও সংগ্রাম সত্ত্বেও এই বিশাল ভারতবর্ষে বাড়িয়া উঠিয়াছে।

আরব ও ইওরোপের কথা একটু স্বতন্ত্র, ধর্ম সেখানে রাজনীতি-সম্পর্কিত: প্রাথমিক সংঘর্ষের পর, পরস্পরকে নিধন করিয়া নিশ্চিহ্ন করিবার চেষ্টার পর একটা আপোস-রফা সেখানে হইয়াছে।

এখন আমাদের দ্রষ্টব্য—বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত সমন্বয়ের আদর্শ কি ঐরূপ আপোস-রফা বা অধুনা-প্রচারিত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মতো একটা কিছু, না ইহাতে অন্য কোন নূতনতা—পরিপূর্ণতা আছে?

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মূল মর্ম এই যে, তুমিও ভাল, আমিও ভাল, তোমারও বাঁচিয়া থাকা দরকার, আমারও বাঁচিয়া থাকা দরকার, আমি তোমাকে সম্মান করিব, সাহায্য করিব, তুমিও আমার সহিত অনুরূপ ব্যবহার করিও, আমি তোমার গায়ে হাত দিব না, তুমি আমার গায়ে হাত দিও না।

আপোস-রফা সংগ্রামেরই একটি নীতি: বর্তমানে তোমার সহিত আমি আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছি না, সাময়িক সন্ধি করিলাম, পরে সময় পাইলে শক্তি সঞ্চয় করিয়া আবার তোমাকে আঘাত হানিব, আপাততঃ তুমি চুক্তির শর্ত রক্ষা করিও।

প্রথম ভাবটির মধ্যে সম্মানজনক বাহ্য ব্যবহার থাকিলেও শ্রদ্ধার ভাব নাই, বরং আছে একটা প্রচ্ছন্ন ভীতির ভাব। আর দ্বিতীয় ভাবটির মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসেরই অভাব।

সমন্বয়—শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নয়, সমন্বয় আপোস-রফাও নয়। এই দুইটির কোনটিই সমন্বয়-ভাবের ধারে-কাছেও যায় না। এ-দুটির মধ্যে মিলনের বহিরাবরণ থাকিলেও পৃথকৃত্বের ভাবই পরিস্ফুট। সমন্বয় সদৃশ বা বিপরীত কয়েকটি ভাবের মিশ্রণ নয়, সমন্বয় প্রতীয়মান 'নানা'র মধ্যে অন্তর্নিহিত একত্ব দর্শন, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য অনুভূতি। সমন্বয়-ভাবের মধ্যে আছে একটি শ্রদ্ধা ও প্রীতির ভাব, আত্মীয়করণের একটি আকাঙ্ক্ষা। সমন্বয় দুর্বলের উদারতা নয়, শক্তিমানের আমন্ত্রণ। সমন্বয় শুধুমাত্র পর-মত-সহিষ্ণুতাও নয়, বরং তথাকথিত পরকে আপন করিয়া লওয়ার

মধ্যেই সমন্বয়ের ভাব ফুটিয়া উঠে, পর তো কেহ নাই, সবই আপন। বিভিন্ন প্রকৃতির ভ্রাতা যেভাবে একই মাতার কাছে মিলিত হয়, বিভিন্ন-মুখী নদী যেরূপে একই সমুদ্রে ধাবিত হয়, বিভিন্ন ধর্ম সেইরূপে এক সত্য সনাতন চিরন্তন মহান্ মানবধর্মে সদা বিধৃত—এই ভাব সমন্বয়ের ভাব।

এই ভাব আসে জ্ঞানের দৃষ্টিতে, প্রেমের অনুভূতিতে। যদি জানি আমারই প্রিয় নানা রূপ ধরিয়া বিভিন্ন ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতেছে, তবে কি আমি তাহার নানা রূপ ও নানা নামের প্রত্যেকটিকেই ভালবাসিব না? যদি বুঝি ঈশ্বর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন নামে আবির্ভূত হইয়া মানুষকে শিখাইয়া গিয়াছেন—তাঁহার কাছে যাইবার পথ, তবে কিভাবে সেগুলিকে অস্বীকার করিব? অনন্তলীলাময়কে একটি মাত্র লীলায়, একটি মাত্র নামে বা রূপে বা ভাবে আবদ্ধ করা অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয় এই অজ্ঞতাই সাম্প্রদায়িকতার জননী। দ্বৈতবাদী একেশ্বর-বাদ যদি অদ্বৈতবাদে পূর্ণ বিকাশ লাভ না করে, তবে এই খণ্ড সাম্প্রদায়িক মনোভাব আসিতে বাধ্য।

একই নানারূপে প্রতীয়মান হন, এ-কথা তো বেদান্ত-সিদ্ধান্ত। সেদিক দিয়া 'সমন্বয়-বাণী' বেদান্তেরই অনুসিদ্ধান্ত। চরম বা পরম সত্য 'এক' বা 'অদ্বিতীয়,' একথা অবশ্য স্বীকার্য। জগতে বা প্রকৃতিতে 'নানা' দেখা যায়, একথাও অস্বীকার করা যায় না, তবে? এইখানেই বেদান্তদর্শনের উত্তর: 'নানা' নামরূপ মাত্র, প্রকৃত পক্ষে একই আছে, 'নানা' সমুদ্রবক্ষে প্রতীয়মান তরঙ্গের মতো। নানা তরঙ্গ কি সমুদ্রের অদ্বিতীয়ত্ব ভঙ্গ করিতে পারে? নানা ধর্মের তরঙ্গ উঠিয়াছে, কত পড়িয়াছে, আরও কত উঠিবে, সবই সেই এক সত্যের মহাসমুদ্রে। যেখানে উদয় সেখানেই লয়।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে অদ্বৈত একটি মত নয়, তত্ত্ব। অদ্বৈত ভাবে অনুভূত সমন্বয় একটি মতবাদ নয়, ইহাও 'অদ্বৈতে'র মতো অবিরোধী তত্ত্ব, অবাধিত সত্য, অদ্বৈতভাবেরই একটি রূপ।

যুগ-মানবের মাধ্যমে যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্মের উদয় হয় যুগ-মনের চাহিদা অনুসারে, সে যুগের মানুষের মনের ধারণাশক্তি অনুযায়ী। যখন বহু মানবের মনে করুণার কণা জমিতেছিল, তাহাই যুগ-প্রয়োজনে রূপ ধারণ করিল করুণাঘন বুদ্ধ মূর্তিতে। আবার যখন বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য নির্ধারণের একান্ত প্রয়োজন দেখা দিল—তখনই জ্ঞানঘন শঙ্করমূর্তির আবির্ভাব। জ্ঞান-সূর্যের প্রখরতাপে যখন হৃদয় শুষ্কপ্রায়, তখন প্রেমঘন শ্রীচৈতন্য বারিবর্ষণ করিয়া ভারত-ভুবন সিক্ত শীতল করিলেন। ভারতের বাহিরেও দেখা যায়—প্রবল প্রতাপান্বিত স্বেচ্ছাচারী সম্রাট্‌সদৃশ পক্ষপাতী 'ঈর্ষাপরায়ণ' জিহোবা যখন আর মানবকে শান্তি বা সাহস দিতে পারিতেছিলেন না, তখনই যীশু আনিলেন তাঁহার স্বর্গস্থ প্রেমময় পিতার বার্তা: স্বর্গরাজ্য তোমাদেরই শুদ্ধ হৃদয়ে।

নানা ধর্মের অভ্যুদয়ে ও বিবাদে যখন মানব মন বিভ্রান্ত, যখন কোন্ ধর্ম সত্য, কোন্ ধর্ম ঈশ্বর-লাভের যথার্থ পথ—এই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না পাইয়া মানুষ ধর্মেরই উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিতেছিল, যখন বহু মানব-মন এমন একটি বিকাশের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল—যাহার ভিতর সকল ভাবই মূর্ত হইয়া উঠিবে, যাহাকে গ্রহণ করিলে সকলকেই গ্রহণ করা হইবে, কাহাকেও বর্জন করিতে হইবে না—তখনই সর্বভাবের ঘনীভূত মূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। সমন্বয়ের ভাব—প্রেমের ভাব, প্রীতির ভাব, শান্তি সাম্য ও সামঞ্জস্যের ভাব। সমন্বয়ের ভাব ভবিষ্যৎ উন্নততর মানব-সমাজের বিশাল ভিত্তির আধার-শিলা।

চলার পথে

'যাত্রী'

কে তুমি ধর্মস্থাপক? বর্তমান শতাব্দীর পরম জডবাদের যুগেও তোমার স্বীকৃতির আসন পেতে বসেছ? ভূগোলানন্দের চেয়ে ভূমানন্দ বড—এ কথা বোঝালে তোমার ঐ সরল গ্রাম্য ভাষায়, গল্প-পুষ্পের কলি ফুটিয়ে। শুধু কি কথায়? জীবনে পরিণত ক'বে দেখালে সব কিছু এমন নির্ভুল ক'রে যে জডবাদী বিজ্ঞান তার অণুবীক্ষণ-দূরবীক্ষণ লাগিয়েও তোমার ভুল ধবে দিতে পারল না। সে যখন জিজ্ঞাসা ক'রল, তুমি যা বল তা আমাদেব চোখে পডে না কেন? উত্তবে দিলে: দিনমানে 'তারা' দেখা যায় না, তা বোলে তাবা কি তখন নেই? ওধারে আবার বিরাট জিজ্ঞাসার তলোযাব উঁচিয়ে স্বামীজী এলেন তোমার কাছে, শুধু স্পর্শ কবেই অত বড প্রশ্নের উত্তব দিযে দিলে তাঁকে। আরও সব এল কত, তোমার দুর্গে কামান দাগতে, কিন্তু তাতে তোমাব দুর্গ-প্রাচীরের একখানা ইঁটও খসল না।

কে তুমি সর্বধর্মস্বরূপ? সংসারী এসে তোমায় প্রশ্ন ক'রল, তুমি তাদের কাছে অপূর্ব রূপ ধরে দিলে দেখা। বললে: যে মা আমার গর্ভধারিণী, যে মা ঐ ভবতারিণী, তিনিই আর একরূপে এখন আমাব পা টিপে দিচ্ছেন। আর বললে তাদের—পাঁকাল মাছের মত থাকতে, নির্জনে দই পেতে মাখন তুলতে। বললে, তিনটে 'স' (শ-ষ-স)-এর কথা—শ,ষ,স। তাতেও যখন লোকে দুঃখের কথা তুলে অনুযোগ করতে লাগল তখন দিলে চরম বাণী—সাপ হয়ে খাই, রোজা হয়ে ঝাড়ি। · জ্ঞানীকে বোঝালে, মাকডসা তাব নিজের ভেতর থেকে জাল বের ক'রে আবার সেই জালেই থাকে, 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।' আর আশ্বাস দিলে এই বলে, বিচিটা পুঁতলেই কি ফল পাওয়া যায়? তাতেও যারা বুঝল না তাদের বোঝাতে গিয়ে বললে, চিলের নিজের মুখেই যে মাছ রয়েছে, মাছ ফেলে দিলে তবে তো কাকের তাডা থামবে। ভিজে দেশলাই কেন জলছে না, তারও দিলে সন্ধান। সেই সাথে বুঝিয়ে দিলে, গুটিপোকা কেমন ক'রে নিজেদের নালেই জড়িয়ে পডছে। আবার পাছে এই সব কথা শুনে তমোগুণ তাদের পেয়ে বসে, তাই সাবধান ক'রে দিয়ে বললে, বিষ ঢেলো না, কিন্তু ফোঁস কোবো। · ভক্তকে বললে, বুড়ি ছুঁয়ে নিয়ে খেলা কব, জাঁতাব খুঁটি ধরে পেষণ দেখ, হাঁসেব মত দুধটুকু খেয়ে জলটুকু বেখে দাও, ঈশ্বর লাভের জন্য ব্যাকুল হও। সেটুকু সামর্থ্যও যদি না থাকে তো বিডালছানা হয়ে যাও। শেষে দিলে চরম ভরসা, 'বকল্মা' দাও। এইখানেই বোধ হয় সব শেয়ালেরই এক 'রা'। তাই শুনি—শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। যীশু বলছেন, হে তৃষ্ণার্ত মানব আমার কাছে এসে তোমার পিপাসা মিটাও।

·সন্ন্যাসী এসে তোমাকে প্রশ্ন করলে। তাদের কথাব উত্তর দেবার আগে দরজা পর্যন্ত দেখে এলে, অন্য ভাবেব কেউ আছে কিনা, তারপর বললে, ত্যাগই এ পথের প্রথম সোপান, 'পন্‌ছি' আউর দরবেশ না কবে সঞ্চয়। উপনিষদেও উচ্চারিত হয়েছে—ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ। মহাভারতেও গীত হয়েছে—ত্যাগ এবহি সর্বেষাং মোক্ষসাধনমুত্তমম্। আর তপস্যার কথায় জানালে, সত্যকথাই কলির তপস্যা, বৈদিক যুগেও যা স্বীকার

করা হয়েছে—সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা। আর চাই, মোক্ষলাভের জন্য এক উদগ্র উদ্যোগ। 'সিদ্ধি, সিদ্ধি' মুখে বলা নয়, তাকে আনতে হবে, ঘুঁটতে হবে, খেতে হবে, তবে তো। পানা ঠেলে জল খাও, মন্থন ক'রে মাখন তোল, চার ফেলে মাছ ধর। খানদানী চাষা হও—বার বৎসর অনাবৃষ্টি হলেও চাষ ছেড না। বাইরেটা রাঙানোর আগে ভেতরটা বেঙেছে কিনা দেখ। তা না হলে সাধুর কমণ্ডলুর মত অবস্থা হবে, চারধাম ঘুরে এল, কিন্তু যে তেতো সেই তেতো। এই-সব ঠিক ক'রে বুঝে নিয়ে এগিয়ে চল। তবে মনে রেখো, একটি জিনিষ মাত্র জগতে উচ্ছিষ্ট হয়নি, সেইটিই ব্রহ্ম। সেখানে 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।'

কে তুমি মহামানব? পুঁথি পড়ে নয়, সকল ধর্ম সাধন করেই বোঝালে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী। বোঝালে, জল নিতে এসেছ, তা নাও, কিন্তু জলের নাম নিয়ে মারামারি কোরো না, একে জল, পানি, 'একোয়া', 'ওয়াটার' প্রভৃতি বিভিন্ন নাম দেওয়া চলে। তাই তো এল কত সিদ্ধ সাধক তোমাকে বিভিন্ন ধর্মসাধন শেখাতে, আর শেষে এল, কত ধর্মের সাধক, তোমাকে গুরু বলে মানতে—কারণ তুমিই তো দেখেছ, গাছতলায় বাস ক'রে, বহুরূপীর বিভিন্ন রূপ। তাই তো তোমারই পক্ষে সম্ভব—ঠিক পথের সন্ধান দেওয়া। আজকের এই আসমুদ্রহিমাচল নয়, ভবিষ্যতের ঐ আমেরুপৃথিবী তোমাকে গুরু বলে মানবে!

কে তুমি অবতারবরিষ্ঠ? নানা ভাবে বোঝালে, যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। প্রখর সূর্যের দিকে তাকানো যায় না, কিন্তু তাকেই আবার প্রত্যূষে দেখলে চোখের তৃপ্তি হয়—ঐ ভাবেই ভগবান আসেন অবতার হয়ে, সূর্যের ভোরের মত নরম হয়ে। আসেন তিনি, এক অচিন্ গাছের রূপ ধরে—তাকে তলিয়ে দেখলে বুঝি, গাছের আকার বটে, কিন্তু তা এক অচেনা গাছ। কারণ তুমি হচ্ছ গর্তওয়ালা পাঁচিল, তাই সাধারণের মত ঘরের ঘেরা-উঠানে থাকলেও বাহিরের ঐ অনন্ত মাঠের সঙ্গে যোগাযোগ থাকে, ঐ ফাঁকটুকু আছে বলে। দুদিক তোমার জানা আছে বলেই তুমি বলতে পারলে, পিঁপড়ে হয়ে চিনির পাহাড়ের সবখানিই নিয়ে যেতে চেষ্টা কোরো না, দু'এক দানা নিলেই পেট ভরে যাবে। বোঝালে, অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তির অভিন্নতার কথা—সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকলেও সাপ, হেললে দুললেও সাপ, তাই লীলাকে ছেড়ে নিত্যকে ভাবা যায় না। দুধের সাদাটা দেখেছ? তাকে দুধ থেকে আলাদা ক'রে নিয়ে কি ভাবতে পারো? তবে আর অহঙ্কার রাখছ কেন? উঁচু জমিতে নয়, নীচু জমিতেই জল জমে যে। দীনহীন ভাবই ভাল। 'Blessed are the meek-natured for they shall see God' অদ্বৈত জ্ঞান চাও তো, একটি একটি ক'রে দশটি জলপূর্ণ ঘটকে (যার উপর সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়ে প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা সূর্য মনে হচ্ছে) ভাঙো, তাহলে শেষে সত্য-সূর্যই অবশিষ্ট থাকবে। কাঁটা দিয়েই কাঁটা তোল, তারপরে দুটোকেই দিও ফেলে। মনে রেখো, অজ্ঞান একটু একটু ক'রে যায় না, দপ্ ক'রে যায়, যেমন অন্ধকার ঘরে দেশলাই জ্বাললে হয়। বোঝালে, সবার পেছনেই সেই অদ্বৈতানুভূতি। এইটে আছে বলেই লীলা। আলু পটল যে গরমজলে লাফাচ্ছে, সে ঐ আগুনেরই জন্য। আগুন সরাও, আলুপটলের লাফানিও যাবে থেমে। সবার উপরে শেষ কথা—সত্যই কলির তপস্যা, যত মত তত পথ, মন মুখ এক করো, ভাবের ঘরের চুরিটি করো বন্ধ।

প্রশস্ত পথের পথিকৃৎ তিনি, পথও তিনি। সেই পথেই চল। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

ব্রহ্ম-বর্ণন

[শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা-গীতি]

শ্রীগৌরীনাথ মুখোপাধ্যায়

ব্রহ্ম কী-রূপ বর্ণিবে কেবা ?
কে হেন ব্রহ্মলাভী।
ঠাকুর কহেন : নুনের পুতুল
তরতর যায় নাবি'
সাগরের জলে, গভীরতা তার
মাপিয়া জানাবে ব'লে,
কিন্তু খবর হ'ল নাক' দেওয়া,
গেল যে অম্‌নি গ'লে।
তেম্‌নি যাঁহারা ব্রহ্ম-সাগরে
গিয়েছেন একবার,
মাপের খবর পারেননি দিতে;
হয়েছেন একাকার ॥

ঠাকুর তাঁহার অমৃত ভাষায়
ক'ন শাস্ত্রের সার,
বলা যায় নাক' স্বরূপ যাঁহার
আভাস দেন যে তাঁর।
উপদেশ-ছলে বলেন ঠাকুর,
'কেউ যদি কভু পুছে,
কেমন ঘি খেলে ? কী বোঝাবে তা'রে ?
হন্দ বল্‌বে বুঝে—
'ঘি আর কেমন, খেয়েছ যেমন',
রসিয়ে বলেন তিনি,
উপমার সাথে অপরূপ তাঁর
বাক্যের জাল বুনি :

সখীরে ডাকিয়া সঙ্গিনী মেয়ে
শুধালো গোপনে তা'রে,—
গতকাল রাতে স্বামী এলো তোর
আনন্দ খুব না রে ?
মেয়েটি কহিল, 'একথা কেমনে
বুঝায়ে তোমারে কই,
স্বামী যবে তোর আসিবে তখন
আপনি জানিবি সই।'

বেদ-পুরাণেতে ব্রহ্মের কথা
ব'লেছে কেমন জানো ?
উপমা গাঁথেন শ্রীরামকৃষ্ণ :
অপরূপ সে তো মানো ?
একজন গেল সাগর দেখতে—
ফিরিয়া আসার পরও,
জিজ্ঞাসা তা'রে করে যদি কেউ—
'সাগর কেমনতর ?'
তখন সে যদি বলে, 'দেখিলাম
কী বা হিল্লোল, আহা !!'
ব্রহ্মের কথা তেমনি শোনাবে,
ভাষায় বলিলে তাহা ॥

কাঙালের ঠাকুর *

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

ঠাকুরের আবির্ভাব কাঙালের বেশে, জন্ম তাঁর ঢেঁকিশালে, কত অভিনয় তিনি ক'রে গেলেন—সব গোপনে। কোন বাহ্যাড়ম্বর নেই, কোন বিভূতিপ্রকাশ নেই, গেরুয়া নেই, মালা-তিলক নেই, এমন কিছু চিহ্ন নেই যাতে ক'রে চেনা যাবে যে তিনি সাধু মহাপুরুষ বা পরমহংস। অনেক বাইরের লোক দক্ষিণেশ্বর এসে তাঁকেই প্রশ্ন ক'রে বসেছে, 'হ্যাগা, পরমহংসঠাকুর কোথায় বল'তে পারো?' কেউ তাঁকে চিনতেও পারত না। তিনিও নির্বিকার চিত্তে উত্তর দিতেন, 'কে জানে বাপু! কেউ বলে ছোট ভট্‌চাজ, কেউ বলে পাগলা বামুন, আবার কেউ বলে পরমহংস—তা তোমরা খুঁজে নাও তাকে।'

কাঙাল-শরণ তিনি, তাই কাঙাল বেশে কাঙালের ঘরেই এসেছিলেন। পিতা ক্ষুদিরাম পূর্বে সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু দেরে গ্রামের জমিদারের কোপে পড়ে তাঁকে ভিটা ছাড়তে হয়। সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা তাঁকে জমিদারের পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বাধা দেয়। এতে তাঁর সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও ধর্মের প্রতি আকর্ষণই প্রকাশ পায়। স্ত্রীপুত্রকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে নতুন পথে যাত্রা করেন, তাঁর সহায় সত্য—ধর্ম—ভগবান। সর্বহারা হয়েও তিনি ধর্ম-সত্য-ভগবানকে ছাড়েননি, এই হ'ল ভারতীয় আদর্শ। মহাভারতের কুন্তী পঞ্চপুত্র নিয়ে সর্বস্ব হারিয়ে বনবাস করছেন, কিন্তু মনে কোন ক্ষোভ নেই, কারণ সঙ্গে রয়েছেন অনন্যশরণ অভয় আশ্রয় ধর্মের মূর্ত বিগ্রহ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

কামারপুকুর গ্রামে এসে সামান্য কয়েক কাঠা জমি সম্বল ক'রে তিনি নতুন সংসার পাতলেন, রঘুবীরজীকে বুকে ক'রে এনে সেখানে বসালেন। সামান্য সংস্থান তাঁদের, কিন্তু মনে বড় তৃপ্তি। এই রকম সামান্য পরিবেশে ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। বাহ্য দৃষ্টিতে এঁরা বিত্তহীন হতে পারেন, কিন্তু অপার্থিব সত্য ও ধর্মসম্পদের এঁরা অধিকারী, এঁদের ঘরেই কাঙাল বেশে তিনি এলেন। চিরকাল রয়ে গেলেন এই কাঙাল বেশেই, আর কৃপাও করতেন এই কাঙালদের।

ভগবানকে পেতে হ'লে কাঙাল হতে হয়। ধনের অভিমান নিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া যায় না। মহাপুরুষরা বলতেন, 'প্রভুর দরজায় কুকুরের মতো পড়ে থাকতে হবে, তবে তাঁর কৃপা পাবে।' তিনি যে দীনবন্ধু দীনতারণ দীননাথ দীনদয়াল দীনশরণ, তিনি কাঙালের ঠাকুর। এই ভাব নিতে হবে। 'বড় হবি তো ছোট হ'—এই চিন্তা ক'রে মন গঠন করলে তবে তাঁর কাছে যাওয়া যাবে। অনন্ত ক্ষমতার অধিকারী তিনি, কিন্তু কোন ঐশ্বর্যই কেউ তাঁর জানতে পারত না। কোন কোন ভাগ্যবান কদাচিৎ তাঁর শক্তির স্ফুরণ দেখে স্তম্ভিত হয়েছিল। শ্রীশ্রীমায়ের জীবন আরও বিচিত্র, ঠাকুরের তবু ঘন ঘন ভাব-সমাধি হ'ত, মায়ের সাধনার কথা কেউই জানতে পারেনি। কত গোপনে তিনি রেখেছেন তাঁর অমিত শক্তিকে। এঁরা যে সাক্ষাৎ ভগবৎ-শক্তি, একবার স্পর্শ ক'রে মানুষের মন বদলে দিতে পারতেন, ভগবান দর্শন করিয়ে দিতে পারতেন। কেউ বাইরে থেকে দেখে এঁদের কিছু টেরও পেত না। এত কাঙাল বেশে এঁরা থাকতেন।

* ১৩.১১.৫৭ তারিখে সন্ধ্যায় আসানসোল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের ধর্মপ্রসঙ্গ: —শ্রীআলোক চট্টোপাধ্যায় অনুলিখিত।

১৮৮৬, ১লা জানুআরি কাশীপুর বাগান-বাড়ীতে ঠাকুর কল্পতরু হয়েছিলেন, সমবেত ভক্তবৃন্দকে একবার স্পর্শ ক'রে তিনি তাদের বহু-সাধনলভ্য চৈতন্য দান করছেন, কি অপূর্ব অদ্ভুত ব্যাপার। তাঁর মধ্যে যে এত অপার শক্তি রয়েছে—বাইরে থেকে দেখে কেউ বুঝতে পারত না। রাজা যেমন ছদ্মবেশে রাজ্য পরিদর্শনে বেরোন, সেই রকম সংগোপনে কাঙালবেশে তাঁর মর্ত্যে আগমন। ঠাকুরের কাছে যে সব ব্রাহ্ম ভক্ত আসতেন, তাঁরা মাথা নুইয়ে প্রণাম করতেন না। কিন্তু ঠাকুরই তাঁদের মাথা হেঁট করতে শিখিয়েছেন, নিজে মাথা নুইয়ে প্রণাম ক'রে। যে যত বেশী মাথা হেঁট করতে পারবে, সে তত তাড়াতাড়ি ভগবানকে পাবে। অহংকার ত্যাগ না হ'লে তাঁর কাছে যাওয়া যায় না। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব বলছেন, তৃণাদপি নীচু হতে হবে। ঠাকুরের ভক্ত নাগ-মশায়ের জীবনে এইটি দেখা যায়। বিনয়ের পরাকাষ্ঠা ছিলেন তিনি। যে সব উপাধি সম্মান প্রতিপত্তি সংসারে আনন্দ দিচ্ছে, প্রভুর দরজায় সেগুলি সব পরিত্যাগ ক'রে গিয়ে তাঁর শরণ নিলে তবেই পরম তৃপ্তি, তখন তিনি বুকে তুলে নেবেন। ঠাকুর নিজের জীবনে তাঁর প্রতিটি উপদেশ পালন ক'রে তাঁর উপদেশাবলীর Practical demonstration (কাজে ক'রে দেখিয়ে) দিয়েছেন জগতের লোককে, কত অপার আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী তিনি ছিলেন। স্বামীজীর মত উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষায় শিক্ষিত যুবককেও তিনি একবার স্পর্শদ্বারা অনন্ত আনন্দলোকের রসাস্বাদ করিয়ে দিলেন। চৈতন্যানুভূতি করালেন, আবার স্পর্শদ্বারা সেই দর্শন-অনুভব সংবরণ ক'রে দিলেন। কি অসীম ক্ষমতা থাকলে এটি সম্ভব, আমরা অনুভব করতে পারি না। এত বিভূতি শক্তি থাকা সত্ত্বেও কিভাবে জীবন কাটিয়ে দিলেন। একেবারে দীনের মতো সাধারণ বেশে ও সেই ভাবে তিনি থাকতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র শুদ্ধসত্ত্ব স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ একবার কাশীতে বিশ্বনাথ দর্শন করতে গিয়েছিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করছেন, তখনকার একটি ছোট ঘটনা মনে পড়ে, মন্দিরে ঢুকতেই মহারাজের চোখে পড়লো, সামনের ছোট উঠোনটিতে একটি ঝাড়ুদার ঝাঁটা দিয়ে বাসি বেলপাতা-ফুল সব পরিষ্কার করছে, এইটি দেখেই মহারাজের এক ভাবান্তর উপস্থিত হ'ল, তিনি আস্তে আস্তে গিয়ে ঝাড়ুদারের হাত থেকে ঝাঁটাটি নিয়ে অল্পক্ষণ মন্দিরের চাতাল একটু পরিষ্কার ক'রে আবার সেটি ফেরত দিলেন। কি মহৎ শিক্ষা দিলেন তিনি ঐ ছোট ঘটনাটির মধ্য দিয়ে। মহাজন-বাণী আছে, 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়'। 'মহারাজ' কি এই ভাব নিয়ে এটি করলেন? এখানে তিনি বহুজনপূজ্য ধর্মগুরু নন, তিনি জগৎগুরু বিশ্বনাথের দীন সেবকমাত্র—এই ভাব প্রকাশ করছেন। সঙ্ঘের সেবকদের তিনি শেখাচ্ছেন Practical demonstration দিয়ে—প্রভুর কাছে সব উপাধি-বিযুক্ত হয়ে দীনতা ব্যাকুলতা নিয়ে উপস্থিত হ'লে তবে তাঁর দয়া হয়। তিনি যে 'অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য'।

মা কত সাধারণ ভাবে থাকতেন, কেউ জানতে পারত না যে ব্রহ্মময়ী স্বয়ং এই নবরূপ ধারণ ক'রে অপূর্ব লীলা ক'রে যাচ্ছেন, এমনি মহামায়ার মায়া। মা-ঠাকরুন যখন দক্ষিণ ভারতে যান, সেই সময় গোলাপ-মাও সঙ্গে ছিলেন। তাঁর চেহারা ছিল সুন্দর আর বেশ রাসভারী। দক্ষিণী ভক্তরা এসে গোলাপ-মাকেই সবাই মা-ঠাকরুন মনে ক'রে প্রণাম করতে যেতেন। মায়ের অতি সাধারণ ভাব দেখে সকলেই অবাক্ হয়ে যেত।

ভগবান একবার তাঁর ভক্তদের তাঁর অনন্ত সম্পদের ভাণ্ডার দেখাচ্ছেন। সেখানে ভক্তদের সুখ দেওয়ার কত জিনিস তিনি রেখেছেন, পরিপূর্ণ রয়েছে তাঁর ভাণ্ডার অনন্ত ঐশ্বর্যরাশিতে, কিন্তু একটি জিনিস তিনি তাঁর ভাণ্ডারে রাখেননি, এটি তিনি চান ভিক্ষাপাত্র হাতে, এটি তিনি চাইছেন তাঁর ভক্তদের কাছে—এটি 'দীনতা', এটি তোমরা অভ্যাস করো। আমিত্ব ত্যাগ করো। ঠাকুর বলছেন, 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল', এই অহংকার পরিত্যাগ করলেই তৃপ্তি আসবে। দীনবন্ধুকে পেতে হ'লে দীন সাজতে হবে। মীরাবাঈ দীনবেশে রণছোড়জীকে আশ্রয় ক'রেছিলেন। সমস্ত পার্থিব সুখভোগলালসা পরিত্যাগ ক'রে কাঙালিনীর বেশে তিনি গিরিধারীলালজীর শরণ নিয়েছিলেন বলেই তো শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দিবানিশির সাথী হয়েছিলেন। ঠাকুরেরও এই ভাব—জগতের সব একদিকে পড়ে রইল, তাঁর শুধু মাকে নিয়ে লীলাবিলাস। মায়ের কাছে তিনি সন্তান, দীনতম সেবকমাত্র।

ঠাকুর তখন দক্ষিণেশ্বরে। রাণী রাসমণির জামাই মথুরবাবুর এক বন্ধু এসেছে মন্দির দেখতে জুড়িগাড়ী ক'রে। মন্দিরের পশ্চিম দিকে গঙ্গার ধারে তখন অপূর্ব ফুলের বাগান ছিল। বন্ধুবর সেই বাগানে ফুলের শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে সেই বাগানের মধ্যে গায়ে কাপড়ের খুঁট দিয়ে একজন লোককে ঘুরে বেড়াতে দেখে তাকে নির্দেশ দিলেন, যেন সে তাঁকে একটি ফুলের তোড়া বানিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ পরে সেই লোকটি একটি তোড়া নিয়ে এসে হাজির বন্ধুটির সামনে। তোড়ার গঠন-পারিপাট্য ও পুষ্পবিন্যাস দেখে তাঁর তো চক্ষুস্থির, কোন সাধারণ মালির পক্ষে তো এমন তোড়া করা সম্ভব নয়। এ মালি নিশ্চয়ই একজন শ্রেষ্ঠ কারিকর। বন্ধুটি তক্ষুনি চললো জানবাজারে—মথুরবাবুর কাছে। সেখানে উপস্থিত হয়ে বন্ধু মথুরকে অনুরোধ করলেন—ভাই এই যে তোড়াটি দেখছ—এটি তোমার দক্ষিণেশ্বর বাগানের মালির তৈরী। আমার ঐ মালিটিকে চাই, আমার বড় পছন্দ হয়েছে তাকে। সেই ফুলের তোড়ার লালিত্য ও মালির চেহারার বর্ণনা শুনে মথুরবাবুর তো বুঝতে কিছুই বাকী রইল না। তিনি তখনি ছুটলেন দক্ষিণেশ্বর—বন্ধুটিকে সঙ্গে নিয়ে। মন্দিরে পৌঁছে উত্তর পশ্চিম কোণের গোলবারান্দাযুক্ত ঘরে সোজা এসে উঠলেন, তারপর যা করলেন তাতে বন্ধুর আর একবার চক্ষুস্থির হবার উপক্রম। মথুরবাবু সেই বাগানের মালিটির পায়ের কাছে সাষ্টাঙ্গে পড়ে বলছে, বাবা একে তুমি ক্ষমা করো, এ না জেনে তোমার সঙ্গে ঐ রকম ব্যবহার করেছে। ঠাকুরের ছিল সবই অদ্ভুত, যখন যে কাজ করতেন, তা সে যত সামান্যই হোক না, সেটি সর্বাঙ্গসুন্দর করতেন, নিখুঁত হত সেটি, তিনি যে সৌন্দর্যময়ী জগৎসৃষ্টিকারিণীর 'খাস তালুকের প্রজা', তাই তাঁর হাতের কাজ ছিল এত সুন্দর। ঠাকুর মথুরবাবুর এই আচরণে সঙ্কুচিত হয়ে বললেন, তাতে কি হয়েছে—তা আর কি! যেন কিছুই হয়নি এই ভাব। কি নিরভিমানতা।

গিরিশবাবুকে অবনমিত করছেন নিজে তাঁর কাছে নত হয়ে। নিজের জীবন দিয়ে তিনি জগৎকে শেখাচ্ছেন, কাকে বলে 'তৃণাদপি সুনীচ' হওয়া। এই দীনতা চাই, চাই এই নিরভিমানতা, চাই আত্মবিসর্জন—তবেই তাঁকে পাবে।

স্বামী তুরীয়ানন্দের কথাসংগ্রহ

[দ্বিতীয় পর্যায়]

ভক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিপিবদ্ধ

কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, ১৯১৯ খৃঃ ৯ই অক্টোবর, অপরাহ্ণ তিন ঘটিকা। পূজনীয় কেদার বাবা, শ্রীচন্দ্রকান্ত ঘোষ এবং কয়েকজন ব্রহ্মচারী ও ভক্ত উপস্থিত।

মধ্যাহ্ন-বিশ্রামের পর পূজ্যপাদ স্বামী তুরীয়ানন্দ অম্বিকা-কুটীরের বারান্দায় আরাম-চেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় বিরাজমান। সেবক সনৎ মহারাজ ছোট টানা-পাখাটি টানিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতেছেন। অনেক বৎসর কঠোর তপস্যায় মহারাজের স্বাস্থ্য ভগ্ন, তদুপরি বহুমূত্ররোগে তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে, তাই বায়ুপরিবর্তনের জন্য কয়েক মাস পূর্বে কাশীধামে আসিয়াছেন। চন্দ্রকান্ত বাবু প্রণামান্তর আসন গ্রহণপূর্বক কুশল প্রশ্ন করিলেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—এখন এক রকম ভালই চলে যাচ্ছে। এখানে এসেই উপর্যুপরি দুবার ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হওয়ায় শরীরটা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিল। ভাগ্যিস্, এখন ডাঃ—যিনি আমাকে কলকাতায় চিকিৎসা করেছিলেন, কোন কার্যোপলক্ষে এখানে এসেছিলেন। তিনি আমাকে দেখে বলেছিলেন যে, আমার বোধ হয় এখানকার change (পরিবর্তন) কার্যকর হবে না। তখন আমার পূর্বের হাঁপানি রোগের লক্ষণ দেখা গিয়েছিল।

ভক্ত—আপনাকে অষ্টমীপূজার দিন যেমন দেখেছিলাম, এখন তার চেয়ে অনেক ভাল দেখছি। বায়ুপরিবর্তনের ফল আসামাত্র না হয়ে ক্রমশঃ হলেই ভাল। দেওঘর গিয়ে প্রথমে বাবুরাম মহারাজের খুব উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু পরে তা টিক্‌ল না।

স্বামী—তারপর তাঁকে কলকাতা আনাই বোধ হয় খারাপ হয়েছিল। রাস্তায় ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হয়ে ডবল নিউমোনিয়াতে পরিণত হয়।

* * *

চন্দ্রকান্তবাবু—আপনি আমাদের তো দেখছেন, সংসার নিয়েই আমরা ব্যস্ত। কি করলে তাঁকে লাভ করা যায় বলুন।

স্বামী—ঠিক এই করলে তাঁকে পাওয়া যায়, এমন কিছু নেই। ঠাকুর বলতেন, বহু জন্মের পুণ্যফলে লোক সরল হয়। স্বামীজী বেশ বলেছিলেন, 'একি শাক মাছ পেয়েছ যে, এত কড়ি দিয়ে কিনে নেবে?' অধ্যবসায় থাকা চাই। একটু ধ্যানজপ করেই কিছু হ'ল না বলে ছেড়ে দিলে চলবে না। তপস্যা করতে করতে রত্নাকরের উপর বল্মীকের স্তূপ জমে গিয়েছিল। ঋষিদের মধ্যে যিনি যে পথে তাঁকে পেয়েছেন, তিনি সেই পথের কথাই শাস্ত্রে লিখে গেছেন। কেউ বলছেন, এরূপ ভাবে পূজা করতে হবে, কেউ বলছেন এরূপে জপ করতে হবে। নারদ বলেন, নদী যেমন সমুদ্রকে পাবার জন্য আর কোন দিকে না চেয়ে (যে পথে সম্ভব সেই পথে) এক লক্ষ্যে তার দিকে চলতে থাকে, তেমনি যে ভগবানকে চায় সে আর সব ফেলে দিয়ে একমনে তাঁর দিকেই চলতে থাকবে। গীতায় ভগবান্ বলেছেন:

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

ভক্তি দুরকম। প্রথমে বৈধী ভক্তি, এত

জপ, এরূপ পূজা করতে হবে। তারপর রাগানুগা ভক্তি, তখন ভক্ত ব্যাকুল হয়ে কেবল তাঁর কথাই চিন্তা করে, তাঁর বিষয় ভিন্ন আর কিছু ভাল লাগে না।

চন্দ্রকান্তবাবু—মহারাজ, জপ করা মানে কি ?

স্বামী—জপ মানে মুখে তাঁর নাম করা, আর অন্তরে তাঁর রূপ চিন্তা করা, তাঁর কথা ভাবা, তাঁকে ভালবাসা। মন যদি অন্য জিনিসে আসক্ত থাকে, তাহলে শুধু মুখে নাম করলে কি হবে? আসল কথা যেমন করেই হোক তাঁকে ভালবেসে আপনার ক'রে ফেলা।

ভক্ত—ঠাকুর যেমন বলেছেন, যো সো ক'রে বাবুর সঙ্গে দেখা করা—তা দারোয়ানের ধাক্কা খেয়েই হ'ক, বা পাঁচিল ডিঙিয়েই হ'ক।

চন্দ্রকান্তবাবু—কেউ যদি ভাবে, ঠাকুরের বা শ্রীমার দর্শন পেয়েছি, আমার আর কিছু করবার দরকার নেই।

স্বামী—তাদের কথা আমি কি ক'রে বলবো? সে বিষয়ে তারাই ভাল জানে।

ভক্ত—এঁরা বোধ হয় বলতে চান, অনেকের বিশ্বাস—মা যখন আমাদের ভার নিয়েছেন, তখন আমাদের আর কিছু করবার দরকার নেই। মা যখন আমাদের এক হাত ধরে রেখেছেন, তখন অন্য হাতে আমরা যা খুশি করতে পারি। মুক্তি আমাদের করতলগত।

স্বামী—ঠিক ঠিক যদি সেরূপ বিশ্বাস কারো হয়, তাহলে তো তার হয়ে গেছে। কিন্তু ওরূপ হওয়া কি সোজা কথা? ওরূপ স্থলে যাতে self-deluded (আত্ম-প্রতারিত) না হয়, দেখতে হবে। ভগবানের উপর যারা সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারে, তারা যদি পূর্বে মহাপাপও ক'রে থাকে, তা হলেও তাঁর কৃপায় এক মুহূর্তে সে পাপ দূর হয়ে যায়। পর্বত-প্রমাণ তুলার মধ্যে এক ফিন্‌কি আগুন ছেড়ে দাও দেখি। সমস্ত তুলা হুহু ক'রে জ্বলে পুড়ে যাবে। হাজার বছরের অন্ধকারের মধ্যে আলো জ্বাললে কি তা একটু একটু ক'রে দূর হয়, না তৎক্ষণাৎ চলে যায়? গীতায় ভগবান্ বলেছেন :

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥

অত্যন্ত দুরাচারও যদি একমাত্র তাঁর শরণাগত হয়ে থাকে, তবে তাঁকে সাধু বলেই জানতে হবে। আর সে 'ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা'। তাঁর কৃপায় সে আর দুরাচার থাকে না, ধার্মিক হয়ে যায়। নাচতে জানলে তার পা বেতালে পড়ে না। পূর্বে বহু পাপ ক'রে থাকলেও শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করার পরে কি আর তার দ্বারা পাপ কাজ সম্ভব হয়? গিরিশবাবু না করেছেন, এমন পাপ কাজ নেই। একবার আমাদের বলেছিলেন, 'আমি যত মদ খেয়েছি তার বোতলগুলি খাড়া ক'রে একটার উপর আর একটা রাখলে মাউণ্ট এভারেষ্ট (হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখর)-এর সমান উঁচু হবে। কবি কিনা, তাই এভাবে বলেছিলেন। গিরিশবাবুকে ঠাকুর সকাল-সন্ধ্যায় ভগবানের নাম করতে বলায় তিনি বলেছিলেন, 'তা কথা দিতে পারি না। আমি তখন কোথায় কোন্ খেয়ালে থাকব, জানি না।' তারপর শুধু খাওয়ার সময় নাম নিতে বলায়ও বললেন, 'তাও আপনার কাছে বলতে পারি না। কত মোকদ্দমা, বাজে ভাবনা নিয়ে থাকি। এও পারব না।' তখন ঠাকুর বললেন, 'তবে বকল্‌মা দে।' পরে গিরিশ বাবু বলেছিলেন, 'তখন তো বকল্‌মা দিয়ে এলুম। পরে বুঝেছি, বকলমা দেওয়া কত শক্ত। দিনান্তে একবারও তাঁর নাম করতে পারব না বলে-ছিলাম। কিন্তু পরে দেখি, প্রতি মুহূর্তে এতটুকু কাজ তাঁকে স্মরণ না ক'রে করবার জো নেই।'

পনর বছরের আফিং খাওয়ার অভ্যাস একদিনে ছেড়ে দিলেন। বলেছিলেন, 'প্রথম তিন দিন বড় কষ্ট হয়েছিল, গা যেন আড়ষ্ট হয়ে আসত। চতুর্থ দিনেই সে ভাব কেটে গেল।' শেষে তামাকটুকু পর্যন্ত খেতেন না।

চন্দ্রকান্তবাবু—সাধক তাঁর কাছে এগোচ্ছে কিনা, তার প্রমাণ কি?

স্বামী—সে নিজেই মনে মনে বুঝতে পারবে, আর অন্যেও টের পাবে। তার কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপুগুলি কমে যাবে। বিষয়ের উপর আসক্তি হ্রাস পাবে, আর প্রাণে শান্তি আসবে।

ভক্ত—ভগবদ্দর্শনের আগে তো আর শান্তি আসে না?

স্বামী—শান্তি আসা অনেক দূরের কথা। কিন্তু তার ভোগ-বাসনাগুলি কমে আসছে, সর্বভূতে প্রীতি হচ্ছে দেখলে বুঝতে পারবে, সে অগ্রসর হচ্ছে। শুধু জপ করলে হবে না। হৃদয়ে বাসনার ঘোগ থাকলে সব জপের ফল সেখান দিয়ে বেরিয়ে যাবে। একজন সমস্ত দিন ক্ষেতে জল সেচন ক'রে সন্ধ্যার সময় দেখলে এক বিন্দু জলও ক্ষেতে যায়নি, সব ঘোগ (ছিদ্র) দিয়ে বেরিয়ে গেছে। এ বিষয়ে নাগমহাশয় বেশ একটি কথা বলেছিলেন। আমি তাঁর বাড়ী গিয়েছিলুম। তাঁর বাপ পাশে এক জায়গায় বসে জপ করছিলেন। নাগমহাশয় আমায় হাত জোড় ক'রে বললেন, 'আশীর্বাদ করুন যেন বাবার ভক্তি হয়।' আমি বললাম, 'ভক্তি তো তাঁর খুব আছে। সর্বদা ভগবানের নাম জপ করছেন, আর কি?' নাগমহাশয় বললেন, 'নোঙর ফেলে দাঁড় টানলে হবে কি? উনি আমাকে বড় ভালবাসেন। জপ করলে কি হবে?' আমি বললাম, 'আপনার মত ছেলেকে ভালবাসবেন না তো কাকে ভালবাসবেন?' নাগমহাশয় বললেন, 'ও-কথা কেন বলেন, ও কথা কেন বলেন? আমার উপর ভালবাসা যাতে যায়, সেই আশীর্বাদ করুন।'

আহা! নাগমহাশয় কি লোকই ছিলেন! নোঙর ফেলে দাঁড় টানার গল্পটা কি জান? কতকগুলি মাতালের অন্ধকার রাত্রে নৌকায় বেড়াবার শখ হ'ল। নদীর ঘাটে গিয়ে নৌকায় উঠেই সকলে দাঁড় টানতে আরম্ভ করলে। সকাল হতে দেখলে নৌকা যে ঘাটে ছিল সেই ঘাটেই রয়েছে। রাত্রে নেশার ঝোঁকে নোঙরটা তুলতে ভুলে গিয়েছিল।

আজি ফাল্গুনে

শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ

আজি, আকাশ বাতাস পৃথিবী কাঁপায়ে
উঠিছে তোমার নামের রোল,
সারাটি ভারতে, সারাটি ধরায়,
সারাটি বিশ্বে লাগিছে দোল।

আজি, কোটি মানবের হৃদয়-কাননে
ফুটিছে তোমার নামের ফুল,
ভরিল মনের গঙ্গা জোয়ারে,
ভাসিল জীবন-তটিনীকূল।

আজি, ফাল্গুনে হেরি তোমার আলোক,
ধরণী ভরিয়া তোমার জয়,
ধন্য হে প্রভু, ধন্য আমি যে
হেরিয়া তোমারে নিখিলময়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

পরমপুরুষ শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের আবির্ভাব-লগ্ন থেকে আমাদের ইতিহাসের সুবর্ণযুগের অভ্যুদয়। যে সময়ে তিনি মর্ত্য-কায়া গ্রহণ ক'রে অবতরণ করেছিলেন, তার পূর্ব থেকেই আমাদের সমাজে সংসারে, জীবনে আচরণে ও চরিত্রে, আমাদের ভাবে ও ভাবনায় শ্রেয়োনীতি সম্যক্ ভাবে অনুসৃত হচ্ছিল—একথা বলা যায় না, বরং পরিলক্ষিত হচ্ছিল প্রেয়পরায়ণ মানুষের সংখ্যাধিক্য।

ক্রমে ক্রমে প্রত্যক্ষ করা গেল, মানুষের মধ্যে চিত্তবৃত্তি ও হৃদয়াবেগের সঙ্গে বিচার-বুদ্ধি জ্ঞান ও সঙ্গতিবোধের সংঘর্ষ। এ-কারণে সংশয়ের মেঘে মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেল ভারতের শাশ্বত সত্য। দৈবীশক্তির নিশ্চিত প্রামাণ্য-স্বরূপ কাহিনীগুলিকে চিত্তবিভ্রম ও কাল্পনিক বলেই উপহাস করার মনোবৃত্তি সর্বত্র পরিস্ফুট হতে লাগলো।

চিরন্তন সত্যাশ্রয়ী সনাতন ধর্ম ও নীতি বর্জন ক'রে নিকৃষ্ট স্তরের অবাস্তব অপ্রাসঙ্গিক অনধিকার চর্চায় এক শ্রেণীর ব্যক্তি আসক্ত হওয়ায় আমাদের ভাব ও ভাবনা বিকৃত হতে শুরু করল। এই শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে বিভ্রান্ত এবং সাগরপারের শিক্ষা-দীক্ষায় পুষ্ট হয়ে সমাজে প্রাধান্য লাভ করলেন। মানুষের বিশ্বাস ও আদর্শের ধারাকে বিপথ-গামী ক'রে তুলল তদানীন্তন যুক্তিবাদীদের দুঃসাহসিক সমালোচনা।

এদিকে এদেশ ব্রিটিশ-শাসিত হওয়ার ফলে প্রতীচ্য সভ্যতার বিভিন্ন পণ্যসম্ভার বাংলার মধ্য দিয়ে সমগ্র জাতির জীবনক্ষেত্রে আনন্দমেলা সৃষ্টি ক'রে তুলল এবং আমাদের মানসিক ভোজে গ্রহণ করা হ'ল যান্ত্রিক সভ্যতার নানা উপকরণ। তখন হয়তো অনেকে ভেবেছেন—যে দেশে ধর্মই মানুষের জীবনের মূল, সে দেশে জড়বিজ্ঞানের প্রমাণানুকূল তত্ত্ব ও তথ্যের নিদর্শনগুলি অযথা বিভ্রান্তি এনে দেবে, আর কণ্টকাকীর্ণ ক'রে তুলবে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রকে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় পুষ্ট বিশ্লেষণ-মুখী মন জড়বিজ্ঞানধর্মী; কিন্তু পাশ্চাত্য ভাববন্যার প্রবাহকে কেমন ক'রে বাঁধ দিয়ে প্রতিহত করবেন, তার পথ কেউ খুঁজে পেলেন না।

খৃষ্টান মিশনারীরা শিক্ষাপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ধর্মপ্রচারেই শুধু রত হলেন না, আমাদের ধর্ম সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে হনন করার উদ্দেশ্যে ও বহুধাবিস্তৃত অপকৌশলের বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ভারতীয় জীবনবাদের বীজমন্ত্র অবলুপ্ত ক'রে এই সব মিশনারী আমাদের ধর্মের নিন্দা করাকেই তাঁদের প্রধান ব্রতরূপে গ্রহণ করলেন।

একদা এদেশ প্রকৃতির অন্তহীন রহস্য শ্রান্তিহীন তপশ্চর্যার মাধ্যমে, সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করেছিল এবং সান্ত ও অনন্তের মধ্যে মিলন-সেতু রচনা দ্বারা নূতন নূতন তথ্যও আবিষ্কার ক'রে জ্ঞানপ্রজ্ঞানের দীপালী উৎসব করেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তার আত্মিক শক্তিকে দুর্বল করবার জন্যে, তার ক্ষীণ দীপাবলী নির্বাপিত করবার জন্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম আমল থেকে চলেছিল অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টা, ফলে আমরা জাতীয়তা-ভ্রষ্ট, ধর্মাদর্শভ্রষ্ট, আত্ম-বিস্মৃত ও আত্মঘাতী হতে লাগলাম। নানা ধর্ম ও উপধর্মের সংঘাতে আমাদের রূঢ় বাস্তব জীবন কোনক্রমেই বিপন্মুক্ত হ'ল না, এর ওপর

কুসংস্কার ও কদাচার শৈবালের মত বৃদ্ধি পেয়ে জাতির জীবনের স্রোতোধারাকে রুদ্ধ ক'রে সঙ্কীর্ণ গণ্ডি রচনা ক'রে তুলল। স্বদেশের সমূহ ক্ষতি হ'ল। নারীনির্যাতন, বহু বিবাহ, পণ-প্রথা, কৌলিন্যপ্রথার ভয়াবহ দুর্গতি, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ এবং মাতৃজাতির প্রতি অসম্মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় দেবীনন্দন ঘটক, স্মার্ত রঘুনন্দন প্রভৃতির ওপর দেশবাসী অভিশাপ দিলেন। এই পটভূমিকার ওপর এসে দাঁড়াল ঊনবিংশ শতাব্দী।

পরমহংসদেবের আবির্ভাবের পথ প্রস্তুত ক'রে গিয়েছিলেন ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা যুগপুরুষ রাজা রাম-মোহন রায়। তিনি আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্র কর্ষণ ক'রে যে সব বীজ ছড়িয়ে গিয়ে-ছিলেন, তাতেই ফলেছিল সোনার ফসল, জন্মলাভ করেছিল বহু বিরাট মহীরুহ। এজন্যে আমরা তাঁর কাছে চিরঋণী।

এই মহামানবের উগ্র সাধনার ফলে আমাদের মাতৃভূমির বীজের বিশুদ্ধি সংরক্ষিত হতে পেরেছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাব সংমিশ্রিত ক'রে রাজা তাঁর স্বজাতির নবজীবন ধর্মাদর্শে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে গেছেন এবং স্বদেশের সর্বপ্রকার ভেদ-বৈষম্য কুসংস্কার ও কুপ্রথা উচ্ছেদ-সাধনকল্পে আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন। তিনি সার্বভৌম উপাসনার জন্যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং প্রচলিত হিন্দুধর্মকে আবর্জনা-মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে তাঁকে বহু প্রতিকূল আবহাওয়ার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। প্রতীকপূজা, অবতারবাদ, পৌত্তলিকতা প্রভৃতি সম্পর্কে ছিল তাঁর নিজস্ব মত, তিনি বেদান্তের নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাকেই হিন্দুর প্রকৃত ধর্মরূপে গ্রহণ করে-ছিলেন, ব্রহ্মজ্ঞান-লাভই যে একমাত্র পারমার্থিক লক্ষ্য, এই সত্য তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল।

রাজা রামমোহনের পরবর্তী সাধকরূপে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রভৃতি মহা-মানবকে দেখা গেল। নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজকে নবতত্ত্ব রূপ দিয়ে যে সময়ে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র নববিধান সমাজ গঠন করেছিলেন, সে সময়ে তাঁরই আদর্শের ছত্রচ্ছায়ায় নরেন্দ্রনাথ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি ভবিষ্যতের মহাপুরুষগণের ধর্মজীবন শুরু হয়। এঁরা সকলেই পরবর্তীকালে পরমহংসদেবের সান্নিধ্যে নিজেদের অধ্যাত্ম-জীবন গঠন করেন। একদিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল থেকে চলছিল ব্রাহ্মসমাজের প্রগতি-মূলক ভাবধারা, অপর দিকে গড়ে উঠেছিল রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের আত্মরক্ষা-নীতি।

এই সময়েই রাজা রামমোহনের তিরো-ভাবের তিন বৎসর পরেই ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে কামারপুকুরে গদাধর বা শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। তাঁরই কথামৃত পান ক'রে স্বদেশের সারস্বত ও ভাগবত সম্প্রদায় যে ভাব ও প্রেরণা পেয়েছেন তা থেকেই আমাদের কাব্য সাহিত্য, দর্শন ও জ্ঞানবিজ্ঞানের পথে নূতন আলোক সম্পাত হতে পেরেছে। আজ যে সব ধর্মকথা আমরা নানা সঙ্ঘ-সাধকের মুখে শুনি, সেগুলি তাঁরই কথামৃতের অনুকরণ বা অনুস্মরণ বলা যেতে পারে।

দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত পূজারী ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম নিয়ে গদাধর চট্টোপাধ্যায় শেষে ১২৬২ সালে কলিকাতার উপকণ্ঠে—দক্ষিণেশ্বরের গাঙ্গেয় তটে ভবতারিণীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হলে, সেখানেই মায়ের বেশকারীর কাযে ব্রতী হয়ে কিছুকাল পরে পূজারী হলেন বটে, কিন্তু পুরোহিতের গতানুগতিক ক্রিয়াপদ্ধতি বা পূজার ক্রিয়ানুষ্ঠানের বাহ্যাড়ম্বর তিনি অনুসরণ করেননি, করেছিলেন দেবীর চরণে প্রাণমন নিঃশেষে সমর্পণ, আর শিশুর মতো সরল প্রাণে ডাকতে ডাকতে

পাষাণীর মুখে কথা ফুটিয়েছিলেন, অবশেষে যে দিন অদ্ভুতভাবে মায়ের দর্শন পেলেন এবং মৃন্ময়ী মূর্তি তাঁর কাছে চিন্ময়ী হ'য়ে কথা বললেন, সেদিন ভারতীয় দর্শনের বিরাট প্রদীপ অপূর্ব ভাবে দক্ষিণেশ্বরে জলে উঠল। তিনি দেবীর অনুমতি নিয়ে সর্ব ধর্ম সাধনা করেছিলেন অধ্যাত্ম লোকের গূঢ় রহস্য উপলব্ধি করবার জন্যে, এবং তাঁরই কাছে বিভিন্ন ধর্মের সিদ্ধ সাধক ও সাধিকা এসে তাঁকে তাঁদের সাধনপন্থাগুলি শিক্ষা দিয়েছেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি প্রত্যেক ধর্মসাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে দিব্যানুভূতিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন। সর্ব ধর্মশাস্ত্রের সব কথাই শুনিয়ে শেষে সার মর্ম ব্যক্ত ক'রে তিনি বলেছিলেন—'যত মত, তত পথ'।

প্রত্যেক ধর্মের সংরক্ষণশীল ব্যক্তির মনে যে সব সংকীর্ণতা ছিল, একে একে সে সব খণ্ডন ক'রে সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণী শোনালেন, আর সেই বাণী বহন ক'রে নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র পৃথিবীতে প্রচার করেছিলেন। মার্কিন দেশে এই বীর সন্ন্যাসী 'ভাগোয়া ঝাণ্ডা' উড়িয়ে দিকে দিকে জ্ঞানের আলো বিকীর্ণ করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের করুণায় উনবিংশ শতাব্দীতে সত্যযুগ দেখা দিয়েছিল এবং এই শতাব্দী স্বর্ণ যুগ নামেও কথিত হয়ে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু সব ধর্মের তত্ত্বকথা শোনাননি, যুক্তিবাদের প্রতিটি তত্ত্ব একে একে বিশ্লেষণ ক'রে দুর্জ্ঞেয় রহস্যগুলি তুলে ধরেছিলেন এবং যুক্তিবাদের সঙ্গে মুক্তিবাদের ভাবধারার প্রয়াগ-তীর্থ রচনা করেছিলেন। তাঁরই দৈব দাক্ষিণ্যে আমাদের ভাব ও ভাবনার অগ্রগমন, এবং অধ্যাত্ম-সাধনার সহজ সরল পথের সন্ধান সম্ভব হয়েছে।

চরৈবেতি

[চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদু মুদুম্বরম্...]

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

সূর্য দেখেছ ? সারাদিন ধরে আকাশের পথে চলছেই,
　চলছেই, তার থামা নেই, যেন চোখে নেই ঘুম ক্লান্তি,
রাত্রির পথ নিমেষে ফুরোয়, উদয়ের চোখে জ্বলছেই
　সূর্য দীপ্তি.... ... . অফুরন্তের অমেয় জীবন শান্তি।

পৌঁছনো নেই, আছে পথ চলা ; সময়ের চলা থামে না,
　চলো—চলে যাই যুগযুগান্তে, চলা—জীবনের অর্থ ;
প্রাণের পূর্ণ অমৃত-দীপে জ্বলে সূর্যের কামনা ;
　অফুরান পথ ফুরায় না যার, পার হয় সে-ই মর্ত্য।

প্রাণতত্ত্ব ঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতবাদ

ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষাল

প্রশ্নোপনিষদে প্রাণ সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে এবং আধুনিক বিজ্ঞান প্রাণের উদ্ভব (Origin of Life) বিষয়ে যে মতবাদ প্রচার করে, এই প্রবন্ধে আমি সংক্ষেপে তাই আলোচনা করছি।

প্রশ্নোপনিষদের প্রথম প্রশ্নে শিষ্য আচার্যকে জিজ্ঞাসা করছেন: ভগবন্ কুতো হ বা ইমাঃ প্রজা প্রজায়ন্ত ইতি। উত্তরে আচার্য বলেছেন: প্রজাপতি তপস্যার দ্বারা 'রয়ি ও প্রাণ' এই মিথুন উৎপন্ন ক'রে বললেন, 'এতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি।' আচার্য শঙ্কর ভাষ্যে লিখেছেন, প্রজাপতি তপস্যার দ্বারা পূর্ব কল্পের স্মৃতি উদ্বোধিত করলেন। তার ফলে তিনি সৃষ্টির সহায়ভূত 'রয়ি' (চন্দ্ররূপ অন্ন অর্থাৎ ভোজ্য বস্তু) এবং 'প্রাণ' (অগ্নিরূপ ভোক্তা) এই মিথুন সৃষ্টি করলেন।

ব্যাখ্যা : সূর্য, অগ্নি, প্রাণ—এই তিনই অন্নাদি আদান শোধন ও পরিপাকের কারণ, এই জন্য এদের ভোক্তৃশ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। আর যে হেতু জীবভোগ্য অন্ন চন্দ্রকিরণে পুষ্ট হয়, সে জন্য চন্দ্ররূপ রয়িকে ভোজ্যশ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। রয়ির মূল অর্থ ধন। ধনদ্বারাই অন্ন সংগৃহীত হয়। [ধন ধান্য সমার্থক]

এর পরের শ্লোকে মহর্ষি বলেছেন: আদিত্যো হ বৈ প্রাণো রয়িরেব চন্দ্রমাঃ, রয়ির্বা এতৎ সর্বং যন্মূর্তং চামূর্তং চ, তস্মান্মূর্তিরেব রয়িঃ। —আদিত্যই প্রাণ, চন্দ্রমাই রয়ি। (এই জগতে) যা কিছু মূর্ত ও অমূর্ত, সবই রয়ি। তবে প্রধানতঃ মূর্ত সকল বস্তুই রয়ি। আচার্য শঙ্কর লিখেছেন, বায়ু অমূর্ত হয়েও জীবের ভোগ্য বস্তু বিধায় রয়িকে মূর্ত ও অমূর্ত বলতে হয় বটে, কিন্তু মুখ্যতঃ প্রায় সমুদয় সৃষ্ট অমূর্ত বস্তু 'প্রাণে'র পর্যায়েই পড়ে এবং সকল মূর্ত বস্তু 'রয়ি'র অন্তর্ভুক্ত।

প্রাণ যে কতদূর সর্বাত্মক ও ব্যাপক, তা পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে বলা হয়েছে। এই ভোক্তা প্রাণই বৈশ্বানর, বিশ্বরূপ এবং সর্বাত্মক বলে প্রাণ অগ্নিস্বরূপ এবং সূর্যকে প্রজাগণের প্রাণস্বরূপ বলা হয়েছে।

সর্বাত্মক সৃষ্টি সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ১।৮ থেকে ১।১২ এই ৫টি শ্লোকের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি:

> সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ
> ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
> *　　　*　　　*
> ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
> সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ॥

ভোক্তা ও ভোগ্য, প্রাণ ও রয়িকে অক্ষর ও ক্ষর, অব্যক্ত ও ব্যক্ত, ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্ররূপে শাস্ত্রে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন উঠেছে—চন্দ্রের ন্যায় আদিত্যও মূর্ত, তবে আদিত্যকে অমূর্ত প্রাণের প্রধান উৎস বলা হয় কেন? এই ত্রিভুবনের প্রসবিতা সুমহান্ আদিত্য প্রাণ-তরঙ্গে পরিপূর্ণ। ঋষি পরবর্তী (প্রশ্ন ১।৬) শ্লোকে বলেছেন: রাত্রি শেষ হয়েছে, ঐ দেখ—আদিত্য উঠছে—প্রাচী, প্রতীচী, দক্ষিণ, উত্তর, ঊর্ধ্ব, অধঃ প্রভৃতি দশদিকে 'প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে'—প্রাণ রশ্মি ধারণ ক'রে আছেন। সৌর মণ্ডলের সমুদয় জড় ও চৈতন্য শক্তি ঐ 'ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে কর্মদায়িনে' সূর্যকে প্রণাম। সূর্যমণ্ডল থেকে বিরাট বিশ্বজগতের প্রতি অণুপরমাণুর অন্তরে প্রতিক্ষণে

স্পন্দিত ও প্রবাহিত হচ্ছে। যে জড় শক্তি পৃথিব্যাদি গ্রহমণ্ডলী ও তদন্তর্গত সমস্ত পদার্থকে স্থিত চালিত ও অনুপ্রাণিত ক'রে আছে আদিত্যদেবের স্থূল শরীরই তার উৎস, আর সূর্যদেবের সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর থেকে ইচ্ছা-ক্রিয়া-জ্ঞান এবং হ্লাদিনী শক্তি অবিরাম জীব-জগতে প্রবাহিত হচ্ছে। ঈশোপনিষদের ১৬ শ্লোকে ঋষি প্রার্থনাতে জানাচ্ছেন : হে পূষন্, একর্ষে, পরম জ্ঞানস্বরূপ সূর্য, আপনার তেজ ও রশ্মি সংযত করুন, যেন আমি আপনার কল্যাণতম রূপ দেখি। 'যোঽসাবসৌ পুরুষঃ 'সোঽহমস্মি'—আপনার মধ্যে যে পুরুষ আছেন আমি সেই, আমার মধ্যেও তিনি আছেন। গায়ত্রী-মন্ত্র সবিতৃদেবের বরণীয় ভর্গকে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরয়িতা বলা হয়েছে। অতএব 'আদিত্য হ বৈ প্রাণঃ' ঠিকই বলা হয়েছে।

প্রশ্নোপনিষদের দ্বিতীয় প্রশ্ন : ভগবন্, কতি এব দেবাঃ প্রজান্ বিধারয়ন্তে, কতর এতৎ প্রকাশয়ন্তে, কঃ পুনরেষাং বরিষ্ঠ ইতি? উত্তরে মহর্ষি বললেন : আকাশই প্রধান দেব। আকাশ থেকে বায়ু, অগ্নি, অপ্, পৃথিবী, বাক্য, মন, চক্ষু, শ্রোত্র, এই সব দেবতা এক সময়ে অভিমানপূর্বক আপন আপন শক্তি প্রকট ক'রে প্রত্যেকেই বলতে লাগলেন, 'এই শরীরকে আশ্রয় দিয়ে আমি ধারণ ক'রে রেখেছি।'

[আকাশাদি পঞ্চভূত কার্যস্বরূপ, আর ভোগসাধন ইন্দ্রিয়গণ করণস্বরূপ। অধিদেবতারা করণগুলিকে স্ফূর্তি প্রদান করেন এবং প্রকাশনে সাহায্য করেন। বুদ্ধির অধিদেবতা ব্রহ্মা অহংকারের রুদ্র, মনের চন্দ্র, চক্ষুর সূর্য, শ্রোত্রের দিক, ত্বকের বায়ু, বাগিন্দ্রিয়ের অগ্নি, পাণির ইন্দ্র, পাদের বিষ্ণু, পায়ুর মৃত্যু এবং উপস্থের দেবতা প্রজাপতি।]

মহর্ষি পিপ্পলাদ এক রূপকের সাহায্যে এই এই দেবগণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তাই নির্মমভাবে প্রমাণ ক'রে দিলেন। পূর্বোক্ত অধিদেবগণ যখন বিবাদে প্রবৃত্ত, তখন বরিষ্ঠ প্রাণ তাঁদের বললেন, 'আপনারা অজ্ঞতাবশে বৃথাই কলহ করছেন। সত্য কথা এই : মহাশয়দের মধ্যে কেহ এই দেহকে ধারণ বা রক্ষা করেন না। আমি নিজেকে পঞ্চধা বিভক্ত ক'রে সারা দেহ ধারণ ও রক্ষা করি।' প্রাণের এই বাক্য শুনেও অধিদেবগণ তাঁকে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতে থাকেন এবং প্রাণের উক্তি তাঁরা বিশ্বাস করলেন না। প্রাণ তখন নিজ প্রভাব দেখাবার জন্য যেন অভিমান-ভরে দেহ ছেড়ে ঊর্ধ্ব উৎক্রমণে উদ্যত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকল দেবতা ত্রস্ত উৎখাত হয়ে দেহের বাহিরে আসতে বাধ্য হলেন। অতঃপর প্রাণ দেহে পুনঃপ্রবেশ করলে তাঁরাও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হন। প্রাণের মহিমা দেখে দেবতারা বিস্মিত হয়ে এইরূপে তাঁর গুণগান করতে লাগলেন :

এই প্রাণই অগ্নিরূপে প্রজ্বলিত হন ও তাপ প্রদান করেন, সূর্যরূপে প্রকাশিত আছেন, মেঘাকারে বর্ষণ করেন ও ইন্দ্ররূপে প্রজা পালন করেন। এই প্রাণই আবহ-প্রবাহস্বরূপ বায়ু, ইনিই পৃথিবীকে ধারণ ক'রে আছেন এবং রয়িরূপে সমস্ত জগৎকে পোষণ করেন। কেহ এখানে রয়ি শব্দে স্থূলভূত অর্থ করেছেন। এই প্রাণ সৎ (মূর্ত), অসৎ (অমূর্ত) ও অমৃত। কেহ প্রাণকে সদসৎ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অমৃত অর্থাৎ পরমাত্মা-স্বরূপ বলছেন। অধিক কি—'রথনাভৌ অরা (শলাকা) ইব' সমস্তই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত আছে। তুমি সর্বাত্মক, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় তোমার জন্য বলি (ভোগ্য বস্তু) আহরণ করেন। যজ্ঞীয় দ্রব্যাদির শ্রেষ্ঠ বাহকও তুমি। স্বীয় শক্তি-বলে তুমি জগৎ-সংহারক রুদ্র। হে প্রাণ, তোমার যে তনু বাক্যে শ্রোত্রে চক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত, যা মনে ব্যাপ্ত (সন্তত) আছে তা কল্যাণময় কর। তুমি উৎক্রমণ ক'র না। শেষে ঋষি বলেছেন, দৃশ্যমান জগৎ, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, সমস্তই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত ও প্রাণের বশে আছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি প্রাণের সর্বাত্মক ও ব্যাপক অস্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আকাশাদি পঞ্চ মূলভূত ও পঞ্চীকৃত স্থূলভূত—সব কিছু প্রাণ-সমুদ্রে নিমজ্জিত, প্রাণ-তরঙ্গে লীলায়িত। সূর্য, বায়ু, গ্রহ, নক্ষত্র, স্থাবর, জঙ্গম—সারা বিশ্ব প্রাণে জারিত। বিশ্বের সৃজন, পালন ও সংহার প্রকৃত পক্ষে প্রাণেরই ক্রিয়া। জগতের সকল শক্তির আধার এই প্রাণ। মাধ্যাকর্ষণ, চুম্বক-শক্তি, বায়ুর গতি, সূর্যের রেডিয়েশন, মেঘের বর্ষণ, তড়িতের ঝিকিমিকি, তথা শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ সমস্তই প্রাণের তরঙ্গ-ভঙ্গি, বিবিধ বিচিত্র বিকাশ মাত্র। রাজযোগে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন: যোগী জানেন, প্রাণকে জয় করিতে পারিলে জগতের সকল শক্তিই তাঁর আয়ত্তে আসে।

বিরাট প্রাণের স্তুতির পরে মহর্ষি উপনিষদের প্রধান প্রতিপাদ্য অক্ষর-ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা জ্ঞাপন ক'রে এই প্রসঙ্গ শেষ করেছেন,—'বিজ্ঞানাত্মা সমস্ত ভূত, ইন্দ্রিয়, দেবতা, প্রাণ—সব কিছু অক্ষরে আশ্রিত: এই তত্ত্ব যিনি জানেন, হে সৌম্য! তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হন।'

প্রশ্নোপনিষদের তৃতীয় প্রশ্ন: সমষ্টি-প্রাণের প্রসঙ্গ শেষ ক'রে এবার ব্যষ্টি-দেহে প্রাণের উৎপত্তি প্রবেশ ও অবস্থানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি বলছেন: হাত-পা-মাথাযুক্ত মানুষের যেমন দেহনিমিত্ত ছায়া উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ব্রহ্মে এই প্রাণতত্ত্ব আতত। মানস সংকল্প (মনোকৃতেন) দ্বারা সম্পাদিত কর্মানুসারে ছায়ার ন্যায় ইহা জীবদেহে প্রবেশ করে। মুখ্যপ্রাণ নিজে পঞ্চধা বিভক্ত হয়ে দেহের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ কার্যে নিযুক্ত আছেন। চক্ষু-শ্রোত্র-মুখ-নাসিকাতে প্রাণ, পায়ু ও উপস্থে অপান, দেহের মধ্যস্থানে সমান (হুতং অন্নং সমং নয়তি), সমস্ত স্নায়ু-মণ্ডলীতে ব্যান এবং সুষুম্না-নাড়ীতে উদান-বায়ু বিচরণ করে। শ্বাসপ্রশ্বাস সঞ্চালন প্রাণের ক্রিয়া। মল-মূত্রাদি নিঃসরণ অপানের ক্রিয়া। অন্নরস এবং রক্তপ্রবাহ দেহমধ্যে সমভাবে সর্বত্র চালিত করাই সমান-বায়ুর ক্রিয়া। দেহের যাবতীয় স্নায়ুমণ্ডলীতে বিচরণশীল ব্যান-বায়ু স্নায়বিক ক্রিয়া নিয়মিত করে। উপনিষদের বহু মন্ত্রে হৃদয়গুহা মধ্যে জীবাত্মার অবস্থান বর্ণিত আছে। এই কেন্দ্র থেকে একশত এক (১০১) প্রধান নাড়ী নির্গত হয়েছে, তার মধ্যে সুষুম্না নামে একটি ঊর্ধ্বগামিনী নাড়ীমধ্যে উদান-বায়ু পদতল হতে মস্তক পর্যন্ত বিচরণ করে। এই বায়ুই সারা দেহের উষ্ণতা রক্ষা করে ও ঠাণ্ডা হতে দেয় না। শ্রুতি বলেন, প্রয়াণকালে উদান বায়ু লিঙ্গশরীরকে শুভাশুভ কর্মানুসারে পুণ্য বা পাপলোকে অথবা মনুষ্যলোকে নিয়ে যায়। উদান-বায়ুর আর এক নিত্যক্রিয়া সম্বন্ধে শ্রুতিতে উল্লেখ আছে যে ইহা জীব-মাত্রকেই সুষুপ্তিকালে অহরহ 'ব্রহ্ম গময়তি' অর্থাৎ ক্ষণেকের জন্য নিজ স্বরূপ দর্শন করায়।*

মহর্ষি অষ্টম শ্লোকে পঞ্চপ্রাণের অধিদেবতার বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন: আদিত্য প্রাণের অধি-দেবতা, পৃথ্বীদেবতা অপানকে নিয়ন্ত্রিত করেন, আকাশস্থ বায়ু সমানের অধিকর্তা, বহির্জগতের বায়ু ব্যানের কর্তা এবং তেজ উদান-বায়ুর অধিদেবতা।

ছান্দোগ্যোপনিষদের ৩৯।১০ শ্লোকে বলা হয়েছে: মরণকালে ইন্দ্রিয়-বৃত্তিগুলি ক্ষীণ হয়, মুখ্যপ্রাণের বৃত্তিই শেষ পর্যন্ত বর্তমান থাকে। মুখ্যপ্রাণ উদান-বায়ুর তেজের সহিত সংযুক্ত হয়ে জীবাত্মার সঙ্গে মিশে যায়। অবশেষে প্রশ্নোপনিষদের ৩।১২ শ্লোকের ভাষ্যানু-

* উদ্বোধন, পৌষ '৬৪ 'স্বপ্ন সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মত' প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

বাদে পূর্বের সমস্ত উক্তির সংক্ষিপ্তসার লিখেছেন। —প্রাণের 'উৎপত্তি', অর্থাৎ পরমাত্মা থেকে জন্ম, 'আয়তি' অর্থাৎ মনঃসংকল্পিত দেহে আগমন, 'স্থান' অর্থাৎ দেহে পঞ্চধা বিভক্ত প্রাণের অবস্থান এবং 'অধ্যাত্ম' অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে আদিত্যাদি অধিদেবরূপে অবস্থান বর্ণনা করেছেন।

* * *

পাশ্চাত্য মনীষীরা প্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে কি মত পোষণ করেন, এখন সংক্ষেপে তাই লিখছি।

Origin of Life (জীবনের উৎপত্তি) সম্বন্ধে Prof J. B S Haldane (অধ্যাপক হ্যাল্ডেন) সকল মতবাদকে প্রধানতঃ চার শ্রেণীতে ভাগ ক'রে বলেছেন যে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী একত্র বিচার করা চলে।

১। Life has no origin, Matter and Life have always existed. —প্রাণের উদ্ভবের প্রশ্নই ওঠে না, কারণ প্রাণ এবং জড়বস্তু সর্বদাই বিদ্যমান আছে। অনন্ত খগোলমণ্ডলী মধ্যে যখন কোন গ্রহ জীবের বাসোপযোগী হয়, তখন আকাশ থেকে জীব-বীজ তার মধ্যে উপ্ত হয়। এই বীজ Spores (কীটাণুর বীজাঙ্কুর) দ্বারা আদিম লতাপাতার ক্ষুদ্রাংশ হতে পারে এবং তা মহাজাগতিক বিকীরণ চাপ (radiation pressure) দ্বারা অথবা কোন চেতন দিব্যপুরুষ (Intelligent Being) দ্বারা গ্রহে স্থাপিত হতেও পারে।

২। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহির্ভূত কোন অলৌকিক প্রক্রিয়া দ্বারা এই পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে।

৩। প্রাণের উদ্ভবের উৎস হ'ল রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া, ক্রমবিকাশের পন্থায় অত্যন্ত ধীরে ধীরে তা সাধিত হয়েছে।

৪। যথেষ্ট সময়, সুযোগ, জড়বস্তু ও রাসায়নিক সংযোগের সম্ভাবনা যদি ঘটে, তাহলে প্রাণের উৎপত্তি সম্ভব হতে পারে।

প্রথম মতবাদ সম্বন্ধে হ্যাল্ডেন বলেন যে উপস্থিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক থেকে তাঁর মনে হয়, এই অসীম অনন্ত বিশ্বের কোন আদি নেই। এই বিশ্বের কোন না কোন অংশে অনাদিকাল থেকে সৃষ্টিক্রিয়া চলেছে। অতএব নূতন কোন গ্রহে সৃজন-বিষয়ে কল্পনার অবকাশ নেই। অধ্যাপক Gold, Boyd, Hoc প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বলেছেন, প্রাণ ও জড়বস্তু অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। নূতন নূতন জড়বস্তুর সৃষ্টি এই শূন্য আকাশ থেকেই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

দ্বিতীয় মতবাদ সম্বন্ধে হ্যাল্ডেন লিখেছেন যে প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ মতবাদ যদি একেবারে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় তবেই বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বে (Genesis) অথবা অন্যান্য দিব্যপ্রকাশে (Revelation) লিখিত—পরমেশ্বরের আজ্ঞায় সৃষ্টি বা তদ্রূপ ব্যাখ্যা মেনে নেওয়া যেতে পারে।

তৃতীয় ও চতুর্থ মতবাদ সম্বন্ধে হ্যাল্ডেন লিখেছেন যে Bernal, Pringle, Pirie প্রভৃতি মনীষী মনে করেন যে এক সময় যন্ত্র-মানুষ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। যতদিন পণ্ডিতেরা এই অসাধ্য সাধন না করছেন, ততদিন তাঁরা ঐ কল্পনা নিয়ে থাকুন। তবে রাসায়নিকরা ও জীবতত্ত্ববিদেরা আজকাল এমন কতকগুলি নূতন তথ্য প্রকাশ করেছেন যা আমাদের ঋষিদের অনুভূতির সঙ্গে সুন্দর ভাবে মিলে যায়।

হ্যাল্ডেন লিখেছেন : প্রোটোজোয়ার ন্যায় অতি ক্ষুদ্র প্রাণীও তার অভিজ্ঞতার দ্বারা আবশ্যক মতো ক্রিয়াকলাপ পরিবর্তন করে। যাদের আমরা জড় বা অজৈব বস্তু বলি, হ্যাল্ডেন তাদের মধ্যেও প্রাণ-চেষ্টা দেখেছেন। কেবল প্রাণ ক্রিয়া নয়, প্রজনন-লক্ষণও দেখেছেন এবং বলেছেন যে ভবিষ্যৎ প্রাণিতত্ত্ববিদেরা হয়তো

প্রতি অণু-পরমাণুকেই জীবন্ত প্রাণী ব'লে প্রমাণ করবেন। এ পর্যন্ত আমরা নিশ্চিত প্রমাণ করেছি যে আবরণযুক্ত সমস্ত পরমাণুপুঞ্জে প্রাণ ও প্রজনন-শক্তি বিদ্যমান আছে।

সম্প্রতি রুশ বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন যে সূর্যকিরণে প্লাবিত আকাশ প্রাণ-তরঙ্গের উৎস। তাঁরা চতুর্থ কৃত্রিম উপগ্রহে কিছু প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ (আদিম জৈব উপাদান) পাঠাচ্ছেন। উহা (cosmic rays bombardment) ব্যোমাকাশের জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর অসংখ্য রশ্মিকণ অবিরাম বিস্ফোরণে উদ্ভূত প্রাণ-তরঙ্গ দ্বারা জীবন লাভ করবে। কৃত্রিম গ্রহটিতে রক্ষিত রাডার যন্ত্রের সাহায্যে প্রোটোপ্লাজ্‌মে প্রাণপঙ্কের সংকেতধ্বনি শোনা যাবে। তাঁদের মতে প্রাণের origin (উদ্ভব) অন্যত্র সন্ধানের আর আবশ্যকতা থাকবে না। মেরুপ্রদেশের অরোরা বোরিয়েলিসই কস্‌মিক রে-তে পরিপূর্ণ।

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন:

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥

যখন জড় ও অজড় বস্তু মাত্র উৎপন্ন হয়, তাহা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগে ঘটছে জানবে। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের ছায়াস্বরূপ ক্ষেত্রে প্রকৃতিতে সর্বদাই সংযুক্ত আছে, অর্থাৎ প্রাণশক্তি ক্ষেত্রকে প্রকাশিত ও অনুপ্রাণিত ক'রে রেখেছে।

কার্বন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি অজৈব বস্তু প্রোটোপ্লাজ্‌মের উদরে গিয়া অহরহ জৈব বস্তুতে রূপান্তরিত হচ্ছে। এও প্রমাণিত হয়েছে যে সদ্যোমৃত দেহের কোষাণুসকল যদি সময় মত তাজা খাদ্য পায় তবে তারাও জীবনের লক্ষণ দেখায়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বলছেন: সৃষ্ট যাবতীয় বস্তুর আদিম অবস্থা অ্যাটম্। এই অচিন্তনীয় অ্যাটমের রূপ দেওয়া হয়েছে তিন রকমের তড়িৎ-কণা, প্রোটন-নিউট্রন-ইলেক্ট্রন-যুক্ত আদিকণ। প্রোটন হ'ল পজিটিভ (ধনাত্মক), ইলেকট্রন নেগেটিভ (ঋণাত্মক) এবং নিউট্রন পজিটিভও নয়, নেগেটিভও নয়—নিউট্রাল। কল্পনা করা হয় যে এক জোড়া প্রোটন ও এক জোড়া নিউট্রন মিলে এক কেন্দ্রাণু (নিউক্লিয়াস) তৈরী হয়, যাকে ঘিরে বিদ্যুদ্‌গতিতে কতিপয় ইলেকট্রন পৃথক্ পৃথক্ কক্ষে ঘূর্ণ্যমান। সূর্যকে কেন্দ্র ক'রে গ্রহগুলি যেমন ঘুরছে, নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র ক'রে ইলেকট্রনরা সেই রকম বৃত্তাকারে নিয়ত ঘুরছে। অতএব প্রাণশক্তিই সকল সৃষ্টবস্তুতে বিদ্যমান। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের শেষ কথা, নিছক matter (জড়বস্তু) বলিয়া কিছুই নাই, বিশ্লেষণে শেষ পর্যন্ত ইহা তড়িৎ-সমষ্টি মাত্র, force বা প্রাণ-তরঙ্গ।

আচার্য বিবেকানন্দ তাঁর রাজযোগ-গ্রন্থে—আকাশ, প্রাণ ও প্রাণায়াম সম্বন্ধে তাঁর উপলব্ধি সরল ও মনোজ্ঞ ভাষায় বর্ণনা করেছেন, কিছু উদ্ধৃত করলাম: আকাশ এই জগতের কারণীভূত অনন্ত সর্বব্যাপী মূল পদার্থ, প্রাণ জগৎ উৎপত্তির কারণীভূত অনন্ত সর্বব্যাপিনী বিকাশিনী শক্তি। [“তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।’ (শ্বেতাশ্বতর ১৷৩)] এই প্রাণ গতিরূপে, মাধ্যাকর্ষণরূপে, স্নায়বীয় শক্তির প্রবাহরূপে, চিন্তাশক্তি, দৈহিক মানসিক আত্মিক—সর্বশক্তির মূল-রূপে অবস্থিত। যখন অস্তি-ভাব বা নাস্তি-ভাব কিছুই ছিল না, যখন তমর দ্বারা তম আবৃত ছিল, তখন এই আকাশ, গতিশূন্য অবস্থায় ছিল। তখন সমস্ত শক্তি শান্তভাব ধারণ করিয়া অব্যক্ত ভাবে বিরাজ করে। পরবর্তী কল্পে আকাশ হইতে পরিদৃশ্যমান সাকার সমস্ত বস্তু উৎপন্ন হয়, এবং প্রাণ নানা

প্রকার শক্তিরূপে পরিণত ও প্রবাহিত হইয়া থাকে। সমুদয় প্রাণীর জীবনী শক্তি এই প্রাণ। মনোবৃত্তি ইহার সূক্ষ্মতম ও উচ্চতম অভিব্যক্তি। অনত্র স্বামীজী বলেছেন : মনে কর কোন স্রোতস্বিনীতে লক্ষ লক্ষ আবর্ত রহিয়াছে। প্রত্যেক আবর্তে প্রতিমুহূর্তে নূতন জলস্রোত আসিতেছে, কিছুক্ষণ ঘুরিতেছে, আবার চলিয়া যাইতেছে। ইহাই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কাহিনী।

ভক্ত কবি বিদ্যাপতি গেয়েছেন :

কত চতুরানন, মরি মরি যাওত,
　　　　ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমাওত,
　　　　সাগর-লহরী সমানা॥

প্রাণায়াম প্রসঙ্গে স্বামীজী লিখেছেন : যে শক্তি স্নায়ুমণ্ডলীর ভিতর দিয়ে বুকের খাঁচা ও মাংসপেশীদের আকুঞ্চন, প্রসারণ দ্বারা ফুসফুসদ্বয়কে কার্যে সঞ্চালিত করছে, তাই প্রাণ। সমষ্টি-জগতে যেমন প্রাণের ব্যক্ত ও অব্যক্তের কথা পূর্বে বলা হয়েছে, ব্যষ্টি-জীবের মধ্যেও কতকগুলি প্রাণশক্তি অব্যক্ত ভাবে আছে। যোগ অভ্যাসের দ্বারা যোগী সেগুলিকে নিজের আয়ত্তে আনেন।

শারীর-বিজ্ঞানীরা মৃতবৎ দেহে প্রাণ কত সময় থাকতে পারে তার বিচারকালে—জলে-ডোবা বা সাপে-কাটা অথবা তাড়িতাহত,শকে অভিভূত মৃতবৎ শরীরে দুই তিন চার ঘণ্টা পরে প্রাণের সঞ্চার দেখে কার্য-কারণ নির্ণয় করতে পারেননি। এখনও হঠযোগীরা বায়ুহীন কাচের বা কাষ্ঠের ঘরে সপ্তাহের অধিক কাল অবস্থানের পর জীবিত অবস্থায় ফিরে আসেন, কি উপায়ে তাদের স্তম্ভিত দেহ-যন্ত্র অক্সিজেন না নিয়ে সুস্থাবস্থায় ফিরে আসে, এও এক প্রহেলিকা

দেহলী *

'বৈভব'

বাতাস যখন ক্লান্ত
সমুদ্র তখন শান্ত।
মন স্থির হয়—বিপুদল রণে ভঙ্গ দিলে।
বৃথা গর্ব, বৃথা মায়া অনিত্য বিষয়ে,
নিত্য শুধু—ধ্বংস অবসান।

মমতার মেঘমায়া আচ্ছন্ন করিয়াছিল যৌবনের মন,
লুকায়ে রাখিয়াছিল সংসারের বিরাট শূন্যতা,
আজ, এত দিনে দেখিতেছি তাই।

　　　　অন্ধকার বদ্ধ কারা এ দেহ-কুটির—
জীর্ণ ভগ্ন, আজ তাই অনন্তের আলোরেখা
　　　　পশিছে অন্তরে।
দুর্বলতা—সবল করিছে মোরে,
জ্ঞানবৃদ্ধ ধীরে ধীরে চলিতেছি আপন আলয়ে
　　পুরাতন বাসা ছাড়ি। নূতনের উন্মুক্ত দুয়ারে—
　　সমগ্র দৃষ্টিতে আজ উদ্ভাসিত দুখানি জগৎ।

* Waller-এর Threshold কবিতাটির ভাবানুবাদ।

'সমানা হৃদয়ানি বঃ'

শ্রীনরেশচন্দ্র মজুমদার

কিছুদিন আগে ঔরঙ্গাবাদে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় আচার্য বিনোবা ভাবে প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। গত সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল দেখিলেই বোঝা যায়, ভারতে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব ক্রমশঃ কমিতেছে। কিন্তু নানা ঘটনা দেখিয়া আশঙ্কা হয় প্রাদেশিকতা বাড়িতেছে, আন্তঃ-প্রাদেশিক সংহতি গড়িয়া উঠিতেছে না।

অতীত যুগের ভারতবর্ষে বহু স্ব-স্ব-প্রধান রাজ্য ছিল এবং ভারতীয় ঐক্যবোধ রাজনীতি-ক্ষেত্রে দানা বাঁধে নাই একথা সত্য, কিন্তু ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অখণ্ড ভারত-চেতনা ছিল অপূর্ব ও শাশ্বত। ভাষা ও আচার-ব্যবহারের বিচিত্রতা সত্ত্বেও বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠী মহামানবের এই সাগরতীরে একদেহে বিলীন হইয়াছে। পরবর্তী যুগে সেমিটিক ভাবের প্রবলতা-হেতু পূর্বোক্ত জাতীয় ঐক্য ব্যাহত হইতে শুরু করিয়াছে, কিন্তু বিভেদের তলদেশে সমন্বয়ের ফল্গুধারা চিরকাল বহিয়া চলিয়াছে।

ভারতধর্ম সহিষ্ণু ও স্থিতিস্থাপক বলিয়াই ঘাতসহ ও মৃত্যুঞ্জয়। ইহা চিরপুরাতন ও চির-নূতন। যুগে যুগে তাহার বাহিরের গঠনের কিছু কিছু পরিবর্তন হইয়া আসিয়াছে বটে,কিন্তু তাহার অন্তঃস্রাবী প্রাণরসের ধারা অপরিবর্তনীয়। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৩ই আষাঢ় তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় ভারতধর্ম ও চীনধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন: ভারতবর্ষের মূলমন্ত্র হচ্ছে—একধারে বিচারের পথ দিয়ে আর একদিকে অনুভূতির পথ দিয়ে এক অবাঙ্মনসো-গোচর শাশ্বত সত্তা সম্বন্ধে আস্থাশীলতা।

বর্তমান ভারতবর্ষের গণমানসের অবচেতন স্তরে ভারতের প্রাণধর্মের বিকার ঘটে নাই। বহু কারণের সমবায়ে সচেতন শিক্ষিত সমাজ আজ বিক্ষুব্ধ ও অশান্ত। বর্তমান যুগের বস্তুতান্ত্রিকতা ভারতের তপস্যা ও ত্যাগের আদর্শকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। স্বার্থ-সংঘাত ও কোলাহলের ইহাই প্রধান কারণ। দেশের সম্পদের উপর বিপুল জনসংখ্যার কিন্তু সম্পদবৃদ্ধির উৎসাহ গতানু-গতিক ধারায় কাজ করিয়া গেলে দেশের দারিদ্র্য দূর হয় না, পরন্তু অভাবগ্রস্ত দেশে নিত্য কলহ ও অশান্তি লাগিয়া থাকে। এই মহাজাতি গঠনের জন্য সম্পদবৃদ্ধির বিরাট সমবেত উদ্যোগ ছিল অপরিহার্য, কিন্তু কোথায় সে উদ্যোগের প্রচণ্ড গতিবেগ?

পশ্চিমের মানুষের কর্মিষ্ঠতা না পাইলেও ভোগের অনুকরণে আমাদের অনেক বুদ্ধিজীবী তাহাদের অগ্রগামী। তাঁহারা ভারতধর্মকে অস্বী-কার করেন অথবা ইহার উপযোগিতা চ্যালেঞ্জ করেন। কয়েক সহস্র বৎসরে ভারতধর্ম বহু চ্যালেঞ্জ সহ্য করিয়াও জাজ্বল্যমান, এবারের চ্যালেঞ্জেও ইহা দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। বিদেশী সাম্রাজ্য-বাদের প্লাস্টারে জোড়াতালি দেওয়া আব্রহ্ম-বেলুচিস্থান অখণ্ড ভারত এবং শতেক শতাব্দীর প্রাণরসে পুষ্ট মহাভারত এক বস্তু নহে। প্লাস্টার-লাগানো অখণ্ড ভারত ইতোমধ্যেই ত্রিখণ্ডিত হইয়াছে। বৃহত্তম যে খণ্ডটি আমরা পাইয়াছি বিলাতী প্লাস্টারের মেরামতিতে তাহার অখণ্ডতা বহাল রাখার এবং শুধু বিলাতী গণতন্ত্রে তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিলে বাস্তব পরিস্থিতির নির্মম আঘাতে একদিন জাগ্রত হইতে হইবে।

ভারতধর্মের অন্তঃস্রাবী অমৃতধারা আকুমারিকা-হিমাচল ভারতের সমস্ত শিরা উপশিরায় প্রবাহিত হইবে, তবেই ভাবময় মহাভারতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইবে। তা বলিয়া আমরা চলমান জগতের পিছনে পড়িয়া থাকিব না, রক্ষণশীলতার প্রাচীর তুলিব না, কারণ সময়ানুযায়ী প্রগতির সাথে সাথে অগ্রসর হওয়াই ভারতধর্মের বৈশিষ্ট্য, তবে প্রগতিকে এই দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী রূপ দিতে হইবে।

ভারতের বিশাল জনতা মহাজাতি হিসাবে সচেতন নয়, কিন্তু ভারত ধর্মে অবিচল। এই কারণেই খণ্ডিত ভারত এখনও অখণ্ড আছে। বিজাতীয় ভাববিকার গণমানসে পরিব্যাপ্ত হইলে অবস্থা শোচনীয় হইত। ভারতীয় ধ্যানধারণার মূর্তবিগ্রহ কোনও মহাপুরুষের নেতৃত্বেই ভারতের জনতা কল্যাণচেতনা লাভ করিতে পারে। সৌভাগ্যক্রমে বহু মহামানবের শুভ আবির্ভাবে সম্প্রতি এরূপ নেতৃত্বই জাতি পাইয়াছিল। সেবাধর্মী বহু কর্মী রাজনীতি হইতে দূরে থাকিয়া বহুবিধ কর্মধারায় জাতির জীবনে রসসিঞ্চন করিয়া চলিয়াছেন। জাতিকে সুপথে পরিচালিত করিবার ক্ষমতা বর্তমানে তাঁহাদেরই বেশী। তাঁহাদের বর্তমান কর্মধারাই একার্যে সুপ্রশস্ত। জাতি যদি ইঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলে তবে সকল সমস্যা ও গণ্ডগোলের মীমাংসা হয়। কিন্তু হায়, একদিকে গতানুগতিকতা অপর দিকে উৎকেন্দ্রিকতা জাতিকে পাইয়া বসিয়াছে। সমাজের প্রায় সকল ক্ষেত্রে রাজনীতির অনুপ্রবেশ স্বার্থসংঘাত-বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। অতীত যুগের ভারতে সর্বগ্রাসী প্রতিযোগিতা-পরায়ণ রাজনীতি ছিল না। ইহা এ যুগের রীতি। এরূপ অবস্থা হইতে পরিত্রাণের উপায় চিন্তনীয়। 'একজাতি একপ্রাণ একতা'—শুধু গানে না থাকিয়া কিভাবে মনে সঞ্চারিত হয়—তাহারই উপায় চিন্তনীয়।

আন্তর্জাতিক চেতনাবৃদ্ধির আত্মপ্রসাদ আমাদের অনেকে অনুভব করেন এবং জাতীয়তার আতিশয্যকে সঙ্কীর্ণতা আখ্যা দেন। জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় না হইলে কোনও আন্তর্জাতিক সংস্থায় আমাদের সম্মানের আসন থাকিতে পারে না। ভারত-মন্ত্র বিস্মৃত হইয়া বিশ্ব-মন্ত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ বলেন : যে আপন ঘরকে অস্বীকার করে, কখনই বিশ্ব তাহার দ্বারে আতিথ্য গ্রহণ করিতে আসে না। নিজের পদরক্ষার স্থানটুকু পরিত্যাগ করার দ্বারা যে চরাচরের বিরাট ক্ষেত্রকে অধিকার করা যায়, একথা কখনই শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না।

এই মহাজাতি যেদিন আত্মস্থ হইবে এবং ভারতধর্মকে আপন অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে, যেদিন সে যথার্থ ভারতবাসী হইবে সেদিন প্রাদেশিকতার অভিশাপ থাকিবে না। সেদিন সে যথার্থ আন্তর্জাতিক হইবারও অধিকার অর্জন করিবে।

সংজ্ঞানসূক্তম্

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে ॥
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥

[ঋগ্বেদ, ১০।১৯১।২—৪]

মহাপ্রভু-চরণে সনাতন

শ্রীমতী সুধা সেন

পিতৃমাতৃহীন দুরন্ত কালো ছেলেটিকে বড় বেশী ভালোবাসেন সনাতন, এক মুহূর্ত ছাড়িয়া থাকিবার উপায় নাই। বহু দুঃখে, বহু সাধ্য-সাধনায় ঘরের ছেলেকে পর করিয়া পরের ছেলেটিকে ঘরে আনিয়া রাখিয়াছেন সনাতন। —আনিয়াছেন না নিজেই ধরা দিয়াছে ছেলে, সাধ্যসাধনায় কি সে আসে?

বৃন্দাবনে মথুর চৌবে ও তাঁহার পত্নী এতদিন যাহাকে পুত্রাধিক স্নেহে পালন করিলেন, তাঁহাদের ছাড়িয়া আসিতে এতটুকু কষ্ট হয় নাই ছেলের। ছেলের নাম মদনমোহন, সনাতন মাধুকরীতে যাইতেন, আর অপলক চোখে তাকাইয়া দেখিতেন, কালো ছেলের রূপের আলোয় চোখ ভরিয়া যাইত।

চৌবের স্ত্রীর নিয়ম ছিল না, আচার ছিল না, ছিল শুধু অগাধ অপ্রাকৃত মাতৃস্নেহ, বক্ষের পরম-ধনের সেবায় আবার আচার নিয়ম কি? এই আচারবিহীন সেবা সনাতনের ভালো লাগে নাই, তিনি আচার শিক্ষা দিতে গেলেন, কিন্তু দেখিলেন সেই আচারবিহীন নিবেদিত অন্নই চৌবের সহিত একত্র বসিয়া ভোজন করিতেছেন তাঁহাদের বালগোপাল,—মদনমোহন।

চৌবে-গৃহিণীকে স্তুতি করিয়া সেই মহাপ্রসাদ অঞ্জলি ভরিয়া লইয়া সনাতন মাথায় মাখিলেন। কিন্তু চৌবে-দম্পতির এত স্নেহ, এত প্রেম—কিছুই গোপালকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না, রাত্রে সনাতনকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন, 'আমাকে তুমি লইয়া যাও, শুধু জল-তুলসী দিয়াই সেবা করিও, আর কিছুই চাই না আমি।' চৌবের স্ত্রীর কাছে বায়না ধরিলেন—'আমাকে সনাতনের হাতে দিয়া দাও।'

পরদিন উজ্জ্বল মধুময় হইয়া সনাতনের প্রভাত উদিত হইল, কিন্তু চৌবে-গৃহিণীর দিগন্ত গভীর কালো অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল। সনাতন আসিলে চৌবে-পত্নী বলিলেন—'লও, লও গোঁসাই, আমার জীবনসর্বস্ব ধনকে তুমিই লইয়া যাও। আমি তো জানি সে যাইবেই, তাহার যে এমনি স্বভাব। অভাগিনী যশোদা বুকের অমৃত দিয়া যাহাকে এত বড় করিলেন, যে নয়নের মণিকে না দেখিয়া তিনি একদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিতেন না, মুহূর্তে তাঁহারই বুকে শেল বিঁধাইয়া সে যখন চলিয়া যাইতে পারিল, তখন আমাকে ছাড়িয়া যাইবে—সে আর বেশী কথা কি? সে যায় যাক্,—সহ্য করিতে না পারি, যমুনায় তো জলের অভাব নাই আমি ডুবিয়া মরিব।

অঝোর-ঝরা অশ্রুধারায় অভিষিক্ত করিয়া গোপালকে আনিয়া মাতা সনাতনের হাতে দিলেন, হৃষ্ট প্রফুল্ল মুখে চলিয়া গেলেন মদনমোহন। উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করিয়া অচেতন হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন মাতা, গোপাল ফিরিয়াও চাহিলেন না একবার।

এখন আসিয়াছেন সনাতনের গৃহে, কিন্তু কি আছে আজ তাঁহার? অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী আজ পথের ভিখারী। না চাহিতে যেটুকু পান সনাতন—তাহাই সযত্নে আনিয়া ধরেন ছেলের সম্মুখে, অবশেষটুকু গ্রহণ করেন নিজে।

আজ মিলিয়াছে শুধু দুইটি শুষ্ক রুটি—ছেলের সম্মুখে লবণবিহীন রুটি দুইখানি ধরিয়া দিয়া বসিয়া রহিলেন ধ্যানস্থ সনাতন।

'গোঁসাই। গোঁসাই গো। ও সনাতন।' অভিমানে রুদ্ধ কিশোর-কণ্ঠ ডাকিয়া উঠিল,—

'দেখ তো, এই শুষ্ক দু'টি রুটি, একটু লবণ পর্যন্ত নাই, কেমন করিয়া খাই আমি ?'

চমকিত হইয়া সনাতন চোখ খুলিলেন— আহা রে! ক্ষীরসরননী-খাওয়া কোমল মুখখানি ম্লান হইয়া গিয়াছে, শুষ্ক রুটি যেন গলায় আটকাইয়া যাইতেছে। সনাতনের চোখে আসিল অশ্রু।—না, কাল হইতে একটুখানি শুধু লবণ ভিক্ষা করিয়া আনিয়া দিবেন তিনি।

রুটির সঙ্গে লবণ যুক্ত হইল। কিন্তু আবার আরম্ভ হইল ছেলের দৌরাত্ম্য—একটু ভাজা তরকারি ছাড়া শুধু নুন-রুটি আর কয়দিন খাওয়া যায়, সনাতন কি এইটুকু চেষ্টা করিতে পারেন না ?

সনাতন রাগ করিলেন—না বাপু! আজ তরকারি, কাল দুধ, পরশু ক্ষীর—কোথায় পাইব আমি ? রাজভোগ খাইয়া তোমার অভ্যাস। তবে আসিয়াছ কেন দরিদ্রের ঘরে ? পার তো নিজে যোগাড় করিয়া খাও।

অভিমানে ঘা লাগিল ছেলের, যোগাড় কি আর করিতে পারি না ? তুমিই তো ছাড়িয়া দাও না, ঘরে রাখিয়াছ বাঁধিয়া ?

উপযুক্ত ছেলে! ঘরের ভাত কেনই বা খাইবেন ? রাজভোগের যোগাড় হইল। শেঠের লবণের নৌকা যমুনার চড়ায় তিনদিন যাবৎ ঠেকিয়া আছে—কত চেষ্টা, কত শ্রম, সবই ব্যর্থ—নৌকা চলে না। শেঠজী আসিয়া পড়িলেন সনাতনের পায়ে—উপায় বল গোঁসাই, দয়া কর। সনাতন বলিলেন—উপায়ের আমি কি জানি ? ঐ ঘরে আছেন মদনমোহন—তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা কর, ঠিক উপায় বলিয়া দিবেন তিনি।

শেঠজী দেখিলেন—কথা কন না, হাসিভরা উজ্জ্বল চোখে তাকাইয়া আছেন মদনমোহন—কালো ছেলে নয়, কালো পাথরের মূর্তি। লুটাইয়া পড়িলেন শেঠজী। আমাকে উদ্ধার কর এইবার—ফিরিবার পথে লাভের সমস্ত ধন দিয়া প্রতিষ্ঠা করিব তোমার মন্দির।

নৌকা চলিল, ব্যবসাতে লাভ হইল প্রচুর। ফিরিবার পথে সমস্ত উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিলেন শেঠজী। ভোগ-আরতির ঘণ্টা বাজে, দুই বেলা রাজভোগ খান মদনমোহন, কিন্তু তবু কি যেন ফাঁক থাকিয়া যায়।

সম্মুখে নিবেদিত রাজভোগের থালা,—দূরে বসিয়া সনাতন—আবার ডাকে ছেলে—"ও সনাতন! ও বুড়ো ?" "কি, আবার কি ?" বিরক্ত হইলেন সনাতন। কোমল দুইটি বাহু আসিয়া সনাতনের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল, "এই রাজভোগ ভালো লাগে না আমার। দাও না আমাকে দু'টি তোমার সেই রুটি ?"

হাসিয়া কাঁদিয়া সনাতন অস্থির হইলেন—হায় রে অবোধ! রাজভোগ ভালো লাগিল না তোমার, ভালো লাগিবে শুষ্ক রুটি ?

* * *

কিন্তু কোথায় চাহিয়া-লওয়া শুষ্ক রুটি, কোথায় বা সনাতন ? বৃন্দাবনের অখ্যাত কুটীরে বসিয়া নীলাচলের দিকে চাহিয়া আছেন মদনমোহন, কবে আসিবেন সনাতন ?—তারপর হইবে তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠা। —ঝারিখণ্ডের দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া নীলাচলে হরিদাসের কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন সনাতন। কিছুক্ষণ পরেই প্রভু আসিলেন, সনাতন প্রভুর পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন।

তৃষিত হৃদয়ে প্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন করেন, সনাতনের কণ্ডুর ক্লেদ প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগে, কোনও বাধা প্রভু মানেন না। সনাতনের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়—প্রভুর পায়ে লোক দেয় চন্দন অগুরু ফুল, আর আমি দিই আমার অঙ্গের পূতিগন্ধময় ক্লেদ। সনাতন স্থির করিলেন

রথের চাকার নীচে প্রাণ বিসর্জন করিবেন, কি হইবে এই দেহ দিয়া, যাহা প্রভুর সেবায় লাগিবে না কোনও দিন ?

গোপন সঙ্কল্প মনের কোণেই রহিল, কেহ জানিবে না—ভাবিলেন সনাতন।

প্রভু আসিয়া ডাকিলেন, সনাতন! কেহ যদি কাহাকেও একটি জিনিস দান করে—সে কি তাহা আবার ফিরাইয়া লয়, না কি লওয়াই তাহার উচিত ?

সনাতন জানেন না এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য কি, বলিলেন, না, না প্রভু! সে কি হয় ?

'তবে ?'—করুণ ব্যাকুল স্বরে সনাতনের হাত দুইটি ধরিয়া প্রভু বলিলেন, 'আমাকে সমর্পিত তোমার এই দেহ তুমি ত্যাগ করিতে চাও কেমন করিয়া ?'

সনাতন চমকিত হইলেন। প্রভু বলিলেন, সনাতন দেহত্যাগে কৃষ্ণলাভ হয় না, তাই যদি হইত তবে এইক্ষণে আমি কোটি দেহ ত্যাগ করিতাম।

বিস্মিত হরিদাস-ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া প্রভু বলিলেন—দেখ তো হরিদাস। কি অন্যায়, আমার জিনিস নষ্ট করিবার অধিকার ইহার কোথা হইতে হইল ?

প্রভু সনাতনের হাত দুইটি নিয়া নিজের মাথায় রাখিলেন—বলো সনাতন, আমাকে কথা দাও, কৃষ্ণ-সেবার এই দেহ তুমি কিছুতেই নষ্ট করিবে না ? ভক্তের দেহ চিন্ময়, তাহাতে সতত কৃষ্ণের অধিষ্ঠান, পাছে তাহা ভুলিয়া যাই—পাছে ঘৃণা করি, তাই কৃষ্ণ তোমার দেহে এই কণ্ডু সৃষ্টি করিয়াছেন, আমার অহঙ্কার চূর্ণ করিবার জন্যই কৃষ্ণ এই ছল পাতিয়াছেন।

রথের চাকার নীচে প্রাণ ত্যাগ করা হইল না। সনাতন পণ্ডিত জগদানন্দের পরামর্শ চাহিলেন। জগদানন্দ প্রভুর সেবক, প্রভুর সুখেই তাঁহার সুখ। সনাতনের অঙ্গের ক্লেদ প্রভুর অঙ্গে লাগে ইহা পণ্ডিতের ভালো লাগে না, তাই সনাতনকে তিনি বৃন্দাবন ফিরিয়া যাওয়ার পরামর্শ দিলেন।

সন্তুষ্ট মনে সনাতন যখন প্রভুকে এই কথা নিবেদন করিলেন, প্রভু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—'কালিকার বটুয়া জগা বয়সে নবীন'—সে তোমার মতো মান্য পণ্ডিতকেও উপদেশ দিতে সাহস করে।

সনাতন ক্ষুব্ধ হইলেন, বলিলেন, প্রভু! আজ বুঝিলাম জগদানন্দের সৌভাগ্যের সীমা নাই এবং আমার দুর্ভাগ্যের কথাও বুঝিলাম। জগদানন্দ তোমার অন্তরঙ্গ, তাই—

'জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা সুধাধারে,
মোরে পিয়াও গৌরব-স্তুতি নিম্বনিসিন্দা-সারে।'

প্রভু ধরা পড়িয়া লজ্জিত হইলেন, বলিলেন : —না, না সনাতন, তুমি কখনই আমার পর নও—তুমিও আমারই, কিন্তু মর্যাদা-লঙ্ঘন আমি সহ্য করিতে পারিব না।

সনাতনের আর তখন বৃন্দাবন যাওয়া হইল না।

জ্যৈষ্ঠ মাস। প্রখর রৌদ্রতপ্ত বেলা-ভূমির অগ্নিসম বালুকারাশির উপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন সনাতন—প্রভুর আহ্বানে যজ্ঞেশ্বর টোটায়। পায়ে ব্রণ হইয়াছে—অঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণাময় কণ্ডু, মাথার উপর জ্বলন্ত সূর্য কিন্তু সনাতনের ভ্রূক্ষেপ নাই—আসিয়া উপস্থিত হইলেন প্রভুর দরজায়। কিছুক্ষণ সুস্থ হইবার অবকাশ দিয়া প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ পথে আসিলে সনাতন ?

—সমুদ্রপথে।

'কেন ?' প্রভু বলিলেন, সিংহ-দরজার ছায়া-শীতল পথ ছাড়িয়া তপ্ত বালুকাপথে কেন আসিলে ?

সঙ্কোচে সনাতন কহিলেন, যে পথে ভক্তেরা চলেন, ঠাকুরের সেবকেরা চলেন, সে পথে আমার মতো নীচের পদস্পর্শ লাগিবে কেমন করিয়া ?

প্রসন্ন আনন্দোজ্জ্বল মুখে প্রভু উঠিয়া গিয়া আলিঙ্গন করিলেন সনাতনকে—বলিলেন, তুমি নীচ নও, তোমার দেহ অপবিত্র নয়, তবুও যে তুমি ভক্তের মর্যাদা রক্ষা কর—সে কেবল তুমি ভক্তোত্তম বলিয়া।

সনাতনের হৃদয় ভরিয়া উঠিল আনন্দ-সুধা-রসে—দেহ হইয়া উঠিল ক্লেদমুক্ত সমুজ্জ্বল। বৎসর কাল সনাতনকে নিজের কাছে রাখিলেন প্রভু—তারপর বিদায় দিলেন—বৃন্দাবনে মদন-মোহন যে প্রতীক্ষা করিতেছেন সনাতনের।

'পরমধন সে পরশমণি যা চাবি তাই দিতে পারে,
কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাছদুয়ারে।'

এই পরশমণির স্পর্শে সোনা হইয়া বৃন্দাবনে চলিলেন সনাতন—বৃন্দাবনের তরুলতা শাখা দোলাইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল, কত ফুল ঝরিয়া পড়িল মাথায়। মদনমোহনের চোখের স্নিগ্ধ প্রসন্ন আলো আসিয়া ছুঁইয়া গেল সনাতনের ললাট।

যমুনাতীরে কুড়াইয়া-পাওয়া স্পর্শমণি গৌর-চিন্তামণির জ্যোতির কাছে ম্লান, তুচ্ছাতিতুচ্ছ হইয়া গেল—অবহেলায় ফেলিয়া রাখিলেন বালুর মধ্যে, অক্লেশে দান করিলেন ব্রাহ্মণ জীবনকে।

ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইলেন—কী সেই পরমধন, যাহার কাছে স্পর্শমণিও তুচ্ছ ?

ধীরে ধীরে চিন্তিত ব্রাহ্মণ উঠিয়া গেলেন সনাতনের কাছে, প্রার্থনা করিলেন—

'যে ধনে হইয়া ধনী　মণিরে মান না মণি,
　　তাহারি খানিক,
মাগি আমি নতশিরে।'　এত বলি নদী-নীরে,
　　ফেলিল মাণিক।

ঐশ্বর্য এমনি করিয়াই বারে বারে তুচ্ছ হয়, বারে বারেই প্রেম তাহাকে এমনি করিয়াই লজ্জা দেয়।

নদীয়ার চাঁদ

বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

পূর্ণিমা চাঁদ আঁকা ধরণীর গায়,
প্রেমঘন গোরা রায় এল নদীয়ায়।
নিখিলের মাধুরী কি মূরতি ধরি'
ধরায় বাঁধিল এসে প্রেমের তরী ?
কলতানে বয়ে যেতে সাগরপানে
অহেতুক-করুণার ভরা-প্লাবনে
শঙ্খধবল-ধারা জাহ্নবী কি
নিশ্চল হ'ল, প্রেম-পরশ লভি' ?
শতেক চাঁদের আলো চরণে লোটে,
পাগল-করানো হাসি বদনে ফোটে।
পথ চলে হরি-প্রেমে আপনহারা,
ঝর ঝর ঝরে পড়ে নয়নে ধারা।

জীব-দুঃখে কেঁদে গোরা কূল নাহি পায়,
পতিত, কাঙালে ডেকে কোলে তুলে নেয়।
যেথা তার শ্রীচরণ পরশ করে
হরিনাম-সুধা যেন মূরতি ধরে,
আনন্দ লুটে লুটে পড়ে চারিধার
নীরবে পরশ করে হৃদয় সবার,
যত তাপ, চিরতরে যায় রে থেমে,
শীতল আলোক আসে পরাণে নেমে।
নদীয়ার পথে পথে বান ডেকে যায়,
লাজ কুল ভুলে লোক সাথে সাথে ধায়।
তাহারে হেরিয়া ধরা ধন্য মানে
ধন্য ভকতদল তাঁহারি ধ্যানে।

ত্রয়ী

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

আমাদের প্রাচীন ঋষিরা আবেগ-ভরে এক দিন বলেছিলেন :

অতোঽপি দেবা ইচ্ছন্তি জন্ম ভারত-ভূতলে।
সঞ্চিতুং সুমহৎ পুণ্যমক্ষয্যমমলং শুভম্॥
(শ্রীমদ্ভাগবত—৫-১৯)

অর্থাৎ স্বয়ং দেবতারাও সুমহৎ অক্ষয় অমল শুভ পুণ্য সঞ্চয় করার জন্য ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হন।

সত্যই অপূর্ব পুণ্যভূমি আমাদের এই মাতৃ-ভূমি ভারতবর্ষ। এই পবিত্র দেশে যুগে যুগে অসংখ্য মুনি-ঋষি, জ্ঞানী-গুণী, ভক্ত-সাধকই যে কেবল আবির্ভূত হয়েছেন বিশ্ব-তমঃ দূর করবার জন্য, তাই নয়—সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং শ্রীভগবানই বারংবার ফিরে ফিরে এসেছেন এই পুণ্যভূমিতে ধরণীর ভার লঘু করবার জন্য। কিন্তু তিনি তো কোন দিন একাকী আসেননি, সর্বদাই সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছেন শক্তিস্বরূপিণী জগজ্জননীকে, প্রাণ-প্রতিম লীলাসহচরগণকে। এরই একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ দেখে আমরা ধন্য হয়েছি শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদামণি এবং শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের যুগপৎ আবির্ভাবের মধ্যে! শ্রীশ্রীঠাকুরের অমৃত জীবন-উৎস শতধারে উচ্ছলিত হয়ে উঠেছিল তাঁর শত শত ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দের মধ্যে। এঁদেরই মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধারা স্বামীজী এবং শ্রীশ্রীমা তাঁদেরই সকলকে ধারণ ক'রে, সংহত ক'রে প্রবাহিত করিয়ে দিয়েছিলেন এক মহানদীরূপে, যা চিরকাল এই সংসার-মরুভূমিকে শীতল ও সরস ক'রে রাখবে, নিঃসন্দেহ। এরূপ ত্রয়ীর সম্মেলন জগতের ইতিহাসে নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের যে অনুপম সাধনা ও ভাবধারা এইভাবে স্বামীজীর মধ্যে বিকাশ ও শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে পূর্ণস্থিতি লাভ করেছিল, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা অতি দুরূহ কার্য, এবং প্রকৃতকল্পে নুনের পুতুলীর সাগরের জল মাপতে যাওয়ার মতোই শ্রীশ্রীঠাকুরকে উপলব্ধি করার প্রচেষ্টাও আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানুষের পক্ষে হাস্যকর। তা সত্ত্বেও দু'এক কথায় বলতে গেলে বলা চলে যে, পুণ্যভূমি ভারতের পুণ্যশ্লোক ঋষিদের ন্যায়ই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল—সাম্য, ঐক্য, সমন্বয় ও সামঞ্জস্য।

একদিন মানব-সভ্যতার প্রথম ঊষাগমে, ভারতের তপোবন ধ্বনিত ক'রে উত্থিত হয়েছিল এক মহামিলন-গীতি 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এ সব কিছুই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই জীবজগৎ, সেজন্য মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, ধর্মে ধর্মে কোন বিরোধ নেই। বর্তমান জড়বাদী যন্ত্র-সভ্যতার যুগের প্রারম্ভেও শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতের এই শাশ্বত ঐক্য-মন্ত্রই পুনরায় ধ্বনিত করেছিলেন মধুরতম স্বরে। কিন্তু তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে উপনিষদ্ বা বেদান্তের সেই নিগূঢ়তম অদ্বৈতবাদকেও তিনি অতি সহজ সরল সুমিষ্ট ভাষায় সাধারণের উপযোগী ও মনোমত ক'রে, বহু সুবোধ্য উপমার সাহায্যে জনসমাজে প্রকাশিত করেন। যথা—তাঁর বিশ্ববিশ্রুত 'যত মত, তত পথ' এই মতবাদের একটি উদাহরণ দিয়ে তিনি বলছেন :

'যেমন ছাদে উঠতে গেলে মই, সিঁড়ি, বাঁশ, দড়ি প্রভৃতি নানা উপায়ে ওঠা যায়, ঠিক তেমনি

সেই একই ঈশ্বরের কাছে যাবার নানা উপায় আছে—প্রত্যেকটি ধর্ম সেই উপায়।'

আর একটি সহজতর উপমা দিয়ে তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ সরস ভঙ্গীতে বলছেন:

'যেমন গৃহস্থের বাড়ী একটা বড় মাছ এলে কেউ ঝোল করে, কেউ ভাজে, কেউ তেল-হলুদ দিয়ে চচ্চড়ি করে, কেউ বা ভাতে দিয়ে বা অম্বল ক'রে খায়, ঠিক তেমনি সকলেই নিজের নিজের শক্তি ও রুচি অনুসারে সেই একই ঈশ্বরের পূজা করছে।'

এই ভাবে, সর্বসাধনসিদ্ধ, সর্বধর্মসমন্বয়-দ্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণ উদ্বোধন করেছিলেন এক উদার মধুর সমন্বয়-যুগের, এবং সত্যই হতে পেরেছিলেন মনীষী রোমা রোঁলার ভাষায়, 'The consummation of two thousand years of spiritual life of three hundred millions of people, great symphony composed of the thousand voices and the thousand faiths of mankind'—তেত্রিশকোটি ভারত-বাসীর দু'হাজার বৎসরের আধ্যাত্মিক জীবনের শ্রেষ্ঠ বিকাশ, বিশ্বমানবের কোটি কণ্ঠের ও সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত। ভারতের—তথা জগতের ধর্ম-সাধনার ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রথম দান: সর্বধর্মসমন্বয়ের মহাবাণী 'যত মত, তত পথে'র নির্দেশ।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই নব সর্বসমন্বয়-ধর্মের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এর সর্ব-জনীনত্ব, অথবা উচ্চ-নীচ পণ্ডিত-মূর্খ নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণ—সকলকেই ক্রোড়ে স্থান দান। সাধারণতঃ দেখা যায় যে একটি বিশেষ ধর্মের তত্ত্বের দিক্ থেকে এবং সেই সঙ্গে ব্যবহার বা আচারানুষ্ঠান, ক্রিয়াকলাপের দিক থেকেও কয়েকটি স্থির অলঙ্ঘ্য নিয়ম থাকে। যাঁরা এই সকল তত্ত্ব গ্রহণ ও আচার পালন করেন না, তাঁদের সেই ধর্মেও স্থান নেই, তাঁরা ধর্মত্যাগী, ধর্ম-বহির্ভূত, পাপী, অবিশ্বাসী, নরক-যোগ্য জীবমাত্র, স্বর্গ বা মোক্ষ তাঁদের জন্য নয়। কিন্তু হিন্দুধর্মের, ভারতীয় ধর্মের পরিধি এরূপ সঙ্কীর্ণ নয়, উপরন্তু সর্বব্যাপী, এই ধর্মে অধি-কারিভেদানুসারে সকলেরই সমান স্থান, সমান গৌরব। যেমন, খৃষ্টান ইস্লাম প্রমুখ নিরাকার-বাদী ধর্মে সাকারোপাসকের কোনরূপ স্থানই নেই। কিন্তু ভারতীয় ধর্মানুসারে—যিনি গাছ পাথর প্রভৃতির পূজা করছেন, যিনি ভূত পূজা করছেন, যিনি সাকার প্রতিমার পূজা করছেন, যিনি নিরাকার ব্রহ্মের মানস পূজা করছেন, তাঁরা সকলেই ভক্ত, বিশ্বাসী ও ধার্মিক, যদি তাঁদের সত্যই ভক্তি ও বিশ্বাস থাকে। এই তো হ'ল প্রকৃত ও একমাত্র সর্বজনীন ধর্ম, সমাজের উচ্চ থেকে নীচ পর্যন্ত এর মঙ্গলময় বিস্তৃতি, কেহই এর স্নেহাঞ্চলচ্ছায়া থেকে বঞ্চিত নন। একই ভাবে—করুণাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ আপামর জন-সাধারণ সকলকেই সমান আদরে বুকে টেনে নিয়ে তাঁর নূতন সমন্বয়-ধর্মের, সর্বজনীন ধর্মের নূতন আশার বাণী শুনিয়ে বললেন:

'ঈশ্বর এক, কিন্তু তাঁর অনন্ত নাম ও অনন্ত ভাব। যার যে নামে ও যে ভাবে ডাকতে ভাল লাগে, সে সেই নামে ও সেই ভাবে ডাকলেই তাঁর দেখা পায়।'

ভারতীয় ধর্মসাধনার ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ দান: ধর্মকে পণ্ডিতদের ও আচারানুরাগিগণের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতেই আবদ্ধ না রেখে, তাকে সগৌরবে স্থাপন করা বিশ্বচিত্ত-শতদলের মর্মমূলে—বীজকোষে, অথবা জীবন-রাজপথের উন্মুক্ত অবাধ কেন্দ্রস্থলে।

ভারতীয় ধর্ম-সাধনার ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণের তৃতীয় শ্রেষ্ঠ দান হ'ল—সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়ত্বের ভিত্তিতেই তাঁর এই নব সমন্বয়-ধর্মের, সর্বজনীন

ধর্মের স্থাপন। পাশ্চাত্য সভ্যতার ভারতবর্ষে প্রথম আগমনের সেই যুগসন্ধিক্ষণে, দেশের জ্ঞানি-গুণী প্রায় সকলেই খৃষ্টানধর্ম দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, ইস্‌লাম-ধর্মের প্রভাবও তখন অনেক ক্ষেত্রেই ছিল। কিন্তু অন্যান্য ধর্মের সাধনা-প্রণালী অবলম্বনে সর্বধর্ম-সমন্বয়ের মর্মোত্থ সত্য পূর্ণভাবে উপলব্ধি করলেও শ্রীরামকৃষ্ণের নিজস্ব মূল সাধন ও সিদ্ধি ছিল সম্পূর্ণরূপেই ভারতীয়। শ্রীঅরবিন্দের অনিন্দ্য ভাষায়, 'He was a self-illumined mystic and ecstatic, without a single trace or touch of the foreign thought or education upon him'—তিনি ছিলেন স্বীয় আলোকে প্রদীপ্ত মরমী, ভাবোন্মত্ত সাধক, যাঁর মধ্যে বিদেশী ভাবধারা ও শিক্ষার কোন চিহ্নমাত্র ছিল না।

এরূপে ভারতের—তথা জগতের ধর্মসাধনার ইতিহাসে তত্ত্বের দিক্ থেকে, শ্রীরামকৃষ্ণের এই তিনটি মহাদান: সর্বধর্মসমন্বয়, সর্বজনীন ধর্মপ্রতিষ্ঠা ও সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় ধর্ম প্রবর্তন—আমাদের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্পদ্‌রূপেই অনন্ত কাল বিরাজ করবে,—নিঃসন্দেহ।

ব্যবহারের দিক্ থেকে, এই তিন তত্ত্বের সমন্বয়ে আমরা পেয়েছি শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অপূর্ব 'জীবশিব-বাদ'। বস্তুতঃ, আমাদের ভারতীয় শাস্ত্রানুসারেই, তত্ত্বের দিক্ থেকে যা বিশ্বাত্মবাদ—ব্যবহারের দিক্ থেকে তাই বিশ্বমৈত্রীবাদ। কারণ, সর্বজীবই যদি ঈশ্বর হয় তবে জীব-সেবাই তো ঈশ্বর-সেবা, সেজন্যই আমাদের প্রাচীন ঋষিরা একদিন সগৌরবে ঘোষণা করে-ছিলেন: জীবঃ শিবঃ, শিবো জীবঃ, স জীবঃ কেবলং শিবঃ।—জীবই স্বয়ং শিব, শিবই স্বয়ং জীব, এই জীব শিব ব্যতীত আর কিছুই নন।

একই ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণও বলেছিলেন, 'জীব শিব'। সাধারণতঃ আমাদের নীতি-গ্রন্থে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, জীবে দয়া করবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দয়ার কোন প্রশ্নই এ-স্থলে নেই, যেহেতু প্রত্যেক জীবই ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্মকে কে দয়া করতে সাহসী হবেন? সেজন্য, জীবে দয়া নয়, জীবে সেবা, জীবে শ্রদ্ধা, জীবে প্রেম—এই তো সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি-তত্ত্ব।

ভারতের শাশ্বত সংস্কৃতির মূর্ত প্রতিচ্ছবি, ভারতাত্মার পূর্ণ প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণের অনুপম জীবন-সাধনার তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক দিক্ সম্বন্ধে অতি সামান্য দু'এক কথা বলা হ'ল।

আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই অতুলনীয় সাধনা কেবল তাঁর মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে ছিল না, পূর্ণতমভাবে বিকশিত হয়েছিল শ্রীশ্রীমা সারদামণি ও যুগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য জীবনে। একের প্রকাশ তিনে, তিনের সমাহার একে। বস্তুতঃ তিন বিরাট ব্যক্তিত্বের এরূপ অপূর্ব সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে আর দ্বিতীয় নেই।

ভারতীয় সভ্যতার লীলাভূমি যজ্ঞক্ষেত্রে ঋগ্বেদের ছন্দোময় মন্ত্র, যজুর্বেদের কর্মমূলক বাক্য, ও সামবেদের মধুর গীতি—একই তত্ত্বের প্রপঞ্চনা ক'রে, একত্রে সম্মিলিত হয়ে উত্থিত হ'ত একই পরমদেবতার উদ্দেশ্যে। একই ভাবে—আধুনিক ভারতের ঋগ্‌মন্ত্ররূপী শ্রীরামকৃষ্ণ, যজুর্বাক্যরূপী স্বামী বিবেকানন্দ ও সামসঙ্গীতরূপিণী শ্রীসারদা-মণির সাধনাও একই তানে ও লয়ে ঝঙ্কৃত হয়ে বিশ্ববাসীকে ধন্য করেছে। পুনরায় রূপক অর্থে বলতে গেলে বলা চলে যে—জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি, সত্য-শিব-সুন্দর, সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ ধর্মের এই ত্রিবেণী-ধারার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন জ্ঞান, স্বামী বিবেকানন্দ কর্ম, শ্রীশ্রীমা ভক্তি, শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন 'সত্য', স্বামী বিবেকানন্দ 'শিব', শ্রীশ্রীমা 'সুন্দর', শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন 'সৎ', স্বামী বিবেকানন্দ 'চিৎ' এবং শ্রীশ্রীমা 'আনন্দ'।

স্বামীজী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ বার্তাবহ বা পরমদূত। এরূপে—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের অপূর্ব 'জ্ঞান'কে তিনি 'কর্ম' বা অসংখ্য ব্যাখ্যা, আলোচনা, ভাষণ, রচনা প্রভৃতির মাধ্যমে দেশে বিদেশে বিস্তৃত করেছিলেন জগদ্বাসীর অশেষ হিতের জন্য। একই ভাবে—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের পরম সত্যকেও তিনি 'শিব' বা শিবস্বর, ক্ষেমময় ও সেবামূলক নিষ্কাম কর্মের দ্বারা প্রমাণিত করেছিলেন। পরিশেষে, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের 'সৎ' বা শাশ্বত সত্তাকে তিনি 'চিৎ' বা সাক্ষাৎ উপলব্ধির মাধ্যমে স্থায়িভাবে ধরে নিয়েছিলেন নিজের জীবনে, অন্যদের জীবনেও তা ধরে দিয়েছিলেন সমভাবে।

কিন্তু শ্রীশ্রীমার কার্য ছিল ভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের 'জ্ঞান,' 'সত্য', 'সৎ' বা সত্তার প্রচার বা প্রমাণের কোন প্রয়োজন তাঁর ছিল না, যেহেতু তিনি স্বয়ংই ছিলেন এ-সকলের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি, মূর্ত প্রতিচ্ছবি। তবে তিনি কি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ছায়ামাত্র—পুনরাবৃত্তি মাত্র? না তা নয়—কেবলমাত্র ছায়ারূপে, কেবলমাত্র পুনরাবৃত্তিরূপে তিনি আবির্ভূতা হননি, কারণ তার তো বিশেষ প্রয়োজন নেই। তিনি আবির্ভূতা হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অচিন্তনীয় অনির্বচনীয় সত্তাকে সহজতম, কোমলতম করতে মধুরতমরূপে বিশ্বসমক্ষে, প্রকাশিত করতে, তাঁকে সকলের নিকট সহজবোধ্য করতে, আপামর জনসাধারণ সকলেরই নিকট তাঁকে এনে দিতে, বিশ্বের প্রত্যেকের ঘরে নিজস্ব প্রাণের নিধিরূপে তাঁকে স্থাপিত করতে। সেইজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ 'জ্ঞান', শ্রীশ্রীমা 'ভক্তি'। জ্ঞান সকলের জন্য নয়, মুষ্টিমেয় প্রখরবুদ্ধি-সম্পন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্যই কেবল। কিন্তু ভক্তি পণ্ডিত-মূর্খ উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকলেরই জন্য—সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। শ্রীশ্রীমা এই ভাবে ছিলেন সকলেরই ঘরের জন, দূরের ঠাকুরকে তিনিই তো ঘরে ঘরে প্রিয়তম ক'রে দিয়েছিলেন। একই কারণে শ্রীরামকৃষ্ণ 'সত্য', শ্রীশ্রীমা 'সুন্দর'। 'কেবল' সত্যকে ধরা ছোঁয়া যায় না, 'কেবল' সত্যের রূপ নেই, 'কেবল' সত্য নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিষ্ক্রিয়, নিরাকার, নিরঞ্জন। কিন্তু সুন্দরের আবেদন সর্বজনীন, যা সুন্দর তা অতি সহজে, অতি মধুরভাবে, কোন বিশেষ প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের অপেক্ষা না রেখে, অনায়াসে সকলের অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশ ক'রে স্থায়ী আসন লাভ করে। আমাদের জীবনে শ্রীশ্রীমায়ের প্রবেশ তো এই একই ভাবে। নীরূপ ঠাকুরের সুন্দরস্বরূপ শ্রীশ্রীমা আমাদের আহ্বানের অপেক্ষা না রেখেই তো বিরাজ করছেন আমাদের চিত্তশতদলে বিশ্ব-সৌন্দর্যের অধীশ্বরী বিশ্বমনোহারিণী লক্ষ্মী-রূপে, আমরা তাঁকে জানি বা না জানি, চিনি বা না চিনি, তিনি তো সর্বদাই আছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তর্নিহিত সমস্ত শক্তিকে সৌন্দর্যরূপে, সমস্ত ঐশ্বর্যকে মাধুর্যরূপে প্রকাশিত ক'রে। পরিশেষে সেই একই কারণে—শ্রীরামকৃষ্ণ 'সৎ', শ্রীশ্রীমা 'আনন্দ'। সৎ বা সত্তা কেবল জ্ঞানের বিষয়, ধারণার বস্তু, কিন্তু আনন্দ প্রাণের বিষয়, প্রেরণার বস্তু। সৎ নির্বিকার, সাধারণ সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বে, কিন্তু আনন্দ আমাদের সাধারণ জীবনেরই শ্রেষ্ঠ ধন, পরমকাম্য প্রাণের তন্ত্রীতে আমাদের ঝঙ্কারই তো ধ্বনিত হয় মধুরতম, উদাত্ততম সুরে। বিশ্বের মনোবীণাতে এই মধুরমোহন, ললিতলোভন, কমল-কোমল ঝঙ্কারই তো শ্রীশ্রীমা, আনন্দস্বরূপ ঠাকুরের যে অন্তর্নিহিত আনন্দ আমাদের নিকটে আবৃত হয়েছিল তাঁর প্রখর তেজের আলোকে, তাকেই শ্রীশ্রীমা প্রকাশিত করেছিলেন সকলের জন্য—তাঁর নিজের রসঘন, অমৃতবর্ষী, আনন্দোজ্জ্বল জীবন দ্বারা।

এরূপে—শ্রীরামকৃষ্ণ অনন্ত, অখণ্ড সত্তা, শাশ্বত, স্বয়ংসম্পূর্ণ স্থিতি, পরম পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা। স্বামী বিবেকানন্দ সেই স্থিতিকে গতিশীল ক'রে তুললেন বাইরের বিস্তৃতিতে। প্রকাশ লীলায়িত হয়ে উঠল প্রচারে, প্রজ্ঞা প্রাণ পেল সেবাধর্মে—নিষ্কাম কর্মে, সাধন সার্থক হয়ে উঠল সাধক-সঙ্ঘের স্থাপনে। পরিশেষে শ্রীশ্রীমা স্থিতি ও গতিকে, প্রকাশ ও প্রচারকে, জ্ঞান ও কর্মকে, সত্য ও শিবকে, সৎ ও চিৎকে সমন্বিত ক'রে উদ্‌ভাসিতা হলেন এক অপরূপ ভক্তিনম্রা, ভাবঘনা, সৌন্দর্যময়ী, আনন্দময়ী মূর্তিতে—শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সমস্ত সাধনার আরম্ভ ও শেষ, মূল ও লক্ষ্য, শক্তি ও প্রেরণা, ঋদ্ধি ও সিদ্ধিরূপে।

দর্শনের দিক্ থেকে, তন্ত্রের দিক্ থেকে শক্তি ও শক্তিমান্ নিশ্চয়ই অভিন্ন। কিন্তু জীবনের দিক্ থেকে, অনুভূতির দিক্ থেকে শক্তি যদি শক্তিমান্‌কেও অতিক্রম ক'রে যায়, তাতেই বা ক্ষতি কি? কারণ স্বয়ং ঠাকুরই কি বলেননি, "ও কি যে সে? ও সারদা, ও আমার শক্তি॥" সারদা সার-স্বরূপিণী—সার-দায়িনী।

মাধ্যাকর্ষণ

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

পাখী উড়ে যায় আকাশে ঊর্ধ্বে, শাখীও উড়তে চায়,
মাটি টেনে রাখে, মর্মর-রবে করে তাই হায় হায়।
জল উড়ে যায় উপরে বাষ্পাকারে,
তপন শুধুই হাতছানি দেয় তারে।
ওঠে অম্বরে বহ্নির শিখা ধূমময় রূপ ধ'রে—
অথবা খধূপে স্ফোরকের রূপে। মানুষ বিমানে চ'ড়ে
যত দূর পারে মেঘের ওপারে ধায়।
ঝরা পাতা সেও ধরা ছেড়ে ওঠে বৈশাখী ঝঞ্ঝায়।

এই উত্থানে 'ওঠা' তো বলা না চলে,
সকলেই নেমে আসে পুন ধরাতলে।
অনিবার্য যে ধরণী মাতার টান,
পতনেরই তরে সকল সমুত্থান।

মানুষ তো ম'রে যায়,
জ্ঞানিগণ বলে, আত্মাটি তার ঊর্ধ্বের পানে ধায়।
হারায় তারে যে, সে কোন আশায় আকাশেরই দিকে চায়?
তারায় তারায় বৃথা খুঁজে তায়—আর করে হায় হায়।
'আত্মা' যদিই থাকে, আর যদি হয় পার্থিব ধন,
কেমনে এড়াবে এই ধরণীর নাড়ীর আকর্ষণ?

সপ্তবিধ অনুপপত্তি খণ্ডন

[অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিকর্তৃক আক্ষিপ্ত অবিদ্যার সপ্তবিধ অনুপপত্তির পরিহার]

ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য

বহু প্রাচীন কাল হইতেই অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে দ্বৈতবাদিগণের আক্ষেপ যেমন চলিয়া আসিতেছে, অদ্বৈতমতেও বিরোধিপক্ষ খণ্ডন করিয়া সেইরূপ বহুলভাবে স্বমতস্থাপনের প্রচেষ্টা প্রচলিত। মহামতি আচার্য রামানুজ স্বকৃত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রতিপাদক শ্রীভাষ্যে অদ্বৈতবাদের তত্ত্বসিদ্ধির অনুকূল 'মায়া'র প্রবল প্রতিপক্ষরূপে উত্থিত হইয়া সপ্ত প্রকার অনুপপত্তি প্রদর্শন পূর্বক মায়াবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদিগণও এই সপ্তবিধ অনুপপত্তির খণ্ডন কিভাবে করিয়াছেন তাহাই অতি সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে বর্ণিত হইতেছে।

প্রথম : বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের পূর্বপক্ষ—অবিদ্যার আশ্রয়ত্ব-অনুপপত্তি

অবিদ্যার খণ্ডন-প্রসঙ্গে প্রথমে আচার্য রামানুজ বলিয়াছেন : ব্রহ্মস্বরূপ-তিরোধান-কারিণী বিবিধ-বিচিত্র-জগৎস্রষ্ট্রী সদসদনির্বচনীয় যে অবিদ্যার প্রভাবে নির্বিশেষ স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মে সমস্ত জগৎ কল্পিত, যে অবিদ্যা মোহময়ী মদিরার ন্যায় এই নিখিল জীবের বিষম অনর্থকরী ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া অঘটন ঘটন করিতেছে, সেই অবিদ্যা কাহাকে আশ্রয় করিয়া এই বিভ্রম জন্মাইতেছে? —অবিদ্যা জীবে আশ্রিত? অথবা পরব্রহ্মে আশ্রিত হইয়া এই সমস্ত কাণ্ড করিতেছে?[১]

প্রথম পক্ষে অর্থাৎ অবিদ্যা জীবকে আশ্রয় করিয়া জগৎ সৃষ্টি করে—ইহা বলা যায় না। কারণ জীব অবিদ্যা-কল্পিত, অর্থাৎ অবিদ্যা যে জীবকে কল্পনা করিয়াছে সেই জীব—ফলতঃ অবিদ্যার কার্য বলিয়া কিরূপে অবিদ্যা তাহাকে আশ্রয় করিবে? কার্যই কারণকে আশ্রয় করে, কারণ (উপাদান) কখনও কার্য-আশ্রিত থাকে না। অবিদ্যা জীবের কারণ হইয়া কার্যস্বরূপ জীবকে কিরূপে আশ্রয় করিবে? সুতরাং অবিদ্যা জীবাশ্রিত নয়।

উহা ব্রহ্মাশ্রিতও নয়। ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ, জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহার বিরোধী অজ্ঞান সেখানে কিরূপে থাকিবে? অন্ধকার কি কখনও আলোকে আশ্রিত হইয়া থাকিতে পারে? অদ্বৈতবাদিগণ তো অজ্ঞানকে জ্ঞানের দ্বারা বাধ্য (নিবর্ত্য, নিবারণীয়) বলিয়া থাকেন। অতএব ব্রহ্মাশ্রিতরূপেও অবিদ্যা দাঁড়াইতে পারে না। পরিশেষে স্থির হইল অবিদ্যার আশ্রয় অসম্ভব।

অদ্বৈতমতে অবিদ্যার আশ্রয়ত্বানুপপত্তির সমাধান

না। অদ্বৈতবাদে অজ্ঞানের আশ্রয় সম্বন্ধে অনুপপত্তি নাই। প্রথম পক্ষ অর্থাৎ অজ্ঞানের জীবাশ্রিতত্ব পক্ষ অসঙ্গত নয়।[২] যে মতে জীব অবিদ্যার আশ্রয় সেই মতে অবিদ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই জীব। জীব অবিদ্যার কার্য নয়। যদিও জীবভাবটি (জীবত্ব) অবিদ্যা-কল্পিত তাহা হইলেও অবিদ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্যাত্মক জীবের ধর্মী (ধর্ম যাহাতে আরোপিত সেই) চৈতন্যাংশটি নিত্য পদার্থ বলিয়া তাহাই অবিদ্যার আশ্রয়। চৈতন্যই সর্বত্র অধিষ্ঠান হইয়া থাকে।

১ যদপ্যুচ্যতে নির্বিশেষ· ····সা হি জ্ঞানবাধ্যাভিমতা। [ব্রঃ সূঃ—শ্রীভাষ্য ১।১।১]

২ বাচস্পতি মতে কল্পতরুপরিমল-কার সমন্বয়সূত্রের শেষে অবচ্ছেদবাদই যে বাচস্পতির মত, তাহা বিস্তৃতরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। আর তাহার মতে অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য জীব নয়, পরন্তু জীব অবিদ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্য।

অবিদ্যার অধিষ্ঠানরূপ (জীব-) চৈতন্য অবিদ্যার আশ্রয়।[৩] সুতরাং জীবের জীবত্বটি কল্পিত হইলেও জীবরূপধর্মি-চৈতন্যটি কল্পিত নয়। আর অবিদ্যা ঐ চৈতন্যাংশকে আশ্রয় করে বলিয়া প্রথম পক্ষে আশ্রয়ের অনুপপত্তি হইল না। যদি বলা যায় অবিদ্যার আশ্রয় যদি চৈতন্যাংশটিই হয় তাহা হইলে সেই চৈতন্য ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া ফলতঃ অবিদ্যা ব্রহ্মাশ্রিতই হইল, জীবাশ্রিত তো হইল না। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, জীব ব্রহ্মস্বরূপ—ইহা সিদ্ধান্ত হইলেও অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যই শুদ্ধব্রহ্মস্বরূপ, আর অবিদ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্য জীবস্বরূপ। জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব পর্যন্ত জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইলেও অবিদ্যাবশতঃ অবচ্ছিন্ন বোধ হয়। অনবচ্ছিন্ন চৈতন্য অবিদ্যার আশ্রয় হইতে পারে না।

জীবের অবিদ্যাবচ্ছিন্ন ভাবটি অবিদ্যা-কল্পিত। তথাপি জীব কার্য নয়। যেহেতু ভাব কার্যবিনাশী বলিয়া জীবেরও বিনাশ সম্ভাবিত হওয়ায় সংসার-মুক্তি কথাটি অলীক হইয়া পড়ে। যে জীব সংসার হইতে মুক্ত হইতে চায় সে নিজেই যদি মরিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার আর মুক্তি কিরূপে হইবে? আর ইহাও বলা যায় না যে অবিদ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্য জীব, সেই জীব কার্য না হইলেও তার অবচ্ছেদটি অবিদ্যার অধীন হওয়ায় সেই অবিদ্যা আবার জীবকে আশ্রয় করিলে 'নিজেকে নিজে আশ্রয় করা' রূপ স্থিতিতে আত্মাশ্রয় দোষের আপত্তি হইবে। যেহেতু অবিদ্যা অংশটি জীবের বিশেষণ নয়, কিন্তু উপাধি বলিয়া, অবিদ্যা অবিদ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে আশ্রয় করিলেও আত্মাশ্রয় দোষ হয় না। লাল রং লাল ফুলকে আশ্রয় করে বলিলে আত্মাশ্রয়দোষ হয়। যেহেতু লাল রংটি ফুলে বিদ্যমান বলিয়া লাল রং লাল ফুলকে আশ্রয় করে বলিলে লালকেও আশ্রয় করে ইহা বুঝায়। কিন্তু ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশকে ঘট আশ্রয় করে বলিলে ঘট ঘটকে আশ্রয় করে—ইহা বলা হয় না, যেহেতু ঘটটি আকাশের বিশেষণ নয়, কিন্তু উপাধি। সেইরূপ প্রকৃতস্থলে, অবিদ্যা অবিদ্যাবচ্ছিন্নচৈতন্য-স্বরূপ জীবে আশ্রিত হইলেও আত্মাশ্রয় দোষ হয় না।[৪]

দ্বিতীয় পক্ষেও দোষ নাই—অর্থাৎ ব্রহ্ম অবিদ্যার আশ্রয় হইলে পূর্বপক্ষী যে দোষ দিয়াছেন, অদ্বৈতবাদে সেই দোষ নাই। 'ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া অবিদ্যার বিরোধী, অবিদ্যা তাহা দ্বারা বাধিত (নিবারিত) হয়। সুতরাং সেই ব্রহ্ম কিরূপে অবিদ্যার আশ্রয় হইবে?'—পূর্বপক্ষীর এই আক্ষেপ ঠিক নয়। যেহেতু ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ নিত্য-জ্ঞানস্বরূপ হইলেও অবিদ্যার বিরোধী নয়। অবিদ্যা তাহা দ্বারা বাধিত হয় না। পরন্তু ব্রহ্ম অবিদ্যার অবিরোধী। যেহেতু 'অবিদ্যা'র অর্থ বিদ্যা বা প্রকাশের অভাব নয়—যাহার জন্য স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের সহিত তাহার

৩ তদনেনান্তঃকরণাদ্যবচ্ছিন্নঃ প্রত্যগাত্মেদমনিদংরূপশ্চেতনঃ কর্তা ভোক্তা কার্যকারণাবিদ্যাদ্বয়াধারঃ।—ভামতী অধ্যাসভাষ্য

পূর্বপূর্বভ্রমজন্যসংস্কাররূপাঽবিদ্যা কার্যাবিদ্যা। অনাদিভাবরূপাঽবিদ্যা কারণাবিদ্যা, তদ্দ্বয়াধার ইত্যর্থঃ। অবিদ্যাধারত্বং চিদংশমাদায়।—অচিদংশস্য জড়স্য তদনাধারত্বাদিতি বোধ্যম্।—ঐ টীকা, ঋজু প্রকাশিকা

গৌড়ব্রহ্মানন্দী—'জীবস্য শুদ্ধচিদ্বৃত্তিত্বাৎ।' অদ্বৈতসিদ্ধি ১ম পঃ

৪ স্বেনৈব কল্পিতে দেশে ব্যোম্নি যদ্বদ্ ঘটাদিকম্। তথা জীবাশ্রয়া বিদ্যাং মন্যন্তে জ্ঞানকোবিদঃ। [অদ্বৈত-সিদ্ধিধৃত শ্লোক—১ম পরিচ্ছেদ] ঐ টীকা গৌড়ব্রহ্মানন্দী—"স্বস্য স্বাশ্রয়ং প্রত্যুপাধিত্বেঽপি অবিশেষণত্বেন স্বাশ্রয়ত্বাঙ্গীকারাৎ।"

জীব ও অবিদ্যার অন্যোঽন্যাশ্রয়দোষ—বাচস্পতিমিশ্র, মধুসূদনসরস্বতী, বেদান্তসারের বালবোধিনী-টীকাকার, অদ্বৈতব্রহ্ম-সিদ্ধিকার প্রভৃতি খণ্ডন করিয়াছেন। এস্থলে তাহা অনাবশ্যক-বোধে উল্লিখিত হইল না।

বিরোধ হইবে : অদ্বৈতবাদে অবিদ্যাকে ভাব ও অভাব হইতে ভিন্ন বলা হয় বলিয়া অবিদ্যা জ্ঞান বা প্রকাশের অভাব-স্বরূপ নয়। বিদ্যা-বিরুদ্ধ অবিদ্যা—ইহাও স্বীকৃত নয়, কারণ অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম বিদ্যাস্বরূপ হইলেও অবিদ্যার বিরোধী—স্বীকার করা হয় না। আর যদি বল অবিদ্যা—চৈতন্য হইতে ভিন্ন বলিয়া চৈতন্যাশ্রিত নয় অর্থাৎ 'অবিদ্যা চৈতন্যাশ্রিত নয়, যেহেতু তাহা চৈতন্য হইতে ভিন্ন'—এইরূপ ব্যাপ্তির দ্বারা ব্রহ্মের অবিদ্যাশ্রয়ত্ব সিদ্ধ হইবে না। তাহা হইলে ইহার উত্তরে বলিব এই ব্যাপ্তির দৃষ্টান্ত নাই, কারণ অবিদ্যা-অতিরিক্ত সমস্ত (কার্য) বস্তু চৈতন্য হইতে ভিন্ন হইয়াও চৈতন্যাশ্রিত। সুতরাং স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম অবিদ্যার বিরোধী না হওয়ায় উহার আশ্রয় হইতে কোন বাধা নাই।[৫]

অদ্বৈতমতে বেদান্তবাক্য-জনিত অখণ্ড মনোবৃত্তি অথবা তাদৃশ অখণ্ডাকার মনোবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ জ্ঞানই অজ্ঞানের বিরোধী। ঐ জ্ঞান উৎপন্ন হইলে আর অজ্ঞান থাকিতে পারে না। উক্ত সিদ্ধান্তের উপর আচার্য (রামানুজ) আক্ষেপ করিয়াছেন যে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাকারবৃত্তি বা বৃত্ত্যুপহিত ব্রহ্ম উভয়ই স্বপ্রকাশ, অথচ ব্রহ্ম অজ্ঞানের অবিরোধী, কিন্তু বৃত্ত্যুপহিত ব্রহ্ম অজ্ঞানের বিরোধী—ইহা কি করিয়া সম্ভব? তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে স্বরূপ ব্রহ্ম এবং বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম এই উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে : স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম নিত্য। বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। ঘটরূপ উপাধির উৎপত্তি ও বিনাশে যেমন ঘট-উপহিত আকাশের উৎপত্তি বা বিনাশ স্বীকার করা হয়, সেইরূপ বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন ব্রহ্মেরও উৎপত্তি বিনাশ কল্পিত হয়। আরও কথা এই যে বৃত্তি আবরণ ভঙ্গ করে অথবা চৈতন্যের অভিব্যক্তি করে বলিয়া তদবচ্ছিন্ন চৈতন্যেরও আবরণ-ভঞ্জকতারূপ বিশেষ স্বভাব সিদ্ধ হয়। শুদ্ধ ব্রহ্মের এই আবরণ-নাশকতা স্বভাব নাই। আর ঐ অখণ্ড মনোবৃত্তিটি অজ্ঞাত ব্রহ্মকে বিষয় করিয়া অজ্ঞানের বিরোধীরূপেই উৎপন্ন হয়। স্বপ্রকাশ শুদ্ধ ব্রহ্ম কিন্তু কাহারও বিরোধী নয়। যেহেতু স্বপ্রকাশ ব্রহ্মেই সমস্ত জগৎ অনুভূত হইতেছে।

রামানুজাচার্য বলিয়াছেন : ব্রহ্ম অন্য অনুভবের বিষয় হন না বলিয়া ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান হইতে পারে না। অতএব জ্ঞান অজ্ঞানবিরোধী বলিলে ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান নিজেই অজ্ঞানের বিরোধী, ইহাই বুঝায়। অতএব ব্রহ্ম অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না।

ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদীরা বলেন : ব্রহ্ম অন্য অনুভবের বিষয় হইতে পারেন না, ইহার অর্থ এই নয় যে ব্রহ্মবিষয়ক কোন অনুভব হয় না, কিন্তু ঘটাদির অনুভব যেমন ঘট প্রভৃতিকে প্রকাশ করে ব্রহ্মানুভব সেরূপ ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না, যেহেতু ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ। তথাপি অদ্বৈত বেদান্তমতে বেদান্তবাক্যরূপ প্রমাণ-জন্য ব্রহ্মবিষয়ক অনুভব স্বীকৃত হয়, আর ঐ অনুভব অজ্ঞানকে নিবৃত্ত করিয়া চরিতার্থ হয়। অন্যথা "দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ" [কঃ উঃ ১।৩।১২] "নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে" [ঐ—১৫] "কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ" [ঐ—২।১।১]। "জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ" [শ্বেঃ উঃ ৫।১৩] ইত্যাদি শ্রুতি যে ব্রহ্ম বিষয় জ্ঞানের কথা বলিতেছেন তাহা অসঙ্গত হইয়া যায়। এইজন্য অদ্বৈতাচার্যগণ বলিয়াছেন :

ফলব্যাপ্যত্বমেবাস্য শাস্ত্রকৃদ্ভির্নিরাকৃতম্। ব্রহ্মণ্যজ্ঞাননাশায় বৃত্তিব্যাপ্তিরপেক্ষিতা ॥ [পঞ্চদশী]

—অর্থাৎ ঘটাদি বাহ্য বস্তুর সহিত বহিরিন্দ্রিয়ের সম্বন্ধজনিত ঘটাকার-অন্তঃকরণবৃত্তি-অবচ্ছিন্ন-

৫ "নৈবং, বিকল্পাসহত্বাৎ। কিমপ্রকাশশব্দেন……তৃতীয়েঽপি।"—চিৎসুখী ৩৭৫পৃঃ, ৭—১১পঃ—নির্ণয়সাগর-মুদ্রিত

চৈতন্য জন্য ঘটাদি যেভাবে প্রকট হয়, স্বরূপচৈতন্য সেভাবে প্রকটতার আশ্রয় হন না, কিন্তু শব্দ-প্রমাণ জনিত-স্ববিষয়ক মনোবৃত্তিতে অভিব্যক্তরূপ বৃত্তিব্যাপ্য হন।

আর যে আচার্য (রামানুজ) বলিয়াছেন : জিজ্ঞাসা করি, ব্রহ্মব্যতিরিক্তের মিথ্যাত্বজ্ঞান, ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানের বিরোধী অথবা জগতের সত্যত্বরূপ অজ্ঞানের বিরোধী? 'ব্রহ্ম ভিন্ন সব মিথ্যা'—এই প্রকার জ্ঞান ব্রহ্মের স্বরূপের অজ্ঞানের বিরোধী হইতে পারে না, কারণ জ্ঞানটি যে-বিষয়ক হয় সেই-বিষয়ক অজ্ঞানটি তাহার দ্বারা নিবৃত্ত হয়। ঘটের জ্ঞান পটের অজ্ঞানকে নিবৃত্ত করে না। প্রকৃত স্থলে জ্ঞান হইল—'ব্রহ্ম ভিন্ন সব মিথ্যা', আর অজ্ঞানটি ব্রহ্মবিষয়ক। সুতরাং উক্ত জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপবিষয়ক অজ্ঞান নিবৃত্ত হইতে পারে না।

'ব্রহ্ম ভিন্ন সব মিথ্যা' এই জ্ঞানের দ্বারা 'ব্রহ্ম ভিন্ন সব সত্য' এই অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেও ব্রহ্মের স্বরূপ-অজ্ঞান থাকিয়া যাইবে।

ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, যেমন শুক্তির অজ্ঞান (শুক্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যের অজ্ঞান) শুক্তিকে আবৃত করিয়া তাহার উপর রজত ও রজতের সত্যতা-আকার জ্ঞানের সৃষ্টি করে, সেইরূপ ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানও ব্রহ্মকে আবৃত করিয়া তাহার উপর সমস্ত জগৎ ও তাহার সত্যত্ব-বুদ্ধি সৃষ্টি করে। উভয়ত্র অজ্ঞান দুইটি নয়, অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ আবরণকারী এবং জগৎ ও জগতের সত্যতাবুদ্ধি-সৃষ্টিকারী অজ্ঞান ভিন্ন নয়, অজ্ঞান একই। ঐরূপ শুক্তিরজত স্থলেও একই শুক্তির অজ্ঞান। একই অজ্ঞানের বিভিন্ন কার্যকারিণী শক্তি। এই দুইটির মধ্যে একটি আবরণ-শক্তি, অপরটি বিক্ষেপ-শক্তি। শুক্তিত্ব-জ্ঞানের দ্বারা শুক্তির অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে যেমন তাহার কার্য রজত ও রজতের সত্যতা-বুদ্ধি নিবৃত্ত হইয়া যায়, সেইরূপ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি মহাবাক্য-জনিত ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞান উৎপন্ন হইলে ব্রহ্মস্বরূপের অজ্ঞান ও তাহার কার্য জগৎ বা জগতের সত্যত্ব-বুদ্ধি নিবৃত্ত হইয়া যাইবে।* অতএব পূর্বোক্ত দোষের আপত্তি আর হইতে পারে না। আর ব্রহ্মের স্বরূপ-বিষয়ক অজ্ঞানের অর্থ ব্রহ্ম সদ্বিতীয়—ইহাও অদ্বৈতবাদিগণের মত নয়। ব্রহ্মের স্বরূপবিষয়ক অজ্ঞান হইতেছে : 'ব্রহ্ম নাই', 'ব্রহ্ম প্রকাশিত হয় না' এই প্রকার অসত্তাপাদক ও অভানাপাদক অজ্ঞান। 'ব্রহ্ম সদ্বিতীয়' এই জ্ঞান অজ্ঞানের কার্য। সুতরাং উক্ত আক্ষেপ অযৌক্তিক।

দ্বিতীয় : পূর্বপক্ষ—তিরোধান-অনুপপত্তি

তারপর বিশিষ্টাদ্বৈতাচার্য বলিয়াছেন : অবিদ্যার ব্রহ্ম-তিরোধান-কারিত্ব সম্ভব নয়। যেহেতু প্রকাশস্বভাব ব্রহ্মের তিরোধানের অর্থ হইতেছে, প্রকাশের উৎপত্তির বাধা অথবা বিদ্যমান প্রকাশের নাশ। প্রকাশের অনুৎপত্তি স্বীকার করিলে ফলতঃ প্রকাশের বিনাশই স্বীকার করা হয়। অথচ ব্রহ্ম অবিনাশী। সুতরাং অবিদ্যার দ্বারা ব্রহ্মের তিরোধান অসম্ভব।

অদ্বৈতমতে উত্তর

তিরোধানের অর্থ উৎপত্তির বাধা বা বিদ্যমানের বিনাশ নয়। ঘট, পট প্রভৃতি অন্ধকারে তিরোহিত হইয়া আছে বলিলে ঘট পটের উৎপত্তির বাধা বা বিদ্যমান বস্তুর বিনাশ বুঝায় না। যদি বল ঘট পট অপ্রকাশ বস্তু বলিয়া ঘট তিরোহিত আছে বলিলে ঘটের প্রকাশ হইতেছে না—

* তথা হ্যাত্মস্বরূপমানং ব্রহ্মজ্ঞানং পূর্বাধ্যস্তসর্বপ্রপঞ্চং নিবর্তয়ন্ স্বাত্মানমপি নিবর্তয়তীতি।—অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি

ইহাই সকলে বুঝে। অর্থাৎ ঘটের প্রকাশের উৎপত্তিতে বাধা হইতেছে, অথবা ঘটের প্রকাশ বর্তমানে নষ্ট হইয়াছে—ইহা বুঝা যায়। কিন্তু ব্রহ্ম যখন সর্বদা স্বপ্রকাশ, তখন তাহার তিরোধান বলিলে তাহার স্বরূপের উৎপত্তির বাধা বা স্বরূপের বিনাশ ছাড়া আর কি বুঝাইবে? তাহার উত্তরে বলা যায় যে ব্রহ্মের তিরোধান বলিলে ব্রহ্ম-প্রকাশের অনুৎপত্তি বা বিনাশ বুঝায় না, কিন্তু ব্রহ্মের সত্তা বা চৈতন্যের প্রকাশ হইলেও বিশেষভাবে আনন্দ প্রভৃতি ধর্মের অভিব্যক্তির প্রাগভাব। এখানে অভিব্যক্তির অর্থ প্রকাশ নয়। প্রকাশ অর্থ হইলে পুনরায় পূর্বদোষের আপত্তি হয়। কিন্তু অভিব্যক্তির অর্থ চিত্তবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হওয়া, অথবা চিত্তবৃত্তির সহিত বিশেষ সম্বন্ধ। যদিও সৎ, চিৎ ও আনন্দ এইগুলি ভিন্ন পদার্থ নয়, তথাপি ভিন্নের মতন প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ আমাদের চিত্তবৃত্তিতে ব্রহ্মের সত্তা বা চৈতন্য অভিব্যক্ত হইলেও আনন্দটি বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হইতেছে না। অভিব্যক্তির প্রাগভাব আছে। আর ঐ প্রাগভাবটি রক্ষা করিতেছে অবিদ্যা। সেইজন্য অবিদ্যাকে ব্রহ্ম-তিরোধায়ক বলা হয়। অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্তই অবিদ্যা-কল্পিত বলিয়া প্রাগভাবও অবিদ্যা-কল্পিত, সুতরাং প্রাগভাবেরও কারণ অবিদ্যা। জ্ঞান হইলে অবিদ্যা নিবৃত্তি হইয়া প্রাগভাবও নষ্ট হইয়া যাইবে, তখন ব্রহ্মের আনন্দাংশ বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হইবে।[৭] সুতরাং অবিদ্যার তিরোধায়কত্বের অনুপপত্তি নাই।

তৃতীয় : অনির্বচনীয়ত্ব-অনুপপত্তিরূপ আক্ষেপ

আচার্য (রামানুজ) বলেন : বস্তুমাত্রই অনুভবের দ্বারা ব্যবস্থাপিত হয়। যে বস্তু যে ভাবে অনুভূত হয় সেই বস্তুর সেইরূপই স্বভাব। সকল লোকে জগতে কোন বস্তুকে সদ্রূপে কোন পদার্থকে বা অসদ্রূপে জানে। এই উভয় হইতে ভিন্নরূপে কেহ কিছু বুঝে না। অনুভবকে বাদ দিলে কোন কিছু প্রমাণ করা যায় না। এখন সদ্রূপে বা অসদ্রূপে যে অনুভব হয়, তাহার বিষয়কে যদি সদসদ্ভিন্ন অনির্বচনীয়রূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সব কিছু সব জ্ঞানের বিষয় হইয়া যায়। আর 'অবির্বচনীয়' কথাটি অসঙ্গত, নির্বচন করিয়াই বলা হইতেছে 'অনির্বচনীয়'। সুতরাং অবিদ্যার অনির্বচনীয়ত্ব অনুপপন্ন।

অদ্বৈতমতে উত্তর

সব অনুভব সব সময় বস্তুর যাথাত্ম্য-বোধক হয় না। প্রত্যক্ষের দ্বারা চন্দ্রকে প্রাদেশ-পরিমিত বলিয়া জানিলেও জ্যোতিঃশাস্ত্রের দ্বারা চন্দ্রের অধিক পরিমাণ জ্ঞানের পর প্রাদেশ-পরিমাণটি বাধিত হইয়া যায়। সেইরূপ সমস্ত বস্তু সদ্রূপে বা অসদ্রূপে প্রতীত হইলেও যুক্তির দ্বারা সর্বত্র তাহা সিদ্ধ হয় না বলিয়া অবিদ্যাকে সদসদনির্বচনীয় বলা ছাড়া উপায় নাই। কারণ অবিদ্যা যদি সৎ হইত, তাহা হইলে তাহার বাধ (নিবারণ) হইত না। অথচ "জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ" [গীতা ৫।১৬] ইত্যাদি বাক্যে ভগবান্ বলিয়াছেন, জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের বাধ হয়। যাহার বাধ হয় তাহাকে আর সৎ বলা যায় না। আর অসৎও বলা যায় না, যেহেতু 'আমি অজ্ঞ' ইত্যাদিরূপে অনুভব হয়। অসদ্ বস্তুর অনুভব হয় না। আর একই সঙ্গে সদসদ্বিরুদ্ধ ধর্ম, সুতরাং

৭ অতো ভানেঽপ্যভাতাসৌ পরমানন্দতাত্মনঃ ॥১১। অধ্যেতৃবর্গমধ্যস্থপুত্রাধ্যয়নশব্দবৎ। ভানেঽপ্যভানং ভানস্ত প্রতিবন্ধেন যুজ্যতে ॥১২। তস্য হেতুঃসমানাভিহারঃ পুত্রধ্বনিশ্রুতৌ। ইহানাদিরবিদ্যৈব ব্যামোহৈকনিবন্ধনম্ ॥১৩। পঞ্চদশী। ব্রহ্মের আনন্দাংশ সামান্যভাবে প্রকাশিত হইলেও বিশেষভাবে প্রকাশের প্রতিবন্ধক হইতেছে অবিদ্যা।

অবিদ্যাকে সদসদনির্বচনীয় বলিতে হইবে।[৮] সুতরাং অবিদ্যা ভাবও নয়, অভাবও নয়, ভাবাভাবও নয়। তবে যে ভাবরূপ বলা হয় তাহা অভাব হইতে ভিন্ন বলিয়া গৌণ প্রয়োগ মাত্র।[৯] আর অনির্বচনীয়কে নির্বচন করা ব্যাঘাত দোষযুক্ত—এই কথাও বলা চলে না। কারণ অদ্বৈতবাদিগণ যে অবিদ্যাকে অনির্বচনীয় বলেন, তাহার অর্থ এ নয় যে, তাহাকে নির্বচন অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা বর্ণনা করা যায় না, কিন্তু উহা এক পারিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত হয়। উহার লক্ষণ হইতেছে সদ্‌ভিন্ন, অসদ্‌ভিন্ন, সদসদ্‌ভিন্ন। এইরূপ অর্থে অনির্বচনীয় বলা হয়।[১০] সুতরাং অবিদ্যার অনির্বচনীয়ত্বের অনুপপত্তি নাই।

চতুর্থ: বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিমতে অবিদ্যার প্রমাণ সম্বন্ধে অনুপপত্তি-আক্ষেপ। ৪(ক) প্রত্যক্ষে আপত্তি

আচার্য (রামানুজ) অবিদ্যার প্রমাণ সম্বন্ধে আক্ষেপ প্রসঙ্গে প্রথমে অজ্ঞান সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব উল্লেখ করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদীরা 'আমি অজ্ঞ' এই অনুভবকে অজ্ঞান বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলেন। তাঁহাদের মতে 'আমি অজ্ঞ' এই অনুভবটি জ্ঞানাভাবের অনুভব নয়। কারণ অভাবের জ্ঞান হইতে গেলে অনুযোগী (অভাবের আশ্রয়) ও প্রতিযোগীর (যাহার অভাব) জ্ঞান থাকা আবশ্যক। জ্ঞানাভাবের প্রতিযোগী হইতেছে জ্ঞান, আর অনুযোগী আত্মা। এই উভয়ের কোনরূপ জ্ঞান যদি না থাকে তবে আর জ্ঞানাভাবের জ্ঞান কিরূপে হইবে? আর যদি প্রতিযোগী বা অনুযোগীর জ্ঞান থাকে তাহা হইলে ঐ জ্ঞান আত্মাতে থাকায় সামান্যভাবে জ্ঞানাভাবের জ্ঞান হইতে পারে না। কিন্তু 'আমি অজ্ঞ' এই অনুভবকে ভাবরূপ অজ্ঞান-বিষয়ক বলিলে পূর্বোক্ত দোষ হয় না। যেহেতু অনুযোগী ও প্রতিযোগীর জ্ঞানের সহিত ভাবরূপ অজ্ঞানের বিরোধিতা নাই বলিয়া আত্মাতে অজ্ঞান অনায়াসে থাকিতে পারে। কিন্তু ইহা অসঙ্গত। 'আমি অজ্ঞ' বা 'আমি নিজেকে বা অপরকে জানি না' এই অনুভবের দ্বারা ভাবরূপ অজ্ঞানের সাধন করা যায় না, যেহেতু অদ্বৈতবাদীর মতে আত্মা হইতেছে অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয়। এখন অজ্ঞানের আশ্রয়রূপে বা বিষয়রূপে আত্মার জ্ঞান আছে কিনা? যদি থাকে তাহা হইলে ঐ জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান বাধিত হইয়া যাওয়ায় অজ্ঞান অনুভূত হইতে পারে না। আর যদি আশ্রয় ও বিষয়ের জ্ঞান না থাকে তবে অজ্ঞান হইতে ভিন্নরূপে অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয়ের জ্ঞান না থাকায় কিরূপে অজ্ঞানের জ্ঞান হইবে? যেমন 'আমি রামকে জানি না' বলিলে রামের সম্বন্ধে সামান্যভাবে জ্ঞান থাকা দরকার, নতুবা 'তাহাকে জানি না' বলা যায় না।

প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে উত্তর

ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন: না, আমাদের মতে এই দোষ নাই। যেহেতু প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের দ্বারা যে প্রমারূপ অন্তঃকরণবৃত্তি উৎপন্ন হয় তাহার দ্বারাই অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়। কিন্তু সাক্ষিচৈতন্যের দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় না, অথচ অজ্ঞান সাক্ষিবেদ্য। আর ঐ সাক্ষি-

৮ অজ্ঞানস্য সত্ত্বে চিদাত্মবদ্‌বাধাভাবপ্রসঙ্গাৎ, অসত্ত্বে চ বন্ধ্যাসুতাদিবৎ অপরোক্ষপ্রতিভাসানুপপত্তেঃ। বাধ-প্রতীত্যোশ্চাজ্ঞানে প্রসিদ্ধত্বাদ্ যুক্তং তস্য অনির্বচনীয়ত্বম্।— বিদ্বন্মনোরঞ্জনী টীকা

৯ ভাবাভাববিলক্ষণস্য অজ্ঞানস্য অভাববিলক্ষণত্বমাত্রেণ ভাবত্বোপচারাৎ'' ইত্যাদি। —চিৎসুখী

১০ সদ্‌বিলক্ষণত্বে সতি অসদ্‌বিলক্ষণত্বে সতি সদসদ্‌বিলক্ষণত্বম্..... ইত্যাদি লক্ষণে নিরবদ্যত্বসম্ভবাৎ — অদ্বৈতসিদ্ধি

চৈতন্যই অজ্ঞানের বিষয় ও আশ্রয়ের গ্রাহক হওয়ায়, তাহার দ্বারা অজ্ঞানের বিষয় ও আশ্রয়ের জ্ঞান হইলেও অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না।[১১] সুতরাং অজ্ঞানের প্রত্যক্ষে অনুপপত্তি নাই।

৪(খ) অজ্ঞানের অনুমানে আক্ষেপ

অদ্বৈতবাদিগণ অজ্ঞানের যে অনুমান প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার উপর আচার্যের (রামানুজের) আক্ষেপ : অদ্বৈতবাদীরা বিবাদের বিষয় প্রমাণ-জ্ঞানটি নিজের প্রাগভাব ভিন্ন, নিজ বিষয়ের আবরক, নিজ কর্তৃক নিবর্ত্য, নিজের দেশস্থিত অন্য-বস্তু-পূর্বক, যেহেতু তাহা অপ্রকাশিত অর্থের প্রকাশক। যেমন অন্ধকারে প্রথমে উৎপন্ন প্রদীপপ্রভা—ইত্যাদি রূপে যে অবিদ্যার অনুমান করিয়াছেন, তাহা যুক্তি-বিরুদ্ধ। যেহেতু উক্ত হেতুর দ্বারা যদি অজ্ঞান-বিষয়ক অজ্ঞান অনুমিত হয়, তাহা হইলে হেতুটি বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে, অর্থাৎ রামানুজাচার্যের অভিপ্রায় এই যে অজ্ঞান সাক্ষি-ভাস্য অর্থাৎ সাক্ষি-প্রত্যক্ষ বলিয়া অজ্ঞানের প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞানের প্রকাশক সাক্ষী অপ্রকাশিত অজ্ঞানের প্রকাশক বলিয়া তাহাতে হেতু আছে। সেই অজ্ঞানের জ্ঞানের বিষয় হইল অজ্ঞান, অতএব অনুমানের দ্বারা যদি অজ্ঞানবিষয়ক অজ্ঞানের আবরক অন্য বস্তু অর্থাৎ দ্বিতীয় অজ্ঞান সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে অজ্ঞানের (প্রথম অজ্ঞানের) জ্ঞান হইতে পারিবে না। কারণ দ্বিতীয় অজ্ঞানই সাক্ষীকে আবৃত করিয়া থাকায় সাক্ষিচৈতন্য ঐ প্রথম অজ্ঞানকে প্রকাশ করিতে পারিবে না। এইরূপ দ্বিতীয় অজ্ঞান-সাক্ষী ও তৃতীয় অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইয়া প্রকাশিত হইতে পারিবে না। সাক্ষী যদি অজ্ঞানকে প্রকাশ না করে তাহা হইলে ঐ অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্বরূপ হেতুটি কিরূপেই বা পক্ষে থাকিবে। সুতরাং হেতুটি যাহা সাধন করিল, তাহা সে নিজের বিরোধীকেই সাধন করিল। সে সাধ্যের ফলে হেতুটি পক্ষ হইতে সরিয়া যাইতে বাধ্য। অতএব হেতুটি সাধ্যের অসমানাধিকরণ হওয়ায় বিরুদ্ধ হইল। অথবা অবিদ্যা-সাধক অনুমিতিও যেহেতু প্রমাণ-জ্ঞান, সেইহেতু অপ্রকাশিত অর্থের প্রকাশক হওয়ায় আর একটি অজ্ঞান সাধন করুক। তাহাতে ফল হইবে এই যে, অজ্ঞানবিষয়ক অজ্ঞানের দ্বারা প্রথম অজ্ঞান-সাক্ষী আবৃত হওয়ায় অজ্ঞানের জ্ঞান আর হইবে না, অর্থাৎ অজ্ঞান সিদ্ধ হইবে না। ফলতঃ অজ্ঞান সাধন করিতে যাইয়া তাহার অসিদ্ধিরূপ অপসিদ্ধান্তই সিদ্ধ হইল। আর যদি অজ্ঞান-বিষয়ক অজ্ঞান অনুমিত না হয় তাহা হইলে ঐ অজ্ঞানের জ্ঞানে বা অনুমিতিরূপ জ্ঞানে অপ্রকাশিত অর্থপ্রকাশকত্ব-রূপ হেতু থাকিল, অথচ 'বস্তন্তরপূর্বকত্ব'-রূপ সাধ্য না থাকায় হেতুটি ব্যভিচারী হইল। আরও কথা এই যে অজ্ঞান-বিষয়ক অজ্ঞান সাধিত হইলে অজ্ঞানের সাক্ষিত্ব অসিদ্ধ হইয়া যাইবে। যেহেতু অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যই অজ্ঞানের সাক্ষী। অজ্ঞানই চৈতন্যের সাক্ষিত্ব-আপাদক। সেই অজ্ঞান-সাক্ষী যদি দ্বিতীয় অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইয়া যায়, তাহাতে দ্বিতীয় অজ্ঞানই চৈতন্যের অজ্ঞান-সাক্ষিত্বকে নিবারিত করিয়া দিবে। সুতরাং অবিদ্যার অনুমান সম্ভব নয়। আরও কথা এই যে—দৃষ্টান্ত প্রদীপ-প্রভাটি চৈতন্যের তুলনায় জড় বলিয়া তাহাতে হেতু অসিদ্ধ।

অদ্বৈতমতে উত্তর

ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদীরা বলেন : যাহা আমাদের প্রকৃত স্থল (পক্ষ) নয়, তাহা লইয়া দোষ দেওয়া হাস্যজনক, অর্থাৎ অদ্বৈতবাদীরা প্রমাণ-জ্ঞানকে পক্ষ করেন। প্রমাণ-জ্ঞান বলিতে

১১ প্রমাণবৃত্তিনিবর্ত্যস্যাপি ভাবরূপাজ্ঞানস্য সাক্ষিবেদ্যস্য বিরোধিনিরূপকজ্ঞান তদ্ব্যাবর্তকবিষয়কগ্রাহকেণ সাক্ষিণা তৎসাধকেন তদনাশাদ্ব্যাহত্যনুপপত্তেঃ।—অদ্বৈতসিদ্ধি—১ম পঃ

—অর্থাৎ ভাবরূপ অজ্ঞান প্রমাণবৃত্তির দ্বারা নিবর্ত্য হইলেও সাক্ষিবেদ্য হওয়ায় অজ্ঞানের বিরোধিনিরূপক জ্ঞান ও অজ্ঞানের বিষয়গ্রাহক সাক্ষী অজ্ঞানের সাধক বলিয়া সাক্ষীর দ্বারা তাহার বিনাশ না হওয়ায় ব্যাঘাত নাই।

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণজনিত বিষয়াকার-বৃত্তি বা বৃত্তি-প্রতিফলিত চৈতন্যকে বুঝায়। অথবা বেদান্তবাক্য-প্রমাণজন্য অখণ্ডব্রহ্মাকারবৃত্তি-অভিব্যক্ত চৈতন্যকে প্রমাণ-জ্ঞান বলে। সাক্ষিচৈতন্যকে প্রমাণ-বৃত্তি বলা হয় না। যেহেতু সাক্ষি-বেদ্য বিষয়ের অন্তঃকরণবৃত্তি স্বীকার করা হয় না। সুতরাং আচার্যের (রামানুজের) অজ্ঞানের জ্ঞানকে ধরিয়া আক্ষেপ অস্থানে বারিবর্ষণ-স্বরূপ।[১২] আর অনুমিতিরূপ প্রমাণ-জ্ঞানটি অপ্রকাশিত অর্থের প্রকাশক হওয়ায়, দ্বিতীয় অজ্ঞানের অনুমান হইলে যে দোষ দেওয়া হইয়াছিল তাহাও অসঙ্গত, কারণ প্রমাণ-জ্ঞান বলিতে প্রথম পক্ষটি ঘটজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান বুঝায়, তাহাতে অনুমানের দ্বারা ঘটের অজ্ঞান বা ব্রহ্মের অজ্ঞান সিদ্ধ হয়। আর অনুমিতিকে পক্ষ করিলে অনুমিতির অজ্ঞান সিদ্ধ হইবে, তাহার দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানান্তর সিদ্ধ হইবে না। প্রমাণ জ্ঞানরূপ পক্ষটি সামান্যভাবে প্রমাণজনিত সকল জ্ঞানকে বুঝাইলেও সেই সেই প্রমাণ-জ্ঞানরূপ পক্ষে সেই সেই ভিন্ন ভিন্ন অজ্ঞান সিদ্ধ হইবে। যেমন তত্তৎপর্বতে তত্তদ্‌বহ্নি অনুমিত হয়। ব্রহ্ম-জ্ঞানের দ্বারা মূল-অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়। ঘটাদি জ্ঞানের দ্বারা ঘটাদির অজ্ঞান নিবৃত্ত। প্রথমোক্ত অজ্ঞানটিকে মূল-অজ্ঞান বলে। শেষোক্ত অজ্ঞানকে কার্য-অজ্ঞান বা অবস্থা অজ্ঞান বলে, ইহার দ্বারা প্রমাণ-জ্ঞানে একটি অজ্ঞান, অনুমিতিরূপ জ্ঞানে আর একটি অজ্ঞান—ইত্যাদিরূপ সাধিত হইলে অনবস্থা দোষ হয়, ইহা যাঁহারা বলেন তাঁহাদের মতও খণ্ডিত হইল। কারণ ভিন্ন ভিন্ন পক্ষে ভিন্নভিন্ন-বিষয়ক অজ্ঞান সিদ্ধ হয় বলিয়া পরস্পরের অপেক্ষা না থাকায় একই বিষয়ের নানা অজ্ঞান বা অজ্ঞানবিষয়ক অজ্ঞান, তদ্বিষয়ক অজ্ঞানসিদ্ধির কোন হেতু নাই। আর প্রদীপের দৃষ্টান্ত বিষয়ে যে আক্ষেপ করা হইয়াছিল, তাহার উত্তরে বলা যায় যে, এখানে অপ্রকাশিত-অর্থ-প্রকাশকত্বরূপ হেতুর অর্থ হইতেছে—যাহা অপ্রকাশিত-অর্থ-বিষয়ক হইয়া প্রকাশ-শব্দ-বাচ্য তাহাই হেতু।[১৩] সেইজন্য প্রদীপ-প্রভাতে হেতুটি অসিদ্ধ হয় না। অতএব অবিদ্যার অনুমানে কোন দোষ নাই।

অবিদ্যাবিষয়ে অর্থাপত্তি-প্রমাণ (সিদ্ধান্তমত)

অবিদ্যাবিষয়ে অর্থাপত্তি-প্রমাণও আছে। যথা: তোমার কথিত অর্থ জানি না,—এইরূপ ব্যবহার লোকে দেখা যায়। অথচ ঐ ব্যবহারকে জ্ঞানাভাবের ব্যবহার বলা যায় না। কারণ 'তোমার কথিত অর্থ জানি না'—এই জ্ঞানটিও একটি প্রমা বলিয়া তাহার বিষয়টি জ্ঞাত হওয়ায়, সেই জ্ঞানের নিষেধ করা অসঙ্গত হইয়া পড়ে। এই হেতু উক্ত ব্যবহারের অন্যথা অনুপপত্তিরূপ অর্থাপত্তি-প্রমাণ-বলেও ভাবরূপ অজ্ঞান সিদ্ধ হয়।[১৪]

শ্রুতি-প্রমাণ

ভাবরূপ অজ্ঞান বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ বহু আছে। দু'একটি দেখান হইতেছে। যথা: 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্' (শ্বেতাশ্বঃ উঃ ৪.১০) 'ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ' [শ্বেতাশ্বঃ উঃ ১।১০]। 'তরতি শোকমাত্মবিৎ' [ছাঃ উঃ ৭।১।৩] 'অনৃতেন হি প্রত্যূঢাঃ' [ছাঃ উঃ ৮।৩।২]

১২ অত্র প্রমাণপদং প্রমাণবৃত্তেরেব পক্ষত্বেন সুখাদিপ্রমায়াং সাক্ষিচৈতন্যরূপায়ামজ্ঞানানিবর্তিকায়াং বাধবারণায়। [অদ্বৈতসিদ্ধি—১ম পঃ]—অর্থাৎ অনুমানের ঘটক প্রমাণ পদটি প্রমাণজনিত বৃত্তিকেই পক্ষ করায় অজ্ঞানের অনিবর্তক সাক্ষি-চৈতন্যরূপ সুখাদি-প্রমাতে যে বাধের প্রসঙ্গ হইত, তাহার বারণের নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে।

১৩ "এবং চাপ্রকাশিতার্থগোচরত্বে সতি প্রকাশশব্দ বাচ্যত্বাৎ অপ্রকাশবিরোধিপ্রকাশত্বাদিতি বা হেতুঃ পর্যবসিতঃ"—ঐ

১৪ "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামীতি ব্যবহারান্যথানুপপত্তিরপি ভাবরূপাজ্ঞান সদ্ভাবে মানম্।" —চিৎসুখী।

এই সকল শ্রুতি যে ভাবরূপ অজ্ঞানের বোধক, তাহা অদ্বৈতচার্যগণ যুক্তি সহকারে দেখাইয়াছেন। বিস্তৃতি-ভয়ে এ-বিষয়ে নিবৃত্ত হইতে হইল। অতএব অবিদ্যার প্রমাণের অনুপপত্তি অসিদ্ধ।

পঞ্চম : স্বরূপের অনুপপত্তি-নিরাস

অবিদ্যার অনির্বচনীয়ত্ব অনুপপত্তির নিবাস দ্বারা ফলতঃ স্বরূপের অনুপপত্তিও খণ্ডিত হইয়াছে। সদসদনির্বচনীয় জ্ঞাননিবর্ত্য ভাবরূপত্বই অবিদ্যার স্বরূপ।

ষষ্ঠ : অবিদ্যার নিবর্তকত্ব-অনুপপত্তি-আক্ষেপ

রামানুজাচার্য বলেন : ব্রহ্ম নির্বিশেষ নয়। সকল শ্রুতিতেই ব্রহ্মকে সবিশেষ সগুণ বলা হইয়াছে। অতএব নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব বলিয়া সেই জ্ঞানেব দ্বারা অজ্ঞান-নিবৃত্তিও অনুপপন্ন : আরও যুক্তি এই যে সমস্ত জ্ঞানই সবিশেষ, নির্বিকল্প জ্ঞানও সবিশেষ-বিষয়ক। এইহেতু নির্বিশেষ জ্ঞান না থাকায় অদ্বৈতমতে অজ্ঞানের নিবর্ত্তক জ্ঞান অসিদ্ধ।

অদ্বৈতমতে উত্তর

ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন : 'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং' 'নেতি নেতি' 'অস্থূলমনণু' ইত্যাদি বহু শ্রুতিব যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিলে দেখা যায় ব্রহ্ম নির্বিশেষ। সবিশেষ বস্তুর ব্যয় বা বিনাশ দেখা যায় বলিয়া—ব্রহ্ম সবিশেষ হইলে তাহাব বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আর নির্বিশেষ জ্ঞান অসম্ভব নয়। বালক মূক, বা জড়ের জ্ঞান সদৃশ এক প্রকার জ্ঞানই নির্বিকল্পক জ্ঞান। বাচস্পতি বলিয়াছেন, 'অস্তি হ্যালোচনং নাম প্রথমং নির্বিকল্পকং। বালমূকাদিবিজ্ঞানসদৃশাং শুদ্ধবস্তুজম্'। 'ইহা এই রূপ' এই প্রকার জ্ঞান নিবিকল্পক নয়, কিন্তু সবিকল্পক। এই জ্ঞানের পূর্বেই 'ইদম্ ইদন্তের' নির্বিকল্পক জ্ঞান হইয়া যায়। প্রথম গো-পিণ্ড দর্শনে গোত্ব-বিশিষ্ট জ্ঞান হয না, বা গোত্ব-প্রকারক জ্ঞান হয না, কিন্তু 'গো' বা 'গো-ত্ব'এর বিশকলিতরূপে জ্ঞান হইয়া থাকে, জ্ঞানে সপ্রকারকত্বটিও ভাসমান হয় না। আরও কথা এই—যে ব্যক্তি পূর্বে চন্দ্রকে সামান্যভাবে দেখিয়াছে, পরে বিশেষভাবে যখন তাহার জানিবার ইচ্ছা হয়, তখন জিজ্ঞাসা করে, 'চন্দ্র কি বা কে ?' তাহার উত্তরে আপ্ত ব্যক্তি বলেন 'প্রকৃষ্ট প্রকাশশ্চন্দ্রঃ' তখন প্রশ্নকাবী ব্যক্তি ঐ লক্ষণ-বাক্য শুনিয়া 'চন্দ্র ও চন্দ্রত্বে'র সংসর্গকে না বুঝিয়া অখণ্ড চন্দ্রকেই বুঝে।[১৫] সেইরূপ 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্মের নির্বিকল্পক জ্ঞান অবশ্যই হয়। ব্রহ্মে বিকল্প নাই বলিয়া নির্বিকল্প জ্ঞান অবশ্যই হইবে সুতরাং অবিদ্যার নিবর্তক জ্ঞানেব সদ্ভাব থাকায় নিবর্তকত্বের অনুপপত্তি নাই।

সপ্তম : অজ্ঞানের নিবৃত্তি-অনুপপত্তি আক্ষেপ

তাবপব শ্রীভাষ্যকার বলিয়াছেন : যেহেতু বন্ধন পারমার্থিক সেইহেতু ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে না। জ্ঞানেব দ্বারা কথনও সত্য বস্তুব নিবৃত্তি হয় না। আরও

১৫ অপর্যায়শব্দানাং সংসর্গাগোচরপ্রমিতিজনকত্বমখণ্ডার্থতা। নচেদমসম্ভবিলক্ষণং, প্রকৃষ্টপ্রকাশাদিবাক্যেষু তৎসদ্ভাবাৎ —চিৎসুখী। 'সত্য, জ্ঞান, আনন্দ' প্রভৃতি অপর্যায় শব্দের যে সংসর্গবিষয়রহিত প্রমাজ্ঞান উৎপাদকতা, তাহাই অখণ্ডার্থতা এই লক্ষণ অসম্ভব নয়। 'প্রকৃষ্টপ্রকাশশ্চন্দ্র' ইত্যাদি বাক্যের অখণ্ডার্থবোধকত্ব দেখা যায়।

কথা—অদ্বৈতবাদিগণের অজ্ঞান-নিবর্তক জ্ঞানটি ব্রহ্মাকার মনোবৃত্তিস্বরূপ বলিয়া ব্রহ্ম ভিন্ন। ব্রহ্ম ভিন্ন সবই যখন মিথ্যা, তখন ঐ ব্রহ্মজ্ঞানও মিথ্যা হওয়ায়, মিথ্যামাত্রই নিবর্তনীয় বলিয়া মিথ্যা জ্ঞানের নিবর্তক কোন সত্য বস্তুর আবশ্যক হইবে। আর যদি বল ঐ অজ্ঞানের নিবর্তক জ্ঞানটি মিথ্যা হইলেও ক্ষণিক বলিয়া অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্যকে নিবৃত্ত করিয়া নিজেই নিবৃত্ত হইয়া যাইবে। ইহাতেও অদ্বৈতবাদে দোষ থাকিয়া যায। যেহেতু ঐ জ্ঞানটি মিথ্যা বলিয়া উহার উৎপত্তি বা বিনাশটিও মিথ্যা হওয়ায় সকল মিথ্যার কল্পনা যখন অজ্ঞানের দ্বারাই প্রবৃত্ত হয়, তখন ঐ ব্রহ্ম জ্ঞানের বিনাশ-কল্পনাও অজ্ঞানের দ্বারাই করিতে হইবে। অতএব ঐ জ্ঞানের বিনাশ-কাল পর্যন্ত অন্ততঃ অজ্ঞানকে থাকিতে হইবে। তাহাই যদি হয় তবে আর ঐ জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নাশ না হওয়ায় অন্য কোন পদার্থকে অজ্ঞানের নাশকরূপে স্বীকার করিতে হইবে। আর যদি বল ব্রহ্মই ঐ জ্ঞানের নাশস্বরূপ, তাহা হইলে নাশস্বরূপ ব্রহ্ম নিত্য বলিয়া ঐ জ্ঞান কখনও উৎপন্ন হইতে পারিবে না। অতএব নিবর্তকের অভাবে অজ্ঞানের নিবৃত্তি অনুপপন্ন। আর মিথ্যাজ্ঞান দ্বারাই বা কিরূপে অজ্ঞানের নিবৃত্তি সম্ভব?

অদ্বৈতমতে উত্তর

বন্ধন সত্য নহে। যেহেতু 'তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়' [শ্বেতাশ্বঃ উঃ ৩।৮] ইত্যাদি যুক্তিসহকৃত শ্রুতির অন্যথা-অনুপপত্তি-বশতঃ সংসারবন্ধন জ্ঞান-নিবর্ত্য বলিয়া মিথ্যাস্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে। আর মিথ্যা হইতে মিথ্যার নিবৃত্তিও হয়, অনেক সময় স্বপ্নের দ্বারাই স্বপ্নদৃশ্য নিবৃত্ত হয়। আর ব্রহ্মজ্ঞানটি মিথ্যা হইলেও তাহার পৃথক নিবর্তক স্বীকারের প্রয়োজন নাই। যেহেতু লোকে এমন দেখা যায় যে অরণি-কাষ্ঠ হইতে উদ্ভূত অগ্নি কাষ্ঠকে দগ্ধ করিয়া আপনিও নিবৃত্ত হয়। সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানও অজ্ঞান প্রভৃতিকে নিবৃত্ত করিয়া নিজেও কারণাভাব-নিবন্ধন নিবৃত্ত হইয়া যাইবে।[১৬]

আর ব্রহ্মজ্ঞানের নাশের কল্পনার জন্য অবিদ্যার অবস্থান স্বীকার করিতে হইবে না। যেহেতু অদ্বৈতিগণ (চরম) জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত ব্রহ্মকেই অবিদ্যার নাশস্বরূপ স্বীকার করেন। ইহাতে আর ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তিতে বাধা নাই, বরং উৎপত্তি অবশ্য স্বীকার্য। কারণ জ্ঞান উৎপন্ন না হইলে ব্রহ্ম জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত হন না। আর ঐ জ্ঞান বর্তমান থাকিলেও ব্রহ্মকে জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত বলা যাইবে না। যাহা উপলক্ষণ তাহা উপলক্ষ্যের বোধকালে থাকে না। সুতরাং জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া নষ্ট হইলে তবেই ব্রহ্ম জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত হন। অতএব জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি সম্ভব হওয়ায় নিবৃত্তির অনুপপত্তি নাই। সুতরাং অদ্বৈতমতে মোক্ষ নির্বিবাদে সিদ্ধ হয়, বরং বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ বা দ্বৈতবাদে পূর্ণমুক্তি নাই।

১৬ সজাতীয় স্বপরবিরোধিনাং ভাবানাং বহুলমুপলব্ধেঃ। যথা পয়ঃ পয়োঽন্তরং জরয়তি, স্বয়ং চ জীর্যতি, যথা বিষং বিষান্তরং শময়তি স্বয়ং চ শাম্যতি, যথা বা কতকরজো রজোঽন্তরাবিলে পাথসি প্রক্ষিপ্তং রজোঽন্তরাণি ভিন্দৎ স্বয়মপি ভিদ্যমানম্ অনাবিলং পাথঃ করোতি [ব্রঃ সূঃ ভামতী ১।১।১]

যদিও এই গ্রন্থ অন্য প্রসঙ্গে বলিয়াছেন তথাপি বৃত্তিরূপ জ্ঞান অবিদ্যাজাতীয় হইয়াও অবিদ্যা, তাহার কার্য এবং নিজেকে যে নিবৃত্ত করিবে—এই বিষয়েও দৃষ্টান্ত সম্ভব।

লণ্ডনের চিঠি

ডক্টর শ্রীশশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত শনিবার লীডস্ থেকে লণ্ডনে এসেছি। ভারতীয় ছাত্রবাসে আছি। ডাল ভাত রুটি খেতে পাচ্ছি, তরকারিতে বড় তেল দেয়। বাড়ীতে ইঁদুর আছে, আরসুলাও আছে।

একজন সঙ্গী জুটেছে, ঘুরে বেড়াচ্ছি। রবিবার স্বামী ঘনানন্দজীর সঙ্গে দেখা হয়েছে, ১লা জানুআরি আশ্রমে প্রসাদ পাব। শ্রীশ্রীমায়ের তিথিপূজার দিন মহারাজ আসতে বললেন। এদেশে আসবার সময় ভেবেছিলাম, এবার বোধ হয় শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি আমার নিরানন্দে কাটবে, কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় ঐ দিন— সারাটি দিন লণ্ডন আশ্রমেই কাটিয়েছি।

আশ্রমটি যদিও সাধারণ একটি বাড়ী—বেশ শান্ত জায়গাটি, নীচের তলায় চারটি ঘর—বসবার, খাবার, আপিস ও রান্নার। ওপরে ঠাকুরঘর, তার সামনে জপের ঘর, আর দুখানা শোবার। বাইরে পিছনে একটু খোলা জায়গা আছে, মহারাজ বললেন—শীতের পর গরমের সময় ফুল ফোটে, এখন আপেল দেখলাম।

একটি সাহেব ব্রহ্মচারী আছেন, মহারাজ নাম দিয়েছেন—'তারকনাথ'।

মায়ের জন্মতিথির দিন সকালে স্বামী ঘনানন্দজীই পূজা করলেন। বিকালে ৬টায় সময় (অবশ্য এখন সূর্য ডোবে বেলা ৪টায়) ব্রহ্মচারী তারকনাথ আরতি করলেন—শুধু কর্পূর দিয়ে। তারপর 'ওঁ হ্রীঁ ঋতং' এবং 'প্রকৃতিং পরমাম্' স্তব দুটি পাঠ হ'ল। মাটিতে কম্বলের উপর সকলের বসার ব্যবস্থা। তারপর খিচুড়ি পাঁপর ও পায়েস প্রসাদ পেলাম—আমরা ভারতীয় ৪জন, ডাচ ১জন ও ৭।৮ জন ইংরেজ মহিলা। ভারতীয়দের মধ্যে বেলুড় বিদ্যামন্দিরের একটি প্রাক্তন ছাত্রকে দেখলাম। আরতির পর মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত সভায় মায়ের জীবন আলোচনা হ'ল।

প্রথম বক্তা মিষ্টার সরকার (বাঙালী)। পরে দুজন ইংরেজ মহিলা—মায়ের জীবনের খুঁটিনাটি সব—তাৎপর্যসহ বেশ গুছিয়ে বললেন, তন্ন তন্ন ক'রে জীবনী পড়েছেন—বোঝা গেল।

বক্তৃতা শুনছিল প্রায় ৫০।৬০জন লোক—তার মধ্যে অর্ধেক এ-দেশীয়। সভার পর কেক বিস্কুট চা ও একটু প্রসাদ দেওয়া হ'ল সকলকে। আশ্রমটি শহরের মাঝখান থেকে ৮।৯ মাইল দূরে, তবে টিউব ট্রেনে বেশী সময়ে লাগে না।

* * *

এখানকার Christmas (খৃষ্ট জন্ম) উৎসবের কথা কিছু লিখি।

এরা কিছুদিন আগে থেকেই নরওয়ে সুইডেন থেকে এক রকম গাছের ডাল আনে, যা বরফেও সবুজ থাকে। প্রায় সব বাড়ীতেই একটি গাছ বা ডাল টবে বসবে। দোকান বা চার্চেও একই রকম,—কোন গাছ বড়, কোনটি বা ছোট। গাছে কাঁচের বল ঝুলছে, আলো (ইলেক্ট্রিক বা মোমবাতির) জ্বলবে। জরির ফিতে দিয়ে ঘিরে সাজানো হবে, আবার পুতুল-পরীও একটি ঝুলবে। কোন কোন বাড়ীতে মোজা ঝুলবে—তাতে Santa Claus উপহার দেবে।

এ সবের সঙ্গে খৃষ্টধর্মের কোন সম্বন্ধ নেই, তবু সর্বত্র এই সব দেশাচারের প্রচলন। লণ্ডনে যে সব বড় গির্জা সেণ্টপল্‌স্ ক্যাথিড্রাল, ওয়েস্ট মিন্‌ষ্টার চার্চ—সেখানেও তাই। দোকানগুলিও খুব সাজায়। লণ্ডনের রিজেণ্ট ষ্ট্রীটে (একটি বড়

রাস্তা), পিকাডিলি সার্কাস থেকে অক্সফোর্ড সার্কাস—সব আলোর মালায় আর চীনা ফানুস (Chinese lamp) দিয়ে বরাবর সমান ভাবে সাজানো।

এই পরবের আর একটি অঙ্গ Christmas greeting (চিঠি) ও উপহার পাঠানো। সবাই ছেলেমেয়েদের জন্য নতুন জামা কেনে, সকালে কেউ কেউ একবার গির্জায় যায়। এর পর উৎসবের বিশেষ অঙ্গ Christmas dinner (সান্ধ্য ভোজ)। টেবিলের মাঝখানে Christmas cake (ক্রীসম্যাস কেক) ভেতরে কিস্‌মিস্ বাদাম প্রভৃতি দেওয়া—খুব গুরুপাক। সাধারণতঃ দু'একজন বন্ধু বা আত্মীয়কে সব বাড়ীতেই নেমন্তন্ন করে। খাবার আগে পটকা ফাটাতে হবে, একটি কাগজের টুপি পরতে হবে। এর পর পানীয় —বড়দের রঙীন, ছোটদের লেবুর সরবৎ, আমি অবশ্য ছোটদের দলে।

অনেক বাড়ীতেই মেয়েরা এই ডিনারের খাবার ১৫।২০ দিন আগে থেকে করতে থাকে, কেকও নিজেরা করে। ভোজের পর পানের ব্যাপার অনেক রাত পর্যন্ত চলে।

পরদিন Boxing day (বক্সিং দিবস)—কেন যে এই নাম—কেউ বলতে পারলে না, এ দিন কেউ রাঁধে না, সব বাসি খায়। কতকটা আমাদের অরন্ধনের মতো।

উপহারের আদান-প্রদান খুব—আমিও এদের দিয়েছি, এরাও আমাকে দিয়েছে।

* * *

এবার এখানকার (শহরের বাইরের) বরফ পড়ার কথা একটু লিখছি। গত মঙ্গলবার দুপুর থেকে ক্রমাগত দুর্দিন—আকাশ থেকে শ্বেতপুষ্প বৃষ্টি (Snowfall) হয়ে ৪।৫ ইঞ্চি তুষার জমেছে, তারপরও রোজই মাঝে মাঝে তুষারপাত চলেছে। চারিদিক সাদা, রাত্রেও একটা যেন আলো দেখা যায়। বরফের ওপর দিয়েই চলাফেরা সব। একটা রবারের ওভার-সু (over shoe) কিনেছি—জুতোটাকে বাঁচাবার জন্যে, একটি রবারের Hot-water-bottle (গরম জলের পাত্র) কিনেছি বিছানা গরম করবার জন্যে, অবশ্য এখনও হাড়-কাঁপানো শীত পড়েনি। থার্মোমিটার মাঝে মাঝে—40°F এর নীচে যায়। আজ সকাল থেকে খুব blizzard—ঠাণ্ডা তুষার-ঝড় চলেছে—বেশ লাগে, একটা এদেশী সোয়েটারও কিনেছি।

বরফের কদর্য দিকটা হ'ল—গাড়ী চ'লে বরফের মণ্ড যখন ছিটিয়ে দিয়ে যায়—এটা অবশ্য আইন-বিরুদ্ধ। সকাল থেকেই রাস্তায় বালি ছড়িয়ে দিয়ে যায় করপোরেশন থেকে। পায়ের চাপে চাপে ফুটপাথের বরফ জমে শক্ত ইঁট হয়ে গেছে—পা পিছলায়, অবশ্য এখানেও বালি দিয়েছে।

চারদিক বরফে ঢাকা। সাতদিন হ'ল বরফ পড়েছে, গলতে চায় না। মাটির temperature (তাপমাত্রা) Freezing point (তুহিনাঙ্ক)-এর উপর ওঠে কম। Dry ice (শুকনো বরফ)— অসুবিধা নেই, গলতে আরম্ভ করলেই বিশ্রী।

* * *

লণ্ডনের বর্ণনা দিয়েই চিঠি শেষ করি। সারা লণ্ডন শহরটাই ম্যুজিয়ামে ভরা, তার মধ্যে বৃটিশ ম্যুজিয়াম (British Museum) একটি, এটির বাড়ীটাও বড়, সংগ্রহও অনেক, তার মধ্যে বেশীর ভাগ পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস-সংক্রান্ত।

কিছু দূরে Science Museum (বিজ্ঞান-সংগ্রহশালা), Natural History Museum (প্রাকৃতিক ইতিহাস-সংগ্রহশালা) এগুলি দেখলে ছেলেরা নিজে নিজেই শিখতে পারে। ছেলেরাও কাগজ-পেনসিল নিয়ে ছবি আঁকতে লেগে গেছে, বা সুইচ টিপে দেখছে—একটা যন্ত্র কেমন চলে। সব জিনিসের—যেমন প্রাণীর

তেমন যন্ত্রের—ক্রমবিকাশের অবস্থা দেখানো হয়েছে একটার পর একটা।

তারপর Commonwealth Institute (কমন-ওয়েলথ প্রতিষ্ঠান), এরোপ্লেন ম্যুজিয়াম, তারপর সব আর্ট গ্যালারি, ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি, বিভিন্ন দেশের বড বড় শিল্পীর আঁকা চিত্র, Portrait gallery—বৃটিশ জাতির মনীষীদের চিত্র, Tate gallery—এখানে ভাল ভাল চিত্র ও কারুশিল্পের নমুনা। Wax Museum-এ মোমের মানুষ সব, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লোকদের প্রতিকৃতি—গান্ধী, নেহেরু, জিন্না, ক্রুশ্চেভেরও আছে।

একটি প্ল্যানেটেরিয়াম রয়েছে—এখানে কৃত্রিম উপায়ে আকাশের গ্রহতারা সব দেখানো হয়।

তারপর London Tower (লণ্ডন টাওয়ার) এখানকার বিশেষত্ব রাজকীয় অলঙ্কার এখানে থাকে, রানী ভিক্টোরিয়াব মুকুটে আছে ভারতের কোহিনুর।

বৃটিশ পার্লামেণ্ট (বা Westminister Palace) দেখা হ'ল, সেখানে House of Lords আরHouse of Commons-এর (লর্ডস ও কমন্স সভার) দুটি ঘর—আমাদের বাংলাদেশের বিধান-সভার চেয়ে ছোট, যুদ্ধের সময় বোমা পড়ে হাউস সব কমন্স্ ভেঙে গিয়েছিল। তিন বছরে তৈরী ক'রে ফেলেছে—ঠিক আগের মতো।

সব থেকে আশ্চর্য কিন্তু লণ্ডন শহরের মাটির নীচে সুড়ঙ্গ পথে ইলেক্ট্রিক ট্রেন—এরা বলে টিউব।

ফুল ফোটে বনে

ডাঃ শ্রীশচীন সেনগুপ্ত

ফুল ফোটে বনে
নিরজনে,
কেবা জানে?

বিলাইয়া দেয়
আপনারে
অকাতরে।
নাহি ভাবে মনে
কিবা হবে
শুকাইবে
দিন শেষে যবে।

প্রসাধন মাঝে,
সযতনে,
তারে এনে
বেধে নানা সাজে—
বৃথা কেন
টেনে আনো
মরণ নীরবে?

সমালোচনা

মহাভারতে অনুশীলন-তত্ত্ব ঃ শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। প্রকাশক — প্রেমানন্দ সাহানা, ৫০, পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা—২০। পৃষ্ঠা—১১০, মূল্যের উল্লেখ নাই।

মহাভারত ভারতীয় সভ্যতা ও সাহিত্যের বিরাট স্তম্ভ। এত বড় গ্রন্থ জগতের কোথাও নাই। 'মহত্ত্বাৎ ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে' —মহাভারত-পাঠে এই বাণীর যথার্থতা উপলব্ধি করা যায়। ইহাতে শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, উপনিষৎ, রাজনীতি, সমরনীতি, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ের যে আলোচনা আছে তাহার তুলনা অন্যত্র মেলে না। 'যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে'। বিশাল ভারতবর্ষের সমস্ত চিন্তাধারা মহাভারত-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ, সেইজন্য ইহা আর্যকৃষ্টির বিশ্বকোষ। মহাভারত সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতীয় সাহিত্যে ও জীবনে শক্তি প্রদান করিতেছে।

আলোচ্য গ্রন্থে মহাভারতের প্রসিদ্ধ চরিত্রগুলির মধ্যে একাদশটি নির্বাচন করিয়া বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। এই চরিত্রগুলি ঃ যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, দুর্যোধন, কর্ণ, দ্রোণ, বিদুর, শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, অর্জুন। গ্রন্থকার সরল ভাষায় স্বাধীন ভাবে প্রতিটি চরিত্রের উপর যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ ধারণা হইতে তাহা পৃথক্ হইলেও তাঁহার চিন্তাশীলতা উপেক্ষণীয় নয়। যে চরিত্রের যেখানে মাধুর্য উদারতা মহত্ত্ব তাহা যেমন লেখনীমুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমনি দোষ ত্রুটিগুলি তাঁহার দৃষ্টিতে যেরূপ ধরা পড়িয়াছে তাহাও বলিষ্ঠ ভাষায় প্রকাশিত। অর্জুন, ভীষ্ম এবং শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রই সুন্দরভাবে আলোচিত, মনে হয় কর্ণের চরিত্র নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করা হয় নাই, আবার কয়েকটি চরিত্র অতি সংক্ষিপ্ত। মহাভারতের কয়েকজন মহীয়সী মহিলার চরিত্র পুস্তকে স্থান পাইলে ইহার মর্যাদা বৃদ্ধি পাইত।

কল্যাণ (হিন্দী পত্রিকা) (মানবতা অঙ্ক, ৩২তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা)—গোরখপুর গীতা প্রেস হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৭০৪ + সূচী ১৫, মূল্য ৭॥।

এই বিশেষাঙ্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে মানবতার বিচার ও বিশ্লেষণ আছে। ত্যাগী মহাত্মা, সাধুসন্ত ও বিচারশীল জননেতাদিগের অমূল্য চিন্তাধারা বহু প্রবন্ধে প্রতিফলিত। 'মানবতার স্বরূপ', 'মানবধর্ম'. 'মানবতা ও পশুত্বের ভেদ', 'বিভিন্ন ধর্মে মানবতার স্বরূপ', 'মানবতা-সংরক্ষক আদর্শ' প্রভৃতি প্রবন্ধে কিভাবে যথার্থ মানুষ হইতে পারা যায় তাহার দিগ্‌দর্শন পাওয়া যাইবে। কবিতা ও শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতিগুলিও সুন্দর। ৩৯খানি বহুবর্ণের সুদৃশ্য চিত্র সহ মোট ১৬০ চিত্রে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থ পূর্ব পূর্ব বিশেষাঙ্কের ন্যায় পাঠক-সমাজে সমাদৃত হইবে।

—জীবানন্দ

এক যে ছিল রাজা—সুকমল দাসগুপ্ত। প্রকাশক ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানী, ৬৪ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩। মূল্য ২ টাকা, পৃঃ ৮০।

রামমোহন সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীগুলিকে ছড়ার ছন্দে শিশুদের উপযোগী ক'রে প্রকাশ করার চেষ্টা রয়েছে। কিন্তু প্রচলিত সব কয়টি কাহিনীর ঐতিহাসিকতা এখনো প্রমাণিত হয়নি। উদাহরণ-স্বরূপ বলা চলে বৌঠানের 'সহমরণে' রামমোহন উপস্থিত ছিলেন কিনা—এমনকি 'সহমরণ' হয়েছিল কিনা, সে বিষয়েও আধুনিক গবেষকেরা সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাছাড়া ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম ঐতিহ্যের দিক দিয়ে দেখতে গেলে রামমোহনের ধর্মচিন্তাকে পূর্ণাঙ্গ বলা চলে কিনা সন্দেহ। সাকার-নিরাকারের দ্বন্দ্ব শিশুমনে প্রবেশ করিয়ে বিশেষ কোন লাভ নেই।

ছড়া-জাতীয় কবিতার সহজ অথচ গভীর শব্দচয়নের সৌন্দর্য এ গ্রন্থে মাঝে মাঝে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রন্থকারের উদ্যম নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়।

—শুভ গুপ্ত

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব

বেলুড় মঠে গত ১৭ই মাঘ (৩১শে জানুআরি) শনিবার স্বামী বিবেকানন্দের ৯৭তম জন্মোৎসব সারাদিনব্যাপী বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। ব্রাহ্ম মুহূর্তে মঙ্গলারতির পর বেদপাঠ দ্বারা উৎসবের শুভারম্ভ হয়। অতঃপর ষোড়শোপচারে পূজা, কঠোপনিষদ-ব্যাখ্যা, কালীকীর্তন, ভজনগান ও হোমমন্ত্রে মঠ-প্রাঙ্গণ উৎসব-মুখরিত হইয়া উঠে। স্বামীজীর মন্দির ও ঘরটি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরে ভোগারতির পর প্রায় ৬,০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। সহস্রাধিক ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ পান।

অপরাহ্নে আহূত সভায় হাওড়ার পৌরপ্রধান শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ সভাপতিত্ব করেন। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী গম্ভীরানন্দ বাংলায় বলেন: যুগাচার্য ও যুগাবতারগণের জীবনাদর্শ তত্তৎ যুগের জনসাধারণকে পথ দেখায় সত্য, কিন্তু তাঁহাদের জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য মানুষ তখনই বুঝিতে পারে না। ইহা কালক্রমে বিকশিত হয়। রামায়ণে আমরা পাই রামচন্দ্রের জীবনকাব্য, অধ্যাত্ম-রামায়ণে পাই তাঁহার জীবন-দর্শন। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের একটি দিক পাওয়া যায়, শ্রীমদ্ভাগবতে আর একদিক ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝিবার সময় আসিয়াছে।

মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী কৈলাসানন্দ ইংরেজীতে 'স্বামীজী কে, কেন আসিয়াছিলেন' প্রভৃতি প্রশ্ন তুলিয়া ঘটনার পর ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলেন, স্বামীজী সেই সপ্তর্ষির ধ্যানমগ্ন ঋষি, শ্রীরামকৃষ্ণের আহ্বানে বর্তমান যুগের উপযোগী ধর্ম স্থাপনের জন্য আসিয়াছিলেন।

নিউ ইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-কেন্দ্রের পরিচালক স্বামী নিখিলানন্দ সুললিত ইংরেজীতে বলেন: আমরা বলিয়া থাকি, স্বামীজী—আমেরিকার কাছে ভারতের দান, একথাও সমান সত্য যে তিনি ভারতের কাছে আমেরিকার দান। এই দুই মহাজাতির আদান প্রদানের উপর ভবিষ্যৎ সভ্যতা গড়িয়া উঠিবে, তাহার যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। ভারত দিবে অধ্যাত্ম-জ্ঞান, আর আমেরিকা দিবে যন্ত্র-বিজ্ঞান,—স্বামীজীর এই স্বপ্ন আজ নানাভাবে সফল হইতেছে। সভাপতি মহাশয় স্বল্প কথায় স্বামীজীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

শ্রীসারদা মঠ—দক্ষিণেশ্বরে গত ১৭ই মাঘ, শনিবার শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীসারদা মঠে বিশেষ পূজা হোম হয়, চণ্ডী ও কঠোপনিষৎ পাঠ হয়, প্রসাদ-বিতরণাদির পর অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় মঠ-প্রাঙ্গণে ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি মহিলা সভায় স্বামীজীর সুসজ্জিত প্রতিকৃতির সম্মুখে ব্রহ্মচারিণী বাসনা কর্তৃক মঙ্গল-গীতি আবৃত্তির পর প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা নারীজাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বামীজীর বিশ্বাস, আশা এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। এই মহৎ উদ্দেশ্যে তিনি বিশ্বের নারীকে আহ্বান জানান। এই মঠ তাহারই ভাব-কেন্দ্র।

শ্রীমতী সর্বাণী দেবী ইংরেজীতে 'স্বামীজীর বাণী—ত্যাগ ও সেবা' সম্বন্ধে এবং শ্রীমতী অনীতা দেবী বাংলায় নারীর শাশ্বত আদর্শ ও বর্তমান

শৈথিল্য ও ভবিষ্যৎ এবং দৈনন্দিন জীবনে কি ভাবে আদর্শের রূপায়ণ সম্ভব ?'—স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বিশদ্‌ভাবে এইগুলি আলোচনা করেন।

সভানেত্রীর ভাষণে শ্রীযুক্তা চৌধুরী স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলেন, স্বামীজীর পরিকল্পিত স্ত্রীমঠ আজ স্থাপিত হইয়াছে, এখানে সন্ন্যাসিনী ব্রহ্মচারিণীরা ত্যাগ ও সেবার ব্রতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন—ইহা বড় আনন্দের কথা। অতঃপর নারীর সনাতন আদর্শ এবং জীবনে তাহার প্রকাশ সম্বন্ধে আলোচনা-কালে তিনি পরম শ্রদ্ধার সহিত শ্রীশ্রীমার আদর্শ জীবনের উল্লেখ করেন।

সারদানন্দ-জন্মোৎসব

উদ্বোধন ভবনে গত ১লা মাঘ (১৫ই জানুআরি) বৃহস্পতিবার শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের শুভ জন্মোৎসব পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় মহা উৎসাহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগ, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, পূজ্যপাদ মহারাজের পুণ্যজীবনী-পাঠ, ভজন এবং প্রসাদ-বিতরণ উৎসবের অঙ্গ ছিল। পূজ্যপাদ মহারাজের ঘরে তাঁহার প্রতিকৃতিটি পত্রপুষ্পমাল্যাদি দ্বারা মনোরমভাবে সাজানো হয়। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত শত শত ভক্তের সমাগমে উদ্বোধন-ভবন আনন্দমুখর ছিল। ৮০০ নরনারী বসিয়া এবং প্রায় সমসংখ্যক ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

নূতন গ্রন্থাগার উদ্বোধন

নাগপুর ঃ গত ৫ই জানুআরি স্বামী শিবানন্দ মহারাজের জন্মতিথি-দিবসে বোম্বাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচ্যবন শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে নবনির্মিত দ্বিতল গ্রন্থাগার-ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে উদ্বোধন-ভাষণে শ্রীচ্যবন রামকৃষ্ণ মিশনের পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন সেবা-কার্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ শুধু ধর্মবিশ্বাসই পুনরুজ্জীবিত করেন নাই, আমাদের আত্মবিশ্বাস এবং ঐতিহ্য-চেতনাও জাগ্রত করিয়াছেন। ভারতকৃষ্টির বাণী—মানব-সেবা ও মানব-মহিমা।

এতদুপলক্ষে সমাগত বোম্বাই রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মসমন্বয়ের অপূর্ব উদ্‌গাতা। বিভিন্ন ধর্ম তিনি জীবনে সাধনা করিয়া দেখাইয়াছেন সকলের লক্ষ্য এক। একটিই সনাতন ধর্ম আছে, সেটি ঈশ্বরকে জীবনে অনুভব করা, বিভিন্ন ধর্ম নামে পরিচিত প্রচলিত সকল ধর্মই সেই সনাতন ধর্মের এক একটি দিক্ মাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের সকল শিক্ষার সার ঃ সব মানুষ এক, সত্যানুভূতিই বিশ্ব-শান্তি আনিতে পারে।

গ্রন্থাগারে নানা ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের সুনির্বাচিত বহু পুস্তক আছে, পাঠাগারে ভারতের এবং বিদেশের অসংখ্য সংবাদপত্র ও সাময়িকী টেবিলে সাজানো থাকে। নূতন গ্রন্থাগার স্থানীয় পাঠকসমাজে এক নূতন উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছে।

সমাজ-শিক্ষা

[নরেন্দ্রপুর লোকশিক্ষা পরিষদের পরিচালনায়]

নরেন্দ্রপুর ঃ গোষ্ঠী-আলোচনা—বাংলাদেশে সমাজশিক্ষা-ক্ষেত্রে সাক্ষরোত্তর শ্রেণীর কাজ এক রকম হয়নি বললেই চলে। তাই এই ক্ষেত্রে যাঁরা নূতন কাজ শুরু করেছেন তাদের একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণমিশন আশ্রম, লোকশিক্ষা পরিষদ সেইজন্য গত দুই মাসে 'সাক্ষরোত্তর শ্রেণীর সমস্যা'র উপর দুইটি গোষ্ঠী-আলোচনার ব্যবস্থা করেন, ঐ আলোচনায় ২৪ পরগনাস্থিত লোকশিক্ষা

পরিষদের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রগুলির শিক্ষকেরা অংশ গ্রহণ করেন।

দেওয়াল-চিত্র—বয়স্কশিক্ষার্থীদের সমাজ-সচেতন ক'রে তোলার জন্য লোকশিক্ষা পরিষদের দেওয়াল-চিত্রের প্রকাশ একটি অভিনব পন্থা। এ পর্যন্ত যে দেওয়াল-চিত্রগুলি প্রকাশ করা হয়েছে তা হচ্ছে যথাক্রমে দেশ-পরিচিতি, দেশমানব-পরিচিতি, 'রোদনভরা এ বসন্ত', গৃহস্থের সাথী, ভৌগোলিক সীমানির্দেশ, সমাজের সাথী, বাংলার বৈজ্ঞানিক, বাংলার সাধক, ফলে-ভরা বাংলা দেশ, কবি-পুরাণ, বাংলার গীতকার।

আলোচনা-চক্র—গত ২৭শে ডিসেম্বর স্বামীজী সেবাসংঘের উদ্যোগে গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম লোক-শিক্ষা পরিষদের পরিচালনায় 'সমাজশিক্ষাসূচীতে ছাত্র-ছাত্রীদের ভূমিকা' এই বিষয় লইয়া দুইদিনব্যাপী এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সেমিনারের উদ্বোধন করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাসচিব ডাঃ ডি এম সেন। সেমিনারে যোগদানকারী ছাত্র যুবক ও সমাজ-সেবীদিগকে জনশিক্ষার প্রকৃত পন্থা বাহির করিবার আবেদন জানান। আলোচনার বিষয়কে পাঁচটি ভাগে করা হয়। যোগদান-কারিগণ ৮টি ভাগে বিভক্ত হইয়া আলোচনা করেন এবং কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, এবং কয়েকটি কর্মপন্থাও উদ্ভাবিত হয়। সেমিনার পরিচালনা করেন বাণীপুর স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীহিমাংশু-বিমল মজুমদার।

সারাদিন আলোচনার পরে প্রতিদিন সন্ধ্যায় চিত্ত-বিনোদনের ব্যবস্থা ছিল। ২৭শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় স্বামীজী সেবাসংঘের শিশুবিভাগের পরিচালনায় 'কুশধ্বজ' পুতুলের অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। ২৮শে রাত্রিবেলা লোকশিক্ষা পরিষদের পরিচালনায় 'শয়তানের সুমতি' নামক সমাজ-শিক্ষামূলক একখানি গীতি-আলেখ্য অনুষ্ঠিত হয়।

সমাজ-শিক্ষা দিবস—গত ৭ই ও ৮ই ডিসেম্বর মেদিনীপুর জেলার মুরাদপুর বিবেকানন্দ লোকশিক্ষা মন্দিরের 'সমাজ-শিক্ষা দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে কৃষি, শিল্প, ব্যায়াম, সুতাকাটা, চলচ্চিত্র প্রভৃতির প্রদর্শনী হয়। ৮ই ডিসেম্বর নবপরিকল্পিত মাতৃ-সদন, শিশুপার্ক-এর ভিত্তিস্থাপন ও স্বামী বিরজানন্দ চ্যালেঞ্জ শীল্ড গাদি-প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয়, প্রায় ৫।৬ হাজার লোকের সমাবেশে উৎসবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ।

কার্য-বিবরণী

বারাণসীঃ পুণ্যতীর্থ কাশীধামে মিশনের এই পুরাতন সেবাশ্রমটি ইহার প্রতিষ্ঠাকাল ১৯০০ খৃঃ হইতে নিয়মিত ভাবে আর্তসেবায় রত। সম্প্রতি প্রকাশিত ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের কার্য-বিবরণীতে ইহার উল্লেখযোগ্য সেবাকার্যঃ

১১৫ শয্যা-সমন্বিত সাধারণ হাসপাতালে সারা বৎসরে ৩,৩৯৬ রোগী ভরতি করা হয়, চিকিৎসা-লাভের পর ২,৭১৪ জন আরোগ্য লাভ করিয়া চলিয়া যায়। অস্ত্র-চিকিৎসা করা হয় ৬৪৬ জনের।

বহির্বিভাগে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ২৪৭,৫৭১ (নূতন ৬৮,৭৬৪)। গড়ে দৈনিক রোগী সংখ্যা ৮৭০। ইন্‌জেকশন সহ অস্ত্র-চিকিৎ-সিতের সংখ্যা ৪৩,৫৯১। গড়ে দৈনিক ৬০০ লোককে গুঁড়া দুধ দেওয়া হইয়াছে। অসহায় নারী ও দরিদ্র ছাত্রগণকে সাহায্য বাবদ মোট টাকা ৫,২২৭৩৭ দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া দুঃস্থ-গণকে কাপড় কম্বল প্রভৃতি প্রদান করা হয়।

কর্মশক্তিহীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাগণের আশ্রয়াগার দুইটিতে যথাক্রমে ৯ ও ২২ জন ছিলেন।

প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবেরেটরি ও এক্স-রে বিভাগের রোগনির্ণয়ের কাজও উল্লেখযোগ্য।

দেবাত্মানন্দ-স্মরণে

পোর্টল্যাণ্ড বেদান্ত-কেন্দ্র : গত ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওরিগন রাজ্যে অবস্থিত পোর্টল্যাণ্ড বেদান্ত-সমিতিতে সভ্য-সভ্যা, ভক্ত ও বন্ধুগণের উপস্থিতিতে এই কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দেবাত্মানন্দজীর (বেলুড় মঠে দেহত্যাগ—৮ই আগষ্ট, ১৯৫৮, উদ্বোধন ভাদ্র, ১৩৬৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) স্মৃতি-তর্পণ অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্র-পরিচালক স্বামী অশেষানন্দ প্রারম্ভিক প্রার্থনার পর এই উপলক্ষে প্রাপ্ত পত্রসমূহের মধ্যে কয়েকখানি হইতে কিছু কিছু পাঠ করেন। প্রভিডেন্স বেদান্ত-কেন্দ্রের স্বামী অখিলানন্দ ও হলিউড বেদান্ত-কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দ তাঁহাদের মর্মস্পর্শী পত্রে স্বামী দেবাত্মানন্দের দেহত্যাগ আদর্শ সন্ন্যাসীর দেহত্যাগ বলিয়া বর্ণনা করেন। ভক্তদের হৃদয়ে শান্তির জন্য তাঁহারা প্রার্থনা জানান।

বেলুড় মঠ হইতে স্বামী নির্বাণানন্দ লেখেন : স্বামী দেবাত্মানন্দের শিক্ষার্থী ও ভক্তগণের নিকট তাঁহার অভাব যে মর্মন্তুদ মনে হইবে—ইহা তো স্বাভাবিকই। তবে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগণের সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ঈশ্বরই একমাত্র সত্য এবং পরিবর্তনশীল সংসারে সব কিছুই অনিত্য—এই চিন্তাই আমাদিগের শোকের উপশম করে। তিনি যে শ্রীরামকৃষ্ণ-লোকে স্থিতিলাভ করিয়াছেন, ইহাতে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

স্যান্‌ফ্রান্সিস্কো হইতে স্বামী অশোকানন্দ পোর্টল্যাণ্ডের ভক্তদের সমবেদনা জানাইয়া লেখেন : অপ্রত্যাশিত ভাবে তিনি চলিয়া গেলেন, তাঁহার আত্মনিবেদিত কঠোর পরিশ্রমের নিদর্শন —পোর্টল্যাণ্ড বেদান্ত-সমিতি তাঁহার অমর স্মৃতি বহন করিবে। ভবিষ্যতের বেদান্তানুরাগিগণের নিকট তাঁহার জীবন বহুতর উদ্দীপনা আনিবে।

নিউইয়র্ক হইতে স্বামী নিখিলানন্দ লেখেন : স্বামী দেবাত্মানন্দ অদ্ভুত কর্মযোগী ছিলেন। তিনি যেন হৃদয়শোণিত দিয়া পোর্টল্যাণ্ডের কেন্দ্রটি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

সমিতির প্রেসিডেন্ট মিঃ র‍্যাল্‌ফ্ টম বলেন, 'স্বামী দেবাত্মানন্দ ১৯৩২ খৃঃ যখন পোর্টল্যাণ্ডে আসেন, তখন তাঁহার প্রথম বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তখন এখানে বেদান্তানুরাগীর সংখ্যা খুবই কম ছিল। নানাবিধ প্রচণ্ড বাধার সম্মুখে যৎসামান্য সঙ্গতি লইয়া তিনি ধীরে ধীরে যেভাবে এখানকার কাজ সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছিলেন, তাহা সত্যই বিস্ময়কর।'

মিসেস রাডার স্বামী দেবাত্মানন্দের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন প্রসঙ্গে বলেন, 'তাঁহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯৩৪খৃঃ ভগবান বুদ্ধের জন্মদিনে। তিনি বুদ্ধদেব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছিলেন। The Light of Asia বইটি আমার আগেই পড়া ছিল। যে গভীর শ্রদ্ধা লইয়া তিনি 'বুদ্ধদেবের জীবন ও বাণী' সম্বন্ধে বলিতেছিলেন, তাহাতে আমি মুগ্ধ হইলাম। ইহার পর প্রায় নিয়মিত ভাবেই তাঁহার বক্তৃতাদি শুনিতে আসিতাম। বেদান্তদর্শন এবং তদনুষঙ্গী ধর্মাচরণ আমার নিকট সম্পূর্ণ নূতন হইলেও তিনি তাঁহার বিষয়বস্তু এমন স্বচ্ছ ও সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করিতেন যে ক্রমশঃ উহার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলাম। স্পষ্টই বুঝিতে পারিতাম যে তিনি যাহা বলিতেছেন তাঁহার জীবনও ঐ সত্যের সহিত এক সুরে বাঁধা। সময়ে সময়ে তিনি এমন একটি উচ্চ প্রেরণা লইয়া বলিতেন যে আমার মনে হইত—আরও বহু লোক কেন এই সব অমূল্য সত্য শুনিতে আসে না। একদিন তাঁহার নিকট এই ভাবটি প্রকাশ

করিলাম। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রশান্ত বিনীত এবং সুমিষ্ট হাসি হাসিয়া কহিলেন— যখন তাদের সময় হবে, তখন আসবে বই কি।

'তিনি যাহা কিছু করিতেন তাহাতে তাঁহার সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া দিতেন। তাঁহার ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টি এবং অপরের কল্যাণ ও সুবিধার দিকে মনোযোগ ছিল প্রখর। এই সমিতির স্থায়ী গৃহ অন্বেষণ ও ক্রয় ব্যাপারে প্রতিপদে তাঁহার ভিতর আশ্চর্য ভগবন্নির্ভরতা দেখিয়াছি। আদর্শনিষ্ঠা, দূরদৃষ্টি এবং আশাপূর্ণ মনোভাবের সহিত তাঁহার ভিতর ব্যাবহারিক জ্ঞানের একটি চমৎকার সমন্বয় ছিল। তাঁহার মিতব্যয়ও ছিল আশ্চর্য। ১৯৩২ খৃঃ এদেশের ব্যাপক অর্থনৈতিক সঙ্কটের সময় এই রক্ষণশীল পোর্টল্যাণ্ড শহরে বেদান্ত-সমিতিটিকে সুদৃঢ় বনিয়াদের উপর স্থাপন করা একটি অসাধ্য সাধন বই কি। কিন্তু স্বামী দেবাত্মানন্দ এই অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন।

'পোর্টল্যাণ্ড শহরের এই বেদান্তকেন্দ্রটি ছাড়া ভক্ত ও বন্ধুগণের নির্জনে ঈশ্বরচিন্তার জন্য শহরের বাহিরে এক 'আশ্রম' স্থাপনের সঙ্কল্প তাঁহার বহুদিন হইতেই ছিল। শ্রীশ্রীমা সারদা-দেবীর জন্মশতবার্ষিকীর সময় এখানে একটি মন্দির নির্মিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমার উদ্দেশ্যে ইহাই স্বামী দেবাত্মানন্দের শেষ সেবা-কৃত্য।'

পোর্টল্যাণ্ড বেদান্তসমিতির সেক্রেটারী মিসেস সোয়ানসন্ বলেন, 'স্বামী দেবাত্মানন্দের আশ্চর্য শান্তভাব, সম্ভ্রমবোধ এবং নির্মলতা আমার চিত্তে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। তাঁহার ক্লাসগুলির মাধ্যমে যে আধ্যাত্মিক প্রেরণা তিনি আমাদের ভিতর সঞ্চারিত করিতেন, তাহা কখনও আমরা ভুলিতে পারিব না। শহরের বাহিরে আশ্রমটিতে গাছপালা ও লতাফুলফলের মধ্যে তাঁহার অপর এক মূর্তি যেন আমরা দেখিতে পাইতাম। ইহাদের সহিত তখন যেন তিনি সম্পূর্ণ তাদাত্ম্য বোধ করিতেন। এই পুণ্যচরিত্র সন্ন্যাসীর নিকট আমরা গভীর নিঃস্বার্থ পিতৃস্নেহ পাইয়াছি।'

সমিতির কোষাধ্যক্ষ মিস্ ওলসেন পোর্টল্যাণ্ডে স্বামী দেবাত্মানন্দের দীর্ঘ কর্মজীবনের একটি ধারাবাহিক বর্ণনা প্রসঙ্গে বিবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কী অবিচলিত বিশ্বাস, স্থিরতা এবং সাহস-সহকারে শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ এই সন্ন্যাসী শ্রীভগবানের কায করিয়া গিয়াছেন তাহার অনেক উদাহরণ দেন।

সিয়াট্‌ল্ বেদান্তকেন্দ্রের পরিচালক স্বামী বিবিদিষানন্দ—মঠে যোগদান করিবার পূর্বে স্বামী দেবাত্মানন্দের শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের সান্নিধ্য ও আশীর্বাদ লাভের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে সিয়াট্‌ল্ কেন্দ্র পোর্টল্যাণ্ড হইতে বেশী দূরে নয় বলিয়া স্বামী দেবাত্মানন্দের উদার ও প্রাণময় সঙ্গ এই দুই কেন্দ্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করিয়াছিল। সিয়াট্‌লের ভক্ত ও বন্ধুগণ স্বামী দেবাত্মানন্দের বিয়োগব্যথা গভীরভাবে অনুভব করিয়াছেন।

সর্বশেষে স্বামী অশেষানন্দ স্বামী দেবাত্মা-নন্দের অনুসৃত আধ্যাত্মিক আদর্শের উল্লেখ করিয়া ভক্ত ও বন্ধুগণকে আশা ও উৎসাহের সহিত অকুণ্ঠিতভাবে নিজ নিজ ধর্মজীবনের সহিত সমিতির কার্যে অবহিত হইবার কথা বলেন।

মঠ ও মিশনের নবপ্রকাশিত পুস্তক

ভগিনী নিবেদিতা—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা প্রণীত, রামকৃষ্ণ মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪৭৭, মূল্য সাড়ে সাত টাকা।

১৯৫২ খৃঃ নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বৎসরেই ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ভগিনী নিবেদিতার একখানি প্রামাণিক জীবনী প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অতি সাবধানতা সহকারে উপাদান সংগ্রহ করিয়া এই মূল্যবান জীবনীগ্রন্থ রচিত। ভগিনী-সম্বন্ধে সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থগুলির এবং বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের অল্পবিস্তর সমালোচনাও এই গ্রন্থে আপনা হইতে আসিয়া গিয়াছে, কারণ ভগিনী-সম্বন্ধে নানা ভ্রান্ত ধারণা ও কল্পনা নানা মহলে প্রচলিত। এক, দুই ক্রমে একচল্লিশটি অধ্যায়ে গ্রন্থ সম্পূর্ণ, ভগিনী নিবেদিতার জীবনের ক্রমবিকাশ ধীরে ধীরে সুন্দর-ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ১৩খানি চিত্র ও শ্রীনন্দলাল বসু অঙ্কিত দুইখানি নকসা পুস্তকটির অলঙ্কার। লেখিকা 'ব্রহ্মচারিণী আশা' নামে উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকার নিকট সুপরিচিতা।

বিবিধ সংবাদ

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

গভীর দুঃখের সহিত আমরা লিপিবদ্ধ করিতেছি যে গত ২১শে জানুআরি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও দেশজননীর নীরব সেবক ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ নিউ আলিপুরে তাঁহার নিজ বাসভবনে মাত্র ৬৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। কেওড়াতলা মহাশ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লীতে তাঁহার দেহ ভস্মীভূত হয়। প্রায় দুই মাস পূর্বে দিল্লীতে তাঁহার শরীরে একটি অস্ত্রোপচার করা হয়, এবং ৮ই ডিসেম্বর কলিকাতায় আসিয়া অবধি তিনি শয্যাগতই ছিলেন।

১৮৯৪ খৃঃ পুরুলিয়ায় অভ্র-ব্যবসায়ী রামচন্দ্র ঘোষের তৃতীয় পুত্ররূপে জ্ঞানেন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে গিরিডিতে পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি মেধাবী ছাত্ররূপে পরিচিত হন। শেষোক্ত স্থানেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে গবেষণা-কার্যে উৎসাহিত করেন। ১৯১৫ খৃঃ এম. এস-সি পাস করিবার পরই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নব-প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। Abnormality of strong electrolytes বিষয়ক তাঁহার গবেষণা বিশ্বের বৈজ্ঞানিক-গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

১৯১৮ খৃঃ জ্ঞানেন্দ্র ইংলণ্ড যাত্রা করেন। প্রথমে সেখানে এবং পরে জার্মানিতে তিনি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণের সংস্পর্শে আসেন। ১৯২১ খৃঃ ঢাকায় নবপ্রতিষ্ঠিত আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন-বিভাগের ভার গ্রহণ করিয়া তিনি ধীরে ধীরে উহা গড়িয়া তুলিতে থাকেন।

ক্রমে ক্রমে ভারতের বিজ্ঞান-জগতে বিভিন্ন বিশিষ্ট ভূমিকায় তাঁহার কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হয়। ১৯২৪ খৃঃ ভারতের রসায়ন-সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া পর বৎসর তিনি বিজ্ঞান কংগ্রেসের রসায়ন-বিভাগের সভাপতি হন, অতঃপর ১৯৩৯ খৃঃ ঐ মহাসভার মূল সভাপতি নির্বাচিত হন।

বাঙ্গালোর বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানের (১৯৩৭-৪৭)

ও খড়্গপুর টেকনোলজির পরিচালক (১৯৫০-৫৪), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯৫৪-৫৫) এবং পরিশেষে ১৯৫৫ খৃঃ প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ কার্যের ভার তিনি কৃতিত্বের সহিত বহন করিয়াছেন।

তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে দেশ যে শুধু একজন প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক হারাইল তাহা নয়—হারাইল একজন শিক্ষাবিদ্, কর্মবীর, কল্যাণ-ব্রতী ও আদর্শবাদী মানুষ। এতগুলি গুণের একত্র সমাবেশ যে কোন দেশে যে কোন কালে দুর্লভ। আমরা তাঁহার মহান্ আত্মার চিরশান্তির জন্য প্রার্থনা করি।

পরলোকে ভক্ত ভূপতিচন্দ্র দাশগুপ্ত

গত ১২ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার ভোরবেলা (২৮ ১১ ৫৮) ৮৫ বৎসর বয়সে ভক্ত ভূপতিচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় কলিকাতা বকুলবাগান রোড-স্থিত বাটীতে সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

যৌবনে আইন পড়া ছাড়িয়া তিনি গ্রামসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। হাই স্কুল, প্রাইমারী স্কুল, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও পথ ঘাট দীঘি ইত্যাদি তাঁহার বহু লোকহিতকর কার্যের নিদর্শন এখনও গ্রামে গ্রামে বিদ্যমান রহিয়াছে। স্ত্রীশিক্ষার প্রতিও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল।

তাঁহার ধর্মপিপাসু মন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের সঙ্গলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল। ১৯১৫ খৃঃ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ বিক্রমপুর-কলমায় ভূপতিবাবুকে দেখিয়া তাঁহার প্রশংসা করেন। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য এই গৃহযোগী ধর্মচর্চা ও ভক্তসেবাদিতেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সন্ন্যাসীরা তাঁহার প্রতি বরাবর বিশেষ প্রীতি পোষণ করিতেন। পাকিস্তান হওয়ার পর তিনি কলমা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বাস করিতে থাকেন। কোন দুঃখকষ্টই তাঁহার মনকে অবসন্ন করিতে পারে নাই। সংসারী হইয়াও চিরকাল সম্পূর্ণ নির্বিকার ছিলেন এবং অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সে দীর্ঘকাল রোগভোগ করিয়াও তাঁহার মুখে কষ্টের চিহ্নমাত্র দেখা যায় নাই। মাত্র ৮ মাস পূর্বে তাঁহার সাধ্বী সহধর্মিণী পরলোক গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার পূত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণচরণে শাশ্বত শান্তি লাভ করুক। ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ।

উৎসব-সংবাদ

বারাসতঃ গত ৫ই হইতে ১১ই জানুআরি সপ্তাহব্যাপী মহাপুরুষ মহারাজের ১০৩তম জন্মোৎসব তদীয় জন্মস্থান ২৪ পরগনা জেলার বারাসত-স্থিত শিবানন্দধামে শ্রীরামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ষোড়-শোপচারে পূজা, শিবমহিম্নস্তোত্র ও চণ্ডীপাঠ, শিবানন্দবাণী-আলোচনা, ভজন, কীর্তন, কথকতা, শোভাযাত্রা, প্রসাদ-বিতরণ, জনসভায় বক্তৃতা প্রভৃতির মাধ্যমে উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রতিদিন বহুসংখ্যক নরনারী যোগদান করেন এবং অন্যূন ১৬,০০০ লোক বসিয়া প্রসাদ পান। বিভিন্ন দিনে বহু সাধু ও ভক্ত পাঠ আলোচনা ও কথকতায় অংশ গ্রহণ করেন।

হাফলং (আসাম): শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-সমিতির উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কল্পতরুরূপে আবির্ভাব-দিনে—১লা জানুআরি জনসাধারণের পক্ষ হইতে সমিতির আবাসিক ছাত্রাবাসে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর পুণ্য জন্মতিথিও সারাদিনব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠানের ভিতর উদ্‌যাপিত হয়। প্রভাতে মঙ্গলারতি, ভজন-সঙ্গীত, পূজার্চনা হোমাদি, কথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ, সর্বসাধারণে

প্রসাদ-বিতরণ, অপরাহ্লের জন-সভা সমগ্র হাফলং শহরকে আনন্দমুখর করিয়া তুলিয়াছিল।

তেজপুর ঃ গত ১লা জানুআরি তেজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মতিথি উৎসব ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কল্পতরু উৎসব পূর্বাহ্ণে চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ, ষোড়শোপচারে পূজা, হোম ও শতাধিক ভক্তগণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ দ্বারা সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। সায়াহ্নে আরতির পর এক মহতী ধর্মসভায় সভাপতি শ্রীচন্দ্রনাথ শর্মা ও শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য শ্রীশ্রীমায়ের জীবনকথা আলোচনা ও কল্পতরু উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

সংস্কৃতি-সংবাদ

প্রাচ্য-বাণী ঃ গত ১০ই জানুআরি কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে প্রাচ্যবাণী মন্দিরের ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কার্যবিবরণীতে ডক্টর যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী বলেন গত ডিসেম্বর মাসের প্রাচ্যবাণী মন্দির হইতে 'শ্রীশ্রীগৌরতত্ত্বম্' এবং 'ভক্তি-বিষ্ণুপ্রিয়ম্' নামক সংস্কৃত নাটক—এই দুইটি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। সর্বসমেত প্রাচ্যবাণী-প্রকাশিত গবেষণা-গ্রন্থের সংখ্যা ১৬০। প্রাচ্যবাণী সংস্কৃত-সঙ্গীত-মহাবিদ্যালয়, সংস্কৃত-ভাষণ-পরিষদ এবং মহিলা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় বিশেষভাবে সংস্কৃত শিক্ষার সম্প্রসারণের কাজে রত রহিয়াছে। এই সভায় ডক্টর যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী-রচিত 'শ্রীশ্রীমহাপ্রভু-হরিদাসম্' নামক সংস্কৃত *নাটক বিশেষ* কৃতিত্বের সহিত অভিনীত হয়।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২৭শে ফাল্গুন (১১.৩.৫৯) বুধবার শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে বেলুড় মঠে ও সর্বত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যজন্মতিথি-উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে এবং পরবর্তী রবিবার ১লা চৈত্র (১৫ ৩ ৫৯) এতদুপলক্ষে বেলুড় মঠে সারাদিনব্যাপী মহোৎসব হইবে।

উদ্বোধন

শিক্ষান্তে উপদেশ

বেদমনূচ্যাচার্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি—সত্যং বদ। ধর্মং চর।
স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ ···সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্।
কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্।
স্বাধ্যায়-প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্॥ দেবপিতৃকার্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্।
মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব।
অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্মাণি। তানি সেবিতব্যানি।
নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি॥
নো ইতরাণি। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্।
শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্।···
এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষৎ।
এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্। এবমু চৈতদুপাস্যম্॥

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ১।১১।১—৪

বেদ অধ্যাপনান্তে আচার্য শিষ্যকে বেদার্থ গ্রহণ করাইতেন : সত্য বলিবে, ধর্ম আচরণ করিবে। অধ্যয়নে ভুল করিবে না।··সত্য হইতে বিচ্যুত হইও না। ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইও না। আত্মরক্ষা-বিষয়ে অবহিত হইও। শ্রীবৃদ্ধিজনক শুভ কর্ম হইতে বিচ্যুত হইও না। স্বাধ্যায় ও অধ্যাপনাবিষয়ে প্রমাদগ্রস্ত হইও না। দেবকার্য ও পিতৃকার্যে ভুল করিও না। মাতা, পিতা, আচার্য ও অতিথিকে দেবতা জ্ঞান করিবে। যে সকল কর্ম অনিন্দিত তাহাই অনুষ্ঠান কর, অপরগুলি নহে। আমাদের যাহা সদাচার তাহাই তোমার অনুষ্ঠেয়, অপরগুলি নহে। শ্রদ্ধাসহকারে বিনম্রভাবে শাস্ত্রভয়ে বন্ধুভাবে দান করিবে।···

ইহাই বিধি, ইহাই উপদেশ, ইহাই বেদের রহস্য, ইহাই ঈশ্বরাজ্ঞা। এই প্রকারেই সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠান করিবে।

কথাপ্রসঙ্গে

শিক্ষায় ধর্ম

প্রতি বৎসরের মতো এবারও যথানিয়মে যথাসময়ে বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল। হয় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, না হয় কোন রাজ্যের রাজ্যপাল সভাপতিরূপে সুচিন্তিত ভাষণের মাধ্যমে নূতন স্নাতকদিগকে লক্ষ্য করিয়া দেশবাসীকে শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদের পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য জ্ঞাপন করিয়াছেন, কোন কোন ভাষণে গঠনমূলক ইঙ্গিতও পাওয়া গিয়াছে।

সমাবর্তন-উৎসব ছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষা-সংস্থার ও কয়েকটি শিক্ষক-প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সম্মেলনে বিশিষ্ট নেতারা আহূত হইয়া যাহা বলিয়াছেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য। তন্মধ্যে জানুআরির মাঝামাঝি মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শ-সমিতির (Central Advisory Board of Education) ২৬তম সভা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। এইখানে আলোচিত হইয়াছে শিক্ষার ক্ষেত্রে আশু পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার ও আসন্ন পুনর্গঠনের কথা—যাহার ফল জাতীয় জীবনে সুদূরপ্রসারী।

এতদ্ব্যতীত কয়েকটি কমিশনও শিক্ষক, ছাত্র এবং শিক্ষার ব্যাপার লইয়া অনেক তথ্য অনুসন্ধান করিয়াছেন ও তাঁহারা প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের আলোচনার বিষয় প্রধানতঃ ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও শিক্ষকদের আর্থিক অসন্তোষ।

এইগুলি সব দেখিয়া শুনিয়া পড়িয়া মনে হয়, সকলেই বুঝিতেছেন শিক্ষা ঠিক পথে চলিতেছে না, কোথায় যেন একটা বিরাট ফাঁক রহিয়া যাইতেছে—যাহা বক্তৃতা দিয়া, প্রবন্ধ লিখিয়া, এমন কি টাকা ঢালিয়াও পূর্ণ করা যাইতেছে না। শিক্ষিত-অশিক্ষিতের ব্যবধান, ধনী-দরিদ্রের ক্রমবর্ধমান ব্যবধান বিরাট দৈত্যের মতো মুখব্যাদান করিতেছে।

পরিতাপের বিষয় 'মেকলে'-প্রবর্তিত কেরানি-সৃষ্টিকারী শিক্ষাই এখনও চালু রহিয়াছে। প্রাণপণ পড়িয়া, মুখস্থ করিয়া, যথাসর্বস্ব খরচ করিয়া কেহ বা পরীক্ষায় সফল হইয়া এবং অধিকাংশই বিফল হইয়া জীবন-সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, কিন্তু যুঝিতে পারিতেছে না। স্কুল বা কলেজ তাহাকে যে শিক্ষা দিয়াছে তাহাতে তথ্য হিসাবে বহু কিছু জানিবার (informations) থাকিলেও জীবন-সংগ্রামে কাজে লাগাইবার বিশেষ কিছু নাই। কেবল একটা ব্যর্থতা ও হতাশা জাতীয় জীবনকে ঘিরিয়া ফেলিতেছে, বিকাশ-উন্মুখ মনকে পঙ্গু করিতেছে।

শিক্ষকদের অসন্তোষ, ছাত্রদের বিক্ষোভ ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ কাহারও দৃষ্টি এড়ায় না। সর্বোপরি দেখা দিয়াছে শিক্ষার ক্ষেত্রেও দুর্নীতি। সমাজে যখন দুর্নীতি দেখা দেয়, তখন তাহা সংশোধন করিবার চেষ্টা করা হয় শিক্ষার স্তর হইতে। ইহাতে পরবর্তী পুরুষ (generation) দুর্নীতি-মুক্ত হয়। কিন্তু যখন শিক্ষার ক্ষেত্রেই এই বীজাণু প্রবেশ করে, তখন কি উপায়?

মানুষ থাকিলেই সমাজ থাকিবে, রাষ্ট্রও থাকিবে; এবং সমাজ ও রাষ্ট্র থাকিলে চিরকাল তাহা সুষ্ঠুভাবে চলিবে, এমন কোন কথা নাই বা নিয়ম নাই। সমাজ বা রাষ্ট্র এক একটি যন্ত্রের মতো, তাহা চালায় মানুষ, অতএব তাহাদের সুপথে বা বিপথে চলা নির্ভর করে

চালক মানুষের উপর। যন্ত্র কালক্রমে যখন বিকল হইয়া যায়, তখন মানুষই তাহা সারাইয়া লয়, অথবা পুরাতনকে বাতিল করিয়া নূতন যন্ত্র সৃষ্টি করে। সে জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সুশিক্ষিত মানুষ—সচেতন মানুষ।

সেই মানুষ দেখিবে সমাজের উত্থান ও পতন, লক্ষ্য করিবে রাষ্ট্রের উন্নতি ও অবনতি, উহাদের কারণ অনুসন্ধান করিবে, তাহার পর অবনতির কারণগুলি এবং উন্নতির বাধাগুলি অপসারিত করিয়া জাতিকে ও সমাজকে আবার অগ্রগতির পথ ধরাইয়া দিবে। এইরূপ মানুষ যে দেশে, যে সমাজে যত বেশী—সেই দেশ ও সমাজ তত সহজে সঙ্কট উত্তীর্ণ হইতে পারে। এজন্য প্রয়োজন শিক্ষা—ব্যাপক শিক্ষা, গভীর শিক্ষা।

* * *

বর্তমানে আমাদের দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতাসত্ত্বেও কেন সকলে তাহা অনুভব করিতে পারিতেছে না, কেন বিক্ষোভ প্রশমিত হইতেছে না, কেন দুর্নীতি জাতীয় জীবনের সর্ব স্তরে বিষক্রিয়া করিতেছে—এগুলির অস্তিত্ব অস্বীকার না করিয়া—এগুলির কারণ অনুসন্ধান আবশ্যক। কোন কোন স্বয়ংসন্তুষ্ট নেতার মতে এগুলি সাময়িক, এবং দীর্ঘ দিন পরাধীন থাকিবার পর স্বাধীনতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। —কতকটা চিররুগ্‌ণের সহসা স্বাস্থ্যলাভের মতো। এগুলির জন্য চিন্তার কিছু নাই।

আরও চিন্তাশীল লোক দেশে আছেন, তাঁহারা জিনিষটিকে অন্য ভাবে দেখেন। ঠিক কথা, দীর্ঘ দিনের পরাধীনতা জাতীয় জীবন জর্জরিত করে, কিন্তু ভারতের অধিকাংশই তো কয়েক শত বৎসর পরাধীনতায় পাথরচাপা ছিল, কিন্তু এরূপ নীচতা নিষ্ঠুরতা অসাধুতা দুর্নীতি স্বার্থপরতা—এত ব্যাপকভাবে কখন দেখা গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না, বরং ত্যাগ শৌর্য বীর্যের কাহিনীচ্ছটায় কলঙ্কিত-চন্দ্রও রাত্রির নীরবতা আলোকিত করিয়াছে। তবে আজ এই নবযুগের উদিত-সূর্য রাহুগ্রস্ত কেন?

কোন কোন চিন্তাশীল মনীষীর মতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ভারতের সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি করিয়াছে। আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে প্রবেশ করিব না। শুধু স্মরণ করিব সেই সময়কার অসহায় বিপন্ন অনিশ্চয়তার অবস্থা। মনোবিজ্ঞানের অভিমত: যে সকল শিশু শান্তিপূর্ণ সংসারের প্রীতিপূর্ণ পরিবেশে কর্তব্যরত পিতামাতার স্নেহক্রোড়ে একটি নিশ্চিন্ত নিশ্চিত আশ্রয়ে লালিত পালিত হয়, তাহারাই শিক্ষায় দীক্ষায় ক্রমশঃ পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে। অপর পক্ষে যে গৃহে কেবল কলহ, পিতামাতায় মনান্তর, সন্তান-পালনে অবহেলা, সেখানে শিশু নিজেকে সর্বদা অবহেলিত অসহায় বিপন্ন অনুভব করে, সে ক্রমশঃ বড় হইয়া সকলকে অবিশ্বাস করে, অপরের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে, প্রতারণা করে, উচ্ছৃঙ্খল হইয়া সংসারে ও সমাজে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিয়াই আনন্দ লাভ করে। এইরূপ অস্বাভাবিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে সমাজে তাহার অশুভ ফল অবশ্যই ব্যাপক হইয়া দেখা দিবে।

প্রাচীন কাল হইলে বলিতাম ত্রিকালদর্শী ঋষিরা সমাজ-নিয়ম রচনা করেন, এখন বলিতে হইবে বিশেষজ্ঞেরা পরিসংখ্যান রচনা করিয়া বলিয়া দেন: কি জন্য কি হইয়াছে, আবার কি করিলে কি হইবে।

সমাজ-শরীরকে পূর্বোক্ত ব্যাধিগুলি হইতে মুক্ত করিবার জন্য শুধু ঘরে বাইরে শান্তির বাণী প্রচার করিলেই চলিবে না, তাহা হইলেই যুদ্ধ ও তাহার আনুষঙ্গিক উপসর্গগুলি দূরীভূত হইবে না, শান্তির জন্য স্বাক্ষর সংগ্রহ করিলেও নয়, সর্বশেষ বলিতে পারি প্রবন্ধ লিখিয়াও নয়। তবে? তবে কি কোন উপায় নাই?

কেহ কেহ সমরায়োজন ব্যর্থ করিবার জন্য নৈতিক বর্ম-পরিধানের আন্দোলন (Moral re-armament movement) চালান। তাহাও শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয় নাই। সময় উপস্থিত হইলে অহিংসাবাদীরাও যুদ্ধকে সমর্থন করে। শান্তিবাদীরাও ন্যায়ের পক্ষ বলিয়া এক পক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং আবার অশান্তির দাবানল জ্বলিয়া উঠে। এই অনিশ্চয়তা, এই অশান্তিই বর্তমানের ব্যাধি। ইহারই জন্য মানুষ দু-দিনে দু-বছরের ভোগ শেষ করিতে চাহিতেছে, ইহারই জন্য একজন পাঁচজনের ভোগ্য বস্তু কাড়িয়া হউক, প্রতারণা করিয়া হউক একা ভোগ করিতে চাহিতেছে। তদুপরি কথা এই, একজনের দেখিয়া আবার দশজন শিখিতেছে। সংক্রামক ব্যাধির মতো ইহা ছড়াইয়া পড়িতেছে। কে রোধ করিবে? সকলেই অল্পবিস্তর রোগাক্রান্ত।

তবে কি সবই ধ্বংসের পথে? না বাঁচিবার উপায় আছে? সংক্রামক রোগে মৃত্যুমুখে উপনীত পিতা সন্তানকে কোন নিরাপদ স্থানে সরাইয়া দেন, সেখানে গিয়া সে বাঁচিয়া থাকুক, নিমজ্জমানা জননীও শেষ পর্যন্ত সন্তানকে বক্ষ হইতে ছিন্ন করিয়া স্রোতের মুখে ছাড়িয়া দেন—যদি সে বাঁচিয়া যায়।

* * *

গত মহাযুদ্ধজনিত আতঙ্কের ও ঘোরতম দুর্নীতির সময়—কি রাজনীতির ক্ষেত্রে, কি আর্থনীতিক ক্ষেত্রে আইন অমান্য করিবার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, পরে আর কেহ ঐ বৃত্তিকে সংযত করিতে পারে নাই, আজ সমাজ তাহারই বিষময় ফল ভোগ করিতেছে। তার পর দেখা দিয়াছে দুর্ভিক্ষ ও দাঙ্গা, সমাজ ধ্বস্তবিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। অবশেষে অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়াছে দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা—এ যেন ডানা ভাঙিয়া দিয়া পাখীকে পিঞ্জর হইতে মুক্তি দেওয়া হইল! দশটি বৎসরের মধ্যে এতগুলি বড় বড় ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করা সুদৃঢ়স্নায়ুর পক্ষেও দুঃসহ। দুর্বল জাতির জীবনের তন্তু ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। পূর্বের আঘাত-পরম্পরার পর কথঞ্চিৎ বিরাম ও বিশ্রাম পাইলে হয়তো নব নব পরিবর্তনের আবেগ দেশ সহ্য করিতে পারিত। যদি ধীরে ধীরে তলদেশ হইতে—প্রাথমিক শিক্ষার স্তর হইতে, দরিদ্র শ্রমিক-কৃষকের স্তর হইতে দেশের উন্নতি-পরিকল্পনা শুরু করা হইত, তবে হয়তো এতদিনে সকল আঘাতের ব্যথা দূর হইয়া যাইত।

এ কর্তব্য এখনও পড়িয়া রহিয়াছে, এখান হইতেই কাজ শুরু করিতে হইবে। দেশবাসীর অন্ন বস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করাই প্রাথমিক কর্তব্য, আমদানী-রপ্তানী, বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠা ও দেশ-বিদেশের প্রশংসা অর্জন তাহার পরবর্তী কর্তব্য। কিন্তু আমরা পরেরটিকে ধরিয়াছি আগে, দশ বৎসরের মধ্যে পঁচিশ বৎসরের কাজ করিয়া স্বীয় কীর্তি অর্জন করিতেই আমরা ব্যস্ত, কিন্তু কতগুলি জীবনের মূল্যে যে ইহা সম্ভব হইতেছে তাহা ভাবিবার সময় আমাদের নাই। এই সময়াভাবের ভাব, এই তাড়াতাড়ি কিছু করিবার ইচ্ছা—ইহাও বর্তমানের আর একটি ব্যাধি।

দশম শতাব্দীতে ঘুমাইয়া হঠাৎ আমরা বিংশ শতাব্দীতে জাগিয়া উঠিয়াছি, লিভায়াথানের ঘুম এখনও সম্পূর্ণ ভাঙে নাই। পরিকল্পনার সঙ্গীতে এ ঘুম ভাঙানো যায় না, এজন্য প্রয়োজন জনগণের প্রতি নেতাদের সহিষ্ণু সহানুভূতি ও প্রাত্যহিক সহযোগিতা। যাহা হইবার হইয়াছে, এখন যাঁহারা বিবিধ ক্ষেত্রে কার্যভার লইয়া আছেন, তাঁহাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য যাহাতে ভবিষ্যৎ পুরুষ (generation) মানুষ হইয়া উঠে, তাহারাও যেন অবহেলিত না

হয়। তাহার জন্য প্রাথমিক স্তর হইতে এই মানুষ গঠনের শিক্ষা দিতে হইবে। শিক্ষাকে শুধুমাত্র জীবিকার উপযোগী করিয়া চালু করা ঠিক নহে, কিন্তু আজ শিক্ষায় যে পরিবর্তন আসিতেছে, তাহার মূল লক্ষ্য এই দিকেই। পক্ষান্তরে বলিতে চাই, ছাত্রকে যদি একটি পরিপূর্ণ 'মানুষে' পরিণত করা যায়, তবে সে জীবনে যে কোন অবস্থাতেই পড়ুক না কেন, সে সদ্‌ভাবে জীবিকা অর্জন করিতে সক্ষম হইবে। নতুবা আজিকার ছাত্র যেমন এম্ কম্ পাস করিয়া ক্ষুদ্র ব্যবসাও করিতে পারে না, ব্যবসায়ীর হিসাব রাখিয়াই সন্তুষ্ট হয়, এম এস-সি পাস করিয়া ইলেকট্রিক লাইনে হাত দিতে ভয় পায় এবং অসন্তুষ্টচিত্তে মাষ্টারি খোঁজে—আগামী কালও দেখা যাইবে টেক্‌নিক্যাল্ পাস করিয়া যুবকেরা না করিবে ছুতারের কাজ, না করিবে কামারের কাজ, তাহারা চাহিবে টেবিল চেয়ার ও মাথার উপর বিজলী পাখা—তাহারা খুঁজিবে অফিসারের কাজ।

প্রকৃত মানুষের লক্ষণ আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা। জীবন্ত মানুষের লক্ষণ সংগ্রাম-শীলতা। শিক্ষিত মানুষের লক্ষণ সাধুতা ও কর্তব্য-পরায়ণতা। আগামী দিনের ছাত্রদিগকে যদি আমরা এগুলি শিখাইতে পারি, তবেই তাহাদের মানুষ হইবার শিক্ষা দেওয়া হইবে, তবেই তাহারা হাতের কাছে যে কাজ পাইবে তাহাই করিবে, কোন কাজ ঘৃণা করিবে না, কোন কাজ ছোট মনে করিবে না। একদিকে যেমন তাহারা ঐ সকল কাজ করিবে জীবন ও জীবিকার তাগিদায়, অন্য দিকে তেমনই করিবে আনন্দে ও কর্তব্যবোধে, দেশ ও জাতির অগ্রগতির পথে আমিও কিছু করিতেছি—এই গৌরববোধে।

* * *

সম্প্রতিকালের ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতা, কর্মচারীদের কর্তব্য-অবহেলা, সকলের—বিশেষত ব্যবসায়ীদের দুর্নীতি সবই এক সূত্রে গাঁথা। কোন কোন মনীষীর মতে ধর্মভাব-বিলুপ্তিই ইহার কারণ; নীতি ও ধর্মমূলক শিক্ষা দিলেই এ সকল সমাজ-ব্যাধি বিদূরিত হইবে। ইহার উত্তরে দুইটি প্রশ্ন করিতে হয়।

(১) যে সব রাষ্ট্র তথাকথিত ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সেখানে কি দুর্নীতি নাই?

(২) ভারতের ব্যবসায়ী-সম্প্রদায় কি যথেষ্ট পরিমাণে ধর্ম আচরণ করে না?

প্রশ্নদুইটির উত্তর সকলেরই জানা। অতএব সমস্যার সমাধানে আমাদের যাইতে হইবে আর একটু গভীরে।

প্রকৃত ধর্ম কাহাকে বলে? সাধারণতঃ ধর্ম বলিতে যাহা বুঝায় তাহা হয় সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস, নয় কতকগুলি আচার অনুষ্ঠান, অথবা এই দুই-এর সমাবেশ। ঐগুলি এক সময়ে অনেক কাজ করিয়াছে, আদিম মানবকে, বন্য বা বেদুইনকে কতকটা সংযত করিয়াছে, কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞানযুগের জটিল মানব ঐসকল বিশ্বাস ও আচার হাসিয়াই উড়াইয়া দিতেছে, ফলে অবশ্য তাহাকে নূতন কতকগুলি নিয়ম, আচার ও বিশ্বাস সৃষ্টি করিতে হইতেছে, তাহার নাম সে 'ধর্ম' না দিক অন্য কিছু দিবে। কালক্রমে তাহাই আবার ধর্মের স্থান অধিকার করিবে ও নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করিবে।

সর্বসংস্কারমুক্ত অসাম্প্রদায়িক ধর্ম কিছু আছে কি—যাহা সর্বাবস্থায় সর্বদেশে সর্বকালে সকলকে শিক্ষা দেওয়া যায়—এবং সে শিক্ষা তাহার উপকারই করিবে, একটি মানুষকে একটি উৎকৃষ্টতর মানুষে পরিণত করিবে?

এ প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয়, হ্যাঁ—এরূপ ধর্ম আছে। চিরদিনই আছে, সূর্যের মতো

পুরাতন সেই মানব-ধর্ম! সূর্যেরই মতো উজ্জ্বল! তবে মাঝে মাঝে সূর্যেরই মতো উহা মেঘাচ্ছন্ন হয়, আবার মেঘ সরিয়া গেলে উহার আলোকে আকাশ উদ্ভাসিত হয়। ইহা সেই উপনিষদের আত্মতত্ত্ব—যাহার কথা পিতা পুত্রকে বলিয়াছেন, স্বামী স্ত্রীকে বলিয়াছেন, মাতা শিশুকে শুনাইয়াছেন, যাহার কথা রাজা প্রজাকে বলিয়াছেন, গুরু শিষ্যকে, বন্ধু বন্ধুকে বলিয়াছেন। এই আত্মতত্ত্ব বৃদ্ধ-যুবা-শিশু, স্ত্রী-পুরুষ সকলের জন্য, সকলের মঙ্গলের জন্য। আত্মবিজ্ঞান সকল শক্তির উৎস। এই জ্ঞানের আভাস মাত্র পাইলে হৃদয় হইতে সকল দুর্বলতা চলিয়া যায়, সেই সঙ্গে চলিয়া যায় সকল প্রকার ভয় ও নীচতা, স্বার্থ ও সংকীর্ণতা, সকল প্রকার অসংযম ও দুর্নীতি। তাহার স্থানে দেখা দেয় শান্ত সংযত নির্ভীক উদার প্রকৃতির এক মানুষ—এক নূতন মানুষ, যাহার প্রয়োজন আজ আমাদের ঘরে ঘরে।

শিক্ষা—কি ও কেন?

কেহ কতকগুলি পরীক্ষা পাস করিয়া হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিতে পারিলেই তোমরা তাহাকে শিক্ষিত মনে কর। যাহা জনসাধারণকে জীবন-সংগ্রামের যোগ্য হইতে সহায়তা করে না, তাহাদের মধ্যে চরিত্রবল, লোকহিতৈষণা এবং সিংহের মতো সাহস উদ্বুদ্ধ করে না, তাহা কি শিক্ষা নামের যোগ্য?

শিক্ষা কি পুঁথিগত বিদ্যা?—না। নানা বিষয়ের জ্ঞান? না—তাহাও নহে। ইচ্ছাশক্তির প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করিয়া উহাকে ফলপ্রসূ করিবার শক্তি অর্জন করাই প্রকৃত শিক্ষা। যথার্থ শিক্ষা বলিতে কতকগুলি শব্দ-সংগ্রহ বুঝায় না, বুঝায় মেধা প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলির পরিস্ফুরণ।—অথবা বলা যাইতে পারে যে মানুষের ব্যক্তিগত সংকল্পগুলিকে সৎ এবং কার্যকারী করিয়া গড়িয়া তুলিবার পদ্ধতিই প্রকৃত শিক্ষা।

মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা স্বতই বর্তমান, তাহারই বিকাশের নাম শিক্ষা।.. শিক্ষা বলিতে আমি বুঝি যথার্থ কার্যকারী জ্ঞান-অর্জন; বর্তমান পদ্ধতি যাহা পরিবেষণ করে, তাহা নহে। শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় চলিবে না। আমাদের প্রয়োজন সেই শিক্ষার, যাহা দ্বারা চরিত্র-গঠন হয়, মনের বল বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হয়, এবং মানুষ স্বাবলম্বী হইতে পারে। চাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত বেদান্তের সমন্বয়—ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাস হইবে যাহার মূলমন্ত্র।

উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য জীবনের সমস্যাগুলি সমাধান করিবার সামর্থ্যলাভ।··· আমি মনে করি ধর্মই শিক্ষার অন্তরতম অঙ্গ। জাতির সমগ্র লৌকিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার ভার আমাদের নিজেদের হাতে রাখিতে হইবে, এবং যতদূর সম্ভব উহা জাতীয় ধারায় এবং জাতীয় প্রণালীতে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

—বিবেকানন্দ

চলার পথে

'যাত্রী'

আদেশ ও আদর্শ। কোন্‌টাকে ধরে পথ চলব? প্রশ্নটা আধুনিক নয়, আবহমান কালের।

যখন শিশু ছিলাম তখন কান্নাই ছিল চরম আবেদন পত্র, তখনকার সেই রিক্ত প্রাণের ঘরে সেইটেই ছিল সবার সেরা সম্পদ। নিজের বিচার বুদ্ধি তখন ছিল স্তব্ধ, ইজম্‌ (-ism)-এর বিচার ছিল না তখন। আর ছিল না 'আমার' উন্মেষ; যে-'আমার' পরবর্তী জীবনে প্রশ্ন তুলেছে—আদেশকে মানবো, না আদর্শকে?

শিশুকালের সেই যুগে যখন পথ-চলার জন্য দাঁড়ানোটুকুও পর্যন্ত শিক্ষা করা হয়নি, তখন নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিল 'আদেশে'র। সে 'আদেশ' তখন ছিল একান্ত স্বাভাবিক, সম্পূর্ণরূপে চলধর্মী। বিকাশ, ব্যাপ্তি ও বিবর্তনের সমগোত্র সে। স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে সে আদেশকে তখন মেনেছি, স্বাভাবিক মনে ক'রে তাকে ধরেছি, স্বায়ত্তবোধে তাকে আঁকড়ে রেখেছি। সূর্যের আদেশ-ছোঁয়ায় পদ্মের পাপড়ি যেমন ক'রে খোলে তেমনি সহৃদয় ছিল সে আদেশ। সেই ছোট্ট জীবনের বোবা নিঃসঙ্গতায় সেই প্রাণদ আদেশকেই ভিখারীর মত পা জড়িয়ে ধরেছিলাম, তাতে তখন ভুল হ'লে মানবত্বের আকুল হাসিটুকুই নিভে যেত যে।

কিন্তু তারপরে এল প্রশ্নের জীবন। তুলনামূলক প্রশ্নের কাঠি ঘসে ঘসে তখনকার সেই তিনবছরের শিশু দেশলাই জ্বালতে লাগল—চলার পথে নিশ্চল আলো জ্বালাবার জন্য। তখন "হীরা হবে, স্বপ্ন দেখে, কয়লা গো"। সেই থেকেই সুরু তাব নূতন বোধি, নূতন চেতনায় পথচলার ইঙ্গিত-সংগ্রহ। আদর্শ ও আদেশের অনুসন্ধান তখন থেকেই হয় আরম্ভ। আর সেই সঙ্গে আসে বিচার বিশ্লেষণ, মানা-না-মানার প্রশ্ন-কণ্টকিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিশেষ রূপ। এই জীবনেই তখন সে, আদেশকে ছেড়ে, আদর্শকে ধরে। এ কেন হয়?

ঘরে বন্ধ ছিল একটা পাখী, ডানা ঝাপ্‌টে মরছিল সে কাচের বন্ধ জানলায়। শেষে ছাড়া পেয়ে ছড়িয়ে পড়ল ঐ বাইরের আকাশে—ঐ নীলিমার অতল পারাবারে। তুমি, আমি হাঁফ্‌ ছেড়ে বললাম, আহা। মুক্ত হয়ে গেল, চলে গেল সে তার অবাধ বিচরণেব অজস্র বৈচিত্র্যে। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বুঝি—পাখিটি ঘর ছেড়ে নীলাকাশে উন্মুক্ত হ'ল বটে, কিন্তু নীলাকাশের বন্ধনটুকু থেকে ছাড়া পেল কি? একটা খাঁচা থেকে আর একটা বৃহত্তর খাঁচায় শুধু বন্দী হ'ল সে। ঘর ছেড়ে এসেও, তেমনি ভাবে, পৃথিবীতে আট্‌কে পড়ে যায় মানুষ। তাই বলি, স্বাধীনতা কোথায়? আর যদি স্বাধীন হয়েছি 'ভেবে' কোন আদর্শকে না মানতে চাই তাহলে ঐ 'ভাবা'রূপ কার্যটিকেই কেন তবে আঁকড়ে ধরে পরাধীন হচ্ছি? হয়'তো সকল সম্বন্ধকে অস্বীকার ক'রে ভাবছি, আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোন আদেশকে মানি না, মানি না কোন আদর্শকে। তখনও কিন্তু আমি প্রকৃতির কার্য-কারণের অধীন, আমার নিজস্ব মনের চিন্তার অধীন, আমার বর্তমান চিন্তা তার পূর্ববর্তী চিন্তার অধীন। এক কথায়, তখনও আমি দেশ-কাল-নিমিত্তের (Space-Time-Causation) অধীন। এই ত্রয়ীর মধ্যে আমরা আমাদের প্রবলতম স্বাধীন ইচ্ছা নিয়েও বাঁধা পড়েছি—কেবল সেই বন্ধনটুকুকে নিজের খেয়ালের মধ্যে না টেনে এনে ভুল ক'রে ভাবছি, আমি স্বাধীন।

সহজভাবে এতে অভ্যস্ত বলেই এমনটি সম্ভব হচ্ছে। তাইতো বাতাসের নীচে বাস ক'রে শরীরের প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় সাড়ে-সাত সের বায়ুর চাপ সহ্য করেও তাকে ভুলে রয়েছি। পৃথিবীর সঙ্গে

অলক্ষ্যে দড়ি-বাঁধা রয়েছি, তবুও বুঝতে পারছি না সেই বাঁধনকে। ঐ বাঁধন যদি না থাকত, তাহ'লে আধুনিক 'রকেটে' চড়ে নয়, নিজের ক্ষমতার জোরেই এক লাফ্ দিয়ে চন্দ্র, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহে, এমন কি তারায় তারায় ঘুরে বেড়াতে পারতাম। পৃথিবীর বুকে চড়ে, অমন বন্ বন্ ক'রে ঘুরেও কেমন ক'রে যে ভাবছি, আমার ছোট্ট চলার পথটুকুতেই আমি স্বাধীনভাবে হাঁটছি।

বাস্তব জীবনের কোথাও আদেশকে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। তাই যদি হ'ল, তাহ'লে একটি সুন্দর, হৃদয়-প্রসারী, প্রকাশধর্মী আদর্শের সূর্যালোকের শপথ মেনে নিয়ে চলাই ভাল। এই রকম আদেশই পরে আমাদের সুমুখে আদর্শ হয়ে এসে দাঁড়াবে।

কথা উঠবে—আমরা কেন আদর্শের পূজারী হব? উত্তরে বলব, এ থেকে কোন মানুষেরই নিস্তার নেই বলে। আর যদি সত্যই নিস্তার থাকত, তাহ'লে আমি আমার 'মনের' বশে যে নিজেকে চালাচ্ছি, সেই 'মনের' আদর্শকেও তাহ'লে মেনে চলতাম না। তা ছাড়া, এই পৃথিবীতে, আমার জীবন-সাম্রাজ্যের চারদিকেই তো, মূর্তির তথা আদর্শের ছড়াছড়ি। আহার করছি, সেখানেও আমার আহার্যবস্তু আমার ভাল-লাগার আদর্শ নিয়ে দাঁড়াচ্ছে। জামা কাপড় পড়ছি, সেখানেও একটা সৌখীনতা, একটা সৌষ্ঠব, আদর্শের রূপ ধরে এসে ইঙ্গিত দিচ্ছে। বাড়ি গাঁথছি, সেখানেও স্থপতি-বিচার আদর্শ হ'যে বুঝিয়ে দিচ্ছে। স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসা, দয়া মায়া-সেবা নিয়ে থাকতে চাইছি, কিন্তু সেখানেও কোন-না-কোন মূর্তি, কোন-না-কোন সম্পর্ক বা আদর্শকে পূজা করছি। মোট কথা—নাম, রূপ ও চিন্তার 'পূজা' আমরা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে প্রতিনিয়তই ক'রে চলেছি। এবং ঐ 'পূজা'—ঐ আদর্শকে ত্যাগ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়, হয়ত শুদ্ধচেতন পাগল বা পূর্ণচেতন ব্রহ্মজ্ঞই তাকে অস্বীকার করতে পারেন।

এর পরে প্রশ্ন ওঠে, কাকে আমরা আদর্শ ব'লে ধরব? বৈজ্ঞানিককে! কেন? একটিমাত্র জড় নিয়ম আবিষ্কার করেছে বলে? সে তো প্রকৃতির অনুকরণকারী। প্রকৃতি চালাচ্ছে এই বিরাট জগৎ। কি অমোঘ তার নিয়ম। কি অনন্ত তার শক্তি। তাকেই প্রণাম ক'রে পূজা করি না কেন? আর প্রকৃতির অন্তর্গত অন্ন, যা না হ'লে আমাদের প্রবলতম চিন্তাও চুপ্‌সে যায়, তাকেই যদি উপাস্যরূপে গ্রহণ করি? কিংবা মৃত্যুকে? যে এসে আমার সীমায়িত আমিত্বকে মুছে দেয়! সেই অবারিত সত্য—সেই গোধূলির আলোমাখা মৃত্যুই—শেষ ও শ্রেষ্ঠ আদর্শ হোক্।

কিন্তু ঐ সব আদর্শ আমার সহজ স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে। আমার জীবনের ভাস্বর শ্রেয়-বোধ ক্রমবিকাশের সিঁড়ি বেয়ে আর উঠতে পারে না। তাই প্রকৃত আদর্শকে ধরার জন্য চাই আন্তর 'দৃষ্টি'—যে দৃষ্টির বিকাশে সকল বাধা, সকল বন্ধনকে ছাড়িয়ে আমি হ'তে পারব মুক্ত, স্বাধীন, অবারিত অবসিত। সেখানে পৌঁছলে দেখব, তাঁকে সূর্য প্রকাশ করে না, চন্দ্র-তারকা দেখিয়ে দেয় না, তিনি নিজে দীপ্তিমান বলেই সব কিছু প্রকাশ পায়, তাঁর আলোক পেয়েই সব কিছু ফুটে ওঠে। তাঁকে আদর্শ করেই তো বলতে পারি: তুমি তেজ, আমায় তেজস্বী কর, তুমি বীর্য, আমায় বীর্যবান কর, তুমি বল, আমায় বলবান কর, তুমি ওজঃ, আমায় ওজস্বী কর; তাই তো বলছি, 'কাঁদছ কেন, বন্ধু! তোমার মধ্যেই তো রয়েছে সকল শক্তি। ওগো শক্তিমান, তোমার অন্তরের সেই বজ্রশক্তিকে জাগাও, দেখবে প্রকৃতি তোমার পায়ের তলায় লুটোচ্ছে। আদর্শের এই দিশারীকে ধরেই এগিয়ে চল। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

বিবেকানন্দ

[ভারত তাঁকে একভাবে চায়, পাশ্চাত্য আর একভাবে]

ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মানব-জাতির ইতিহাসে দেখা যায় এক এক যুগে এক এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। এসব মহাপুরুষের এই সংসারে আগমন নিরর্থক বা অহেতুক নয়। মানুষের অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এঁরা বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন সাধনের জন্য আসেন এবং পৃথিবীর ও মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্য অনেক কাজ ক'রে যান। সাধারণ মানুষের জীবন পশুবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত মনে হয়। তারা অজ্ঞানাচ্ছন্ন হয়ে কাম ক্রোধ ও লোভের বশে নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধি করবার জন্য ব্যস্ত থাকে এবং নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পাবার জন্য অপরের স্বার্থ বা সুখের কথা ভাবে না, অপর সব লোকের স্বার্থহানি ও সুখশান্তি নষ্ট ক'রে শুধু নিজের সুখ ও ধনৈশ্বর্য প্রাপ্তির চেষ্টা করে। ফলে আমরা দেখি মানুষে মানুষে, পরিবারে পরিবারে, এক সমাজ ও অন্য সমাজের মধ্যে, এক জাতি ও অন্য জাতির মধ্যে অথবা এক রাষ্ট্রগোষ্ঠী ও অন্য রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে হিংসা-দ্বেষ, দ্বন্দ্ব-কলহ ও বিবাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি হয় এবং শেষে যুদ্ধবিগ্রহ, ধ্বংসলীলা আরম্ভ হয় এবং একটা মহা বিপর্যয়ের বা প্রলয়ের কালাগ্নি জ্বলে ওঠে। সাধারণ মানুষের এরূপ পশুভাব-প্রবণতা এবং ধ্বংস ও বিপর্যয় সৃষ্টির প্রবৃত্তি সত্ত্বেও যে জগতে আজ কতকটা সুখশান্তি বা সুশৃঙ্খলা দেখা যায়, তার কারণ বোধ হয় মানব-ইতিহাসে মধ্যে মধ্যে দেবমানব বা মহাপুরুষদের আবির্ভাব। এঁরাই মোহান্ধ মানুষকে জ্ঞানের আলোক দেন, স্বার্থান্ধকে নিঃস্বার্থ ও পরার্থ কল্যাণ-ব্রতে দীক্ষা দেন, পথহারা মনুষ্য-সমাজকে দিব্য পথের সন্ধান দেন এবং মানুষ পশুত্বের স্তর থেকে যে দেবত্বে উন্নীত হতে পারে ও কেমন ক'রে হয়ে থাকে তার চাক্ষুষ প্রমাণ দিয়ে যান।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুআরি যে দেব-শিশু কলিকাতা মহানগরীতে জন্মগ্রহণ ক'রে তাঁর বংশকে পবিত্র করেছেন, পিতামাতাকে কৃতার্থ করেছেন এবং ধরণীকে ধন্য করেছেন, উত্তরকালে যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা-দীক্ষায় লোকোত্তর জ্ঞান-ভক্তি-বিবেক-বৈরাগ্য নিয়ে বিবেকানন্দ নামে সারা বিশ্বে পরিচিত ও পূজিত হয়েছেন, তিনি এমনই একজন মহাপুরুষ। কেহ তাঁকে বীর সন্ন্যাসী বলেন, কেহ অদ্বৈত ব্রহ্ম-জ্ঞানী বলেন, কেহ বা তেজস্বী স্বদেশপ্রেমিক বলেন, আবার কেহ কেহ তাঁকে অক্লান্ত কর্ম-যোগী অথবা ঝঞ্ঝারূপী পুরুষসিংহ (Cyclonic personality) বলেছেন। এসব বর্ণনা আংশিক-ভাবে সত্য বটে, কিন্তু এর কোন একটিতেই তাঁর দেবচরিত্রের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় বলে মনে হয় না। তাঁর জীবনী বাণী ও কর্ম-ধারা আলোচনা করলে মনে হয়, তিনি ছিলেন যুগ-প্রয়োজন-সাধক যুগাচার্য। অবশ্য তার মূলে ছিলেন তাঁর গুরু যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনিই তাঁকে যুগাচার্যের যোগ্য শিক্ষাদীক্ষা দিয়েছিলেন, লোককল্যাণ-ব্রতে ব্রতী হতেও প্রেরণা দান করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'নরেন্দ্র খুব বড় আধার'। তিনি তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীব-

সেবা',—এই আদর্শ। নরেন্দ্র এক সময় নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন থাকতে চাইলে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'তুই এত ছোট হবি কেন? লোকে যেমন বড় গাছের ছায়ায় বসে শ্রান্তি দূর করে, আর শান্তি পায়, তেমনি তোর কাছে বহু লোক এসে তাদের পাপতাপ জুড়োবে ও শান্তি পাবে।' রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ যেন অভেদ আত্মা, যুগ-প্রয়োজনে একই ভগবানের দুই রূপ—গুরু ও আচার্য। এ যুগের বিশেষ প্রয়োজন সাধন করতে তাঁদের আবির্ভাব। সেই প্রয়োজন কি এবং উহা ভারতের পক্ষে কিরূপ ও পাশ্চাত্য জগতের পক্ষেই বা কিরূপ, সেই আলোচনা সূত্রে দেখতে পাব যে, ভারত বিবেকানন্দকে চায় একভাবে, পাশ্চাত্য জগৎ চায় আর একভাবে।

* * *

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার জন্মভূমি। এদেশে বেদ-বেদান্তের মূলে যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, তাতে ঐহিক সুখ অপেক্ষা পারমার্থিক নিঃশ্রেয়স লাভকেই মানব-জীবনের চরম আদর্শ বলে গ্রহণ করা হয়েছে এবং ভোগাসক্তি অপেক্ষা মুক্তিকেই কাম্য বস্তু বলে স্বীকার করা হয়েছে। এজন্য এ দেশে ভোগ অপেক্ষা ত্যাগের মহিমা স্বীকৃত হয়েছে, প্রবৃত্তি-মার্গ থেকে নিবৃত্তি-মার্গের অধিক মূল্য দেওয়া হয়েছে এবং আত্মা ঈশ্বর ও ব্রহ্মকে পরম সত্য ও তত্ত্ব বলে গ্রহণ ক'রে জীবজগৎকে কখনও বা অসত্য ও মায়াময় বলা হয়েছে, আর কখনও বা অনিত্য, অসার, দুঃখময় ও জীবের বন্ধনের কারণ বলে হেয় জ্ঞান করা হয়েছে। ফলে পার্থিব জীবনের সঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবনের সম্বন্ধ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে পড়ে এবং কাল-ক্রমে দুইটির মধ্যে কোন সম্বন্ধই নেই এরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ভারতবাসীরা পার্থিব জীবনকে অবহেলা ও অস্বীকার করতে লাগলেন এবং ঐহিক জীবন দুঃখ-দৈন্যে, অজ্ঞতা-মূর্খতায় ও ব্যাধি-বিষাদে ভরে উঠতে লাগল। অপর দিকে তাঁদের আধ্যাত্মিক জীবনও ক্রমশঃ শীর্ণ, বিশুষ্ক ও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। জীব-জগতের প্রতি তাঁদের আর বিশেষ প্রীতি বা শ্রদ্ধা দেখা গেল না এবং সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া বা জীবজগতের কল্যাণের জন্য যত্ন বা প্রচেষ্টা করা তাঁদের কর্তব্য বলে মনে হ'ল না। অথবা তাঁরা সেটাকে অকর্তব্য বলেই ভাবতে লাগলেন, যেন পার্থিব জীবন আধ্যাত্মিকতার বিরোধী ও পরিপন্থী।

বর্তমান যুগে স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম সম্বন্ধে এই ভ্রান্ত ধারণা ও তার কুফল মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন এবং তাকে পরিশুদ্ধ ক'রে জীবজগতের কল্যাণার্থে তার প্রয়োগ করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টার মূলে বোধ করি ছিল তাঁর গুরুর জীবন-বেদ। শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এবং নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেও ভক্তিভাব নিয়ে ছিলেন, শিবজ্ঞানে জীবসেবার কথা বলে-ছিলেন এবং জীবজগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ ও তাঁর লীলার রূপ বলে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিত্য ও লীলা, সাকার ও নিরাকার, ব্রহ্ম ও শক্তি দুইই মেনে-ছিলেন, একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে ভাবা যায় না—বলতেন। কাজেই তাঁর জীবনে সন্ন্যাসের সঙ্গে কর্মের, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির এবং আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে বাস্তব জীবনের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। তাঁর যোগ্য শিষ্য বিবেকানন্দ এই শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাই আমরা দেখতে পাই যে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত ভ্রমণ ক'রে ভারতের জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা দেখে ব্যথিত ও করুণাবিগলিত হয়েছেন এবং তার প্রতিকার

করবার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন। তাই আমরা তাঁর কাছে কার্যে পরিণত বা কার্যকরী বেদান্তের (Practical Vedanta) কথা শুনতে পেয়েছি। তিনি বনের বেদান্তকে ঘরে এনেছিলেন, শঙ্করের প্রখর জ্ঞানের সঙ্গে বুদ্ধের করুণাবিগলিত চিত্ত পেয়েছিলেন, আর নিঃসঙ্কোচে বলতে পেরেছিলেন, 'জীবের কল্যাণের জন্য এই দুঃখময় সংসারে হাজার বার জন্মগ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি। এই রোগ-শোক-অজ্ঞতা-অনাহারক্লিষ্ট জীবগণই আমার একমাত্র উপাস্য দেবতা, অন্য ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি না।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' তিনি শুধু এই কথা বলেই ক্ষান্ত হননি, তাঁর সারা জীবনে, তাঁর ধ্যানে জ্ঞানে কর্মে এই মহতী বাণী প্রতিধ্বনিত ও প্রতিফলিত হয়েছে। তাই আজ আমরা দেখতে পাই ভারতে সন্ন্যাসীর জীবনাদর্শের একটা অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটেছে। পূর্বে সন্ন্যাসী বা সাধু বলতে লোকে বুঝত পর্বত-গুহাবাসী বা অরণ্য-সেবী নিঃসঙ্গ ও নির্মম সর্বত্যাগী ও নিষ্কর্মা পুরুষ। কিন্তু একালে আমরা দেখছি শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের সন্ন্যাসীরা সব মায়িক বন্ধন ছিন্ন করলেও জীবজগতের প্রতি উদাসীন হননি, পরন্তু তাঁদের জীবনে ত্যাগের সঙ্গে সেবার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহুমুখী ও সুদূরপ্রসারী সেবাকার্য শুধু সন্ন্যাস-আদর্শের নয়, জগতের ভাবধারারও পরিবর্তন ঘটাতে আরম্ভ করেছে।

আজ ভারতের একান্ত প্রয়োজন—স্বামী বিবেকানন্দ, ভারতের আশা-ভরসা—স্বামী বিবেকানন্দ। ভারত তাঁর জীবনের এই দিকটা—আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে ব্যাবহারিক জীবনের বলিষ্ঠ মিলনের দিকটা, বিশেষভাবে চায়। শুষ্ক আধ্যাত্মিকতার বশে বাস্তব জীবনকে হীন বা ক্ষীণ না ক'রে, তার বলে জীবনের সর্ব ক্ষেত্রকে উর্বর করা ভারতবাসীর একান্ত কর্তব্য। ভারতবাসী তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতার সুষ্ঠু প্রয়োগ করতে পারলে ভারতের পুনরভ্যুত্থান সুনিশ্চিত হবে, বিশ্বসভায় তার গৌরবের স্থান সংরক্ষিত থাকবে এবং কালে জগতের জ্ঞানগুরুর আসন ও মানবজাতির নায়কত্বের মর্যাদা লাভ করাও তার পক্ষে সম্ভব হবে।

* * * *

পাশ্চাত্য জগতের কাছেও বিবেকানন্দের প্রয়োজন কম নয়। পাশ্চাত্য তাঁকে সমভাবে চায়, অবশ্য সেটা একটু অন্যভাবে। পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে কোন কোন জাতি তাঁকে শুধু চায় না, তাঁকে নেবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। আমাদের কর্তব্য তাঁর ভাব যথাযথভাবে তাদের কাছে ধ'রে দেওয়া। ভারত বিবেকানন্দকে চায় তার আধ্যাত্মিকতাকে ব্যবহারমুখী করবার জন্য, তাকে কার্যে পরিণত করবার জন্য। অপরদিকে পাশ্চাত্য জগৎ তাঁকে চায় তার ব্যাবহারিক বা পার্থিব জীবনকে উন্নত করবার জন্য, তাকে পরিশুদ্ধ, সুসংস্কৃত ও ঊর্ধ্বগামী করবার জন্য।

আজ পাশ্চাত্য জগৎ সকল পার্থিব সম্পদের অধিকারী হয়েছে—মনে হয়। পাশ্চাত্য দেশ ধনকুবেরের দেশ, প্রকৃতির ঐশ্বর্যে ভরা দেশ, শিল্প সম্পদে সমৃদ্ধ দেশ, বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব ও অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারে গৌরবান্বিত দেশ। কিন্তু এমন অপরিমেয় পার্থিব সম্পদের অধিকারী হয়েও ওদেশবাসীদের মনে প্রকৃত সুখশান্তির অভাব দেখা যায়। যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে সেখানকার ঐশ্বর্যের কিঞ্চিৎ

পরিচয় পেয়ে আমি যেমন বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি, তেমনি কোন কোন আমেরিকাবাসীর মুখে তাদের অতৃপ্ত ও অশান্ত হৃদয়ের বেদনা-বাণী শুনেও আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। তাঁদের কেহ কেহ আমাকে বলেছেন, 'আমরা পার্থিব ঐশ্বর্যের শিখরদেশে (climax of material prosperity) উঠেছি বটে, কিন্তু আমাদের হৃদয় অতৃপ্ত। আমাদের আধ্যাত্মিক ক্ষুৎপিপাসা (spiritual hunger) মিটে না, ভারতের কাছে আমরা এমন কিছু পাবার আশা করি, যাতে আমাদের এ পিপাসার শান্তি হবে—হৃদয়ে শান্তি পাব। পাশ্চাত্য দেশে অনেকের মনে যে শুধু একটা দিব্য অশান্তি (divine discontent) দেখা যায় তাই নয়, তাদের বাহিরেও শান্তি নেই, নিরাপত্তা নেই, নিরুদ্বেগের ভাব নেই। পাশ্চাত্য জগতে আজ হিংসা-দ্বেষ, অবিশ্বাস ও ভয়ের ভাব যেন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। যে শিল্প-বিজ্ঞান তাকে এত বড করেছে, আজ তারই আধুনিক আবিষ্কারগুলি তাকে গ্রাস করবার উদ্যোগ করছে, তার সমাধি-ক্ষেত্র রচনা করছে।

স্বামী বিবেকানন্দ বহু বৎসর পূর্বেই পাশ্চাত্য জগৎকে সাবধান ক'রে বলেছিলেন, 'পাশ্চাত্য সভ্যতা একটা আগ্নেয়গিরির উপরে অবস্থিত, অকস্মাৎ একটা অগ্ন্যুদ্গার হলেই তার সব ধ্বংস হয়ে যাবে।' এ আসন্ন ধ্বংসের মুখ থেকে যদি পাশ্চাত্য জগৎকে বাঁচতে হয়, সে দেশের লোকের মনে যদি নিরাপত্তার ভাব ফিরিয়ে আনতে হয়, তাদের অশান্ত হৃদয়ে যদি স্থায়ী দিব্য শান্তি পেতে হয়, তবে তাদের পার্থিব ও ব্যাবহারিক জীবনকে ভারতের আধ্যাত্মিকতার আলোকে উদ্ভাসিত করতে হবে, তার পুণ্য কিরণে তাকে নির্মল ও উজ্জ্বল করতে হবে এবং সেই ভাব-ধারায় তাকে অনুপ্রাণিত করতে হবে। সেই কাজ করবার জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশে ভারতের শাশ্বত বাণী প্রচার করেছেন, মরলোককে অজর, অমর ও অভয়ের কথা শুনিয়েছেন। পাশ্চাত্য দেশ তাঁকে চায়।

এদেশের এবং ওদেশের যুগপ্রয়োজনে তিনি এসেছিলেন, উভয় দেশই তাঁকে চায়। তাই বলি : যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দকে ভারত একভাবে চায়, পাশ্চাত্য জগৎ আর একভাবে চায়।

Message to India and West

Bold has been my message to the people of the West, bolder is my message to you, my beloved countrymen. The message of ancient India to new Western nations I have tried my best to voice—ill done or well done the future is sure to show, but the mighty voice of the same future is already sending forward soft but distinct murmurs, gaining strength as the days go by, the message of India that is to be to India as she is at present.

—*Vivekananda*

টয়েন্‌বীর দৃষ্টিতে ধর্ম

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

একজন প্রথিতযশা পণ্ডিতকে বলতে শুনেছি, গিবনের পরে টয়েন্‌বীর (Toynbee) মত এত বড়ো ঐতিহাসিক আর জন্মায়নি। এই কথায় তাঁর বইগুলি একবার নেড়েচেড়ে দেখবার চেষ্টা করলাম। ইতিহাসের এক এক খণ্ড পড়ি, আর তাঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতায় বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে যাই। মানুষ এক জীবনে এত বই পড়তে পারে এবং এত লেখা লিখতে পারে!

কিছু দিন আগে কলকাতার এক হাসপাতালে যাই পরিচিত একজনকে দেখতে—বামুনের ছেলে, কিন্তু পরে গোঁড়া খ্রীষ্টান হয়ে যায়, হিন্দুধর্মকে সে একেবারে সইতে পারতো না। সেদিন রোগশয্যার পাশে যেতেই সে আমার হাতখানা দু-হাতে চেপে ধরল। তারপর আবেগকম্পিতকণ্ঠে ব'লল, 'আমার মতের পরিবর্তন হয়েছে। এই বইখানা প'ড়ে ধর্ম সম্পর্কে আমার ধারণা বদলে গেছে।' দেখলাম তার হাতের কাছে একখানি বই রয়েছে। বইখানার নাম 'An Historian's Approach to Religion' লেখক আর কেউ নয়, টয়েন্‌বী।

ভারী কৌতূহল হ'ল বইখানা একবার পড়ে দেখতে। ওর মধ্যে কি এমন আছে যার ছোঁয়া লেগে অমন গোঁড়া খ্রীষ্টানের মন থেকে গোঁড়ামি মুছে গেল। বইখানা একটা লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ ক'রে তার মধ্যে ডুব দিলাম। পড়তে পড়তে এক জায়গায় দেখলাম লেখা রয়েছে, মানুষের আদিম পাপ (Original Sin) হচ্ছে আত্মকেন্দ্রিকতা (self-centredness)। এই আত্মকেন্দ্রিকতা হচ্ছে মানবস্বভাবের একটা মজ্জাগত দুর্বলতা আর এই দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে না পারলে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের যোগ কোনকালেই সম্ভব নয়। টয়েন্‌বীর মতে:

> Man's goal is to seek communion with the presence behind the phenomena, and to seek it with the aim of bringing his self into harmony with this absolute spiritual reality.

—এই বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরালে যে সত্য রয়েছে তার সঙ্গে যুক্ত হ'তে চাওয়াই মানুষের চরম লক্ষ্য। এই পরম আধ্যাত্মিক সত্যের সঙ্গে নিজের আত্মার যোগ-সাধনের উদ্দেশ্যে মানুষ চাইছে মিলতে—যে মিলের মধ্যে তার জীবনের সার্থকতা।

টয়েন্‌বী বলছেন, ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের যোগের পথে আত্মকেন্দ্রিকতার মতো এমন দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আর নেই। কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিক এই কথাই বলেছেন। সদরওয়ালা'কে ঠাকুর বলছেন: 'এই অহঙ্কার আড়াল আছে ব'লে ঈশ্বরকে দেখা যায় না। আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল।' টয়েন্‌বী বলছেন, অহঙ্কার ত্যাগ করবার সময়ে মানুষের মনে হয় তার জীবন বুঝি কোন্ অতলে হারিয়ে গেল। কিন্তু সত্যি সত্যি অহঙ্কার যখন চলে যায় তখন মানুষ অনুভব করে, সে প্রকৃতপক্ষে বেঁচে গেল। সে বেঁচে গেল—কারণ তার জীবন একটা নূতনতর কেন্দ্র খুঁজে পেয়েছে। এই নূতন কেন্দ্রটি হচ্ছে সেই পরম সত্য যা বস্তুজগতের অন্তরালে আধ্যাত্মিক সত্তারূপে নিত্য বিরাজমান।

অহঙ্কার-ত্যাগের পথে মানুষের নবজীবনের

আনন্দলাভের কথা বুঝাতে গিয়ে ঠাকুর বাছুরের উপমা দিয়েছেন: বাছুর 'হাম্বা হাম্বা, আমি আমি' করে। তার দুর্গতি দেখ। হয়তো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লাঙল টানতে হচ্ছে। রোদ নাই, বৃষ্টি নাই। হয়তো কসাই কেটে ফেল্লে। জুতো তৈরী হ'ল। অবশেষে কিনা নাড়িভুঁড়িগুলো নিয়ে তাঁত তৈয়ার করে, যখন ধুনুরীর তাঁত তোয়ের হয় তখন ধোনবার সময় 'তুঁহু তুঁহু' বলে। আর 'হাম্বা হাম্বা' বলে না, 'তুঁহু তুঁহু' বলে, তবেই নিস্তার, তবেই তার মুক্তি। কর্মক্ষেত্রে আর আসতে হয় না।

টয়েন্‌বী বলছেন: যেহেতু আত্মকেন্দ্রিকতা মানবস্বভাবের মজ্জাগত ব্যাধি, সেই হেতু আমাদের নিজেদের ধর্মকে একমাত্র খাঁটি এবং সত্য ব'লে অভিহিত করার দিকে একটা ঝোঁক অল্পবিস্তর সকলের মধ্যেই দেখা যায়। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের নিজেদের ধর্মই সত্য এবং এই ধর্মের পথেই মুক্তি। কিন্তু টয়েন্‌বী বলছেন, আমাদের এই বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত ধোপে টেকে না—কারণ সমগ্র সত্যকে আমরা কেউ জানি না। আমরা সত্যকে শুধু আংশিক ভাবেই জানি এবং যা জানি তা কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখার মতো ধোঁয়াটে। টয়েন্‌বীর ভাষায়:

> We believe that our own religion is the way and the truth, and this belief may be justified, as far as it goes. But it does not go very far; for we do not know either the whole truth or nothing but the truth. 'We know in part' and 'we see through a glass, darkly'.

এই প্রসঙ্গে ঠাকুরের অন্ধের হস্তী-দর্শনের উপমা সহজেই মনে আসে। টয়েন্‌বী তাঁর পুস্তকের উপসংহারে বলছেন: এখন আমরা যে জগতে বাস করছি সেখানে জীবন্ত ধর্মগুলির অনুসরণকারীদের উচিত পরস্পরের ধর্মমতকে সহ্য করা, সম্মান করা। আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে নিজের ধর্ম এবং প্রতিবেশীর ধর্ম উভয়কে পাশাপাশি রেখে কার আসন উঁচুতে—সে সম্পর্কে নিরপেক্ষ রায় দিতে পারে? আশৈশব যে জেনে আসছে একটা ধর্মকে আপন গৃহের পরিবেশের মধ্যে—সে যদি বাইরে থেকে পরবর্তী কালে জানা অন্য ধর্মের সঙ্গে চিরপরিচিত নিজ ধর্মের তুলনা করে, তবে তার বিচারে ভুল হ'তে বাধ্য। পূর্বপুরুষের ধর্মের এমনই একটা প্রভাব আছে আমাদের অনুভূতির উপরে যে আমরা নিরপেক্ষ মন নিয়ে অন্য ধর্মের বিচার করতে পারি না। একেবারে শেষের দিকে টয়েন্‌বী বলছেন:

> The missions of the higher religions are not competitive; they are complementary We can believe in our own religion without having to feel that it is the sole repository of truth We can love it without having to feel that it is the sole means of salvation.

—উচ্চতর ধর্মগুলির উদ্দেশ্য কখনও প্রতিযোগিতামূলক হতে পারে না। তারা হবে পরস্পরের পরিপূরক। আমাদের নিজেদের ধর্মই সত্যের একমাত্র আধার—একথা মনে না করেও স্বধর্মে আমরা আস্থা রাখতে পারি। আমাদের ধর্মকে ভালবাসতে হ'লে—ঐ ধর্মই মুক্তির একমাত্র পথ—এমন ধারণা পোষণ করার কোন প্রয়োজন নেই।

'কথামৃতে' রয়েছে: যখন বাহিরে লোকের সঙ্গে মিশবে, তখন সকলকে ভালোবাসবে। মিশে যেন এক হয়ে যাবে—বিদ্বেষভাব আর রাখবে না। 'ও ব্যক্তি সাকার মানে, নিরাকার মানে না, ও নিরাকার মানে, সাকার মানে না; ও হিন্দু, ও মুসলমান, ও খ্রীষ্টান' এই বলে নাক

সিঁটকে ঘৃণা কোরো না। তিনি যাকে যেমন বুঝিয়েছেন।

টয়েন্‌বীর লেখার মধ্যে ঠাকুরের উদার সুরের কি আশ্চর্য প্রতিধ্বনি!

টয়েন্‌বীর সিদ্ধান্ত হচ্ছে, আত্মকেন্দ্রিকতা সব মানুষের এবং সম্প্রদায়ের মধ্যেই অল্পবিস্তর রয়েছে, তবে ভারতীয় ধর্মগুলির তুলনায় মুসলমান, খ্রীষ্টান এবং ইহুদী ধর্মে আত্মকেন্দ্রিকতা অনেক বেশী। আর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকেরা যখন আজ পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসে পড়ছে যন্ত্রযুগের কল্যাণে, তখন 'The spirit of the Indian religions, blowing where it listeth, may perhaps help to winnow a traditional Pharisaism out of Muslim, Christian and Jewish hearts' অর্থাৎ ভারতীয় ধর্মগুলির ভাবধারার স্পর্শে মুসলমান, খ্রীষ্টান এবং ইহুদীদের হৃদয় থেকে চিরাচরিত আত্মকেন্দ্রিকতার অপসারণ খুবই সম্ভবপর।

টয়েন্‌বী মহামানবের মিলনের জন্যে চেয়ে আছেন ভারতবর্ষের দিকে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভারতবর্ষ কি হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বীকে কল্যাণের পথরেখা দেখাবে না? স্বামী বিবেকানন্দ কোন্ প্রেরণায় সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ালেন একটা জ্বলন্ত সূর্যের মতো?—পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দিলেন ঋষিদের তপোবনের মৃত্যুহীন উদার বাণী?—নিশ্চয়ই ভালোবাসার প্রেরণায়। বিদ্বেষে বিদীর্ণ পৃথিবীকে শান্তি দিতে পারে ভারতের ধর্ম, যার মূলকথা সকলের মধ্যে একই অনন্ত আত্মার অস্তিত্ব। এই আত্মার অস্তিত্বকে সকলের মধ্যে সমভাবে দেখতে পারলে তবেই মানুষের পক্ষে মানুষকে ভালবাসা সম্ভব। ভারতবর্ষ যুগযুগান্ত ধ'রে তার নানা সাধকের কণ্ঠকে আশ্রয় ক'রে এই ঐক্যের মন্ত্রই প্রচার ক'রে এসেছে এবং বহু শতাব্দীর ঝড়-ঝঞ্ঝাকে অতিক্রম ক'রে সে আজও বেঁচে রয়েছে প্রেমের মহাধর্মের জগৎ-জোড়া প্লাবনে দুনিয়াকে একাকার ক'রে দেবার জন্যে—এই তো বিবেকানন্দের কথা। তিনি চেয়েছিলেন একটা আত্মবিস্মৃত প্রাচীন জাতির মর্মের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারিত করতে, একটা আধ্যাত্মিক মহাজাগরণের মধ্যে তার ক্লৈব্যের অবসান ঘটাতে।

টয়েন্‌বীও ধর্মের মধ্যেই মানুষের নবজীবনের সম্ভাবনা দেখেছেন। টেকনলজির মধ্যে মানুষ এতদিন খুঁজছিল তার নূতন দিনের স্বর্গকে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে মানুষ ভাবতে আরম্ভ করেছে, পরমাণবিক শক্তিকে মুক্ত ক'রে সে হয়তো পৃথিবীকে একটা সামাজিক এবং নৈতিক সর্বনাশের মুখে ঠেলে দিয়েছে। বৈজ্ঞানিক আরও দেখেছেন, গত ২৫০ বছর ধরে যে বৌদ্ধিক স্বাধীনতা (intellectual freedom) তিনি ভোগ ক'রে আসছিলেন ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এসে সেই স্বাধীনতা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের আবিষ্কার নিয়ে পরস্পরের মধ্যে এখন আর আলোচনা করতে পারেন না। গবর্ণমেন্টের আনুকূল্যে যখন পদার্থবিজ্ঞানের এই সব পরমাণবিক আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে, তখন লৌহযবনিকার অন্তরালে বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কৃত সত্যকে প্রচ্ছন্ন রাখবার অধিকার একমাত্র গবর্ণমেন্টেরই আছে।

মানুষের স্বাধীনতা যখন সকল দিক থেকে এই ভাবে সঙ্কুচিত হয়ে আসছে, তখন টয়েন্‌বী আধ্যাত্মিকতার মধ্যে দেখতে পেয়েছেন স্বাধীনতার দুর্গ।—তাঁর ভাষায়: In a regimented world, the realm of the Spirit may be freedom's citadel. কিন্তু এই আধ্যাত্মিক

স্বাধীনতা কেবল রাষ্ট্রের চেষ্টায় সম্ভব নয়। জনসাধারণের হৃদয়ে পরস্পরের ধর্ম সম্পর্কে শ্রদ্ধার ভাব জাগ্রত থাকলে তবেই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা সত্য হ'য়ে উঠতে পারবে। টয়েন্‌বী বলছেন :

> True spiritual freedom is attained when each member of society has learnt to reconcile a sincere conviction of the truth of his own religious beliefs and the rightness of his own religious practices with a voluntary toleration of the different beliefs and practices of his neighbours.

সমাজের প্রতিটি মানুষ যখন শিখবে—কেমন ক'রে নিজের ধর্মবিশ্বাসে এবং ধর্ম-আচরণে আস্থা অক্ষুণ্ণ রেখেও স্বেচ্ছায় প্রতিবেশীর স্বতন্ত্র ধর্মবিশ্বাস এবং স্বতন্ত্র ধর্ম-আচরণের প্রতি সহনশীল মনোভাব পোষণ করা যায়, তখন সত্যিকারের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা আমরা অর্জন করতে পারব।

টয়েন্‌বীর মতে এই সহনশীলতার পিছনে থাকা চাই এই সত্যের স্বীকৃতি যে—ধর্ম নিয়ে কলহ পাপ, কেননা এই কলহ মানুষের স্বভাবের মধ্যে যে বন্য পশু আছে তাকেই খুঁচিয়ে জাগিয়ে দেয়। মানুষের আত্মার এবং ভগবানের মাঝখানে কারও দাঁড়াবার চেষ্টা করা উচিত নয়। টয়েন্‌বী বলছেন : ঈশ্বরের সঙ্গে কোন আত্মার কি রকমের সম্পর্ক হবে তা নিয়ে আর কারও হস্তক্ষেপ করবার অধিকার নেই। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ধর্মবিশ্বাস তো ভিন্ন ভিন্ন হবেই, 'because Absolute Reality is a mystery of which no more than a fraction has ever yet been penetrated by or been revealed to any human mind.' টয়েন্‌বী বলছেন : সকলের ধর্মমত কখনও এক হ'তে পারে না, কারণ পরম সত্য হচ্ছে এমন একটা রহস্য যার অংশ ছাড়া সমগ্র রূপ আজ পর্যন্ত কোন মানুষের মনের কাছে ধরা পড়েনি। টয়েন্‌বীর এই ভাবটি শ্রীরামকৃষ্ণের সেই বহুরূপীর উপমায় কী সুন্দর ফুটে উঠেছে। যে গাছতলায় থাকে সে জানে যে, বহুরূপীর নানা রঙ—আবার কখনো কখনো কোন রঙই থাকে না। অন্য লোক কেবল তর্ক ঝগড়া ক'রে কষ্ট পায়।

টয়েন্‌বীর মতে যারা ভগবানের ইচ্ছাকে নিজেদের জীবনের মধ্যে পূর্ণ করবার জন্যে সেই মহা অজানার পানে চলতে চায় তারা একই বস্তুর অন্বেষণে ব্রতী। তার পরেই বলছেন :

> They should recognize that they are spiritually brethren and should feel towards one another, and treat one another, as such. Toleration does not become perfect, until it has been transfigured into love.

—'তাদের জানা উচিত, যারা ঈশ্বরকে খুঁজতে বেরিয়েছে তারা পরস্পরের সগোত্র। ভাই ভাইকে যেমন দেখে, ভাই ভায়ের প্রতি যেমন আচরণ করে, তাদের পরস্পরের প্রতি মনোভাব এবং আচরণ সেই রকম হওয়া উচিত। সহনশীলতা যখন প্রেমে রূপান্তরিত হয় তখনই তো তার মধ্যে পরিপূর্ণতা আসে।'

টয়েন্‌বীর বইখানি পড়তে পড়তে ঠাকুরের কথাগুলি কেবলই মনে পড়ছিল। আর মনে পড়ছিল হাসপাতালের মৃত্যুপথযাত্রী সেই রোম্যান ক্যাথলিক ভাইটির কথা যার অন্তিম জীবনে ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারে একটা আমূল পরিবর্তন এসেছিল টয়েনবীর 'An Historian's Approach to Religion' পড়ে।

মনের মায়া

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

বিপত্নীক রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় ঘরের দাদাওয় বসিয়া আত্মচিন্তা করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হইয়াছে, রাত্রির প্রথম প্রহর ক্রমশই গাঢ় হইয়া আসিতেছে। ছেলেমেয়েরা তাদের বিধবা পিসিমার সহিত ওপাড়ায় কথকতা শুনিতে গিয়াছে। বাড়ির নির্জনতা রামজীবনের ভারী ভাল লাগিতেছিল। সচরাচর এমন তো হয় না।

রামজীবন বিগত জীবনের কথা ভাবিতে-ছিলেন। পঞ্চাশটা বৎসরে অনেক দেখিলেন, অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিলেন, কত লোকের নিন্দা ভালবাসা কুড়াইলেন। অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা মিটিয়াছে, অনেক মিটে নাই, অনেক বন্ধু লাভ করিয়াছেন, অনেক শত্রুও। কত ছবিই না চোখে ভাসে, কত নরনারীর কত কথা নূতন করিয়া কানে বাজে। নারায়ণ! নারায়ণ! আশ্চর্য এই মানুষের জীবন। দিনের পর দিন তীব্রবেগে অসংখ্য ঘটনা ঘটিয়া যায়—আবার দিনের পর দিন ঘটনাগুলির ছাপ মনের কোঠায় জমা হইতে থাকে। ভুলিতে চাহিলে ভোলা যায় না, দূর করিয়া দিতে চাহিলে আরও জটিলভাবে জড়াইয়া যায়।

আচ্ছা, পঞ্চাশ বৎসর আগে তিনি কোথায় ছিলেন? অথবা আদৌ ছিলেন না? পিছনে তাকাইলে বড় জোর চার বৎসর বয়সের কথা রামজীবন আবছায়া কিছু মনে করিতে পারেন, কিন্তু তাহার পূর্বে ভাবিতে গেলে সব একেবারে অন্ধকার। যখন কেবল হামাগুড়ি ছাড়িয়া হাঁটি হাঁটি পা পা করিয়া হাঁটিতে শিখিতেছেন—মা, বাবা, মামারা, খুড়ী, জেঠী এমন কি বড়দিদি, মেজদা ইহারা সবাই পাশে দাঁড়াইয়া উৎসাহ দিতেছেন—মনে পড়ে কি সে কথা? না। মাতৃ-গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রথম যখন পৃথিবীর আলোক দেখিয়াছিলেন, স্মরণে আছে কি সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্ত? না। পৃথিবীতে আসিবার আগেও তো একটা জীবন ছিল—অন্ততঃ মাতৃ-গর্ভে দশমাস। মনে পড়ে কি? না—কিছুই মনে পড়ে না। কিন্তু মনে পড়ে না বলিয়াই যে তাহা নস্যাৎ, তাহা তো নয়। মাতৃগর্ভে আসিবার পূর্বেও হয়তো কোনও এক ধরনের অস্তিত্ব ছিল—হয়তো অন্য এক জন্ম—এই জন্মেরই মতো আশা-নিরাশা-হাসি-কান্না-সার্থকতা-ব্যর্থতায় বেষ্টিত একটি জন্ম। হয়তো সেই জন্মে রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন মনোহর বসু অথবা মহারাষ্ট্রের ভালেরাও ডাণ্ডেকার। কে জানে? রামজীবন আপন মনে হাসিয়া উঠিলেন।

আর কয় বৎসর বাঁচিবেন? কুড়ি? পনর? দশ? এই কয় বৎসরে আরও কিছু অভিজ্ঞতা জমিবে—স্মৃতির পুঁটলিটি আরও কিছু ভারী হইবে। তাহার পর? ভাবিয়া কিছুই কূল পাওয়া যায় না। ভাবিতে গেলে মনে হয় সব অন্ধকার। জন্মের আগেও অন্ধকার, মৃত্যুর পরেও অন্ধকার। মাঝখানে শুধু একটু আলো—বর্তমান জীবনের পঞ্চাশ বা ষাট বা আশি বৎসরের আলো। এই পঞ্চাশ বা ষাট বা আশি বৎসরের প্রত্যেকটি মুহূর্ত ছুটিতে ছুটিতে আসে,—ছুটিতে ছুটিতে চলিয়া যায়। একটিকেও ধরিয়া রাখা যায় না। কিন্তু তাহারা রাখিয়া যায় মনে এক একটি দাগ। সব দাগগুলি মিলিয়া একটা

জমাট মূর্তি সৃষ্টি করে—অসংখ্য রূপ, অসংখ্য শব্দ, অসংখ্য গন্ধ স্পর্শ আবেগ অনুভূতি উল্লাস ব্যথায় পরিপূর্ণ স্মৃতির সঞ্চয়। রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন বা ব্যক্তিত্ব এই সঞ্চয়েরই সঙ্গে দৃঢ়ভাবে বাঁধা। এই স্মৃতিসম্ভারকে তিনি তুচ্ছ করিতে পারেন না—তুচ্ছ করিলে তাঁহার জীবনের অনেক গভীর ভালবাসা, অনেক মূল্যবান আদর্শ অর্থহীন হইয়া যায়। পিতা আজ স্থূল দেহে নাই, মাতৃদেবীও নাই, সতীসাধ্বী কল্যাণময়ী সহধর্মিণীও আজ জীবনের পরপারে। কিন্তু তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতি তো রহিয়াছে। রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনের মধ্যে তাঁহারা বাঁচিয়া আছেন।

রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া যে মনটি গড়িয়া তুলিয়াছেন, উহার ভিতর তাঁহার নিজের ব্যক্তিত্ব আছে, তিনি এ যাবৎ যাহা কিছু করিয়াছেন, ভাবিয়াছেন—উহাদের ছাপ আছে, আবার ভবিষ্যতে তিনি যাহা আশা ও আকাঙ্ক্ষা করেন তাহাদেরও সূক্ষ্ম রেখাগুলি রহিয়াছে। বড় আশ্চর্য রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন। আজ যদি হঠাৎ তাঁহার নিকট হইতে উহা কাড়িয়া লওয়া হয় তাহা হইলে রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেহে প্রাণ থাকিলেও তিনি মৃতকল্প, কেননা ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের সকল মূল্যই তাঁহার নিকট হইতে তিরোহিত হইয়া যাইবে। রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনুষ্যত্ব তাঁহার মনেই ওতপ্রোত। বাঁচিয়া থাকার যত প্রেরণা, এই পৃথিবীর প্রতি যত আকর্ষণ—সবই তাঁহার মনের জন্য। জীবনের মায়া—আখেরে মনেরই মায়া। দেহের মায়া অপেক্ষা মনের মায়া অনেক বেশী দৃঢ়মূল। আজ যদি অকস্মাৎ মৃত্যু আসে রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় শিহরিয়া উঠিবেন প্রধানতঃ কিসের জন্য? তাঁহার দেহের জন্য, না তাঁহার মনের জন্য?

এই পঞ্চাশ বৎসরে দেহের পরিণাম তিনি তো কম দেখেন নাই। শরীরের কত ব্যাধি, কত যন্ত্রণা, কত পরিবর্তন, তাঁহার নিজের এবং আরও শত শত ব্যক্তির জীবনে তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কত লোককে মরিতে দেখিয়াছেন, কত পরিচিত প্রিয়জনের মৃতদেহ নিজের চোখে পুড়িতে দেখিয়াছেন। দেহের মায়া অতএব একান্তই অযৌক্তিক। দেহ যাইবে, যাক্—এই অবশ্যম্ভাবী ঘটনার জন্য রামজীবন পরোয়া করে না? কিন্তু মন? তিলে তিলে সঞ্চিত, বর্ধিত, পরিপুষ্ট, অতি যত্নে রক্ষিত আশা-আকাঙ্ক্ষা আবেগ-উদ্দীপনা জ্ঞান-বিজ্ঞান উল্লাস-অনুভূতির পুঁটলিটি তিনি ছাড়িবেন কোন্ প্রাণে? উহা যদি যায় তাহা হইলে তো কিছুই আর রহিল না। একেবারে নীরন্ধ্র অন্ধকারে ডুবিয়া যাওয়া। উঃ, বড় ভয়াবহ। না, তিনি তাঁহার মনের মায়া ছাড়িতে পারেন না। রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় ঘামিতে লাগিলেন।

* * *

কিছুক্ষণ দম লইয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুনরায় আত্মবিশ্লেষণে ব্যাপৃত হইয়াছেন। মনের মায়া বস্তুটি কি? কি করিয়া উহা এত শক্তিসঞ্চয় করে? পঞ্চাশ বৎসর আগে এই দেহ যে ছিল না, তাহা জানা কথা। কিন্তু মন ছিল কি না, তাহা জানা নাই। শাস্ত্রের প্রমাণ এখন নাই তুলিলাম। অতএব মনের যাহা কিছু বিস্তার তাহা এই পঞ্চাশ বৎসরেই ঘটিয়াছে, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তের নানা ছাপ একত্রিত হইয়া ঘটিয়াছে। যেভাবে ঘটিয়াছে, ঐভাবে না ঘটিয়া অন্য ভাবেও ঘটিতে পারিত, অর্থাৎ মনের সঞ্চয়টির কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে এখন যে আকর্ষণগুলি, ভালবাসাগুলি, আকাঙ্ক্ষাগুলি বর্তমান তাহারা একটা অপরিহার্য পথ

ধরিয়া আসে নাই, বরং এক প্রকার আকস্মিকভাবেই আসিয়াছে। নিস্তারিণী দেবীর সহিত বিবাহ না হইয়া সুহাসিনী দেবীর সহিতও তাঁহার পরিণয় ঘটিতে পারিত। এখনকার দুই পুত্র এক কন্যার বদলে এমনও হওয়া বিচিত্র ছিল না যে তিনি এক পুত্র ও তিন কন্যার পিতা। তাঁহার ভগিনী যে বিধবা হইয়া তাঁহার আশ্রয়ে আসিবে এবং তাঁহার মাতৃহীন সন্তানদের ভার লইবে, ইহা নাও ঘটিতে পারিত। রামজীবনের বাড়ীতে দুইটি গাভী আছে। নিজের হাতে গাভীদের পরিচর্যা করিতে তাঁহার ভাল লাগে। তাঁহার মনের সঞ্চয়ে গাভী দুটির ছবিও স্পষ্ট ভাসিতে থাকে। যদি একটিও গাভী না থাকিত? গাভীর স্মৃতির সহিত জড়িত মনের ঐ অংশটাও তো থাকিত না। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র না হইয়া যদি কলার ছাত্র হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার মনের গঠন নিশ্চয়ই অন্যরূপ হইত।

বাহিরে ঘটনা ঘটে, রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় দৈবাৎ ঘটনাগুলির সামনে পড়েন, কিন্তু নিষ্কৃতি পান না। ঘটনাগুলি তাঁহার মনে তাহাদের ছাপ ফেলিয়া যায়। উহারা তাঁহার মনের অংশ-বিশেষ হইয়া যায়, মনের ওজন ও পরিধিকে বাড়াইয়া যায়। কিন্তু ছাপগুলি সাদা কালীর ছাপ নয়, পাকা রঙের ছাপ। উহারা এলোমেলো ভাবে আসে না, আসিলেও ক্ষতি ছিল না, আসার রীতিটিও যে কোন রকম হইতে পারিত—এত ফাঁক, এত স্থিতিস্থাপকত্ব রহিয়াছে, তথাপি ছাপগুলি কী দৃঢ়, কী প্রখর। আজ এই মুহূর্তে যদি মৃত্যু আসে এক সঙ্গে কত ছবি চিত্তের দ্বারে শেষ বারের মতো ভিড় করিবে—জীবনসঙ্গিনী নিস্তারিণী দেবীর সেবাস্নিগ্ধ শান্ত মূর্তিটি, কমল ও শ্যামল ছেলে দুটির চেহারা, আদরিণী কন্যা রুবী, কানপুরে সহোদর অমিয়জীবন, জয়নগরে বড় দিদি চম্পকলতা, মামীমা, বৃদ্ধ জেঠা মহাশয়, এই তাঁহার নিজের উপার্জনে নির্মিত পরিচ্ছন্ন সুন্দর বাড়িটি, স্বর্গীয়া নিস্তারিণীর বহুযত্নে সজ্জিত আসবাবপত্রগুলি, গাভীদ্বয়, কেলো কুকুরটি, বিড়ালটি, ময়না পাখীটি, পাড়ার বন্ধুবান্ধব, অফিসের সহকর্মীরা, তাঁহার ঘরের ব্যক্তিগত লাইব্রেরির প্রায় হাজারখানি বই—হ্যাঁ, ইহাদের প্রত্যেকেরই ছবি শেষ বিদায় লইতে আসিবে, প্রত্যেকটি ছবি বলিবে,—যাইও না যাইও না, তুমি গেলে আমরা থাকিব কি করিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমাদের চোখ যে অন্ধ হইয়া যাইবে। আজ এই মুহূর্তে যদি মৃত্যু আসে উপরের এই স্বচ্ছ উদার আকাশ তো রামজীবন আর দেখিতে পাইবেন না, দুই ফার্লং দূরে ঐ নদী, ঐ শ্যামল শস্যক্ষেত্র, লতা ফুল ফল, এই মাটি, এই বায়ু, এই জল সবই তো মুছিয়া যাইবে। মৃত্যু, নিষ্ঠুর মৃত্যু, সর্বসংহারক মৃত্যু। পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া জমা এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত আশা, এত সাধ, এত তৃপ্তি সবই নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে মৃত্যুর স্পর্শে? একটি মুহূর্তে? না, রামজীবন আর ভাবিতে পারেন না। ভাবিলে কূল পাওয়া যায় না।

আশ্চর্য। মনের ছাপগুলির এত শক্তি। আগে তো টের পান নাই রামজীবন। ভাল মানুষের মতো এই সংসারে মনকে তিনি যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দিয়াছেন, মনও উল্লাসবেদনা হাসিকান্না কুড়াইয়া কুড়াইয়া জমা করিয়াছে,—কিন্তু প্রত্যেকটি সঞ্চয় তাঁহাকে এমন নিবিড়ভাবে বাঁধিবে, তাহা তো আগে নজরে পড়ে নাই। এখন পরিত্রাণের উপায়? মনের মায়াকে তুচ্ছ করিবেন তিনি কোন্ সামর্থ্যে?

গীতার কথা কি সত্য?—অর্জুন, তুমি ও আমি এবং আমরা সকলেই এই জন্মের আগেও ছিলাম, পরেও থাকিব। এক একটি দেহ ধারণ

যেন এক একটি কাপড় পরিধান। একটি কাপড় পুরানো হইয়া গেলে উহা বাতিল করিয়া দিয়া আমরা নূতন একখানা কাপড ব্যবহার করি। কই, পুরানো কাপড়টির জন্য তো কাঁদিতে বসি না। অথচ যখন সেই কাপড়টি নিত্যকার সঙ্গী ছিল, তখন তাহার উপব মমতাবোধ তো কম ছিল না। নূতন কাপড আসিলে সেই মমতা স্বাভাবিক নিয়মে ম্লান হইয়া যায়, নূতন কাপড়ের জন্য নূতন মমতা সঞ্চিত হইতে থাকে।

দেহ ও মন দুই লইয়া জীবন। দেহ যেমন একটি কাপড়, মনও তেমনি একটি গাত্রা-বরণ। দুই পরিচ্ছদই বার বার বদলাইতে হয়। এক জন্মেব স্মৃতির পুঁটলি অন্য জন্মে নিরর্থক। অবশ্য মনেব বাসনা এবং প্রবৃত্তি—একত্রে যাহার নাম 'সংস্কার' তাহা নষ্ট হয় না। গীতার বিচারে দেহের মায়া যদি অযৌক্তিক হয়, মনের মায়াই বা দাঁডায় কোন্ যুক্তিতে? রামজীবন বন্দ্যো-পাধ্যায় যখন মনোহর বস্থ বা ভালেরাও ডাণ্ডেকার ছিলেন, তখন সেই জন্মের নানা ব্যক্তি ও বস্তুকে লইয়া যে সকল আকর্ষণ ভালবাসা জড করিয়াছিলেন সেই সঞ্চয়গুলি এখন কোথায়? পূর্বতন ঐ দেহদ্বয়ের ন্যায় সেই সেই জন্মের আগন্তুক স্মৃতিগুলিও তো এখন নাই। অসংখ্য অতীত জন্মে রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় অসংখ্য দেহ এবং অসংখ্য স্মৃতির পুঁটলির মালিকানা পাইযাছিলেন। সব গিয়াছে, সব যাইবে। ইহাই জগৎ-রীতি। তাহা হইলে এই জন্মের আকর্ষণ-গুলির জন্যই বা রামজীবন কাঁদিতে বসিবেন কেন? এই দেহকে যেমন একটা নির্দিষ্ট কালের অতিরিক্ত সময় ধরিয়া রাখা যায় না, এই জন্মের নানা ব্যক্তি, বস্তু ও আবেগ-অনুভূতির দাগগুলি —এক কথায় যাহার নাম 'মনের মাযা' উহাকেও তেমনি বরাবর পুষিয়া রাখা চলে না। 'মনের মায়া'কে তলাইয়া দেখিলে উহাব শক্তি নিস্তেজ হইয়া আসে।

দেহের মায়া ও মনের মায়া দুয়ে মিলিয়া জীবন-তৃষ্ণা। দুইকেই অতিক্রম করিতে হইবে। জীবন-তৃষ্ণা দূর করিতে পারিলে মানুষ নিজেকে খুঁজিয়া পায়—জন্মমৃত্যু এবং অজস্র পরিবর্তনের অতীত নিজেব চিরশুদ্ধ স্বরূপকে। ঐ শাশ্বত আত্মসত্যে দাঁড়াইয়া রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় 'মনের মায়া'কে তুচ্ছ করিবেন,—ঠিক করিলেন।

অরূপ!

বিভা সরকার

রূপ নাই—তাই কি অরূপ?
লভি নাই—তাই কি এ মোহ?
তোমারে দেখিনি তবু
আছ তুমি, তাই কি বিরহ?
তব অণু—হতে বিশ্বতনু
তবু হায়। ধরা নাহি যায়—
ভুবন ভরিয়া আছ, তবুও অতনু
ছোটে মন—দূর অধরায়।

আডালে আডালে থাকো
না পাই সীমানা
জীবন রহস্য প্রিয়
যায় না তো জানা।
কে জানে ডুবুরী বিনা
কিবা আছে অতলের বুকে
দৃষ্টিহীন নাহি জানে
জ্যোতির্ময় জাগিছে সম্মুখে!

শিক্ষা ও শিক্ষকসমস্যার একদিক

ডক্টর শ্রীসচ্চিদানন্দ ধর

আজকাল শিক্ষা ও শিক্ষকসমস্যার কথা অনেকেই ভাবছেন। এই সমস্যা সমাধানেরও নানা পন্থা অনেকে নির্দেশ করছেন। আজকাল দেশে বুনিয়াদী শিক্ষা, সমাজ-শিক্ষা, বয়স্ক-শিক্ষা, নারী-শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়েব উচ্চশিক্ষা প্রভৃতি নানা দিক্ থেকে শিক্ষার সমস্যাকে দেখা হচ্ছে। প্রত্যেক বিষয়ে বিশেষ বিভাগ সৃষ্টি ক'বে সরকার মন্ত্রী উপমন্ত্রী, ডিরেক্টর ডেপুটি-ডিরেক্টর, ইন্স্‌পেক্টর সাব-ইন্স্‌পেক্টর সহ-ইন্সপেক্টর প্রভৃতি নানা পদেব লোকদ্বারা শিক্ষাকে একটা বিশেষ রূপ দেবার চেষ্টা করছেন। পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন হচ্ছে—জীবনের বাস্তব প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে আরম্ভ ক'রে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্তরেব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে একটা বিশেষ পরিবর্তন এসেছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার নানা কমিশন বসিয়েছেন, নানা আলোচনা-সভার আয়োজন করেছেন, ক্ষেত্র-বিশেষে উদারভাবে অর্থসাহায্য করছেন—শিক্ষাকে সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গসুন্দর করতে। কিন্তু সরকারের প্রবর্তিত শিক্ষাসংক্রান্ত সংস্কার ও নূতন পদ্ধতির প্রতি দেশের সকলের সমান বিশ্বাস বা সমর্থন নেই। তাই প্রচলিত নূতন শিক্ষা-পদ্ধতির বিরুদ্ধ সমালোচনাও দেশে প্রচুর,—শিক্ষার প্রতি স্তরেই। সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন, এমন যাঁরা বাইরে থেকে প্রচলিত বা পরিবর্তন-শীল শিক্ষাপদ্ধতির সমালোচনা করছেন—তাঁরাও কোন একটা সুষ্ঠু কার্যকরী শিক্ষাপদ্ধতির নির্দেশ দিতে পারছেন না। ফলে সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে—শিক্ষার ক্ষেত্রে। তবু শিক্ষা চলছেই—নিত্যনতুন পরীক্ষণের মধ্য দিয়ে। শিক্ষার কারখানা ঠিকই চালু আছে! তার উৎপাদিত পণ্যের গুণ-নির্বিচারে বাজারে চাহিদা এখনও আছে। পাড়ার স্কুল আর মাষ্টার-মশায়দের শোচনীয় ব্যবহারের জন্য আক্ষেপপূর্ণ সমালোচনা করেও সেই স্কুলেই—সেই মাষ্টার-মশায়দের কাছেই ছেলে পাঠাচ্ছি লেখাপড়া শেখবার জন্যে,—মানুষ হবার জন্যে।

সরকারী দৃষ্টিভঙ্গি

সরকার শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে নিজেদের বিশেষজ্ঞ এবং বাইরের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌দের নিয়ে একটা শিক্ষাপদ্ধতির খসড়া করেন। যখনই দেশব্যাপী একটা শিক্ষার পরিবর্তনের প্রয়োজন মনে হয় তখনই সরকার এক একটা 'কমিশন' বা প্রতিনিধিমূলক সংস্থা সৃষ্টি করেন। এই জাতীয় সংস্থার প্রতিনিধিগণ তাঁদের মতামত সরকারকে জানান। তখন সরকার আইনের সাহায্যে বা অন্য ক্ষমতাবলে এই পরিবর্তনে হাত দেন। শিক্ষাব খাতে ব্যয়ের যে পরিমাণ টাকা থাকে তার বিলিব্যবস্থা করেন। বৎসরের শেষে জন-সাধারণ হিসাব পায়—সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে কত টাকা খরচ করেছেন, কত নতুন স্কুল বা কলেজ হয়েছে, কত বেকার ব্যক্তি শিক্ষকতার কাজ পেয়েছেন, শিক্ষকদের কত ক'রে 'মাগ্‌গী ভাতা' দেওয়া হয়েছে, কোন্ শ্রেণীর শিক্ষকদের কত বেতন বৃদ্ধি হয়েছে, কয়টি বেসরকারী বিদ্যালয় কি পরিমাণ সাহায্য পেয়েছে, কতগুলি বৃত্তি বা বিশেষ বৃত্তি দেওয়া হয়েছে—ইত্যাদি। বাজেটের

নির্ধারিত টাকা বৎসরের মধ্যে যথাযথ বিলি ক'রে দিয়ে—কি কি কাজ হ'ল তার একটা তালিকা প্রকাশ করলেই মোটামুটি সরকারী কর্তব্য শেষ হ'ল বলা চলে। গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে খুব স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্র থাকাও সম্ভব নয়। দেশের জনসাধারণের প্রতিনিধি 'বিধান সভা' যে বিধান ক'রে দেবেন—কয়েকজন ব্যক্তি সেই বিধানকে কার্যকরী করবেন মাত্র। অবশ্য এই বিধানকে কার্যে রূপান্তরিত করার মধ্যে যথেষ্ট কৃতিত্ব, দক্ষতা, দূরদর্শিতা ও চিন্তাশীলতার প্রয়োজন হয়। বিশেষতঃ শিক্ষাসংক্রান্ত নীতিকে কার্যে পরিণত করতে বিশেষ চরিত্রবল, ধীশক্তি ও মনীষার প্রয়োজন—একথা আমরা সকলেই অনুভব করি। কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকার জনসাধারণের টাকাকে নির্দিষ্ট শিক্ষার খাতে খরচ ক'রে এবং এই টাকায় কি কি কাজ হ'ল তার একটা সুন্দর পরিসংখ্যান দিয়েই কর্তব্য শেষ করতে পারেন কি ?

শিক্ষার সঙ্গে জীবনের যোগ

আমরা স্কুল-কলেজে যে বিদ্যা বা লেখাপড়া শিখি তার সঙ্গে জীবনের সংযোগ কতটুকু আছে—এই নিয়ে ভাবনা শুরু হয়েছে প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে থেকে। বিদ্যালয়ে অধীত বিদ্যা আমার অন্নবস্ত্রের সংস্থানের পক্ষে পরবর্তী জীবনে কতটা কার্যকরী হবে ও কতটা অর্থকরী হবে—এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই আমরা শিক্ষার সঙ্গে জীবনের যোগের কথা ভেবে আসছি। যার ফলে আমরা অনুভব করেছি ও করছি—সাহিত্য বা দর্শন-জাতীয় অধ্যয়ন অপেক্ষা—বিজ্ঞান, বাণিজ্য, চিকিৎসা বিদ্যা (ডাক্তারি, কবিরাজী নহে) বাস্তুবিদ্যা ও অন্যান্য কারিগরি বিদ্যা অধিকতর অর্থকরী, সুতরাং শ্রেয়স্করী। আজকাল অধিকাংশ বিদ্যার্থী এবং অভিভাবক—লেখাপড়ার এই বাস্তব কাঞ্চন-মূল্যের দিকে লক্ষ্য রেখে অধ্যয়নের ও অধ্যাপনার প্রয়াসী হন। এটা এক পক্ষে ভাল। নৃতত্ত্বে এম-এসসি পড়ে, তারপর ওকালতি পাশ ক'রে, সরকারের রাজস্ব-বিভাগে কাজ ক'রে, এখন উদ্বাস্তু-পুনর্বাসন বিভাগে কাজ করছেন—আমার এরূপ একজন বন্ধু আছেন। অপর বন্ধু সংস্কৃতে 'অনার্স' পাশ ক'রে কমার্সে এম-এ পাশ করেছেন। জানিনা দ্বিতীয় বন্ধু এখন কোথায় আছেন এবং কি কাজ করছেন। বৃত্তি-নির্বাচনে আমরা সব সময় ব্যক্তিগত রুচি ও পছন্দকে কাজে লাগাতে পারি না। রূঢ় অর্থনৈতিক চিন্তা আমাদের অনেক সময় বাধ্য করে—নিজের প্রবণতাকে বিসর্জন দিয়ে—অন্যটিকে গ্রহণ করতে। এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 'স্বধর্ম' ত্যাগ ক'রে পরবৃত্তি গ্রহণ করতে গিয়ে অনেক জীবন ব্যর্থ হয়। এতে ব্যক্তি ও সমাজ—উভয়েরই ক্ষতি। আমার ধারণা নিজের প্রবণতার বৃত্তিকে নিষ্ঠার সঙ্গে ধরে রাখলে আখেরে ঠকতে হয় না। বৃত্তির প্রতি নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা থাকলে আত্মতৃপ্তি পাওয়া যায়, সমাজ এবং রাষ্ট্র কালে মর্যাদা দেয়, অর্থও আসে। এখন রাষ্ট্রীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় নিজের পছন্দমত বৃত্তিমূলক শিক্ষা বেছে নেওয়ার সুযোগ হয়েছে অনেক। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিভাগ উপবিভাগ নিয়ে এখন বিশেষ অধ্যয়ন করা যায়। পরে জীবিকার সংস্থানও হয়। তবে ব্যবস্থা এখনও সুপ্রচুর নয় এবং সকল বৃত্তির মূল্য এক নয় বলে পছন্দেরও ইতরবিশেষ আছে।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক

শিক্ষাপ্রসার, অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি, বিজ্ঞান সাহিত্য ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থাপনার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে একদল চিন্তাশীল ব্যক্তি শিক্ষার্থীর নৈতিক দুর্বলতা লক্ষ্য ক'রে নিরাশ হচ্ছেন। গুরুর শিষ্যের প্রতি স্নেহ নেই, শিষ্যের গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নেই। এই অভিযোগ

পারস্পরিক। এখন প্রশ্ন এই : শিষ্য গুরুকে কেন শ্রদ্ধা করবে, আর গুরুই বা শিষ্যের প্রতি কেন পিতৃবৎ স্নেহশীল হবেন? আর কিভাবেই বা এই সম্পর্ককে মধুর ক'রে তোলা যায়? গুরু এবং শিষ্যের শ্রদ্ধা ও স্নেহহীন যান্ত্রিক উদাসীন সম্পর্কের জন্য দায়ী কি শিক্ষক, না ছাত্র, না আধুনিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি? এর সংক্ষিপ্ত জবাব দেওয়া সহজ নয়। আমি নিজে একজন শিক্ষক। তাই ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি এই ব্যাপারে প্রথম দায়ী শিক্ষক, দ্বিতীয়—বিদ্যালয়, তৃতীয়—ছাত্রের অভিভাবক ও চতুর্থ দায়ী ছাত্র। আর পঞ্চম দায়ীকে যদি দাঁড় করানো যায় সে হচ্ছে সমাজ—যে শিক্ষার মূল্যায়ন করে।

শিক্ষক জাতির জনক (?)

আমরা সভাসমিতির বক্তৃতায় শুনি শিক্ষক জাতির জনক। শিক্ষকরাই ভাবী নাগরিক তৈরী করেন। তাঁদের দায় পবিত্র, জীবিকা মহৎ—ইত্যাদি। এসব কথা যাঁরা বলেন—তাঁরা অন্তরে অন্তরে তা বিশ্বাস করেন কিনা এবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আর যাঁদের উদ্দেশ্য ক'রে বলা হয় সেই শিক্ষকমশায়রাও তা বিশ্বাস করেন না, মনে করেন—'এ হচ্ছে নৈবেদ্য না দিয়ে, শুধু মন্ত্র দিয়ে তুষ্ট করবার বৃথা ছলনা। শিক্ষকদের মাইনে বাড়ছে না, ভাতা বাড়ছে না—শুধু বড় বড় কথা শুনছি।' সমাজে শিক্ষকদের প্রতি একটু করুণামাখা, আপাত-দরদী স্তোক বাক্যের ছলনা আছে বৈকি। শিক্ষকরা বাহিরে একটু বোকা সেজে এসব কথা শুনে আসেন। কিন্তু ক্ষোভ সমানই থেকে যায়। এমনি একটা ছলনা চলেছে—শিক্ষকসমাজ ও বাইরের সমাজের সঙ্গে। যদি আমাদের রাষ্ট্র এবং সমাজ দক্ষিণার ভাল ব্যবস্থা না করেও অন্তর দিয়ে শিক্ষক এবং শিক্ষকতাকে শ্রদ্ধা করতেন, তাহলে সমাজ হয়তো শিক্ষার আরও ভাল ফল আশা করতে পারত। 'মাষ্টার মশাই' মানেই পাড়ার সকলের কৃপার একটি পাত্র।

শিক্ষকতার যোগ্যতা—পাণ্ডিত্য?

শিক্ষকের কাছ থেকে আমরা যা আশা করি তার উপর নির্ভর করবে শিক্ষকের যোগ্যতা নির্ণয়। আমাদের স্কুল কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের কতগুলি ডিগ্রি (তার আবার শ্রেণীবিভাগ আছে)—শিক্ষকের যোগ্যতার মাপকাঠি ক'রে রাখা হয়েছে। এ ছাড়া বর্তমানে যোগ্যতা মাপের সহজ কোন যন্ত্র নেই—কিন্তু আমাদের এ বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত যে শুধু ডিগ্রি দিয়ে শিক্ষক নিযুক্ত করার জন্যই বাঞ্ছিত শিক্ষার সামগ্রিক ফল আমরা পাচ্ছি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রিধারী ব্যক্তিও শিক্ষক হিসাবে ব্যর্থ হতে পারেন, যদি তাঁর শিক্ষাদান বিষয়ে প্রবণতা না থাকে। আমার মতে শিক্ষকতার প্রথম গুণ হবে শিক্ষা-প্রবণতা। অনেকেই জীবনের অন্যক্ষেত্রে চেষ্টা ক'রে, ব্যর্থ হয়ে সর্বশেষে শিক্ষকতায় আসেন। এঁদের নিজের উপর শ্রদ্ধা নেই, নিজের বৃত্তির উপরও নেই। সুতরাং এক্ষেত্রে ফল খুব ভাল আশা করা যায় না। অপর পক্ষে প্রবণতা-গুণে একজন সাধারণ ডিগ্রি-সম্পন্ন শিক্ষকও নিজের শিক্ষাদান-ক্ষমতাকে বাড়িয়ে নিতে পারেন এবং ছাত্রদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারেন।

শিক্ষকের চরিত্র ছাত্রের শ্রদ্ধার কারণ

পাণ্ডিত্যকে মানুষ প্রশংসা করে, চরিত্রকে শ্রদ্ধা করে। ছাত্রেরা শিক্ষকদের প্রধান বিচারক। অবসর-বিনোদনের সময় বন্ধুমহলে ছাত্রেরা প্রায়ই অধ্যাপকদের চরিতকথা আলোচনা ক'রে থাকে। এই সত্যটি যে কোন কর্ণবান্ শিক্ষকই উপলব্ধি ক'রে থাকবেন। আর শিক্ষক-মশায়দের নিজ ছাত্রজীবনের স্মৃতিতে ফিরে যেতে

অনুরোধ করি। সেখানে দেখতে পাব আমরাও আমাদের মাষ্টারমশায়দের নিয়ে কি সব আলোচনা করছি। কোন্ শিক্ষক ফাঁকিবাজ, কে ঘণ্টা পড়ার অনেক পর ক্লাসে আসেন এবং ঘণ্টা শেষ হওয়ার আগেই বেরিয়ে যান, কে পাঠ্য বিষয়বস্তু না পড়িয়ে বাজে গল্প ক'রে ঘণ্টা কাটিয়ে গেলেন, কে প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও ডিসেম্বর মাসে পাওনা আদায় ক'রে নিলেন—এ-সব আমাদের গোপন মনের কথা ভাল করেই জানতে পাবি। ফলে শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রদের খুব একটা শ্রদ্ধা থাকে না। অপরপক্ষে যদি তাদের অন্তর দিয়ে ভালবাসা যায়, তাদের পড়াশুনা এবং অন্যান্য বিষয়ে উন্নতির জন্য চেষ্টা করা যায় এবং সর্বোপরি তাঁদের সামনে একটা নির্লোভ, সংযত ও নিষ্ঠাপূর্ণ জীবন যাপন করা যায়—তাহলে ছাত্রেরা শিক্ষককে আপনা থেকেই শ্রদ্ধা করে। শিক্ষকতা ক'রে শিক্ষকের বৃত্তিকে হেয় জ্ঞান করলে ছাত্রদের মনের উপর তার প্রতিক্রিয়া ভাল হয় না।

শিক্ষা—জীবন দিয়ে জীবন জাগানো

দীপ দিয়ে দীপ জালানোর মত শিক্ষা হচ্ছে জীবন দিয়ে জীবন জাগানো। লেখা-পড়ার বাইরে যদি কোন বস্তু শিক্ষকের কাছ থেকে আশা করা যায়—সেটা হচ্ছে ছাত্রের জীবনে শিক্ষকের চরিত্রের প্রতিফলন। সমাজকে আমরা যত দোষই দিই না কেন, সমাজ এখনও 'চরিত্র পূজা' করে। নিজে অসদুপায়ে অর্থোপার্জন করলেও বাবা মনে-প্রাণে আশা করেন—আমার ছেলে সৎ হোক, বীর হোক, সত্যনিষ্ঠ হোক। খুব উদ্ধত দম্ভী পিতামাতাকেও দেখি, ছেলেকে স্কুলে ভরতি করবার সময় শিক্ষকের নিকট জোড়হাতে বিনয়ের সঙ্গে বলেন, 'এ ছেলেকে আপনার হাতে সঁপে দিলাম। আজ হতে এ আপনার ছেলে। তাকে মানুষ করার ভার আপনার।' যদি শিক্ষক হিসাবে আমরা আমাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ থাকি তাহলে ভেবে দেখতে হবে অভিভাবক বা সমাজ আমাদের কাছ থেকে যা আশা করেন তার কতটুকু দেবার আমরা উপযুক্ত করেছি নিজেদের। শিক্ষকের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হ'লে নিজেদের বেতালে পা পড়ার সম্ভাবনা কম। ছাত্রের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করার দায়িত্ব শিক্ষকের। পন্থা—চরিত্র-বল, পাণ্ডিত্য নহে। ছাত্র একবার 'যেন তেন প্রকারেণ' শ্রদ্ধাবান্ হয়ে উঠলে শিক্ষক যা বলবেন তা তার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হবে—মরমে আঘাত দেবে, ফলে ছাত্রের বিদ্যা এবং শিক্ষা দুইই হবে। একদিকে যেমন সে শিক্ষকের কাছ থেকে ইতিহাস, ভূগোল, গণিত শিখবে—তেমনি সে শিক্ষকের চরিত্র দেখে উদ্বোধিত হবে বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনের জন্য। তিনিই যথার্থ শিক্ষক যিনি চরিত্র দ্বারা ছাত্রকে প্রভাবিত করতে পারেন।

আচার্য বনাম অধ্যাপক

আমরা টাকার বিনিময়ে ছাত্রকে বিশেষ কোন বিষয় শেখাই। এখন শিক্ষকতা মুখ্যতঃ জীবিকা মাত্র। আমি মাষ্টারি না ক'রে গ্রাসা-চ্ছাদনের জন্য অন্য বৃত্তি নিলেও পারতাম। টাকার বিনিময়ে বিদ্যালয়ে গিয়ে বা ছাত্রের বাড়ীতে গিয়ে বা ছাত্রকে নিজের বাড়ীতে এনে একটা বিষয় পড়িয়ে বুঝিয়ে দিলাম। মাসান্তে তার বাবা বা বিদ্যালয় আমার চুক্তিবদ্ধ বৃত্তিটা দিয়ে দিলেন। বাহ্যতঃ সম্পর্কটা অর্থ-কেন্দ্রিক। কিন্তু যেহেতু একটা বিকাশশীল মন তার জিজ্ঞাসা নিয়ে আমার মনের সান্নিধ্যে আসে এবং আমি আমার বুদ্ধি ও মনের বিশ্লেষণকে তার মধ্যে সঞ্চারিত করি সেই জন্য সম্পর্কটা স্বভাবতই যান্ত্রিক হতে পারে না। প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যে একটা বৃত্তি থাকে—নিজের

চিন্তা এবং ভাবনাকে অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করবার। আমি গণিত পড়াতে পড়াতে হয়তো কখনও আমার ভালমন্দ রুচিপছন্দকে কথায় বা কাজে আমার ছাত্রের সামনে প্রকাশ ক'রে ফেলি। একেই বলা যায় শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব (ভাল বা মন্দ গুণ) ছাত্রকে অল্পবিস্তর প্রভাবিত করে—এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। এজন্যই অধ্যাপককে হতে হয় আচার্য। 'আচার্য' তিনি, যাঁর আচরণ অনুকরণীয়। আগে গুরুকুল বাসের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আচার্য-সান্নিধ্য-লাভ—অধ্যয়ন গৌণ। আরুণি, ধৌম্য-প্রমুখ শিষ্যগণ গোপালন, আচার্যের ক্ষেত্র-সংরক্ষণ প্রভৃতি কাজের ফাঁকে ফাঁকে গুরু ও গুরুপত্নীর জীবন দেখে একটা সুষ্ঠু জীবনের ধারণা নিয়ে শিক্ষাকে পূর্ণ করতে পারতেন। শিক্ষায়—বুদ্ধি-চর্চা অপেক্ষা জীবনচর্যার মূল্য বেশী। জীবন-চর্যার মূর্ত উদাহরণ আচার্য। আমরা যারা শিক্ষক—তারা আচার্য হবার দাবি কতটা করতে পারি ?

ছাত্রাবাস —আধুনিক গুরুকুল

আজকাল দেশে ভাল ছাত্রাবাসের অভাব—এরূপ অভিযোগ অভিভাবকেরা ক'রে থাকেন। নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা ও জীবনের মহৎ প্রেরণা প্রভৃতির অনুকূল পরিবেশপূর্ণ স্থানে অভিভাবকেরা ছাত্রদের রাখতে চান। কিছুদিন আগে খৃষ্টান মিশনারী-পরিচালিত স্কুল কলেজ ও ছাত্রাবাসকে দেশের লোক এরূপ আদর্শপূর্ণ শিক্ষাস্থান বলে মনে ক'রত। কার্যতও তাই ছিল—অস্বীকার করা যায় না। অধুনা রামকৃষ্ণ মিশন-পরিচালিত স্কুল কলেজ ও ছাত্রাবাসের জনপ্রিয়তা এবং চাহিদা দেশে প্রচুর। ৩।৪ বৎসরের শিশু থেকে ১৮।২০ বৎসরের যুবক সকলের ক্ষেত্রেই এইরূপ ছাত্রাবাস ও বিদ্যালয় আদর্শ শিক্ষার পক্ষে উপযুক্ত স্থান বলে অভিভাবকেরা মনে করেন। কিন্তু এরূপ ছাত্রাবাস বা শিক্ষায়তন চাহিদার তুলনায় খুবই কম। এসব ছাত্রাবাসেরও প্রাণকেন্দ্র কয়েকজন নিষ্ঠাবান্ ত্যাগী শিক্ষাব্রতী। তাঁরাই যথার্থ আধুনিক গুরুকুলের আচার্য। এরূপ 'দীপ্ত জীবন' দেশের সর্বত্র আশা করা যায় না কি ? যাঁদের সান্নিধ্য থেকে আরও নবীন জীবন বিকশিত হয়ে উঠবে সৌন্দর্যে ও সৌরভে ? দেশের শিক্ষক-সমাজের কাছে জাতি এই-ই চায়।

গৃহ ও বিদ্যালয়ের সমবেত সাধনা

গৃহে মা-বাবার ও পরিবারের শিক্ষাই শিশুর সংস্কার গঠন করে। তারপর বিদ্যালয় ও তার শিক্ষক। সুতরাং শিক্ষক, শিক্ষায়তন ও ছাত্রাবাসের দোষ দেখার আগে অভিভাবকের নিজের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে হবে। শিশুর সামনে 'আচার্য' হতে হবে, তারপর শিক্ষক। মা-বাবার দায়িত্ব সীমাবদ্ধ, তাও নিজের সন্তানের মধ্যে। শিক্ষকের দায়িত্ব বৃহত্তর ক্ষেত্রে—সমাজের সকলকে নিয়ে গৃহ ও বিদ্যালয়ের যুগপৎ সমবেত সাধনায় আমাদের ভাবী পুরুষ অবশ্যই 'মানুষ' হবে।

আমেরিকায় ভারত-ধর্মের প্রভাব

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

স্বামীজীর কথা দিয়েই শুরু করি :

Many things strike me here (in America) It may be fairly said that there is poverty in this country. I have never seen women elsewhere as cultured and educated as they are here. Well educated men there are in our country, but you will scarcely find anywhere women like those here. It is indeed true that goddesses themselves live in the houses of virtuous men I have seen thousands of women here whose hearts are as pure and as stainless as snow.

এ-থেকে এটুকু বোঝা যায় যে ধর্মীয় মনোভাব সকল দেশের লোকেব মধ্যেই আছে, কোন বিশেষ দেশের তা একচেটিয়া নয়। হয়তো সব মানুষের মধ্যে এর খোঁজ পাওয়া যাবে না। কিন্তু একদল মানুষ সব জায়গাতেই আছেন যাঁদের মন ধর্মমুখী।

তবে দূর থেকে দেখে তো সব বোঝা যায় না। কাছ থেকে দেখলে অনেক ভুল ধারণারই অবসান হয়। অনেকেই মনে করেন ডলারই আমেরিকার একমাত্র ভগবান। আমেরিকাকে কাছ থেকে জানার আগে আমারও তাই ছিল ধারণা। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখেছি সে ধারণা ভুল। ঐহিক ঐশ্বর্যের জন্যে আমেরিকানরা প্রাণপাত পরিশ্রম করছে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের মধ্যে ধর্মপ্রবণতাও বেশ চোখে পড়ে। ওয়াশিংটন ইণ্টারন্যাশনাল সেণ্টারের এক বক্তৃতায় শুনেছিলাম যে, ইদানীং চার্চের সভ্য-সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কিন্তু এতে যতটা না বিস্মিত হয়েছি, তার চেয়েও বেশি হয়েছি আমেরিকানদের মধ্যে পরধর্মসহিষ্ণুতা দেখে। খ্রীষ্টান ধর্মেরই নানা শাখা প্রশাখা, এর প্রায় সবগুলিই আমেরিকানদের মধ্যে দেখা যায়। প্রোটেস্টাণ্ট, ক্যাথলিক, প্রেসবিটেরিয়ান, মেথডিষ্ট—আরও কত কি। কিন্তু ধর্মবিশ্বাস নিয়ে বিরোধ নেই।

এ-সম্পর্কে একটি অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে। শিকাগোয় পৌঁছবার পর একদিন শ্রীমতী হেলমেট মেয়ারের আতিথ্য গ্রহণ করে-ছিলাম। শহরের উপকণ্ঠে South Luellaতে বাড়ি। শ্রীমতী মেয়ার কথায় কথায় জানালেন যে, তাঁর এবং তাঁর পরলোকগত স্বামীর ধর্ম-বিশ্বাস ছিল পৃথক্, তাঁরা পৃথক্ পৃথক্ গীর্জায় যেতেন। কিন্তু এই নিয়ে সংসারে তাঁদের মধ্যে কোন দিন কোন বিরোধ দেখা দেয়নি। তাঁর ছেলেমেয়েরা তাদের পিতার ধর্মে বিশ্বাসী। তিনি এ নিয়ে কোন দিন আপত্তি করেননি। শ্রীমতী মেয়ারের এই উদারতা আমাকে সেদিন বিশেষ বিস্মিত করেছিল।

আরও দেখেছি ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের প্রতি আমেরিকানদের প্রবল আগ্রহ। শুধু অধ্যাপক সাহিত্যিক বা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই আগ্রহ প্রচুর।

অবশ্য এই আগ্রহের মূলে প্রধানতঃ স্বামী বিবেকানন্দ। শিকাগোর ধর্মমহাসম্মেলনে তাঁর বক্তৃতা এবং তারপর আমেরিকায় তাঁর কার্যাবলীর

ফলেই ভারত-ধর্ম সুষ্ঠুভাবে আমেরিকায় প্রচারিত হ'তে শুরু করে।

বিবেকানন্দের মধ্য দিয়েই আমেরিকা সেদিন পরিচয় পেয়েছিল ভারত-ধর্মের উদারতার, বিশ্ব-বোধের। সহিষ্ণুতা, সহযোগ এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাই যে ভারতীয় ধর্মের মূলমন্ত্র—বহু প্রমাণ ও উদ্ধৃতি দিয়ে স্বামীজী সেদিন তা সকলকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

শুধু তো শিকাগোর ধর্মমহাসম্মেলনে বক্তৃতা-দানই নয়, বলতে গেলে গোটা আমেরিকাতেই তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন ঝড়েব বেগে, বক্তৃতা দিয়েছেন অসংখ্য, ব্যাখ্যা করেছেন ভারতের ধর্ম ও দর্শন। আশ্চর্য নয় যে, সেদিন আমেরিকায় তিনি অভিহিত হয়েছেন Cyclonic Hindu এবং Lightning Orator নামে। স্বামীজীর সেই সব বক্তৃতায় ধর্মভাব আমেরিকাব জীবনের মর্মমূলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ ইতিহাস অবশ্য অনেকেরই জানা।

স্বামী বিবেকানন্দের আরব্ধ কর্ম চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা যাঁরা করছেন, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের নাম তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আমেরিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্রের সংখ্যা এগারটি। ইচ্ছে ছিল এর সব কটিই দেখে যাব। অন্যান্য কাজ ও সময়ের স্বল্পতার জন্যে তা সম্ভব হয়নি। তবু অনেকগুলি কেন্দ্রেই আমি গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে বিশেষ প্রীত হয়েছি এবং কেন্দ্রগুলির কার্যকলাপ আমাকে বিশেষ মুগ্ধ করেছে। সে বিবরণে পরে আসছি।

তার আগে আমেরিকায় ভারত-ধর্ম প্রচারে একটি নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, সে নাম স্বামী অভেদানন্দ। ১৮৯৭ খৃঃ আগষ্ট মাসে তিনি আমেরিকায় এসে পৌছান। এর আগে স্বামীজী তাঁকে নিয়ে আসেন লণ্ডনে। তাঁর জ্ঞান, মনীষা ও অভিজ্ঞতার ফলে শীঘ্রই তিনি ভক্তদের শ্রদ্ধা অর্জন করেন এবং নিউ ইয়র্কের কার্য-পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ১৮৯৯ খৃঃ স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকায় আসেন, তখন তিনি স্বামী অভেদানন্দের সাফল্যে বিশেষ মুগ্ধ হন। অভেদানন্দের বন্ধু, অনুরাগী ও ছাত্রের সংখ্যা সেই সময় ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯০১ খৃঃ তাঁর বক্তৃতা এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে কোন কোন দিন শ্রোতার সংখ্যা ছয় শতে পৌছাত। স্বামী অভেদানন্দ সেই সময় যেসব পুস্তক রচনা করেন তার সংখ্যাও প্রচুর।

* * *

এবার আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। নিউ ইয়র্কের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেণ্টারের স্বামী নিখিলানন্দ আমায় একদিন চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন। সেদিন ঝিরঝির ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল বাইরে। আমরা গল্প করছিলাম সেণ্টারের গেস্ট রুমে বসে বসে।

নিখিলানন্দ এককালে কলকাতার 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সহ-সম্পাদক ছিলেন। তিনি তাঁর সাংবাদিক জীবনের গল্প শোনাচ্ছিলেন। তখন খবরের কাগজে রিপোর্টার খুব বেশি থাকত না। তাই সহ-সম্পাদক হয়েও তাঁকে একাধিক সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক অধিবেশনের 'রিপোর্ট' করতে হ'ত।

নিখিলানন্দ বললেন, তিনি যখন প্রথম আমেরিকায় আসেন তখন তিনি সাংবাদিকের বিশ্লেষণী দৃষ্টিতেই আমেরিকাকে দেখেছিলেন। তিনি তখনই লক্ষ্য করেছিলেন যে, আমেরি-কানদের মধ্যে একটা ধর্মভাব রয়েছে। কিন্তু সেটা রয়েছে প্রচ্ছন্ন হয়ে। তিনি ভেবেছিলেন সেদিনই যে, যদি এই সুপ্ত ধর্মভাবকে জাগিয়ে তোলা যায়, তবে তা হবে একটা বিরাট কাজ।

নিখিলানন্দের কথা শুনে আমার স্বামী বিবেকানন্দের একটা কথা মনে পড়ল। স্বামীজী একবার বলেছিলেন: Education is the manifestation of perfection already in man. আমেরিকা সত্যই উচ্চশিক্ষিতের দেশ; তাদের মধ্যে যে নানা বিষয়ে perfection (সিদ্ধি) আসবে তা খুবই স্বাভাবিক। ধর্মভাবটাও শিক্ষিত মানুষের মধ্যে থাকার কথা এবং সেই ধর্মভাবকে জাগিয়ে তোলা সত্যই একটা মহৎ কাজ।

নিখিলানন্দ সেদিন আমাকে তাঁর সেণ্টারের সব কিছু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি সেখানে ইতিপূর্বে এসেছেন তাঁদের কথা বললেন। আরও জানালেন যে, এই সেণ্টারে যে সব বক্তৃতা হয় তাতে বহু আমেরিকান যোগ দিয়ে থাকে এবং এদের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে।

প্রায় পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতায় নিখিলানন্দ স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন যে, ভারত-ধর্মের আদর্শ আমেরিকানরা ক্রমশঃ আরও বেশি ক'রে উপলব্ধি করছে। এর ফলে দু'দেশের মধ্যে বোঝাপড়া উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

স্বামী নিখিলানন্দ আমেরিকার বুদ্ধিজীবী-মহলে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছেন। তাঁর যে সকল রচনা বিশেষ আদৃত হয়েছে—তার মধ্যে The Gospel of Sri Ramakrishna, গীতা ও উপনিষদের অনুবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ল। নিউ ইয়র্ক থেকে মাইল ৪০ দূরে একটা গ্রামে এক সংবাদপত্রগোষ্ঠীর মালিক Crowell Colliers-এর International Manager-এর বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়েছি। খাওয়া-দাওয়ার পর গৃহকর্ত্রী বললেন: আমার মা এখানে আছেন, আপনি আজ আসছেন শুনে তিনি বিশেষ উল্লসিত। যদি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করেন তবে তিনি খুব খুশি হবেন।

গৃহকর্তাও অনুরূপ অনুরোধ করলেন। রাজী হলাম। বললাম, নিশ্চয় দেখা ক'রব।

গৃহকর্ত্রী আমায় উপরে নিয়ে গেলেন। সেখানে একটি ঘরে মৃদু আলোর নীচে খাটে শুয়ে আছেন অতি বৃদ্ধা এক মহিলা। উত্থানশক্তি রহিত। আমি নমস্কার করার আগেই আমায় করজোড়ে নমস্কার করলেন।

সবিস্ময়ে দেখলাম তাঁর শয্যার নিকট দেওয়ালে তিনটি ছবি টাঙানো—যীশু, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ। আমার সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করার পরই তাঁর দুচোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। বার বার 'সোয়ামীজী'র কথা বলতে লাগলেন। আমায় জিজ্ঞাসা করলেন নিখিলানন্দের সঙ্গে দেখা হয়েছে কি না?

জানালাম, হ্যাঁ।

—আবার কি দেখা হবে তাঁর সঙ্গে?

—হ্যাঁ।

শুনে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন যে, আমি যেন নিখিলানন্দকে বলি—যাতে তিনি এসে এই বৃদ্ধাকে একবার দর্শন দিয়ে যান। আরও জানালেন স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দও তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁর কাছেই তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কথা শোনেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের এবং ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে অনেক বই পড়েছেন বলে জানালেন।

আমি যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দেশের মানুষ এবং আমার সঙ্গে তিনি যে আলাপ করতে পেরেছেন, এ-জন্য তিনি বিশেষ গৌরবান্বিত বোধ করছেন বলে জানালেন সেই বৃদ্ধা।

ভারতের প্রতি, ভারত-ধর্মের প্রতি সেই মার্কিন মহিলার অকৃত্রিম অনুরাগের কথা কোন দিন ভুলতে পারব না।

নিউ ইয়র্কে রামকৃষ্ণ মিশনের আর একটি কেন্দ্র আছে। বর্তমানে স্বামী পবিত্রানন্দের তত্ত্বাবধানে এই কেন্দ্রটি পরিচালিত। কেন্দ্রটির নাম—বেদান্ত সোসাইটি।

পবিত্রানন্দের আমন্ত্রণে এই কেন্দ্রে প্রায় পুরো একটি দিন কাটাবার সুযোগ পেয়েছিলাম। আশ্রমে গিয়েই দেখা পেলাম এক আমেরিকান আশ্রম-সেবিকার। তাঁর সেই শান্ত সৌম্য মূর্তি আজও চোখে ভাসছে। তাঁর মুখভাবই বলে দেয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে উৎসর্গীকৃত তাঁর জীবন।

পবিত্রানন্দের সঙ্গে আমেরিকায় ভারতীয় ভাবাদর্শের প্রভাব সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হ'ল। স্বামীজী বললেন, আমেরিকা জড়বিজ্ঞানের দেশ, কিন্তু এখানে ধর্মবিশ্বাসী মানুষও কম নয়। ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ বলে ভারতের প্রতি আমেরিকানদের গভীর শ্রদ্ধা।

পবিত্রানন্দ একটি আমেরিকান যুবকের কথা বললেন। ছেলেটি প্রায়ই আসত এই আশ্রমে বক্তৃতা শুনতে। হঠাৎ একদিন সে আসা বন্ধ ক'রল। কিছুদিন পরে স্বামীজীর সঙ্গে তার দেখা হতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সে আর আসে না কেন আশ্রমে? ছেলেটি উত্তরে জানালে যে, বাবা-মায়ের বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্যে তার মন অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, তাই সে আসতে পারেনি।

পবিত্রানন্দ বললেন, এ-ঘটনা একটাই নয়। আমেরিকায় 'broken homes' (ভাঙা ঘর)-এর সমস্যা একটা বড় সমস্যা। এর ফলে আমেরিকান-দের জীবনে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। তাই শান্তি খুঁজতে এরা অনেকেই আসে আমাদের এই আশ্রমে।

এর পর লস্ এঞ্জেলেসের বেদান্ত মঠ। এই আশ্রমে যে বিস্ময় আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল তার জন্যে আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না।

সন্ধ্যায় পৌঁছেই চোখে পড়ল—একদল নরনারী মা কালীর একটি মূর্তি তৈরী করছেন। তাঁদের সকলেই আমেরিকান। আমি আশ্চর্য হয়ে বহুক্ষণ ধরে দেখলাম মূর্তিনির্মাণে তাঁদের একাগ্রতা, তাঁদের চোখ-মুখের ভক্তিনম্রভাব।

আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দ তখন সেখানে ছিলেন না। দুর্গাপূজা উপলক্ষে তিনি গিয়েছেন লস্ এঞ্জেলেস থেকে প্রায় ৮০ মাইল দূরে—সাণ্টা বারবারায়। সেখানে পূজা হয়েছে। স্বামীজীর সহকারী স্বামী বন্দনানন্দ তখন আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত।

মূর্তি গড়া রেখে সেই আমেরিকান নরনারীদের একজন আমাকে ভারপ্রাপ্ত সহকারীর কাছে নিয়ে গেলেন। স্বামীজীর সহকারীর বাংলা শুনে বুঝতেই পারিনি যে তিনি বাঙালী নন, মাদ্রাজী—এমন চমৎকার বাংলা বলেন। তাঁর সঙ্গে সেদিন সন্ধ্যায় অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছিল।

পরের দিনই প্রভবানন্দ ফিরে এলেন আশ্রমে। আমায় খবর দেওয়া হ'ল যে তিনি এসেছেন এবং পরদিন আশ্রমে আমার মধ্যাহ্ন-ভোজের নিমন্ত্রণ।

পরদিন তাঁর সঙ্গে দেশের গল্পগুজব হ'ল অনেক। স্বামী প্রভবানন্দ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার অনুবাদ করেছেন। সেই অনুবাদের ভূমিকা লিখেছেন এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরেজ সাহিত্যিক আলডুস্ হাক্সলি। আমাকে এক কপি উপহার দিলেন তিনি। বহু সংস্করণ হয়েছে বইটির—ভারত-ধর্মের প্রতি আমেরিকার মানুষের ক্রমবর্ধমান আকর্ষণের আর একটি উজ্জ্বল প্রমাণ।

মধ্যাহ্নভোজের সময় বহু আমেরিকানের

সঙ্গে একত্র মিলিত হলাম, ভোজে ভারতীয় আহার্যই পরিবেশিত হ'ল। সকলের গায়েই সাধারণ পোষাক। দেখলাম, ভারতের বাহুল্যহীন সরল জীবনযাত্রায় এরা বেশ অভ্যস্ত।

কথায় কথায় একটা বিষয়ের প্রতি স্বামী প্রভবানন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। বললাম, রামকৃষ্ণ মিশন আমেরিকায় খুবই উল্লেখযোগ্য কাজ করছে। কিন্তু এই কাজ প্রধানতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর দিকেই কেন্দ্রীভূত। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চল এই দিক থেকে যেন অবহেলিত বলে মনে হয়। অথচ দক্ষিণাঞ্চলে নিগ্রোদের বিবিধ সমস্যা গুরুতর। সেখানে ধর্মের প্রচার আরও বেশি প্রয়োজন, সুতরাং দক্ষিণাঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশনের কতকগুলি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত নয় কি?

উত্তরে প্রভবানন্দ বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তো বটেই। কিন্তু এই প্রয়োজন মেটানো যাচ্ছে না উপযুক্ত সন্ন্যাসীর অভাবে। রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রের যাঁরা ভারপ্রাপ্ত হবেন তাঁদের শুধু ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান থাকলেই চলবে না, জ্ঞান প্রচার করার, সেই ধর্ম ও দর্শন সকলকে উপলব্ধি করানোর কৌশলও তাঁদের জানতে হবে।

এরপর শিকাগোর বেদান্ত সোসাইটি। এই কেন্দ্রের প্রধান হলেন স্বামী বিশ্বানন্দ।

টেলিফোনে এনগেজমেন্ট ক'রে এসেছিলাম। স্বামীজীর সঙ্গে আলাপ ক'রে খুব আনন্দ পেলাম। তাঁর সদাহাস্যময় মুখটি সদা প্রশান্ত।

বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে বিশ্বানন্দের খুব আগ্রহ। অনেক আলোচনা হ'ল। কথায় কথায় এল অচিন্ত্যকুমারের 'পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ' গ্রন্থের কথা। তিনি বললেন, বইটি অতি সুন্দর হয়েছে, তবে কোথাও কোথাও যেন তথ্যের বিকৃতি ঘটেছে। সেটুকু না থাকলেই ভালো হ'ত।

তারপর পর উঠল শিকাগোর সেই বিখ্যাত ধর্মমহাসম্মেলনের কথা। বিশ্বানন্দ জিজ্ঞেস করলেন, যেখানে স্বামীজী বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেই শিকাগো মিউজিয়ম-হলে গিয়েছিলেন নাকি?

বললাম, এখানে পৌছানোর পরই গিয়েছিলাম। শিকাগোকে তীর্থক্ষেত্র মনে করেই এখানে এসেছি। মিউজিয়াম-হলে না গিয়ে পারি?

ধর্মমহাসম্মেলনের অনেক গল্প বললেন বিশ্বানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা আমেরিকাবাসীর মনে কি প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল তা তো সকলেরই জানা।

বিশ্বানন্দ জানালেন, এই আশ্রমে প্রায়ই নতুন নতুন আমেরিকান দর্শক ও শ্রোতা আসেন। ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে এঁদের আগ্রহ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। চূড়ান্ত ভোগবিলাসের মাঝেও তাঁদের মনে এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, 'What next?'—ততঃ কিম্? ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যের মধ্যেই যে প্রকৃত শান্তি নেই তা ধীরে ধীরে এঁরা বুঝতে পারছেন। তাই ভারত-ধর্মের প্রতি আগ্রহ।

বিশ্বানন্দের কথা শুনে আমার মনে পড়ল আমার এক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা।

রাজধানী ওয়াশিংটনে আমন্ত্রণ পেয়ে নিডহাম* দম্পতির বাড়ি গিয়েছি। ঢুকেই থমকে দাঁড়াই। দু'দিকের দেওয়ালে বাঙলাদেশের শিল্পীদের ছবি। যামিনী রায়, গোপাল ঘোষ, সুনীলমাধব। ঘরের এক কোণে বাঁকুড়ার প্রকাণ্ড এক কাঠের ঘোড়া, শান্তিনিকেতনের শিল্পসম্ভার, দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি মূর্তি। মার্কিন রাজধানী ওয়াশিংটনে রীতিমত একটি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম।

* মিঃ নিডহাম, প্রাক্তন ডাইরেক্টর, USIS, United States Information Service, Calcutta.

মিঃ নিডহ্যামকে জিজ্ঞেস করলাম, মিসেস নিডহ্যাম কোথায়?

বললেন, আমার বাবা-মা দু'জনেই অসুস্থ। তাঁদের পরিচর্যার জন্যে স্ত্রী নিউ ইয়র্কে। আমাকেও মাঝে মাঝে যেতে হয়।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনার বাবার বয়স কত?

প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন মিঃ নিডহ্যাম। তারপর বললেন, জানেন মিঃ বোস, বাবার বয়সের কথা উঠতেই চট ক'রে আমার মনে পড়ে গেল আমাদের জীবন-নীতির সঙ্গে ভারতীয় জীবন-দর্শনের তফাতের কথা। আমার বাবার বয়েস সত্তরের ওপর। মার বয়েস তার কাছাকাছি। কিন্তু আমাদের তো আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। বয়েসের কথা তো আমরা কোন দিন ভাবি না। এ ব্যাপারে আপনাদের ব্যবস্থা কিন্তু সুন্দর। পঞ্চাশে পা দিয়েই মনকে ঈশ্বর-মুখী করবার উদ্যোগ। আমার সত্যি ভালো লাগে এই আইডিয়া।

কথায় কথায় গীতায় বর্ণিত স্থিতপ্রজ্ঞের কথা তোলেন নিডহ্যাম। জিজ্ঞেস করলেন সেই সংস্কৃত শ্লোকটি মনে আছে কি না আমার। ভাগ্যি মনে ছিল, তাই বললাম:

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

এ-শ্লোকের ব্যাখ্যায় আর একটি শ্লোকের উল্লেখ—যেখানে সমুদ্রের সঙ্গে স্থিতধী মানুষের তুলনা:

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ॥
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥

শ্লোক শুনে নিডহ্যাম উল্লসিত। ভারতের সঙ্গে যে তাঁর প্রাণের যোগ!

সবশেষে রামকৃষ্ণ মিশনের বোস্টন কেন্দ্রের কথা বলি। বোস্টনে ডঃ অমিয় চক্রবর্তী রয়েছেন। ইচ্ছে ছিল তাঁর সঙ্গেই বোস্টন আশ্রমে যাব। ডঃ চক্রবর্তীর মুখেই বোস্টনে অখিলানন্দের কার্যাবলীর কথা শুনেছিলাম। কিন্তু সেই সময় স্বামী অখিলানন্দ আশ্রমে ছিলেন না। তিনি প্রভিডেন্সে গিয়েছিলেন বক্তৃতা দিতে। বোস্টন থেকে নিউ হ্যাম্পশায়ারে ডারহ্যাম যাই। যাবার সময় আশ্রমে জানিয়ে যাই যে, আবার বোস্টনে ফিরে এলে জানাব।

বোস্টনে ফেরার আগে আশ্রমে খবর দিয়েছিলাম। স্টেশনে পৌঁছে দেখি স্বয়ং স্বামী অখিলানন্দ আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁর সঙ্গে অনেক আলাপ আলোচনা হ'ল স্টেশনে বসে। তিনি আমাকে নিউ ইয়র্কের ট্রেনে তুলে দিলেন, এবং আর একবার বোস্টনে আসতে বললেন।

দেশে ফেরার আগে স্বামীজীর কথায়ই একবার বোস্টন কেন্দ্রে গিয়েছিলাম। আশ্রমের ধর্মসভায় যোগদান করেছিলাম সেবার। দেখলাম, যোগদানকারী আমেরিকানের সংখ্যা মোটেই কম নয়।

কথায় কথায় বললেন স্বামী অখিলানন্দ, আমেরিকা উচ্চশিক্ষিতের দেশ হলেও তাদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলা আজও রয়েছে। তাদের অনেকের মন আজ ধর্মাভিমুখী হচ্ছে, কিন্তু তাদের মধ্যে ধর্মপ্রচার ও ধর্মভাব জাগিয়ে তোলার সুযোগ এখনও যথেষ্ট রয়েছে। সেই কাজেই আমরা আত্মনিয়োগ করেছি।

বোস্টনে স্বামী অখিলানন্দের প্রভাব অপরিসীম, দলে দলে লোক আসে তাঁর মুখে ভারতের কথা, ভারত-ধর্মের কথা শুনতে। তার মধ্যে বুদ্ধিজীবীর সংখ্যাও কম নয়।

বোস্টনে থাকতে একথাও আমি জেনেছিলাম

যে, স্বামী অখিলানন্দ ম্যাসাচুসেটস্ ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজীর উপদেষ্টা কমিটির অন্যতম সদস্য।

শুনে আনন্দিত এবং বিস্মিত হলাম। এই ইনষ্টিটিউট বিশ্বের মধ্যে কারিগরিবিদ্যা-শিক্ষার সর্ববৃহৎ কেন্দ্র। তাঁরা স্বামীজীকে তাঁদের অন্যতম উপদেষ্টা নির্বাচিত করেছেন। ভারতীয় সন্ন্যাসীদের প্রতি আমেরিকাবাসীর শ্রদ্ধার এ একটি বিশেষ নিদর্শন।

রামকৃষ্ণ মিশন ছাড়া যোগদা-সৎসঙ্গ ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন প্রচারের জন্য কাজ করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। লস এঞ্জেলেসে এদের প্রধান কেন্দ্রের নাম Self Realisation Fellowship Centre এর কার্য পরিচালনা করেন আমেরিকানরা। মনে হয়, ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন প্রচারের কাজ ভারতীয়দের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হলেই ভালো।

শেষকালে আর একজনের নাম উল্লেখ করি: অধ্যাপক হরিদাস চৌধুরী। সানফ্রান্সিস-কোয় তাঁর আশ্রম। ভারতীয় ধর্ম প্রচারে অরবিন্দের দর্শনের ওপরই তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

আমাদের দূতাবাসগুলির মাধ্যমে যে সব প্রচারকার্য চলে থাকে তা প্রধানতঃ রাজ-নৈতিক, তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু বে-সরকারীভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের দ্বারাও যে আমেরিকার মতো জড়বিজ্ঞানে উন্নত একটি দেশে ভারত-ধর্ম ও ভারত-সংস্কৃতির প্রচারে অনেক কাজ হতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে ঘুরে বেড়িয়ে সে ধারণাই আমার হয়েছে।

আমার ঠাকুর

শ্রীশান্তশীল দাস

আমার ঠাকুর সহজ মানুষ ভারি,
গরিব ঘরের ছেলে,
আমার ঠাকুর নয় উপাধিধারী,
জ্ঞান যে কোথায় পেলে।
আমার ঠাকুর বৈরাগী নয় মোটে,
সবার মাঝেই থাকে,
আমার ঠাকুর—যেথায় সবাই জোটে,
সবাই যে পায় তাকে।
আমার ঠাকুর মাটির মা'কে ডাকে,
মাটিতে পায় সাড়া,
আমার ঠাকুর দেখতে যে পায় মাকে,
মায়ের মাঝেই হারা।
আমার ঠাকুর সহজ কথাই বলে,
সবই যে তার সোজা,

আমার ঠাকুর সহজ পথেই চলে,
সহজে যায় বোঝা।
আমার ঠাকুর সবার পূজা করে,
সব দেবতার প্রিয়,
আমার ঠাকুর মেলায় এসে ধরে,
—বিশ্বে বরণীয়।
আমার ঠাকুর যা বলে তাই বেদ,
জীবকে দেখে শিব,
আমার ঠাকুর ঘোচায় ভেদাভেদ,
দিব্য জ্ঞানের দীপ।
আমার ঠাকুর অশরণের শরণ,
আতুর জনের ঠাঁই,
আমার ঠাকুর সকল কলুষ হরণ,
তুলনা তাঁর নাই।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল

॥ কাব্যপরিচয় ও সমালোচনা ॥

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীমদনমোহন গোস্বামী

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। চৈতন্য-জীবনী কাব্য ব্যতীত এই শতাব্দীতে প্রাচীন ধারার 'পাণ্ডববিজয়' এবং 'চণ্ডীমঙ্গল' নামক দুইটি পাঁচালী কাব্য প্রথম পাওয়া গেল। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের পূর্বে রচিত 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য পাওয়া যায় না।

বঙ্গদেশে সুপ্রাচীন কাল হইতেই চণ্ডীদেবীর (মার্কণ্ডেয় চণ্ডী) মাহাত্ম্যবিষয়ক নানাবিধ কাহিনী প্রচলিত। এই কাহিনীগুলির মধ্যে দুইটি—'কালকেতু ফুল্লরা' ও 'ধনপতি-খুল্লনা'—পঞ্চদশ শতক হইতেই 'চণ্ডীমঙ্গল' পাঁচালী কাব্যের বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। 'অন্নদা-মঙ্গল এর দেবীর মত সৌম্য না হইলেও 'চণ্ডী-মঙ্গল'-এর দেবী উগ্রা নহেন, তিনি পশুপালিকা, ব্যাধ ও পশুপালকাদির আরাধ্যা, এবং 'কান্তার-কামিনী'। অবশ্য এই পাঁচালী কাব্যের চণ্ডী-দেবীর আর্য-মূর্তির উপর লৌকিক ধর্মের বিবিধ প্রলেপ পড়িয়াছে, ইহা সর্বদাই স্বীকার্য। 'চণ্ডী মঙ্গল'-এর কাহিনীযুগলের উপাস্যা দেবীও সর্বতো-ভাবে অভিন্ন নহেন। গোধাবাহন বা গোধা-প্রতীক-যুক্তা দেবীর মূর্তি আর্যাবর্তের সর্বত্র পাওয়া যায়। ধনপতি-কাহিনীর উপাস্যা অষ্ট-তণ্ডুল-অষ্টদূর্বা উপচারে পূজিতা দেবী বনদুর্গা। অনুমান হয়, দুইটি কাহিনীই কোন অপভ্রংশে ছিল, অন্ততঃ 'ফুল্লরা', 'খুল্লনা' নামগুলি দেখিয়া তাহাই মনে হয়। ধনপতির কাহিনী মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত ব্রতকথা হইতে আসাও বিচিত্র নহে। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' গ্রন্থে আদৌ উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশস্থিত 'মঙ্গলকোট'-এর অনুসরণে উত্তর-রাঢদেশে উজানী মঙ্গলকোটের উল্লেখ আছে এবং ইহাতে দেবীর 'গোধিকারূপ ধারণ', 'কমলে-কামিনী' ইত্যাদির কথা আছে—

ত্বং কালকেতুবরদাচ্ছলগোধিকাসি
যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা।
শ্রীশালবাহননৃপাদ্ বণিজঃ সসূনো
রক্ষেঽম্বুজে করিচয়ং গ্রসতী বমন্তী॥

মঙ্গলচণ্ডীর নাম-সম্পৃক্ত কোন কোন অর্বাচীন পুরাণে যে মঙ্গল-দৈত্যের কাহিনী পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের কল্পনা। ভবিষ্যপুরাণে বর্ণিত 'মঙ্গলচণ্ডিকা' ব্রতকথার সহিত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের কোন সম্পর্ক নাই। মঙ্গলচণ্ডীর নামের অর্থ দেবী মঙ্গলময়ী এবং তাঁহার পীঠস্থানের নাম মঙ্গলকোট। কালকেতুকে বরদানকারিণী দেবী পৌরাণিক মহিষমর্দিনী।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে মঙ্গলচণ্ডী-কাহিনীর লোকপ্রিয়তা বৃন্দাবন দাসের কাব্য হইতে জানা যাইতে পারে—

ধর্ম কর্ম লোক সবে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥

ইহার পূর্বেও যে কাহিনীটি বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল, ইহা মনে করা অসঙ্গত নহে।

চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের বাল্মীকি মাণিক দত্ত। মুকুন্দরামের কথা—'মাণিক দত্তের দাণ্ডা করিয়ে প্রকাশ', এই জনশ্রুতির স্বীকৃতি মাত্র—

আদ্য কবি বন্দিলাঙ মহামুনি ব্যাস।
মাণিক দত্তের আজ্ঞা করিয়ে প্রকাশ॥

কিন্তু মাণিক দত্তের যে পুঁথি পাওয়া যাইতেছে তাহা অত্যন্ত প্রাচীন নহে, যদিচ রচনাটি

প্রাচীন ছড়াবহুল এবং এই মাণিক দত্ত পূর্বতন অপর জনৈক মাণিক দত্তের নিকট ঋণী। এই ঋণের পরিমাণ নির্ণয় করাও সহজ নহে। কাব্যের উপক্রমণিকায় ধর্মমঙ্গল-কাব্যানুসারী সৃষ্টিকাহিনী প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা অবশ্য কাব্যের প্রাচীনত্বের পরিপোষক—

অনাস্তের উৎপত্তি জগত সংসারে।
হস্তপদ নাহি ধর্মের ভ্রমে নৈরাকারে॥
আপনে ধর্ম গোঁসাঞি গোলোক ধিয়াইল।
গোলোক ধেয়াইতে ধর্মের মুণ্ড স্বজিল॥

* * *

গান করে দেবীর ব্রত সুখী সর্বজয়া।
যে ঘটে অবতার করিবে মহামায়া॥
দেবীর চরণে মাণিক দত্তে গায়।
নায়কের তরে দুর্গা হবে বরদায়॥

অনুরূপ ভাবে সহদেব চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল-কাব্যে চণ্ডীদেবতার উল্লেখ রহিয়াছে। মুকুন্দরামের কাব্যের কোন কোন মুদ্রিত সংস্করণের আদিতে ধর্মঠাকুর সম্বন্ধীয় শ্লোকাবলী প্রক্ষিপ্ত হইতে দেখা যায়। আসল কথা হইতেছে মনসা, ধর্ম, চণ্ডী, শিব ইত্যাদি অপৌরাণিক দেবতা-বিষয়ক ছড়া বা পাঁচালীগুলির মূলে আর্য ও আর্যেতর উপাদানের সংমিশ্রণ রহিয়াছে। বিবিধ পাঁচালীতে বিবৃত একই জাতীয় সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ইহারই ফল বলা যায়। পুনশ্চ—সহজিয়া ও বাউলদিগের রচনায় সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বিবরণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং এই উভয় বিবৃতির কোনটিই পৌরাণিক নহে। ইহাও লক্ষণীয় খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও শ্রীচৈতন্যদেবের মহান্ আদর্শ ও তৎসম্পৃক্ত সাহিত্যের মধ্যেও লৌকিক, অপিচ বহু অংশে অমানবিক চণ্ডীকাব্য আপনার স্থান করিয়া লইয়াছিল।

মুকুন্দরামের কাব্যের সহিত ঐক্য বর্তমান মাধবাচার্য [=দ্বিজ মাধব, মাধবানন্দ]-প্রণীত চণ্ডীমঙ্গলকাব্য 'শারদাচরিত'-এর। কাব্যরচনা-কাল ১৫০১ শক=১৫৭৯–৮০ খ্রীঃ। উভয় চণ্ডীতে বহু অংশে মিল পাওয়া যায়। তবে এই মাধবাচার্য গঙ্গামঙ্গল ও কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য-রচয়িতা মাধবাচার্যের সহিত অভিন্ন কি না বলা শক্ত। কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যকর্তা মাধবনামধেয় ব্যক্তির সংখ্যাও একাধিক। 'সারদাচরিত'-রচয়িতা মাধব ও 'গঙ্গামঙ্গল'-কাব্যপ্রণেতা মাধবও এক ব্যক্তি সম্ভবতঃ নহেন, যদিচ উভয়ের কাব্যে গণেশ-বন্দনা অংশে কিছু মিল আছে। মাধবের কাব্যে কাহিনী সংক্ষিপ্ত ও শিবায়ন অংশ বর্জিত।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণ-উপাধিক মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (খ্রীঃ ষোড়শ শতকের শেষ পাদ)। ইহার পূর্ববর্তী বলিয়া কথিত কবি বলরাম শ্রীকবিকঙ্কণ। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দুইটি ধারা। একটি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ, অপরটি লৌকিক কাহিনীমূলক শিবায়ন খণ্ড, গোধিকা খণ্ড ও কমলে-কামিনী খণ্ড—এই তিন উপভাগে বিভক্ত। মুকুন্দরামের কাব্যে মূলতঃ দ্বিতীয় ধারা-টিই পাইতেছি। সপ্তদশ শতক হইতে প্রথম ধারায় বহু কাব্য বিরচিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শত-কের শেষের দিকেও পূর্ববঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য প্রণীত হইয়াছে, পুনশ্চ অনেক কবির কাব্যে দুই ধারা মিলিয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্ত দিতেছি। জনার্দনের 'চণ্ডীমঙ্গল পাঁচালীতে' কেবল ধনপতির আখ্যান আছে। দ্বিজ হরিরামের চণ্ডীমঙ্গল-এ (১৭ শতক) উভয় কাহিনীই রহিয়াছে। কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল'-এ কমলে-কামিনীর অনুরূপ কাহিনী পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতকের অধিকাংশ দেবী-মাহাত্ম্য কাব্য মার্কণ্ডেয় চণ্ডী অবলম্বনে রচিত। এই পর্যায়ে পড়ে কৃষ্ণজীবনের 'অম্বিকামঙ্গল' বা 'অভয়া-মঙ্গল' (পুঁথি-লিপিকাল ১২১৬ সাল), মুক্তারাম সেনের 'সারদামঙ্গল' (১৭৪৭ খ্রীঃ), ব্রজলাল-রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' (পুঁথি খণ্ডিত), ভবানীশঙ্কর

দাসের 'মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা' (১৭৭৯-৮০ খ্রীঃ), গোবিন্দানন্দ কবিকঙ্কণের পাঁচালী, শিবচরণ সেনের 'গৌরীমঙ্গল', হরিশ্চন্দ্র বসুর 'চণ্ডীবিজয়', দ্বিজ কমললোচনের 'চণ্ডিকাবিজয়' (১৭ শতক ?), হরিনারায়ণ দাসের 'চণ্ডিকামঙ্গল', রামশঙ্কর দেবের 'অভয়ামঙ্গল', জয়নারায়ণ সেন [=রায়]-এর 'চণ্ডিকামঙ্গল' প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত কয়েকটি ক্ষুদ্র পাঁচালীর পুঁথি চাটিগাঁ অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে, যেমন, 'ঘোর মঙ্গলচণ্ডী', দ্বিজ রঘুনাথ-বিরচিত 'নিত্যমঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী', মদনদত্ত ও দ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্রের পাঁচালী, দেবীদাস সেনের 'শ্রীমন্তের চৌতিশা', শ্রীচাঁদ দাসের 'কালকেতুর চৌতিশা', ধনপতি-খুল্লনার কাহিনীযুক্ত 'চৈত্র-মাহাত্ম্য' পুঁথি প্রভৃতি।[১]

অষ্টাদশ শতকের পূর্বে দেবী-বিষয়ক কোন গীতি পাওয়া যায় না। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ছেলে-ভুলানো ছড়াটি প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য। অনেকে মুকুন্দরামকে ইংরেজ লেখক চসারের সহিত তুলিত করিয়াছেন, অবশ্য উভয়ের আবির্ভাব কালের পার্থক্য দুই শত বৎসর। কাউয়েল সাহেব মুকুন্দরামের কিছু অংশ ইংরেজীতে কাব্যানুবাদ করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহা অনস্বীকার্য, মুকুন্দরামের প্রভাব পরবর্তী বহু কবির উপর পড়িয়াছে এবং ইহা একান্তই স্বাভাবিক। ক্ষমানন্দ, রামদাস আদক, ভারতচন্দ্র প্রভৃতির নাম দৃষ্টান্ত-স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। পৃথ্বীচন্দ্রের 'গৌরীমঙ্গল' কাব্যে কবি-কঙ্কণ মুকুন্দরাম ও রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র উভয়েরই উল্লেখ আছে। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-এর প্রথম মুদ্রণ হয় বটতলাতে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে, মুকুন্দরামের কাব্যের প্রথম সংস্করণ বটতলাতে প্রকাশিত হয় ইহার চারি বৎসর পরে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে। এই কাব্য পরে বহু জন দ্বারা (অক্ষয় চন্দ্র সরকার, রামজয় বিদ্যাসাগর প্রভৃতি) এবং বহু প্রতিষ্ঠান হইতে (বঙ্গবাসী, বসুমতী ইত্যাদি) বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় টীকা-পাঠান্তর ইত্যাদি সহযোগে ইহার একটি সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। সংস্করণটির আলোচনা প্রবন্ধের শেষাংশে করা হইয়াছে।

মুকুন্দরামের জন্ম-সন ও কাব্যরচনার কাল লইয়া মতান্তর বর্তমান।[২] এই বিষয়ে পরিগৃহীত মতানুসারে কবির জন্মভূমি বর্ধমান জেলার সেলিমাবাদ থানার অন্তর্গত দামুন্যা গ্রাম (বর্তমান বর্ধমান রায়না থানার অন্তর্ভুক্ত)। কবির পিতামহ চক্রবর্তী-পদবিক কয়ড়ি গাঞি রাঢ়ী শ্রোত্রিয় জগন্নাথ, পিতা গুণিরাজ-উপাধিক হৃদয়, মাতা দেবকী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবিচন্দ্র, কনিষ্ঠ রমানাথ (রামানন্দ), পুত্র-পুত্রবধূ শিবরাম-চিত্রলেখা, কন্যা-জামাতা যশোদা-মহেশ। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে রচনা-কাল-জ্ঞাপক যে শ্লোকটি আছে ['শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা'], তাহা হইতে (রস=৬ নহে) ১৪৯৯শক=১৫৭৭–৭৮ খ্রীঃ পাওয়া যায়। চট্টগ্রামে প্রাপ্ত 'কবিকঙ্কণের চৌতিশা' পুঁথিতে যে শ্লোক আছে ['চাপ্য ইন্দু বাণ সিন্ধু শক নিয়োজিত। পঞ্চবিংশ মেষ অংশে চৌতিশা পূর্ণিত॥'] তাহাতে পাওয়া যায় ১৫১৫ শক=১৫৯৩–৯৪ খ্রীঃ।[৩] মানসিংহ বাঙ্গালার সুবেদারি পান ১৫১১ শক=১৫৮৯ খ্রীঃ। কবিপুত্র শিবরাম কুতুব খাঁর নিকট কয়েক বিঘা জমির সনন্দ পাইয়াছিলেন। কুতুব বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সুবেদার ছিলেন ১৬০৬খ্রীঃ। কবির পৃষ্ঠপোষক বাঁকুড়া রায়ের[৪] পুত্র রঘুনাথের রাজত্বকাল ১৪৯৫–১৫২৫শক=১৫৭৩–১৬০৩ খ্রীঃ। সুতরাং কাব্যরচনার শেষ কাল সম্ভবতঃ ১৬০৩ খ্রীঃ। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে অরাজকতা দেখা দিয়াছিল। পাঠানরাজ দাউদ

খাঁ কাররানির রাজত্বকালে ডিহিদার মামুদ সরিপের [=গিয়াসুদ্দীন মামুদ শাহ (১৫৩৩ খ্রীঃ)] অত্যাচারে কবিকঙ্কণ বাস্তু ত্যাগ করিলেন। অবশেষে বাঁকুড়া রায়ের পোষকতা লাভ করিয়া তৎপুত্র রঘুনাথের আদেশে কবি কাব্য-রচনা করেন। আত্মকাহিনী অংশে এই বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নির্ভরযোগ্য প্রাচীন পুঁথিও দুর্লভ। দামুন্যায় প্রাপ্ত পুঁথি (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে আদর্শরূপে গৃহীত) অসম্পূর্ণ, ও পাঠ বহু অংশে ভ্রান্তিবহুল। কাইতি গ্রামে প্রাপ্ত পুঁথির লিপি-কাল ১১৮৩ সাল। এই পুঁথিতে যে স্বতন্ত্র আত্মপরিচিতি অংশ পাওয়া যাইতেছে, তাহা নিতান্তই পরবর্তী কালের জাল রচনা। 'দিগ্‌ বন্দনা' সন্দর্ভটিও প্রক্ষিপ্ত, লৌকিক দেবাধিক্যে ও বিবিধ ধর্মের প্রলেপে অংশটি পরিপূর্ণ। সূর্য, সহদেব ও শুকদেব বন্দনা অংশগুলি সব পুঁথি ও মুদ্রিত সংস্করণে পাওয়া যায় না।

মঙ্গলকাব্যগুলির সাধারণ কাঠামো যেইরূপ, চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ও অনুরূপভাবে গঠিত। স্বপ্নাদেশ, চৌতিশা, বারমাস্যা, দেবতার প্রয়োজনমত স্বর্গ-বাসীদিগের মর্ত্যে আগমন, দেবতার খেয়াল-খুশি, বিবিধ দেবদেবী বন্দনা, সৃষ্টি-প্রক্রিয়া, হরগৌরী-সংবাদাদি সমস্তই চণ্ডীমঙ্গলে পাওয়া যাইতেছে। কাহিনীটি উত্তর-ভারতীয় প্রাপ্ত সম্পদ নয়, বাঙ্গালা দেশের নিজস্ব এবং কবির গভীর রসবোধ ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশীলতা,বেদ-জ্যোতিষাদি বিদ্যার দ্বারা অনুশীলিত জ্ঞান, স্থানীয় রীতিনীতি ইত্যাদির সম্বন্ধে সচেতনতা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটিকে বঙ্গ সাহিত্যের একটি সম্পদ করিয়া রাখিয়াছে। কবি চিত্রকুশলী। ত্রিপদী ও পয়ারের দোতারা বাজাইয়া কবি আসর মাত্‌ করিয়াছেন। কাব্যে রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ ইত্যাদি গ্রন্থের উল্লেখ, বিবিধ স্থান, নদ-নদী, শহর-গ্রামাদি বর্ণন ও নিখুঁত চরিত্রাঙ্কন কবিকঙ্কণের কাব্যকে মহা-কালের পাতায় অমর করিয়া রাখিয়াছে।

কাব্যের মানবিকতা অপর একটি বিশেষ লক্ষণীয় উপাদান। ফুল্লরা-কালকেতুর জীবনযাত্রায়, ভাঁড়ু দত্ত, যদু তেলি, মুরারি শীল প্রভৃতির চরিত্র-চিত্রণে, জমিদারী বন্দোবস্তে কালকেতুর প্রজাবিলির নমুনায়, পশুগণের গোহারিতে, বায়স-রূপিণী চণ্ডীর দৌত্যে, খুল্লনার অঙ্গীকারে এবং সমসাময়িক সমাজ-বর্ণনায় কবি মানবিকতার মানদণ্ডকে উন্নত রাখিয়াছেন। মঙ্গল-কবিরা স্বভাবতই যুগচিত্রশিল্পী হইয়া থাকেন। মুকুন্দ-রামের কাব্যেও এই যুগচিত্রশিল্পের অপ্রতুল নাই। ধনপতি ও শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রাকালে যে গ্রামগুলির নাম রহিয়াছে (হসনপুর, গাঙ্গাড়া, বাকুল্যা প্রভৃতি), তৎসমূহের অনেকগুলি আজিও অস্তিত্বহীন নহে। প্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয়, প্রাপ্ত পুঁথিগুলির মধ্যে গ্রামের নামগত ঐক্য সাধারণতঃ লক্ষিত হয় না। কাব্য পাঠে জানা যায়, তৎকালে বঙ্গদেশের বহু স্থান জঙ্গলাকীর্ণ, জনসাধারণ পাঠানমোগলের অত্যাচারে বিপন্ন, সমাজে বর্ণশ্রেষ্ঠগণ অধঃপতিত, সৌভাগ্যসন্ধান-তৎপর বণিককুলের অভ্যুদয়, জমিদারগণের অত্যাচার, সুন্দরবনাঞ্চলে পর্তুগীজ জল-দস্যুদিগের উপদ্রব ('হার্মাদের ডর') এবং দেশে দেশে অবাধ বাণিজ্য ও দ্রব্যাদি বিনিময় ছিল।

ইহা ছাড়া সামাজিক রীতিনীতিরও একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ কাব্যটির মধ্যে পাওয়া যাইতেছে। জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু তিনটিরই চিত্র কবিকঙ্কণ অঙ্কিত করিয়াছেন। জন্মে হুলুধ্বনি, নাড়িচ্ছেদ, 'দৃষ্টি-নিবারণ', ষষ্ঠী পূজা, নামকরণ ও পঞ্চমবর্ষে কর্ণবেধ, দ্বাদশ বর্ষেই কন্যা অরক্ষণীয়া। বিবাহে পণপ্রথা, যৌতুক দান, উচ্চকোটিতে পুরুষের বহু বিবাহ ও স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী বা স্ত্রীসজ্যের সহমরণ। পুরুষের পরিধান পাগড়ি, অঙ্গরাখা ও ধনী হইলে 'নেত',

তসর ও দোছুটি। দরিদ্রের সম্বল 'খুঞা'। মেয়েদের পরিধানে শাড়ী, চিত্রিত কাঁচুলী, হাতে লৌহ ও 'কুলুপিয়া শঙ্খ'। শ্রাদ্ধাদিতে জ্ঞাতি-সম্বর্ধনা ও শ্রেষ্ঠ নির্বাচনে অনিবার্য গোলযোগ। স্বামীকে সবশে আনয়নার্থ বিবিধ অভিচার, ক্রিয়া-কলাপ ইত্যাদি তো ছিলই।

অসাধ্য সাধনের সময় প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ডাক পড়ে বিশ্বকর্মা ও পবনসুনু হনুমানের। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও তাঁহারা যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া আত্মকর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। কাব্যে নানাবিধ প্রাণী, দ্রব্য, ফল, ফুল ইত্যাদির কথা পাওয়া যায়। তৎকালীন কবিকুলের লক্ষ্য ছিল সর্ববিষয়ে গ্রন্থকে বিশ্বকর করিয়া তোলা। ইহার জন্য একটি বাঁধা-ধরা নিয়মও ছিল। নগর গ্রাম, নায়ক নায়িকা, বন যুদ্ধ ইত্যাদির বর্ণনা যাহার ফলে একজাতীয়ই হইয়া দাঁড়াইত।

কাব্যের ভাষায় কিছু পরিমাণে প্রাচীন শব্দ এবং রূপ (তথি, তেঁই, কাঁতি, কোঁঙর) সংরক্ষিত থাকেই। চণ্ডীমঙ্গলের ভাষায় মধ্যে মধ্যে অপভ্রংশ শব্দ প্রয়োগের বাহুল্য কাব্যটির প্রাঞ্জল হইবার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। তৎকালীন উচ্চারণভঙ্গী ও লিপিকরের অজ্ঞতা পুঁথিগুলির বানান সম্বন্ধে অনবধানতার জন্য দায়ী। ধ্বনির দিক দিয়া বিপ্রকর্ষ করিয়া শব্দের সম্প্রসারণ করা হইয়াছে [পরণাম, মুকুতি, মরত (মর্ত্য), কিলিশ (ক্লেশ)]। পুরাপুরি অভিশ্রুতির প্রয়োগ সুবিরল [লোটায়্যা, লয়্যা, বাজায়্যা]। সন্ধি ও সমাস সাধারণ। কারক প্রয়োগ সবিভক্তিক ও অবিভক্তিক দুই ভাবেই পাওয়া যায়। বাক্যরীতি সাধারণ নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার সহিত সদৃশ। শব্দভাণ্ডার-বিচারে তৎসম, তদ্ভব ও দেশী শব্দ ব্যতীত মুসলমানী শব্দ (যথাযথ ও বিকৃত উভয় ভাবেই) প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। কুড়ি হাজার পঙ্‌ক্তিতে নাম সমেত ২০০-২১০ টি ফারসী শব্দ পাওয়া গিয়াছে। কাব্যে সুভাষিতের সন্ধানও কিছু মেলে ['এত অহঙ্কার গো তাবৎ শোভা করে। কৃপাময়ী লক্ষ্মী গো যাবৎ থাক ঘরে॥'] পুঁথির বিকৃত ও অশুদ্ধ পাঠের জন্য কাব্যের কোন-কোন অংশ দুর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

বিচার করিলে দেখা যায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্য নিখুঁত নহে। ছন্দের বৈচিত্র্যহীনতা কাব্যটির মধ্যে অনিবার্যভাবে একঘেয়েমি আনিয়া দিয়াছে। অত্যুক্তি ও অস্বাভাবিক বর্ণনাও যে নাই, এমন নহে। খুল্লনার সপত্নীর সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা, শ্রীমন্তের শ্যালিকাদিগের সহিত রঙ্গরস ইত্যাদি বর্ণনায় কিঞ্চিৎ আতিশয্য ঘটিয়াছে। কলিঙ্গ ও গুর্জর দেশ বর্ণনা কবির দুর্বল ভূগোল-জ্ঞানের পরিচয় দেয়। কলিঙ্গের অবস্থান যথাযথ হয় নাই। অপর একটি কথা। কবির জীবনের দুঃখ তাঁহার কাব্যে এমন ভাবে রেখাপাত করিয়াছে, যে তিনি পরবর্তী কবিদিগের জন্য অবিমিশ্র রসসম্পদ রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। এই দিক দিয়া কবির আদৌ সংযম ছিল না বলিয়াই মনে হয়। উত্তর যুগের কবি ভারত-চন্দ্রের জীবনে উত্থান-পতন মুকুন্দরামের তুলনায় কিছুমাত্র কম ছিল না, তথাপি তাঁহার কাব্যে কবিকঙ্কণের অত্যন্ত হা-হুতাশ কোথাও দেখি না। অনেকের মতে মুকুন্দরাম 'দুঃখের কথায় বড'। মুকুন্দরাম যদি দুঃখের কবি হইতেন তবে কথা ছিল না। কিন্তু মুকুন্দরাম সমগ্র কাব্যে আপনাকে ভুলিতে পারেন নাই। তাই কাব্যে কবি মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন।

অপর একটি আলোচনাযোগ্য বিষয় হইল—চণ্ডীমঙ্গলের ধর্ম ও কবির ধর্ম। চণ্ডীমঙ্গলের আরাধ্য-দেবতার মধ্যে আর্য ও আর্যেতর সংমিশ্রণ দেখা গেলেও তাহাতে কাব্যটিকে মূলতঃ

শাক্ত কাব্য বলিতে বাধা হয় না। তবে কাব্যে চৈতন্য-বন্দনা আছে, বৈষ্ণব-পক্ষপাতিত্বের দৃষ্টান্তও বিরল নহে, হরিনাম-মাহাত্ম্যও (কৃত্তিবাস-কথিত নাম-মহিমা) রহিয়াছে। জনশ্রুতি, কবির পিতামহ সম্ভবতঃ শৈব ছিলেন ও পরে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, আদৌ বৈষ্ণব কবিকে ভগবতী শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারিণী বনমালিনী মূর্তি প্রদর্শন করিয়া উক্ত বিশেষ মহিষ-মর্দিনী রূপেই তদগৃহে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন। এইস্থানে একটি কথা কিন্তু সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় দর্শনে হরি ও হরে ভেদ নাই, শাক্ত ও বৈষ্ণবে যে বিরোধ তাহা নিতান্তই বাহ্য, কাজেই কবির উপাস্যা দেবীর মধ্যে যে দুই ধর্মের মৌলিক ঐক্য প্রদর্শিত হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাঙ্গালী জাতির জীবনে ও সাহিত্যে যে পরিবর্তন দেখা গিয়াছিল, তাহারই আভাস রহিয়াছে কাব্যে চৈতন্য-বন্দনায় ও মানবিকতায়। ভারতচন্দ্রে চৈতন্য-বন্দনা না থাকিলেও মানবিকতা আছে পূর্ণ মাত্রায়। আসল কথা, চণ্ডীমঙ্গল কাব্য শাক্ত সঙ্গীত—শাক্তের কড়িতে বৈষ্ণবের কোমল মিলিয়া কাব্যটি সুমধুর হইয়াছে, সন্দেহ নাই। যাঁহারা কাব্যের সর্বত্র বৈষ্ণব ধর্মের ছায়া দেখেন, তাঁহারা কবির ধর্মকেও দেখেন না, কাব্যের ধর্মকেও উপেক্ষা করিয়া চলেন। কবির ধর্ম ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক ধর্মের উপরে, কাব্যের ধর্ম সহৃদয়-হৃদয়সংবাদী রসের প্রতিষ্ঠায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, অনেকে 'জগন্নাথমাহাত্ম্য' [=জগন্নাথ-মঙ্গল, জগন্নাথ-চরিত্র, ব্রহ্মপুরাণ] কাব্য-প্রণেতা দ্বিজ মুকুন্দ [=মুকুন্দ ভারতী]-কে (১৭ শতক) মুকুন্দরামের সহিত অভিন্ন মনে করিয়া তাঁহার বৈষ্ণবত্ব বিধান করেন। বলা বাহুল্য, দুই মুকুন্দ এক ব্যক্তি নহেন।

চণ্ডীমঙ্গল [=অভয়ামঙ্গল] কাব্য অতীত কালের অচলায়তন—প্রাণ না থাকিলেও ইহার যে একটি বিশিষ্ট জাতি আছে যাহার দ্বারা আজিও ইহা চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর (প্রথম ভাগ) যে নূতন সংস্করণটি প্রকাশ করিয়াছেন (১৯৫২ খ্রীঃ), তাহাতে তিনখানি পুঁথি [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি নং ১০৯০ (আদর্শীকৃত), ১০৯৩, ৪৪০০] এবং দুইটি মুদ্রিত সংস্করণ [বঙ্গবাসী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতির দ্বারা] ব্যবহৃত হইয়াছে। পুঁথিগুলির পাঠ যথাসম্ভব অপরিবর্তিত রাখিয়া এবং পাঠান্তর ও অতিরিক্ত পাঠগুলি যথাস্থানে যুক্ত করিয়া গ্রন্থের সম্পাদকদ্বয় [শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী] অনুসন্ধিৎসু সুধীবর্গের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। ভূমিকাতে আখ্যান-ভাগের স্বাভাবিকতা ও বাস্তবতা, বস্তু তথা বাস্তব রসের কবি মুকুন্দরামের পরিবেষণ-নৈপুণ্য, গ্রন্থের কিয়দংশে (যথা, চৌতিশা স্তবে) কাব্যপ্রথার দ্বারা আচ্ছন্ন বাস্তববোধ, সাম্প্রদায়িক মনোভাবহীনতা, কবির বর্ণনায় স্থানীয় প্রভাব (local colouring) ইত্যাদি বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থটির সম্পাদনায় বিলক্ষণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তথাপি ভূমিকাটি সুলিখিত হইলেও সর্বত্র সুপ্রকাশিত ও সুসমাপ্ত হয় নাই। পুঁথিগুলির সংখ্যা উল্লেখ ব্যতীত অন্যবিধ কোন পরিচয়ই প্রদত্ত হয় নাই এবং মূল কবি মুকুন্দরামকে উপলক্ষ্য করিয়া তাবৎ চণ্ডীমঙ্গল-কবিদিগের কথাই সমধিক বিবৃত হইয়াছে। কালকেতুর কাহিনীর পৌরাণিক পটভূমিকার আলোচনায় স্মার্ত রঘুনন্দনের চণ্ডীপূজার স্মৃতির ব্যবস্থায় ব্যাধোপাখ্যান-শ্রবণ

একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া সন্নিবেশিত হইয়াছে ও চণ্ডীদেবীর ব্যাপারে সুধীভূষণ ভট্টাচার্য প্রণীত 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' এর উপর বরাত দেওয়া হইয়াছে। কলিঙ্গ-প্লাবনে নদ-নদীদিগের শোভাযাত্রার ব্যাপারে ইংরেজ কবি স্পেন্সার প্রণীত 'ফেয়ারী কুইনী' কাব্যকে স্মরণ করা হইয়াছে।

মুকুন্দরাম দুঃখের কবি নহেন, দুঃখবাদীও নহেন, তাঁহার কাব্যের মনোভাব দুঃখজয়ী, অসঙ্গতির অনুযোগে তাঁহার কাব্যে অশ্রু শ্লেষে পরিণত হইয়াছে—এই মতবাদ 'ব্যাখ্যায় উলট্-পালট্' করার মতই। চণ্ডীকাব্যের দেবতা চণ্ডী ও আদ্যা উভয়েই শ্রীরাধার ভাবদ্যুতি, কাব্যের নায়িকার রূপায়ণে বৈষ্ণবাদর্শ বর্তমান। কালকেতুর পশুশিকারের ব্যর্থতায়, কোতোয়ালের ছদ্মবেশে ও খুল্লনার বনবাসে শ্রীরাধার প্রণয়-বিভ্রান্তি, কৃষ্ণের ছলনা-কুশলতা ও করুণরসের প্রকাশ দর্শনান্তর পুনশ্চ 'মুকুন্দরামে এই বৈষ্ণবভাব-প্রাধান্য অনেকটা ক্ষীণ' বলা হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যের উপর বৈষ্ণব-সাহিত্যের ভাব ও রীতিগত প্রভাব অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যের যত্র তত্র প্রতিফলন কষ্টসাধ্য তো বটেই, পরন্তু অবাঞ্ছিত ও অপ্রাসঙ্গিক। আলোচ্য গ্রন্থটিতে মুকুন্দরামের জীবন ইত্যাদি সম্পর্কিত পরিপূর্ণ আলোচনা, কাব্যের ভাষা ছন্দ-অলঙ্কার, শব্দভাণ্ডার প্রভৃতির সুবিস্তৃত পরিচয়, বিবিধ 'খিল' অংশগুলির নির্ভর-যোগ্যতা সম্পর্কে আলোচনা, পুঁথি-পরিচয় ও তৎসংক্রান্ত চিত্রাবলী সংযুক্ত হইলে ইহা অত্যন্ত উপাদেয় হইত। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর দ্বিতীয় ভাগ আজিও মুদ্রিত হয় নাই বলিয়াই জানি। দ্বিতীয় ভাগের সম্পাদনা ও পরিচিতি প্রথম ভাগের সম্পূরক হইলে বলিবার কিছুই থাকিবে না।

---

১ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [প্রথম সং (প্রথম ভাগ)]।

২ কবির জন্মকাল : ১৫৩৭খ্রীঃ (দীনেশচন্দ্র সেন), ১৫৩৩খ্রীঃ [তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য), ১৫৪৭খ্রীঃ (বঙ্গভাষার লেখক), ১৫৪৪খ্রীঃ (চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)।

কাব্যরচনাকাল : ১৫৯৪খ্রীঃ (বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়) ; ১৫৭৩-১৬০৩ খ্রীঃ (রাজনারায়ণ বসু), ১৫৯০-১৬০৩ খ্রীঃ বঙ্কিমচন্দ্র), ১৫৯৪।৯৬খ্রীঃ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল অব্ লেটার্স, ১৯২৭)। দামুন্যার চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতি কবিকঙ্কণের বংশধর বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। তবে ইঁহারা কবির গৃহদেবতা সিংহবাহিনীর পুরোহিত-বংশীয় কিনা বলা শক্ত। ইঁহারা সাবর্ণ শ্রোত্রিয়। —[বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' র উপক্রমণিকা।]

৩ ডাঃ সুকুমার সেন তদীয় প্রবন্ধে ['মুকুন্দরামের দেশত্যাগকাল' (বিশ্বভারতী পত্রিকা। মাঘ-চৈত্র, ১৩৬৩ সাল। পৃঃ ২৪৮-৫৫)] কবিকঙ্কণের দেশত্যাগকাল ও স্বপ্নাদেশ-প্রাপ্তির সময় অনুমান করিয়াছেন 'শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা' অর্থাৎ ১৪৬৬ শক = ১৫৪৪ খ্রীঃ। স্মরণীয়, তিনি 'রস' অর্থে পূর্বমত ৯ পরিত্যাগ করিয়া ৬ ধরিয়াছেন। এই সময়ের সহিত মানসিংহের বাঙ্গালা-অধিকার-কাল মেলে না। মানসিংহ বিহারের সিপাহশালার ছিলেন ১৫৮৭খ্রীঃ, আফগান-দমনে উড়িষ্যা অভিযান করেন ১৫৯০-৯১ খ্রীঃ, বাঙ্গালা-উড়িষ্যার অধিকর্তা ১৫৯৪-১৬০৫ খ্রীঃ এবং বঙ্গদেশে অনুপস্থিত ছিলেন ১৫৯৯ খ্রীঃ শেষ হইতে ১৬০০ খ্রীঃ শেষ পর্যন্ত। কাব্যে দেশের যে বিপর্যয়ের উল্লেখ আছে তাহা পাঠান সুলতান কিংবা মানসিংহের আমলে হয় নাই, ইহা ঘটিয়াছিল ১৫৩৭-৬৪ খ্রীঃ আফগান অধিকার কালে। সম্ভবতঃ নূতন আফগান সুলতানের সময় কবির লিখিত দেশের দুর্দশা চরমে উঠিয়াছিল। অবশ্য—ডাঃ সেনের এই অনুমান সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার অপেক্ষা রাখে।

৪ ব্রাহ্মণভূমির অন্তর্গত আরড়া গ্রামের [বর্তমান মেদিনীপুর জেলা, থানা ঘাটাল।] জমিদার পালধি গাঞি বাঁকুড়া রায়। ইঁহার পিতা বীরমাধব শ্বশুর দুলাল সিংহ, ভার্যা দনা দেবী, পুত্র রঘুনাথ, পৌত্র চক্রধর (রাজত্বকাল ১৬০৪ খ্রীঃ)। বর্তমান বংশধরগণ মেদিনীপুরের অন্তর্গত সেনাপতি গ্রামে বাস করেন।

৫ ইহা সম্ভবতঃ চণ্ডীমঙ্গল-কাব্য রচয়িতা বা গায়েনদিগের সাধারণ উপাধি।

চৈত্র-কুহু

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

চৈত্রদিনে হাওয়ার হাহাকারে
হঠাৎ শুনি
কোকিল ডাকে
শুক্‌নো গাছের ডালে।
বসন্ত তো চলেই গেছে,
কোথায় বা ফাল্‌গুন,
রোদে আগুন,
হাওয়ায় আগুন,
মাঠে আগুন ঝরে,
কেবল শুনি কোকিল ডাকে
চৈত্রদিনের ঝড়ে।
দ্বিপ্রহর
চৈত্রঝড
কাঁপে রোদের ঢেউ,
শূন্য মাঠে
প্রহর কাটে
নেই কোথাও কেউ।
ঝরাপাতার পত্রসেনা
হাওয়ার যুদ্ধে মেতে
তেপান্তরের দিগ্বিজয়ে
চায় বুঝি বা যেতে।
এমন সময় আমের বনে
হঠাৎ অকারণে,
কোকিল কেন গান গেয়ে যায়
কাহার আমন্ত্রণে?
কোকিল ছিলে সুখের সখা,
হ'লে দুখের সাথী,
দীপকে আর পঞ্চমে আজ
তাই তো মাতামাতি।
দ্বিপ্রহরের অগ্নি-তাপে,
তোমার সুরের স্পর্শ কাঁপে,
চৈত্রদিনের একলা দুপুর
ভরলো তোমার গানে,
কোকিল, কালো কোকিল শোনো,
এই কথাটি রইলো আমার
চিরদিনের কানে।

আনন্দ

শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

এলাম ভবে তোমার খোঁজে
দেখতে তোমার স্বরূপখানি,
হেরি হেথায় সবই তুমি
তোমার মাঝেই ভুবনখানি।
সব সেজে গো করছ খেলা
তুমিই বসাও তোমার মেলা,
দেখছ তুমি তোমার লীলা
একের বহু রূপ যে জানি।
মায়ার জালে বেঁধে আমায়
আর রেখ না জীবন-স্বামী,
ভক্তি-ফুলের মালা মম
চাই দিতে ওই কণ্ঠে আমি।
আমার 'আমি' দিছি তোমায়
ভেদ কি আছে তোমায় আমায়,
তোমার নিত্য লীলার পথে
কর আমায় অনুগামী!

অরবিন্দ-জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত

সম্প্রতি শ্রীঅরবিন্দকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্গদেশে নূতন করিয়া আলোচনার সূত্রপাত হইতেছে, এই সন্ধিক্ষণে আমরা স্মরণ করি তাঁহার জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাব।

সাত বৎসর বয়সে শিক্ষার জন্য শ্রীঅরবিন্দ ইংলণ্ডে প্রেরিত হন। তথায় চৌদ্দ বৎসর বাস করিয়া তিনি ১৮৯৩ খৃঃ ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। যে বৎসর তিনি ভারতে ফিরিয়া আসেন, সেই বৎসরেই স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো শহরে বিশ্বধর্মমহাসম্মেলনে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার ঐতিহাসিক বক্তৃতা প্রদান করেন।

এই চমকপ্রদ ঘটনা সম্পূর্ণ বিদেশী ভাব আদর্শ ও পরিবেশে লালিতপালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক অরবিন্দের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও রচনাবলী, বিশেষতঃ স্বামীজীর ভারতীয় তরুণদের নিকট 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'-রূপ অগ্নিগর্ভ বাণী এবং জন্মভূমির সর্বাঙ্গীণ পুনরুত্থানের কার্যে আত্মনিয়োগ করিবার উদাত্ত আহ্বান অরবিন্দকে তাঁহার পরবর্তী তের বৎসর (১৮৯৩—১৯০৬) বরদায় অবস্থানকালে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। অরবিন্দ বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যে মহৎ কার্যসকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও গভীর মনোনিবেশের সহিত অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন।

১৯০৯ খৃঃ 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় অরবিন্দ লিখিয়াছিলেন: বিবেকানন্দের বিদেশযাত্রা দ্বারা ইহাই সর্বপ্রথম সুস্পষ্টরূপে সূচিত হয় যে ভারত শুধু বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই জাগে নাই, পরন্তু আধ্যাত্মিকতা দ্বারা জগৎ জয় করিবার জন্যও তাঁহাকে প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে।

অন্য এক সময়ে বিবেকানন্দের কথা বলিতে গিয়া অরবিন্দ বলিয়াছিলেন: 'শক্তিধর পুরুষ বলিতে যদি কেউ থাকেন, তবে তিনি বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ পুরুষসিংহ। আমরা অনুভব করি, বিবেকানন্দের শক্তি ও প্রভাব প্রচণ্ডভাবে কাজ করিতেছে, কিভাবে—তাহা আমরা ভালরূপে জানি না, কোথায়—তাহাও ভালভাবে জানি না, যাহা এখনও কোন আকার গ্রহণ করে নাই তাহার ভিতরে, এবং যাহা-কিছু মহৎ, সিংহসদৃশ বীর্যসম্পন্ন অথচ কমনীয়, স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি দ্বারা লব্ধ ও উজ্জীবক তাহার মধ্যে, ইহা ভারতের আত্মায় প্রবেশ করিয়াছে। আমরা বলি, ঐ দেখ। বিবেকানন্দ ভারতমাতা ও তাঁহার সন্তানদের অন্তরাত্মায় এখনও বাস করিতেছেন।'[১]

কারাগারে যে অপূর্ব আধ্যাত্মিক উপলব্ধি অরবিন্দের পরবর্তী জীবনকে সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত করিয়াছিল তৎসম্বন্ধে একটি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন: ইহা সত্য ঘটনা যে, কারাগারে

১ Swami Vivekananda was a soul puissance, if ever there was one, a very lion among men. We perceive his influence still working gigantically—we know not well how, we know not well where—in something that is not yet formed, something leonine, grand, intuitive, upheaving, that has entered the soul of India, and we say, 'Behold! Vivekananda still lives in the soul of his Mother and in the soul of Her children.'

নির্জন ধ্যানে এক পক্ষকাল নিরন্তর বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর আমাকে উদ্দেশ করিয়া ধ্বনিত হইতেছিল। আমি তাঁহার সাক্ষাৎ উপস্থিতি অনুভব করিতেছিলাম। আধ্যাত্মিক অনুভূতির একটা বিশেষ, সীমাবদ্ধ অথচ অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এবং সেই বিষয়ে যাহা বলিবার তাহা বলিয়াই কণ্ঠস্বর থামিয়া গিয়াছিল।[২]

১৯০২ খৃঃ বরদায় ভগিনী নিবেদিতার সহিত অরবিন্দেব সাক্ষাৎ হয় এবং এই বিদুষী মহিলার শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হন। অরবিন্দ যখন রাজনৈতিক আন্দোলনেব পুরোভাগে ছিলেন তখন ভগিনী নিবেদিতার ভারত-প্রীতি ও স্বাধীনতা-আন্দোলনে গভীর অনুরাগ তাঁহাকে কয়েক বৎসব অরবিন্দের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আনিয়াছিল।

ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে নিবেদিতার নির্ভীক মতের সহিত অরবিন্দের মতেব অনেকাংশে মিল ছিল। ভগিনী নিবেদিতাই অরবিন্দকে বৃটিশ-শাসিত ভারতের বাহিরে থাকিয়া ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতে সময়োচিত উপদেশ দিয়াছিলেন। প্রধানতঃ এই পরামর্শ অনুসারেই অরবিন্দ ফরাসী-অধিকৃত চন্দননগরে আত্মগোপন করিতে সংকল্প করেন এবং পরে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর (১৯১০—১৯৫০) পণ্ডীচেরিতে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা ও যোগসাধনায় কালাতিপাত করেন। জনৈক অন্তরঙ্গ সহকর্মীকে অরবিন্দ বলিয়াছিলেন, 'মা-কালী ভগিনী নিবেদিতার মাধ্যমে আমাকে আত্মগোপন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন।' নিবেদিতাই অরবিন্দকে বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' গ্রন্থখানি উপহার দিয়াছিলেন।

অরবিন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য অনুভূতি ও অমৃতময়ী বাণী অরবিন্দের জীবন ও চিন্তাধারাকে গঠন করিতে অল্প সাহায্য করে নাই।

আলিপুর জেলে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত তাঁহার নিত্য পাঠ্য ছিল এবং এই গ্রন্থ তাঁহার পরবর্তী জীবনের পথ নির্ণয়ে সহায়তা করিয়াছে, তাহার ইঙ্গিত তদানীন্তন লেখার মধ্যে পাওয়া যায়। অরবিন্দ মাঝে মাঝে 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় ইংরেজীতে ও 'ধর্ম' পত্রিকায় বাংলায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া লোকদিগকে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইতে এবং জীবন গঠন করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেন। যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ দীর্ঘ দিন বাস ও সাধনা করিয়াছিলেন, সেই দক্ষিণেশ্বরের মৃত্তিকা অরবিন্দ পরম পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিতেন। অরবিন্দ নিজেই সেকথা লিখিয়াছেন—সেই দক্ষিণেশ্বরের পবিত্র মৃত্তিকা তিনি শক্ত কাগজে নির্মিত এক পেটিকায় সযত্নে রক্ষা করিয়া নিজের প্রকোষ্ঠে রাখিয়াছিলেন। যে পুলিশ কর্মচারী অরবিন্দকে সেই প্রকোষ্ঠে গ্রেপ্তার করেন, তিনি দক্ষিণেশ্বরের মৃত্তিকা-সম্বলিত পেটিকায় কোন বিস্ফোরক দ্রব্য রহিয়াছে সন্দেহ করিয়া উহা লইয়া গিয়াছিলেন। অরবিন্দ এই প্রসঙ্গে লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন, "মোটের উপর, এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে, পুলিশ কর্মচারীর সন্দেহকে ভিত্তিহীন বলা যাইতে পারে না, কারণ দক্ষিণেশ্বরের মৃত্তিকা

২ 'It is a fact that I was hearing constantly the voice of Vivekananda speaking to me for a fortnight in the jail in my solitary meditation and felt his presence. The voice spoke on a special and limited, but very important field of spiritual experience, and it ceased as soon as it had finished saying all that it had to say on the subject.

আমার আধ্যাত্মিক জীবনে বিস্ফোরক সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ ছিল।"

'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অরবিন্দ লিখিয়াছিলেন: যখন কলিকাতার শিক্ষিত যুবকদের মুকুটমণি বিবেকানন্দ একজন নিরক্ষর হিন্দু তাপসের, বিদেশী ভাব বা শিক্ষার লেশমাত্রের সহিত সম্পর্কহীন সমাধিমান্ অতীন্দ্রিয়জ্ঞানসম্পন্ন মহাযোগীর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিলেন, তখনই সংগ্রামে জয়লাভ হইল।

বোম্বাই নগরে শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গে এক বক্তৃতায় অরবিন্দ বলিয়াছিলেন, ভগবান সেই মানুষকে বাংলাদেশে কলিকাতার নিকটবর্তী দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে পাঠাইয়াছিলেন, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চারিদিক হইতে শিক্ষিত লোকগণ—বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবস্থল, যাঁহারা ইওরোপের নিকট হইতে যাহা কিছু শিক্ষা করা যায় তৎসমস্তই শিখিয়াছিলেন তাঁহারা—এই তাপসের পদতলে নিপতিত হইয়াছিলেন। ৩

১৯০৯ খৃঃ অরবিন্দ 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন: দক্ষিণেশ্বরে যে কাজ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা সমাপ্ত হওয়া তো দূরের কথা, বুঝিতেও পারা যায় নাই। ৪

৩ God sent that man to Bengal and sent him in the temple Dakshineswar in Calcutta, and from North and South, and East and West, the educated men, men who were the pride of the University, who had studied all that Europe can teach, came to fall at the feet of this ascetic.

৪ The work that was begun at Dakshineswar is far from finished, it is not even understood.

পাপিয়ায় যেন কোরো না চাতক

শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস

দৈন্য-দুঃখে পড়ে—
হরি-করুণায় ধন-গর্বিত
যাইনি ধনীর ঘরে।
ময়ূরাক্ষীর বালুচর-তীরে,
পল্লী-মায়ের পর্ণকুটীরে—
রৌদ্রে বাদলে গোঁয়াইনু আজ
ষাটটি বছর ধরে।

তাঁর ভরসায় থাকি,
সাধু-সন্তের আছে গতায়াত
আছে সাথে মাখামাখি।
অনুরাগ-ফাগে রাঙাইয়া মন,
শুনি দূর-বাঁশী-সুর অনুখন,
সব সংশয় এড়াতে পেরেছি
তাঁরে নিশি-দিন ডাকি।

অঙ্গন-তরু মোর,
বৃন্দাবনের হাওয়ায় ডাকিয়া
আনে নিতি সাঁঝ ভোর।
বন-বিহগের অবিরাম গানে,
অভাবের কথা পৌঁছে না কানে;
তাঁর পথ চেয়ে সজল নয়নে
রয়েছি মত্ত ভোর।

গৃহ-জ্বালা হ'তে দূরে
থাকি না, তবুও তিনি রেখেছেন
মোরে আনন্দপুরে।
প্রভাতে রবির বন্দনা গাই,
ক্ষুব্ধ প্রাণের বেদনা জানাই,
ফুলে ফুলে অলি গুঞ্জন করি'
কাছে উড়ে ঘুরে ঘুরে।

আরতি-ঘণ্টা সাঁঝে,
বাজিলে দেউলে মন যায় ভুলে
কি নাই আর কি আছে।
ভাবের গোমুখী-নীরে ডুব দিয়ে,
দৈন্য-দুঃখে লই জুড়াইয়ে,
'পাপিয়ায় যেন কোরো না চাতক'

নির্জন ধ্যানে এক পক্ষকাল নিরন্তর বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর আমাকে উদ্দেশ করিয়া ধ্বনিত হইতেছিল। আমি তাঁহার সাক্ষাৎ উপস্থিতি অনুভব করিতেছিলাম। আধ্যাত্মিক অনুভূতির একটা বিশেষ, সীমাবদ্ধ অথচ অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এবং সেই বিষয়ে যাহা বলিবার তাহা বলিয়াই কণ্ঠস্বর থামিয়া গিয়াছিল।[২]

১৯০২ খৃঃ বরদায় ভগিনী নিবেদিতার সহিত অরবিন্দের সাক্ষাৎ হয় এবং এই বিদুষী মহিলার শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হন। অরবিন্দ যখন রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন তখন ভগিনী নিবেদিতার ভারতপ্রীতি ও স্বাধীনতা-আন্দোলনে গভীর অনুরাগ তাঁহাকে কয়েক বৎসর অরবিন্দের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আনিয়াছিল।

ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে নিবেদিতার নির্ভীক মতের সহিত অরবিন্দের মতের অনেকাংশে মিল ছিল। ভগিনী নিবেদিতাই অরবিন্দকে বৃটিশ-শাসিত ভারতের বাহিরে থাকিয়া ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতে সময়োচিত উপদেশ দিয়াছিলেন। প্রধানতঃ এই পরামর্শ অনুসারেই অরবিন্দ ফরাসী-অধিকৃত চন্দননগরে আত্মগোপন করিতে সংকল্প করেন এবং পরে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর (১৯১০—১৯৫০) পণ্ডীচেরিতে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা ও যোগসাধনায় কালাতিপাত করেন। জনৈক অন্তরঙ্গ সহকর্মীকে অরবিন্দ বলিয়াছিলেন, 'মা-কালী ভগিনী নিবেদিতার মাধ্যমে আমাকে আত্মগোপন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন।' নিবেদিতাই অরবিন্দকে বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' গ্রন্থখানি উপহার দিয়াছিলেন।

অরবিন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য অনুভূতি ও অমৃতময়ী বাণী অরবিন্দের জীবন ও চিন্তাধারাকে গঠন করিতে অল্প সাহায্য করে নাই।

আলিপুর জেলে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত তাঁহার নিত্য পাঠ্য ছিল এবং এই গ্রন্থ তাঁহার পরবর্তী জীবনের পথ নির্ণয়ে সহায়তা করিয়াছে তাহার ইঙ্গিত তদানীন্তন লেখার মধ্যে পাওয়া যায়। অরবিন্দ মাঝে মাঝে 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় ইংরেজীতে ও 'ধর্ম' পত্রিকায় বাংলায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া লোকদিগকে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইতে এবং জীবন গঠন করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেন। যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ দীর্ঘ দিন বাস ও সাধনা করিয়াছিলেন, সেই দক্ষিণেশ্বরের মৃত্তিকা অরবিন্দ পরম পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিতেন। অরবিন্দ নিজেই সেকথা লিখিয়াছেন—সেই দক্ষিণেশ্বরের পবিত্র মৃত্তিকা তিনি শক্ত কাগজে নির্মিত এক পেটিকায় সযত্নে রক্ষা করিয়া নিজের প্রকোষ্ঠে রাখিয়াছিলেন। যে পুলিশ কর্মচারী অরবিন্দকে সেই প্রকোষ্ঠে গ্রেপ্তার করেন, তিনি দক্ষিণেশ্বরের মৃত্তিকা-সম্বলিত পেটিকায় কোন বিস্ফোরক দ্রব্য রহিয়াছে সন্দেহ করিয়া উহা লইয়া গিয়াছিলেন। অরবিন্দ এই প্রসঙ্গে লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন, "মোটের উপর, এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে, পুলিশ কর্মচারীর সন্দেহকে ভিত্তিহীন বলা যাইতে পারে না, কারণ দক্ষিণেশ্বরের মৃত্তিকা

২ It is a fact that I was hearing constantly the voice of Vivekananda speaking to me for a fortnight in the jail in my solitary meditation and felt his presence. The voice spoke on a special and limited, but very important field of spiritual experience, and it ceased as soon as it had finished saying all that it had to say on the subject.

আমার আধ্যাত্মিক জীবনে বিস্ফোরক সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ ছিল।"

'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অরবিন্দ লিখিয়াছিলেন: যখন কলিকাতার শিক্ষিত যুবকদের মুকুটমণি বিবেকানন্দ একজন নিরক্ষর হিন্দু তাপসের, বিদেশী ভাব বা শিক্ষার লেশমাত্রের সহিত সম্পর্কহীন সমাধিমান্ অতীন্দ্রিয়জ্ঞানসম্পন্ন মহাযোগীর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিলেন, তখনই সংগ্রামে জয়লাভ হইল।

বোম্বাই নগরে শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গে এক বক্তৃতায় অরবিন্দ বলিয়াছিলেন, ভগবান সেই মানুষকে বাংলাদেশে কলিকাতার নিকটবর্তী দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে পাঠাইয়াছিলেন, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চারিদিক হইতে শিক্ষিত লোকগণ— বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবস্থল, যাঁহারা ইওরোপের নিকট হইতে যাহা কিছু শিক্ষা করা যায় তৎসমস্তই শিখিয়াছিলেন তাঁহারা—এই তাপসের পদতলে নিপতিত হইয়াছিলেন। ৩

১৯০৯ খৃঃ অরবিন্দ 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন: দক্ষিণেশ্বরে যে কাজ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা সমাপ্ত হওয়া তো দূরের কথা, বুঝিতেও পারা যায় নাই। ৪

৩ God sent that man to Bengal and sent him in the temple Dakshineswar in Calcutta, and from North and South, and East and West, the educated men, men who were the pride of the University, who had studied all that Europe can teach, came to fall at the feet of this ascetic.

৪ The work that was begun at Dakshineswar is far from finished, it is not even understood

পাপিয়ায় যেন কোরো না চাতক

শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস

দৈন্য-দুঃখে পড়ে—
হরি-করুণায় ধন-গর্বিত
যাইনি ধনীর ঘরে।
ময়ূরাক্ষীর বালুচর-তীরে,
পল্লী-মায়ের পর্ণকুটীরে—
রৌদ্রে বাদলে গোঁয়াইনু আজ
যাটটি বছর ধরে।

তাঁর ভরসায় থাকি,
সাধু-সন্তের আছে গতায়াত
আছে সাথে মাখামাখি।
অনুরাগ-ফাগে রাঙাইয়া মন,
শুনি দূর-বাঁশী-সুর অনুখন,
সব সংশয় এড়াতে পেরেছি
তাঁরে নিশি-দিন ডাকি।

অঙ্গন-তরু মোর,
বৃন্দাবনের হাওয়ায় ডাকিয়া
আনে নিতি সাঁঝ ভোর।
বন-বিহগের অবিরাম গানে,
অভাবের কথা পৌঁছে না কানে;
তাঁর পথ চেয়ে সজল নয়নে
রয়েছি মত্ত ভোর।

গৃহ-জ্বালা হ'তে দূরে
থাকি না, তবুও তিনি রেখেছেন
মোরে আনন্দপুরে।
প্রভাতে রবির বন্দনা গাই,
ক্ষুদ্ধ প্রাণের বেদনা জানাই,
ফুলে ফুলে অলি গুঞ্জন করি'
কাছে উড়ে ঘুরে ঘুরে।

আরতি-ঘণ্টা সাঁঝে,
বাজিলে দেউলে মন যায় ভুলে
কি নাই আর কি আছে।
ভাবের গোমুখী-নীরে ডুব দিয়ে,
দৈন্য-দুঃখে লই জুড়াইয়ে,
'পাপিয়ায় যেন কোরো না চাতক'
—এ মিনতি তাঁর কাছে।

নিজেদের সমস্যা-সমাধানে নারী

শ্রীমতী শান্তি ঘোষ

পুরাতন ও আধুনিকের মধ্যে বিবাদ চিরন্তন। প্রাচীনা বলেন যে তাঁহাদের আচার ব্যবহার সমাজ শিক্ষা সব কিছুই আধুনিকাদের চেয়ে ভাল, আবার আধুনিকারা একথা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে—তাঁহাদের প্রথাগুলিই মার্জিত। কেহ যদি বিচারকের আসন গ্রহণ করেন, আর যদি তিনি ন্যায় বিচারক হন—তবে দুই পক্ষের মধ্যেই ভাল ও মন্দ দুইই দেখিতে পাইবেন। জগতে এক তরফা ভাল বা এক তরফা মন্দ কিছু নাই। একজনের কাছে যাহা সুখকর অন্যের কাছে তাহা কষ্টকর, আবার একের পক্ষে যাহা দুঃখের কারণ তাহাতে বহুর মঙ্গল দেখা যায়।

প্রাচীনাদের কাছে আমাদের অনেক কিছু জানিবার ও শিখিবার আছে। জীবনের পথে তাঁহারাই অগ্রণী, অভিজ্ঞতায় তাঁহারাই ধনী। প্রাচীনকালে বিজ্ঞানের এত প্রচলন ছিল না। তাঁহারা সহজ সরল জীবন যাপন করিতেন, তখনকার কালে ডাক্তার-বৈদ্যের এত প্রচলন ছিল না, আবার এত ভেজালের সৃষ্টিও হয় নাই। তাঁহারা ব্যবহার করিতেন খাঁটি খাদ্যসম্ভার। ঔষধ হিসাবে জানিতেন নানা রকম গাছের পাতা শিকড় বাকল ইত্যাদি। আজকাল লেবেল না থাকিলে আমরা ঔষধ ব্যবহার করিতে ভয় পাই, কিন্তু প্রাচীনাদের জানা ছিল বহু প্রকারের ভেষজ। প্রতি বাড়ীতেই ছোটখাটো একটি ডিস্‌পেনসারিতে কিছু কিছু ঘরে-প্রস্তুত ঔষধপত্র থাকিত।

প্রাচীনারা নবীনাদের মত স্কুল-কলেজে যাইবার সুযোগ পান নাই, রামায়ণ-মহাভারতই তাঁহাদের পাঠ্য পুস্তক ছিল। ঐ আদর্শেই তাঁহারা নিজেদের গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন। নবীনারা রামায়ণ-মহাভারতের যুগে পিছাইয়া যাইতে রাজী নহেন, তাঁহাদের জানিবার আছে অন্য বহু তত্ত্ব। তাঁহারা জন্মিয়াছেন বিজ্ঞানের যুগে, এখন কেবলমাত্র পুরাতনের কাহিনী জানিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে মন রাজী নহে। সমস্ত পৃথিবীর—এমনকি তাহার বাহিরের খবরাখবর জানিবার জন্য সে উৎসুক। বহু কিছু জানিতেই সে ব্যস্ত, একটী লইয়া সাধনা করিবার মতো অবকাশ তাহার নাই।

আপন সংসারই ছিল প্রাচীনাদের গণ্ডি, তাহারা এই অল্প সীমানার মধ্যে রাজত্ব করিয়াই মহাখুশী থাকিতেন। সংসারটী থাকিত তাঁহাদের নখদর্পণে, কিন্তু সংসারের বাহিরের সব কিছুই অন্ধকারাবৃত।

বর্তমান যুগে আধুনিকাদের তেমন ভাবে সংসার করা হইয়া উঠে না। আজিকার নারীকে বহুপ্রকার বাহিরের কাজ করিতে হয়, অর্থোপার্জন তাহাদের মধ্যে একটী। মানুষের প্রয়োজন কালের গতিকে বাড়িয়াই চলিয়াছে, জীবন হইতেছে জটিলতর, সেই জটিলতার গ্রন্থি খুলিবার মানসে মানুষ ছুটিয়া চলিয়াছে, কিন্তু গ্রন্থি খুলিবার জন্য যে ধৈর্য প্রয়োজন, আজ তাহা নাই। চঞ্চলতায় কোন কার্য সুসম্পন্ন হয় না, মানুষকে হইতে হইবে ধীর স্থির। কিন্তু সে অবকাশ কোথায়? প্রতিদিনের প্রয়োজন মিটাইতেই মানুষ ব্যস্ত। পিছনে ফিরিবার, গতকল্য কি করিয়াছি তাহা চিন্তা করিবার অবকাশ তাহার নাই।

অতীতকালে মানবের প্রয়োজন ছিল অল্প, তখন শাক অন্ন ঘৃত দুগ্ধ পাইয়াই মানুষ সন্তুষ্ট

থাকিত। মোটা একখানি বস্ত্র হইলেই লজ্জা নিবারণ হইত, কিন্তু বর্তমানের প্রয়োজন শত সহস্রমুখী। শাক ভাতের স্থান লইয়াছে চপ-ফ্রাই, কাটলেট-কেক, পেষ্ট্রি ইত্যাদি; মোটা বস্ত্রের পরিবর্তে প্রয়োজন জর্জেট নাইলন প্রভৃতি। কালের চক্র ঘুরিতেছে, প্রতিদিনই নূতনের পিছনে ছুটিয়া চলিয়াছে মানুষের মন। অতীতের অপেক্ষা বর্তমানের সমস্যা অতীব জটিল, এই জটিলতাময় জীবনযুদ্ধে ব্রত আধুনিক নারী-সমাজ।

প্রাচীনাদের সহজ সরল জীবন পথ এখনকার যুগে অকল্পনীয়, তবু এই জটিল জীবনের অশান্তির হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে নবীনাদের কর্তব্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া নিজেদের সমস্যার সমাধান করা।

নবীনারা আলোক প্রাপ্তা, পৃথিবী-রহস্যে প্রাচীনাদের অপেক্ষা তাঁহাদের জ্ঞান বেশী, কিন্তু প্রাচীনাদের কাছে জীবন-রহস্যে তাঁহারা শিশু। অতি সুখের মনে করিয়া যাহার পিছনে তাঁহারা ছুটিয়া চলিয়াছেন, প্রাচীনাদের নিকট তাহা তুচ্ছ। ইঁহারা নিজেদের গতজীবনের দিনগুলি চিন্তা করিয়া মনে করেন, তখন কি ছেলে মানুষই না ছিলাম। আজিকার নবীনা সেই 'ছেলেমানুষি'র পিছনেই ছুটিয়া চলিয়াছেন। এই অবস্থাটা কাটাইয়া উঠিতে পারিলে তবেই তাঁহাদের জীবন সার্থক হইবে।

তাই মনে হয় একে অন্যের মতকে অবজ্ঞা না করিয়া যদি উভয়ে মিলিত চেষ্টায় যুগোপযোগী একটা সমাজ গঠিত করিতে অগ্রসর হন, তবেই বর্তমান সমস্যার সমাধান হইতে পারে। দুইজনা দুইজনের সহিত বিরোধ করিলে চলিবে না। যাহা কিছু জীবনকে নিশ্চয় মঙ্গলের পথে লইয়া যাইবে তাহার সন্ধান করিতে হইবে। প্রাচীনারা দিবেন পুরাতনের ইতিহাস, আর নবীনারা দিবেন বর্তমানের বিজ্ঞান।

পাঠ্যপুস্তক ও সিনেমার ছবির মধ্য দিয়া দেশ-বিদেশের সভ্যতার কথা জানা আছে আজিকার বোনেদের। সকল সভ্যতার সারটুকু তাঁহারা অনায়াসেই নিজের জীবন-সমস্যার কাজে লাগাইতে পারেন।

আজিকার সমস্যা অতীব জটিল, তবে বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছে বহু কিছু সুবিধাজনক ব্যাবহারিক বস্তু। বিজ্ঞানের কল্যাণকারী দানগুলি যদি আমরা দৈনন্দিন কাজে লাগাই তবে শারীরিক দুঃখকষ্ট অবশ্যই লাঘব হইবে, অবসর মিলিবে, তাহা আমাদের জীবনের কঠিনতর সমস্যা মিটাই-বার সহায়তা করিবে। যাহার যেটুকু ক্ষমতা আছে সেটুকু যদি অনেকের কল্যাণে নিয়োজিত করিতে পারি--তবে দেখিব আপন আপন জীবনও সুখে ভরিয়া উঠিবে। প্রতি মানবের জীবন দোষ ও গুণের সমষ্টি। গুণহীন মানুষ হইতেই পারে না। নিজের জীবনে পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিলেই দেখিতে পাইব যে জগৎকে দিবার মতো কিছু না কিছু মিলিবেই।

শুধু সকলের কাছে লইবার আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া দিবার জন্য চেষ্টিত হইলেই দেখিব জীবনের ধারা অনেকখানি বদলাইয়া গিয়াছে।

যে আমি আজ এতখানি লিখিবার সাহসী হইতেছি, স্বীকার না করিয়া পারি না যে প্রতি মুহূর্তেই সূত্র হারাইয়া যাইতেছে, প্রতি ক্ষণে স্বার্থপরতা আসিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে, মানুষের অকল্যাণকর কথা মুখ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে, তবু এইটুকু আশা রাখি যে বার বার চেষ্টা করিতে করিতে হয়তো কিছুটা অগ্রসর হইতে পারিব। প্রতি ক্ষণে মনে রাখিতে হইবে আমার এ মুখ জগতের

কল্যাণকর কথাই বলিবে, আর আমার হাতও জগতের কল্যাণকর কাজেই রত থাকিবে।

যাঁহারা আজিকার যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা বিজ্ঞানের যুগে জন্মিয়াছেন বলা হয়। প্রাচীনাদের অপেক্ষা তাঁহাদের জানিবার ও জানাইবার সুযোগ অনেক বেশী। আমাদের দেশের বহু শিল্প দর্শন গ্রামের জীর্ণ কুটীরের অন্তরালে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই বিজ্ঞানের যুগ দূরকে করিয়াছে নিকট, শব্দকে করিয়াছে পৃথিবীময় ব্যাপ্ত। এক স্থানে বসিয়া একটী কথা বলিলে সারা পৃথিবীতে তাহা ধ্বনিত হইতে পারে।

আমাদের ভারতের যে সকল চিরস্মরণীয় নারী ছিলেন, সীতা সাবিত্রী, খনা লীলাবতী, গান্ধারী কুন্তী, "মাতা সারদা"—এঁদের কথা আজিকার শিক্ষিতা বোনেরা পৃথিবীর চারিদিকে তো ছড়াইয়া দিতে পারেন। প্রচার করিবার ক্ষমতা সকলের থাকে না, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় যাঁহারা উচ্চশিক্ষিতা তাঁহাদের তো সুযোগ মিলিয়াছে, তাঁহারা এ সুযোগ হারাইবেন কেন? যে যুগে রেডিও ছিল না, সিনেমা ছিল না, লাউড স্পীকার ছিলনা, ট্রেন ছিল না, হাওয়াই জাহাজ ছিল না, সে যুগেও পৌরাণিক কাহিনী যদি শুধু মুখে মুখেই প্রচারিত হইয়া আজ পর্যন্ত তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছে, তবে আজিকার দিনে পৃথিবীব্যাপী প্রচার অসম্ভব হইবে কেন? হয়তো সকলে শুনিবে না, তবু বলিতে দোষ কি? লক্ষ জনের মধ্যে তো একজনও শুনিতে পারে। তবে ভারত হইতে যাহা লুপ্ত হইতে বসিয়াছে তাহা আজ বিদেশিনীরা বিশ্বাস করিবেন কেন? তাই আজ সর্ব প্রথমে ভারতের ঘরে ঘরে ইহার প্রচার করা প্রয়োজন। আমরা প্রত্যেকে যতটুকু জানি ততটুকুই বিলাইতে অগ্রসর হইলে কাজ অনেকখানি সহজ হইয়া উঠিবে। যেখানে যে ভাবে বলার প্রয়োজন সেখানে সেই ভাবেই বলিতে হইবে। এমন কি ঘরে ঘরে আলোচনা-হইলেও অনেক কাজ হইবে। শুধু পুরাণের কথা, ইতিহাসের কথা বলিয়াই ইহার সমাপ্তি ঘটাইলে চলিবে না। আজিকার বর্তমান সমাজের কথা, শিশু পালন ও তাহাদের শিক্ষা, গৃহকর্মের শিক্ষা দীক্ষা ইত্যাদি বহু সমস্যাই মায়েরা নিজেরা মিলিত হইয়া মিটাইতে পারেন। আমার বলিবার বা লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে পরস্পর পরস্পরের দোষানুসন্ধান না করিয়া আমরা মিলিত চেষ্টায় একটী নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিতে পারি। বর্তমানের দারুণ সমস্যার কিছুটা সমাধান আমরা নিজেরাই করিতে পারি। বিরোধ মানুষকে ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দেয়, কিন্তু একতা আনিয়া দেয় শক্তি। আজ সমাজের প্রয়োজন সেই মিলিত শক্তি—যাহা নীরবে লোকলোচনের অন্তরালে সংসারে ও সর্বত্র আনিয়া দিবে কল্যাণ ও শান্তি।

নারীদিগের সম্বন্ধে আমাদের হস্তক্ষেপের অধিকার তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া পর্যন্ত। নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে।

—বিবেকানন্দ

গীতা-রহস্য

ডাঃ যতীন্দ্রনাথ ঘোষাল

শিক্ষিত মনে প্রশ্ন জাগে, ভগবদ্‌গীতার বিভূতিযোগ ও বিশ্বরূপ-দর্শনের পরেই পুস্তকের সমাপ্তি সূচিত হয়েছে। পুনরায় ছয় অধ্যায়ের প্রয়োজনাভাব বলা যায়। কিন্তু যাঁরা এই গ্রন্থকে একাধারে কাব্য ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্র মনে করেন, রণক্ষেত্রের পটভূমিতে অষ্টাদশ অধ্যায়ে রচিত এই অপূর্ব গাথাকে তাঁরা বাস্তব-দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখে বিচার করেন শাস্ত্র-হিসেবে,—তাই কোন অসঙ্গতি তাঁদের মনে আসে না। গীতায় বিরাট অসঙ্গতি এবং কল্পনার দৈন্য আছে বলে যাঁরা মনে করেন, একটা অনুভূতির কথা তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিই। দিনের বেলা তন্দ্রার ঘোরে ঘটনাবহুল বহু দৃশ্য-সমন্বিত সমগ্র একটা জীবনের স্বপ্নচিত্র অনেকেই দেখেছেন—অথচ হয়তো ঘড়িতে দেখা গেল মাত্র কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই সব সমাপ্ত হয়েছে। এটাকে আমরা আশ্চর্য মনে করি না, স্বীকার করি যে আমাদের চিত্তদর্পণের এই আলেখ্য বায়োস্কোপের ফিল্মের মত হু হু ক'রে চলে যায়,—রেখে যায় জাগ্রত মনে তার স্মৃতি। যদি আমরা বলি যে এই ভাবেই মহাযোগে শ্রীকৃষ্ণ শোকে মুহ্যমান সখা অর্জুনকে এইরূপ চিত্র দেখিয়ে প্রকৃতিস্থ করেছিলেন কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের মধ্যে, তবে শিক্ষিত ব্যক্তি কি বলতে বাধ্য হবেন না যে এর সম্ভাবনা স্বীকার্য?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলি, বিশ্বরূপ-দর্শনের পর সাধারণ কবি নিশ্চয়ই লিখতেন, 'অতঃপর অর্জুন নিমিত্তমাত্র হয়ে লক্ষীছেলের মতো যুদ্ধে মন দিলেন।' কিন্তু পরম জ্ঞানী ও মন্ত্রদ্রষ্টা ব্যাসদেব যে অপূর্ব কাব্য-ইতিহাস-দর্শন লিখে গেছেন তা কালের অপ্রতিহত প্রভাবকে ছাড়িয়ে উঠেছে বহু উর্ধ্বে এই বস্তু-স্বাতন্ত্র্য-যুগেও। বিজ্ঞান ও দর্শনকে একসূত্রে গ্রথিত ক'রে যে গ্রন্থটি তিনি রচনা ক'রে গেছেন, যুগে যুগে সকল দেশের মনীষীদের মনে তা দিব্যজ্ঞানের চিত্র পূর্বে অঙ্কিত করেছে, আজও করছে এবং অনাগত ভবিষ্যতেও করবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পটভূমিতে 'শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন-সংবাদ' স্মরণমাত্র একটি কথা তাঁর মনে হয়েছে বার বার—'Intense activity without, with intense rest within'। ভারতীয় মনীষার সুউচ্চ দিব্য-চিন্তা-প্রসূত চিত্র। কুরুক্ষেত্র-রণভূমির বিরাট কোলাহলের মধ্যে যোগিরাজ শ্রীকৃষ্ণ শান্ত-সমাহিত নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে শিষ্যকে কর্ম-ধ্যান-জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়-বাণী শুনিয়েছেন। তখন গুরু-শিষ্য উভয়েই যোগারূঢ়। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে তখন অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ আলাপ করেছেন সখারূপে। অর্জুন এইমাত্র জানেন যে তাঁর সখাটি মানবশ্রেষ্ঠ,—জ্ঞানে কর্মে সকল রকমে শ্রেষ্ঠ পুরুষ, কিন্তু তবু তখনও তিনি সখা, তাঁর সঙ্গে হাস্যপরিহাস চলে।

সখা যখন বললেন, বিস্ময়ে সমুপস্থিত যুদ্ধের প্রাক্‌কালে পাগলামি রাখ, লড়াই করতে এসেছ—কিন্তু তোমার যে ক্লীবত্ব এসে পড়ছে, ওঠ, জাগ। অর্জুন বললেন, 'না, না, ক্লীবত্ব আসবে কেন? আমি পূর্ণ জ্ঞানের কথা বলছি, আমার মন সত্ত্বগুণেই অবস্থিত—এই রাজ্য, সম্পদ আমি চাই না' ইত্যাদি। সখা বললেন—বটে, তুমি জ্ঞানের কথা বলছ, কিন্তু জান প্রকৃত জ্ঞানী জগৎকে কি চোখে দেখেন? তবে শোন……।

কিছুক্ষণ জ্ঞানের কথা বলে তিনি বুঝলেন যে অর্জুনের মুখের কথা ও মনের কথা এক নয়। তাই বললেন, ক্ষত্রিয়-সন্তান তুমি, যুদ্ধ করাই তোমার ধর্ম।

শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন, অর্জুনের মনের অন্ধকার কিছুমাত্র যায়নি, তখন তিনি স্বরূপে প্রকাশিত হয়ে সখাকে শিষ্যের আসনে বসিয়ে পরম তত্ত্ব শোনাতে শুরু করলেন। ক্রমে লুপ্ত হয়ে গেল যুদ্ধ-বিগ্রহ, পাণ্ডব- বংশের স্মৃতি। যোগারূঢ় জগদ্গুরু নিজেকে প্রকাশ করতে লাগলেন, অপূর্ব ভাবে সহজ সরল ভঙ্গিতে জ্ঞান, কর্ম, যোগ —বেদ-উপনিষদের গূঢ়তত্ত্ব শিষ্যের চিত্তে দিলেন প্রস্ফুটিত ক'রে, গুরুমন্ত্র কানের ভেতর দিয়ে নয়, চিত্তপটে ফিল্মের পর ফিল্মের মতো হতে লাগল প্রকাশিত। ক্রমে এল বিভূতিযোগ, তখন শিষ্য তন্ময় হয়ে দেখছে পুরুষোত্তম শ্রীভগবান বেদ-উপনিষদের মর্মবাণীরূপে তাঁর অন্তরের বিজ্ঞান-ভূমিতে প্রতিফলিত।

তারপর পরম-সৃষ্টি-রহস্যের একটি কোণের মায়া-জাল সামান্য সরিয়ে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ভবিষ্যতের চিত্র অর্জুনের দিব্যচেতনায় করলেন পরিপ্রকাশিত। ·আর যুদ্ধের কথা নেই। জগদ্গুরুর সামনে—নারায়ণের পদতলে উপবিষ্ট শিষ্য তখন সাধনভূমির উচ্চ সোপানে। বিহ্বল হয়ে তিনি বলছেন—ঠাকুর। বল, বল, জ্ঞানী ও যোগীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? চলল প্রশ্নের পর প্রশ্ন —এইভাবে ব্যাসদেব গুরু-শিষ্য-সংবাদ গ্রথিত করেছেন।

কিন্তু কাব্যের উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ করা চাই—তাই প্রয়োজন—অর্জুনকে যুদ্ধে নামানো। তখনও শিষ্য দিব্যভূমিতে আরূঢ়, ক্রমে ক্রমে ফিরে আসছে কর্ম-জগতের চেতনা। জগদ্গুরু শ্রীভগবান শিষ্যকে বললেন—এখন বুঝেছ, তোমাকে যে কর্মক্ষেত্রে পাঠিয়েছি, যে প্রকৃতি দিয়ে গড়েছি তোমায়—সেইরূপে এই কর্মভূমিতে তোমায় চলতে হবে। পাপপুণ্য আমাতে অর্পণ কর। তোমার সকল ভার আমার উপর।

যুক্তিবাদী বন্ধু বলবেন—সকল অবতারই বলেছেন, আমাকে ভজনা কর, আমি তোমার পাপপুণ্যের ভার নেব, কথাটা কেমন একটু অযৌক্তিক নয় কি? অন্ততঃ ঔপনিষদিক জ্ঞানের পরিপন্থী মনে হয়।

বন্ধুকে কুরুক্ষেত্রের পটভূমি স্মরণ করতে বলি—বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শন ক'রে ভয়বিহ্বল হয়ে বলছেন, তোমাকে সখা ভেবে হাস্যপরিহাস করেছিলাম, এখন ভয় হচ্ছে। ঠাকুর, তোমার আসল রূপ দেখাও। তুমিই চতুর্ভুজ বিষ্ণুনারায়ণ, আমাদের ইষ্টদেবতা। অর্জুন সেইরূপেই দেখলেন তাঁর সখাকে। পরে আবার দেখেছেন তাঁকে সারথিরূপেও। তখন আর তিনি পাণ্ডব-অর্জুন নন ইষ্টের সন্নিধানে যোগসাধনে প্রবৃত্ত সাধক, বলছেন—এই যোগের বিষয় আরও বল। 'হন্ত তে কথয়িষ্যামি'—গুরু শিষ্যকে ক্রমে ক্রমে পুরুষ-প্রকৃতি, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ, গুণত্রয়-বিভাগ সব সংক্ষেপে বললেন, শোনালেন কেমনভাবে তিনি সমাজবন্ধন, জীবের প্রকৃতি অনুসারে কর্মবিভাগ ইত্যাদির সৃষ্টি করেছেন।

ক্রমে অর্জুনের চৈতন্য বিজ্ঞান-ভূমি থেকে এল মনোজগতে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন—নরশ্রেষ্ঠ, তোমাকে সব কথা বললাম, এখন তুমি যা ভাল বোঝ করো। তবে শেষ কথাটি ভুলো না যে, যে স্বভাব বা প্রকৃতি নিয়ে তুমি সংসারে এসেছ, সেই মতো কাজ করলে সহজে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হবে। আর এও জেনো, আমিই সকল জীবের অন্তরে বসে আছি, আমিই যজ্ঞের অধিপতি ও যজ্ঞের ফলদাতা এবং জীবকে ন্যূনতম বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে জীবনপথে এগিয়ে নিয়ে যাই ভূমার দিকে।

সমালোচনা

আলোক-তীর্থ ঃ (প্রথম খণ্ড) শৈলেন্দ্র-নারায়ণ ঘোষাল। মূল্য ৭৲ ; পৃঃ ৪১২। প্রকাশক : ডাঃ বঙ্কিম চৌধুরী, 'সন্তধাম'—কর্ণেলগোলা, মেদিনীপুর।

মতামতের স্বাধীনতা ভারতবর্ষের সংবিধান-সম্মত, তবে ধর্ম ও সাহিত্যের আলোচনায় এর নিরঙ্কুশ প্রয়োগ যতখানি, অতখানি অন্যত্র অসম্ভব। অনেক সময়ই আমরা বাচালতাকে যুক্তি এবং স্পর্ধাকে পৌরুষ বলে ভুল করি। এই গ্রন্থের গ্রন্থকার মূল বক্তব্য হিসাবে নতুন কিছু উপস্থিত করেননি ; ঈশ্বরানুভূতি করেছেন বা ঈশ্বরাদেশ পেয়েছেন, এমন কোন পরিচয় এ গ্রন্থে দেননি। কিন্তু অনায়াসে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নিজের বুদ্ধির ঘটি নিয়ে মাপতে গেছেন। আপাতদৃষ্টিতে কিছু মুখ-রোচক মালমশলা তিনি হাজির করেছেন—যাদের প্রত্যেকটির স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে সহস্র কথা বলার আছে। কিন্তু আমরা তো শুনেছি, তর্কের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় না, পি এইচ-ডি উপাধিধারীর সার্টিফিকেটেও নয়। গ্রন্থপাঠে চিন্তাশীল পাঠক শুধু হেসেই নিরস্ত হবেন—নয়তো বলবেন, 'যার পেটে যা সয়'।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঐ কথাটির মধ্য দিয়ে ইঙ্গিত ক'রে গেছেন অধ্যাত্মসাধনায় বিভিন্ন স্তরের অধিকারী আছে, যুগ যুগ ধরে ভারতের সাধকেরাও তাই ক'রে এসেছেন, এমন কি কবীর নানক দাদু পর্যন্ত (লেখক যাঁদের একমাত্র প্রামাণ্য বলে মনে করেছেন)। কিন্তু এঁদের মতই যে ঠিক, এমন যুক্তি লেখককে কে দিয়েছেন, বোঝা গেল না ; না কি—একমাত্র তিনি বলছেন, এটিই প্রমাণ। মহাপুরুষদের বা অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের আলোচনায় যে গভীর ধ্যান ও মননের প্রয়োজন, তার কোন প্রমাণই এ প্রগলভ গ্রন্থে নেই ; উপরন্তু এদের জীবন ও বাণীর কষ্টকল্পিত অপ-ব্যাখ্যার উদাহরণ অজস্র। একটি উদাহরণ দিই :

২৭০ পৃষ্ঠায় মহামনীষী মাইকেলের সঙ্গে শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব যে প্রথমে কথা বলতে পারেননি, তার কারণ হিসাবে লেখক বলেছেন যে মাইকেলকে বিধর্মী বলেই 'ভারতীয় হিন্দু' শ্রীরামকৃষ্ণদেব, তাঁর সঙ্গে কথা বলেননি। অথচ একটু আগেই লেখক এ পুস্তকে নারায়ণ শাস্ত্রীর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন—'কি। এই দুই দিনের সংসারে পেটের দায়ে নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করা।' শাস্ত্রীমশায় ওই পেটের দায়ে যুক্তিকেই অস্বীকার করেছিলেন, খৃষ্টধর্মকে নয়। এর পর মধুসূদন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে উপদেশ চাইলে শ্রীরামকৃষ্ণ কিছু বলতে পারলেন না, বলেছিলেন, আমার মুখ কে যেন চেপে ধরলে—কিছু বলতে দিলে না। শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের এই আচরণটিই লেখক তাঁর পরধর্ম-মত-অসহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত ধরে নিয়ে কটূক্তি করেছেন। কিন্তু এই ঘটনা বর্ণনার পর 'লীলা-প্রসঙ্গে' আরও যে একটু কথা ছিল, সে কথা লেখক কৌশলে বাদ দিয়ে গেছেন। হৃদয়ের সাক্ষ্য অনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণ কিছুক্ষণ পরে কয়েকটি আধ্যাত্মভাবের গান গেয়ে এবং উপদেশ দিয়ে মধুসূদনকে মুগ্ধ করেন।

মধুসূদন কেন পেটের দায়ে খৃষ্টান হবার কথা বলেছিলেন, সেকথা তিনি জানেন। পেটের দায়ে তাঁর খৃষ্টান হওয়ার কথা নয়, তিনি ধনীর সন্তান। কিন্তু খৃষ্টভক্তি তাঁকে পরধর্ম গ্রহণ করায়নি, বিলাত যাবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় তিনি খৃষ্টান হয়েছিলেন। এই সামান্য কারণে স্বধর্মত্যাগ

কোন কালেই সমর্থনীয় নয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে খৃষ্টান হওয়ার জন্যই মধুসূদনের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে পারেননি—এমন অভিযোগ অভিসন্ধি-প্রণোদিত। খৃষ্টভক্ত উইলিয়ামসের সঙ্গে তাঁর সপ্রেম আচরণের তাহলে কী অর্থ হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই ধরনের স্বকপোল-কল্পনার কোন অধিকার লেখকের নেই, একথা মনে করিয়ে দিয়ে ভাগবত সম্বন্ধে লেখকের অশোভন অবিনয়ের একটি চরম দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করি: "কথায় আছে, মূঢ় দাম্ভিক চপলমতি কোন মাতালের হাতে ধারালো তরবারি থাকলে তাতে যেমন অনর্থ ঘটে, তেমনি কৃষ্ণগুণানুবাদের রসকথায় রসোন্মত্ত ভাগবত-কারও 'mightier than the sword' লেখনীমুখে কী অনর্থ ঘটিয়েছে দেখুন।" (পৃঃ ১৯৬)—উদ্ধৃতিটি এ গ্রন্থ সম্বন্ধেই সুপ্রযোজ্য।

লেখকের নিজস্ব অধ্যাত্মপন্থা সম্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্য নেই। একথা ঠিক যে, শিশুর আধো আধো মুখের ডাকও পিতার কানে এবং প্রাণে পৌঁছায়, কিন্তু বয়স্ক 'শিশু'র অহম্মন্যতাকে মঙ্গল-কামী পিতা কী চোখে দেখেন, তা বলাই বাহুল্য।

কোন প্রবীণ সাধুর মুখে শুনেছিলাম পূজনীয় স্বামী তুরীয়ানন্দজী জনৈক অধ্যাত্মসাধককে বলেছিলেন অধ্যাত্মসত্য স্বয়ং উপলব্ধি করেননি, এমন কারও রচনা পড়তে যেও না—বিভ্রান্ত হবে। আলোচ্য গ্রন্থটির অহঙ্কৃত অত্যুক্তিগুলি মহাপুরুষের এই উক্তির সত্যতা আর একবার প্রমাণিত করেছে। —পুণ্য মিত্র

ভক্তিসাধন কুসুমাঞ্জলি: গ্রন্থকার ও প্রকাশক—পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীদামোদর মহাপাত্র সাং সুপকারসাহী, পুরী। পৃষ্ঠা ৯৬+৩২, মূল্যের উল্লেখ নাই।

কলিযুগে ক্ষীণস্বাস্থ্য, স্বল্পধী, স্বল্পায়ু, দুঃখ-দ্বন্দ্ব-সমস্যা-জর্জরিত মানুষের ঈশ্বরলাভের পথে ভক্তিযোগই সহজ সরল উপায়। মানবের হৃদয়ে আছে ভালবাসার অন্তঃসলিলা রস-নির্ঝরিণী। সেই রসধারা জাগতিক কোন বিষয় বা লোকের উপর সীমাবদ্ধ না থাকিয়া যখন ঈশ্বর বা পরমাত্মার উপর প্রযুক্ত হয় তখনই তাহা ভক্তি আখ্যা পাইবার যোগ্য। সকল বয়সের নরনারীর পক্ষেই ভক্তিপথ প্রশস্ত। ভক্তিপথে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন-মূলক তপশ্চর্যা ও জটিল যোগ-সাধনের প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন—শ্রীভগবানের নামগুণগান ও প্রাণের ব্যাকুলতা। ভগবানের নামে শরীর মন পবিত্র হয়, নির্মল সত্ত্বগুণাশ্রিত হৃদয়ে ভগবানের রূপ প্রতিফলিত হইয়া থাকে।

আলোচ্য গ্রন্থে বৈষ্ণব মতে সাধনোপযোগী যাহা করণীয় তাহা সন্ধ্যা-পূজা-ধ্যান-প্রকরণের মাধ্যমে এবং নিত্যক্রিয়ার ক্রম ও অনুশীলন-পদ্ধতিতে বিধিমুখে বিবৃত, অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রার্থও সুন্দরভাবে পরিস্ফুট। এতদ্ব্যতীত 'শ্রীশিক্ষাষ্টকম্', 'শ্রীজগন্নাথাষ্টকম্', 'শ্রীচৈতন্যাষ্টকম্', প্রভৃতি অমূল্য স্তোত্রগুলি পুস্তকখানিকে একটি বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করায় ইহা ভক্তমাত্রেরই আদরণীয় হইবে বলিয়া মনে হয়। —জীবানন্দ

মঠ ও মিশনের নবপ্রকাশিত পুস্তক

সারদা-রামকৃষ্ণ লীলাগীতি (কথিকা সহ)—স্বামী চণ্ডিকানন্দ প্রণীত, প্রকাশক স্বামী সৌম্যানন্দ, সম্পাদক রামকৃষ্ণ মিশন, শিলং। পৃষ্ঠা ৮৮, মূল্য এক টাকা চার আনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের লীলাবলম্বনে ভক্তিরসাত্মক ৫০ খানিরও অধিক গান সুরতাল সহ সন্নিবেশিত। গানের মাঝে মাঝে তাঁহাদের জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি সরলভাবে বর্ণিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বহুমুখী বিদ্যাভবন উদ্বোধন

মেদিনীপুর ঃ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাভবনে বহুমুখী শিক্ষাদানের জন্য যে নূতন ভবনটি নির্মিত হইয়াছে, গত ২১শে ফেব্রুআরি তাহার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ। এই ভবনে বিজ্ঞানাগার এবং উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার ক্লাস-কক্ষগুলি স্থাপিত হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে সন্ধ্যায় বিদ্যাভবন-প্রাঙ্গণে প্রশস্ত চন্দ্রাতপের নীচে একটি বিরাট জনসভায় প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধান অতিথির ভাষণে স্বামী মাধবানন্দজী শিক্ষায় অসাম্প্রদায়িক ধর্মের স্থান এবং স্বামীজীর শিক্ষার আদর্শে স্থাপিত এই সব প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। ডক্টর মজুমদার শিক্ষার গুরুত্ব ও লক্ষ্য বিশ্লেষণ করেন।

পরদিন ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার রামকৃষ্ণ বিদ্যাভবনের পারিতোষিক-বিতরণী সভায় ভাষণ দেন। স্বামী মাধবানন্দজী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া পারিতোষিক বিতরণ করেন। পরে ছাত্রদের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

পুরস্কার-বিতরণী সভা

বিদ্যামন্দির, বেলুড় ঃ নবনির্মিত ব্যায়ামাগারের প্রশস্ত হলে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে গত ২২শে ফেব্রুআরি বেলুড় বিদ্যামন্দিরের বার্ষিক পারিতোষিক-বিতরণোৎসবে নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া পুরস্কার বিতরণ করেন।

বার্ষিক কার্য-বিবরণী পাঠ-প্রসঙ্গে বিদ্যামন্দিরের (কলেজের) অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দ বলেন: বিদ্যামন্দিরের অগ্রগতি অপ্রতিহত। আবাসিক সাধু শিক্ষকদের সাহচর্যে নিয়মিত প্রার্থনা পড়াশুনা ও কাজকর্মের ভিতর দিয়া ছাত্রদের সুশৃঙ্খল জীবন গঠনের প্রচেষ্টা সাফল্যের পথে অগ্রসর। ১৯৫৮ খৃঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল বিশেষ সন্তোষজনক।

	পরীক্ষার্থী	১ম (বিভাগে)	২য়	৩য়
আই. এস-সি	৫৬	৪১	১৫	
আই এ.	৩০	২৭*	৪	১

* (১ম, ৩য় ও ৭ম স্থান অধিকৃত)

পরিশেষে অধ্যক্ষ মহারাজ বলেন যে শীঘ্রই বিদ্যামন্দির 'তিন বৎসরের ডিগ্রি কলেজে' রূপান্তরিত হইবে।

সভাপতির ভাষণে স্বামী নিখিলানন্দ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মন—'মানুষ কি?' এই প্রশ্নের কি উত্তর দিয়াছে, তাহার বিস্তৃত আলোচনা করেন, এবং এই প্রতিষ্ঠানকে 'মানুষ' গঠন করিবার দুরূহ কার্যে ব্রতী দেখিয়া আশা ব্যক্ত করেন, স্বামীজীর স্বপ্ন সফল হইবে।

ছাত্রগণের সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজী আবৃত্তি ও ভজনগান উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ৩৬ জন ছাত্র সাধারণ শিক্ষা, বিশেষ গুণাবলী, প্রবন্ধরচনা, সঙ্গীত, আবৃত্তি ও অভিনয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য পারিতোষিক লাভ করে।

উৎসব-সংবাদ

তমলুক : গত ১৯শে ডিসেম্বর, পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষে পূজা, কীর্তন, আলোচনার ব্যবস্থা হইয়াছিল। পূজ্যপাদ মহারাজ ১৯১৫ খৃঃ তমলুকে আসিয়াছিলেন, সেই কথা স্মরণ করিয়াই এই অনুষ্ঠান।

গত ৫ই জানুআরি আশ্রমে পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ-বিতরণ, জীবনী আলোচনা ও শ্রীশ্রীরামনাম সঙ্কীর্তন হইয়াছিল।

গত ১৫ই জানুআরি পূজ্য স্বামী সারদানন্দ মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষে পূজা, ভোগরাগ ও আলোচনা হয়।

ফরিদপুর : রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৩১শে জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হইয়াছে। উক্ত দিবসে বিশেষ পূজা, মঙ্গলারতি, হোম ও চণ্ডীপাঠ হয় এবং সন্ধ্যায় ভজন সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। পরিশেষে স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীশিশিরকুমার আচার্য স্বামীজীর জীবনদর্শন আলোচনা করেন।

৬ই ফেব্রুআরি বৈকালে আশ্রম-প্রাঙ্গণে স্বামীজীর জন্মোৎসব ভাব-গম্ভীর পরিবেশে অতি সুশৃঙ্খলভাবে ফরিদপুরের সহকারী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা জজ সাহেবের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সর্বশ্রেণীর নরনারী ঐ উপলক্ষে আশ্রম-প্রাঙ্গণে সমবেত হন। চারিদিকে স্বামীজীর অমূল্য বাণী টাঙাইয়া দেওয়া হয়, স্থানীয় মহাকালী পাঠশালার ছাত্রীগণ গুরুস্তব, ও স্বামীজীর বন্দনা-গীতি সুন্দরভাবে গান করিয়া সকলকে প্রীত করে।

পুরী : গত ৩১শে জানুআরি হইতে দিবসত্রয় পুরী রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরিতে বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। পূজা, চণ্ডীপাঠ, ভজন, জনসভায় বক্তৃতা, প্রসাদ-বিতরণ,স্কুল ও কলেজের বালিকাদের মধ্যে বক্তৃতা, আবৃত্তি ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, নাটকাভিনয় প্রভৃতি উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। প্রায় দুই শত বালক-বালিকা বিশটি বিভিন্ন ক্রীডায় অংশ গ্রহণ করে। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ 'বিবেকানন্দ ও ভারতের নবজাগরণ' সম্বন্ধে ইংরেজী, ওড়িয়া ও বাংলা ভাষায় বক্তৃতা-প্রতিযোগিতায় এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীগণ ওড়িয়া ও বাংলা ভাষায় আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। স্বামী সদাশিবানন্দ মহারাজ প্রতি-যোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিবরণ করেন। এক বিরাট জনসভায় সভাপতি ওড়িস্থার উন্নয়নমন্ত্রী শ্রীরাধানাথ রথ, স্বামী সন্তোষানন্দ, অধ্যাপক শ্রীজয়কৃষ্ণ মিশ্র ও অধ্যাপক শ্রীসত্যবাদী মিশ্র স্বামীজী-প্রবর্তিত শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ওড়িয়া ভাষায় লিখিত 'কুরুক্ষেত্র' নামক একটি নাটিকা মিশন লাইব্রেরি ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ কর্তৃক অভিনীত হয়।

ভুবনেশ্বর : শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গত ৯ই ফেব্রুআরি পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের শুভ জন্মোৎসব বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগ, আরাত্রিক, ভজন, প্রসাদ-বিতরণ ও জীবনী আলোচনার মাধ্যমে মহা আনন্দে সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্বামী অসঙ্গানন্দ 'ধর্মপ্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ' পুস্তক হইতে পাঠ করেন। অপরাহ্ণে মঠপ্রাঙ্গণে আয়োজিত সভায় শ্রীদীনবন্ধু সাহু (সভাপতি), শ্রীনিত্যানন্দ দাস ও পণ্ডিত শ্রীঋষিরাম ধর্মের মূল কথা, সেবা-রহস্য ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের ধর্মজীবন আলোচনা করেন। শ্রীশ্রীরামনাম-সঙ্কীর্তন এই উৎসবের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল।

কার্য-বিবরণী

বিবেকানন্দ সমাজসেবা-কেন্দ্র : (১৭, নন্দলাল মল্লিক লেন এবং ৯।১, রমেশ দত্ত স্ট্রীট, কলিকাতা—৬) : স্বামীজীর শিক্ষাদর্শে উদ্বুদ্ধ পাথুরিয়াঘাটা রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসের কয়েকজন বিদ্যার্থী দ্বারা রামবাগান বস্তিতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের সেবাকল্পে এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে।

১৯৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দের কার্য-বিবরণীতে প্রকাশিত ইহার বর্তমান চতুর্বিধ কর্মধারা—

(১) শিশুবিভাগ :

১। বিবেকানন্দ নার্সারি স্কুল (৩ হইতে ৬ বছরের শিশুদের জন্য) : ছাত্রসংখ্যা ৩৪

২। বিবেকানন্দ বেসিক স্কুল : ছাত্রসংখ্যা ১৫৯, এখানে মৃৎশিল্প, খেলনা তৈরী, সেলাই, বুনন, অঙ্কন, বেত ও বাঁশের কাজ শেখানো হয়। লেখাপড়া ছাড়া গানবাজনা ও অভিনয় শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে।

৩। ছাত্রাবাস : বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ১০ হইতে ১৬ বছরের ১৫জন অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্র লইয়া এই বিদ্যার্থিভবন। ছাত্রদের থাকা-খাওয়া, স্কুলের বেতন, পোষাক ও শিক্ষার অন্যান্য খরচ সবই আশ্রম হইতে বহন করা হয়।

(২) বয়স্ক-বিভাগ :

১। বিবেকানন্দ নৈশ বিদ্যালয় : ইহার প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ১৬৭ জন লিখন-পঠনক্ষম হইয়াছে।

২। সারদামণি নৈশ বিদ্যালয় : ১৯৫৭ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত, এখানে মেয়েদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাজ হইতেছে।

৩। সমাজ-শিক্ষার ক্লাস : চলচ্চিত্র, কথকতা, বক্তৃতা, থিয়েটার ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিক্ষা-বিস্তার করা হয়। পাক্ষিক দেওয়াল-পত্রিকায় বস্তির উন্নয়ন কিভাবে হইতে পারে প্রবন্ধ ও চিত্রের সাহায্যে দেখানো হইয়া থাকে।

৪। গ্রন্থাগার ও পাঠাগার : গ্রন্থাগারে নির্বাচিত ৮০০ বই আছে, পাঠাগারে একটি দৈনিক পত্রিকা সহ কতকগুলি সাময়িকী রাখা হয়। দৈনিক উপস্থিতি গড়ে ১৫।

(৩) স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ :

বস্তি যাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইতেছে। একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা হইয়াছে। এখানে অভিজ্ঞ চিকিৎসক চিকিৎসার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। ৭,০০০ রোগী চিকিৎসা লাভ করিয়াছে। প্রতিদিন তিন শত হইতে চার শত শিশুকে দুধ দেওয়া হয়।

(৪) জীবিকার মান উন্নয়ন :

দরিদ্র জনগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য 'বিবেকানন্দ শ্রম-শ্রী' সমবায়-সমিতি খোলা হইয়াছে।

আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার

সানফ্রান্সিস্কো : বেদান্ত সোসাইটি

বিভিন্ন রবিবারে বেলা ১১টায় এবং বুধবার রাত্রি ৮টায় সমিতির ভাষণ-গৃহে স্বামী অশোকানন্দ, স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করেন :

নভেম্বর :—উন্নত মনের প্রকৃতি ও ক্রিয়া, ঈশ্বরের অনুসন্ধান কখন এবং কিরূপে? কোথা হইতে, কেন, কোথায়? যেখানে প্রেম ও যুক্তি মিলিত হয়, বাস্তব সত্তাই পরম পুরুষ, শক্তির রহস্য, সমস্ত অনর্থের মূল কি? চৈতন্যের ঊর্ধ্বগতি, আমি কি আমার ভ্রাতার রক্ষক?

ডিসেম্বর :—যথার্থভাবে কর্ম করিবার উপায়; ঈশ্বরকে পাওয়া যায় কিরূপে? ব্যক্তি-মানস ও বিশ্বমানস, আমি শরীর নই, আমি মন নই, অধ্যাত্ম-জীবন ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম; আমার জানা দেব-মানব, শাশ্বত খৃষ্ট।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে মেজর প্রভাত বর্ধন

আমরা গভীর দুঃখের সহিত লিপিবদ্ধ করিতেছি যে গত ২৫শে ফেব্রুআরি বুধবার রাত্রে মেজর প্রভাত বর্ধন ৬৯ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। মেজর বর্ধন অকৃতদার ছিলেন।

১৮৯০ খৃঃ কলিকাতা বহুবাজারের বিখ্যাত বর্ধন বংশে প্রভাত বর্ধন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা চণ্ডীচরণ বর্ধন ধর্মপরায়ণ ও সুপরিচিত শিক্ষাব্রতী ছিলেন, তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত হিন্দু বয়েজ স্কুলে প্রভাতের প্রথম শিক্ষা শুরু হয় এবং পিতার ধর্মভাব ও লোকহিতৈষণা তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করে। বহুবাজারে স্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি অনাথ ভাণ্ডারের উন্নতিকল্পে তাঁহার পরিশ্রম চিরস্মরণীয়। অকালে পিতৃ-বিয়োগের পর ১৯১৪ খৃঃ কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম বি পাশ করিয়া তিনি সামরিক বিভাগে যোগদান করেন এবং এই কার্যে ভারতে ও মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দেশে ৮ বৎসর কাটান। তিনি ১৯২২ খৃঃ ইংলণ্ডে গমন করিয়া এফ আর সি এস ও এম আর. সি. পি পাস করিয়া আসেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পুনরায় ইওরোপে গিয়া সেখানকার হাসপাতালের কার্যপদ্ধতি দর্শনান্তর দেশে ফিরিয়া তিনি স্বদেশ ও স্বধর্মের উন্নতিকল্পে জনকল্যাণের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত—বিশেষতঃ 'কালচার ইনষ্টিট্যুটে'র সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করি।

উৎসব-সংবাদ

শিকড়াঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের ষষ্ঠনবতিতম জন্মতিথি-পূজা তদীয় পুণ্য জন্মস্থান শিকড়া-কুলীনগ্রামে গত ৯ই ফেব্রুআরি সোমবার মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে পূজা, ভজন, রামনাম-কীর্তন, চণ্ডী ও ভাগবত পাঠ, শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ, ব্রহ্মানন্দ-জীবনী আলোচনা-ছায়াচিত্র-প্রদর্শন, ধর্মসভা প্রভৃতি কর্মসূচী লইয়া সপ্তাহব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের প্রথম দিবস মধ্যাহ্নে ৬০০ ভক্ত নরনারী প্রসাদলাভে ধন্য হন।

উৎসবের শেষ দিবস (রবিবার) গ্রামবাসী ও ভক্তগণ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও মহারাজের প্রতিকৃতি মাথায় লইয়া শঙ্খধ্বনি ও কীর্তন সহযোগে তীর্থ-পরিক্রমা করেন। মধ্যাহ্নে অনুমান ৬,০০০ ভক্ত নরনারী, গ্রামবাসী ও নানাস্থান হইতে আগত পল্লীবাসিগণ প্রসাদলাভে ধন্য হন।

সাধুসজ্জন-সমাগমে উৎসবের আনন্দ ও ভাবগাম্ভীর্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

সালকিয়াঃ ৮ই ফেব্রুআরি সালকিয়া তরুণদল কর্তৃক উষাঙ্গিণী বালিকা বিদ্যালয়-ভবনে স্বামী বিবেকানন্দের ৯৭তম জন্মোৎসব বিশেষ গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়।

উক্ত সভায় স্থানীয় ভক্তমণ্ডলীর পক্ষ হইতে স্বামীজীর জীবন আলোচিত হইলে বিধান সভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় ও সভাপতি স্বামী মিত্রানন্দ স্বামীজীর বাণী পর্যালোচনা করেন।

ফলতা (২৪ পরগনা)ঃ গত ২৫শে ডিসেম্বর চেতলা শ্রীরামকৃষ্ণ-মণ্ডপের এই শাখা আশ্রমে বার্ষিক শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসব

সুসম্পন্ন হইয়াছে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সুদূর পল্লী অঞ্চল হইতে এবং কলিকাতা হইতে ভক্তগণ আশ্রমে সমবেত হইতে থাকেন। শ্রীমন্দিরে পূজা, পাঠ ও হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথির কথকতা এবং ভজন আশ্রমে নির্মল আনন্দের সঞ্চার করে। মাকড়-দহ শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয়ের ভক্তগণের শ্রীরামকৃষ্ণ-নামকীর্তনে সমবেত জনগণ আনন্দ লাভ করেন, মধ্যাহ্নে পাঁচ সহস্রাধিক নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী ও বাণী আলোচিত হয়।

জামনগর : গত ১৭ই মাঘ স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে স্থানীয় বালমনোবিকাশ কেন্দ্রের উদ্যোগে কাশীবিশ্বনাথ-মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রাতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিশেষ পূজা, সপ্তশতী চণ্ডীপাঠ ও হোম হয়। সন্ধ্যা ৬টায় স্কুল-কলেজের ছাত্রদের জন্য স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ত্র্যম্বকভাই জাবেরীর পৌরোহিত্যে এক সভায় অধ্যাপক মদনমোহন জানী স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও শিক্ষা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সভাপতি স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ পাঠ করিয়া শুনান ও বুঝাইয়া দেন।

১৮ই মাঘ প্রাতে সীতা-মাহাত্ম্য, দেবর্ষিস্মরণ, দশাবতার, শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং অন্যান্য দেব-দেবীর স্তব পাঠ করা হয়। সন্ধ্যা ৬টায় রাজকোট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দের সভাপতিত্বে এক সভায় মনীষী কাকা কালেলকার, অধ্যাপক তুমন্ত পাণ্ডিয়া, নবনগর হাইস্কুলের হেড মাষ্টার জে. ডি. মারু সাহেব, ডাঃ ওয়াই. জে মারুভাই এবং সভাপতি গুজরাতী ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন, সভাপতি ইংরেজীতেও কিছুক্ষণ বলেন। প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্রদিগকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

পিপড়াড়ি কোলিয়ারী : গত ১৭ই মাঘ শনিবার শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

স্বামীজীর প্রতিকৃতি পত্র-পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করা হইয়াছিল। পূজা, গীতাপাঠ ও ভজন উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। সন্ধ্যায় আয়োজিত সভায় ডাঃ ধনঞ্জয় দে গীতার ভক্তি-যোগ পাঠ করেন। অতঃপর স্বামীজীর বাণী আলোচিত হয়। ভক্তবৃন্দের সমাগমে উৎসব আনন্দমুখর হইয়া উঠে।

কার্য-বিবরণী

বিবেকানন্দ সোসাইটি, কলিকাতা : স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ জনকল্যাণে রূপায়িত করিবার জন্য যে সকল সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে বিবেকানন্দ সোসাইটির নাম প্রাচীনতার দিক হইতে উল্লেখযোগ্য। ১৯০২ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত এই সমিতিব চার বৎসরের (১৯৫৩-৫৬) কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার কর্ম-ধারা প্রধানতঃ প্রচার, শিক্ষা ও সেবা-মূলক।

সাপ্তাহিক ও সাময়িক ধর্মসভায় গীতা, উপনিষৎ, শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত প্রভৃতি আলোচিত হইয়া থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধদেব, শংকরাচার্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উদ্‌যাপন করা হয়।

প্রতি বৎসর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রচনা-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। সোসাইটির হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে ১৯৫৬ খৃঃ ১৭,২২২ রোগীকে ঔষধ এবং ১২ জন দরিদ্র ছাত্রকে নিয়মিত সাহায্য বাবদ ৩৪১৲ টাকা দেওয়া হয়।

সমিতির গ্রন্থাগারে ধর্ম দর্শন ও সাহিত্য বিষয়ক ৪,০০০ নির্বাচিত পুস্তক আছে; পাঠাগারে বহু পত্র-পত্রিকা নিয়মিত আসে।

সোসাইটির বর্তমান সভ্য-সংখ্যা ৪২০।

আজাদ-স্মৃতি বক্তৃতা

গত ২২শে ফেব্রুআরি নতুন দিল্লী বিজ্ঞান-ভবনে শ্রীজওহরলাল নেহরু আজাদ-স্মৃতি বক্তৃতা-মালার উদ্বোধন-কালে 'বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারত' সম্বন্ধে একটি লিখিত ভাষণ একঘণ্টা পাঠ করেন, এবং পরদিন উহা শেষ করেন।

বক্তৃতার প্রারম্ভে মৌলানা আজাদের গুণাবলী বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, মৌলানা ভারতকৃষ্টির একটি সমন্বিত প্রতীক। যুগে যুগে ভারতের রূপবিবর্তন, শিল্পবিপ্লব, ভাবসংঘর্ষ এবং যন্ত্রবিজ্ঞানের অগ্রগতি—ইহাই ছিল আলোচনার বিষয়বস্তু। ইসলাম ও পাশ্চাত্য চিন্তা কিভাবে ভারতজীবন প্রভাবিত করিয়াছে তাহা আলোচনা করিয়া বর্তমানে যে দুইটি শক্তি—জাতীয়তা ও সমাজসাম্যের দাবি প্রবল ভাবে কাজ করিতেছে, বক্তা তাহার উল্লেখ করেন।

বিজ্ঞান-সংবাদ

সমুদ্রজলের লবণ দূরীকরণ: একটি মার্কিন ও একটি ব্রিটিশ কোম্পানি চুক্তিবদ্ধ ভাবে কাজ করিতেছে যাহাতে 'মেম্ব্রেন' পদ্ধতিতে জলের লবণতা দূরীকরণ-যন্ত্র জলাভাবের দেশসমূহে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে।

আওনিক্স্ কোম্পানি (Ionics Company) বহুদিন হইতেই মেম্ব্রেন পদ্ধতিতে বৈদ্যুতিক আয়ন স্থানান্তরিত করিয়া অল্প ব্যয়ে জলের লবণতা দূর করিতেছে। পদ্ধতিটির বৈজ্ঞানিক নাম ইলেকট্রো-ডায়ালিসিস্ (Electrodialysis, —membrane process for de-salting of sea-water), অন্যান্য—অধিকাংশ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত তাপ-শক্তির পরিবর্তে এই পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ-শক্তি ব্যবহৃত হয়। মধ্যসমুদ্রের, উপসাগরের বা নদীমোহানার জলকে এই পদ্ধতিদ্বারা অতি সহজে লবণমুক্ত করা যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকায়, পারস্য উপসাগরে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে। অন্যান্য জলাভাবের দেশে—যথা ভারতে, অস্ট্রেলিয়ায়, আফ্রিকার নানাস্থানে, এই যন্ত্রের চাহিদা বাড়িতেছে।

আণবিক বিদ্যুৎ-শক্তি: গত ১৬ই ফেব্রুআরি ডক্টর ভাবা (Chairman of Atomic Energy Commission) লোকসভার সদস্যদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, ১৯৬৪ খৃঃ শেষাশেষি ভারত আণবিক বিদ্যুৎ-শক্তি ব্যবহারোপযোগী করিতে সক্ষম হইবে।

আণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রাথমিক খরচ অনেক, যথা এক মিলিয়ন কিলো-ওআট বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি প্ল্যাণ্ট স্থাপন করিতে ২৫০ কোটি টাকা পড়িবে। প্রচলিত বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ হইতে ইহা বেশি, তবে পরবর্তী কালে ক্রমশঃ উৎপাদন-খরচ কমিয়া যাইবে এবং উৎপন্ন বিদ্যুৎ হইতে আয় হইবে।

উৎপাদনের জন্য প্রথমে ইউর্যানিয়ম ব্যবহৃত হইবে, পরে থোরিয়ম। ভারতে প্রায় ৩০,০০০ টন ইউর্যানিয়ম আছে, সম্প্রতি রাজস্থানেও ইহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

ভ্রম-সংশোধন: ফাল্গুন-সংখ্যার ১০১ পৃষ্ঠায় 'লণ্ডনের চিঠি'র দ্বিতীয় কলমে ৪র্থ পঙ্‌ক্তি পড়িবেন: 'প্রথম বক্তা মিসেস্ সরকার'।
এই-সংখ্যার ১২৯ পৃষ্ঠায় 'মনের মায়া' প্রবন্ধে ২য় পঙ্‌ক্তি প্রথম শব্দ পড়িবেন: 'দাওয়ায়'।

উদ্বোধন

শংকরাচার্য-কৃত বুদ্ধ-স্তুতি

ধরাবদ্ধপদ্মাসনস্থাঙ্ঘ্রি-যষ্টি-
নিয়ম্যানিলং ন্যস্তনাসাগ্রদৃষ্টিঃ।
য আস্তে কলৌ যোগিনাং চক্রবর্তী
স বুদ্ধঃ প্রবুদ্ধোঽস্তু নিশ্চিন্তবর্তী॥

[শ্রীশঙ্করাচার্যকৃত দশাবতার স্তোত্রান্তর্গত নবম শ্লোক]

যাঁহার পদযষ্টি বদ্ধ পদ্মাসনে অবস্থিত—যিনি পদ্মাসন বন্ধনপূর্বক ভূতলেই অবস্থান করিতেন, বায়ু সংযমপূর্বক প্রাণায়াম করিয়া, যিনি নাসাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অবস্থান করিতেন, যিনি কলিযুগে যোগিগণের শ্রেষ্ঠ—সেই বুদ্ধদেব আমাদের বাসনাশূন্য চিত্তমধ্যে সদা জাগ্রত থাকুন।

ধ্যানিশ্রেষ্ঠ শ্রীবুদ্ধের উদ্দেশ্যে রচিত জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ আচার্য শঙ্করের এই শ্লোকচন্দ্র ভারত-ভুবন আলোকিত করুক, চিত্তের মলিনতা ভাসাইয়া দিয়া বৈশাখী পূর্ণিমার শান্তি-সুধা আমাদের হৃদয় মন পরিপূর্ণ করুক।

কথাপ্রসঙ্গে

ভারাক্রান্তা ধরিত্রী

কি স্বদেশী, কি বিদেশী পুরাণে আমরা পড়ি—প্রথমে মানুষ ছিল না, তারপর মানুষে মানুষে পৃথিবী ভরিয়া গেল—আবার মহাপ্রলয়ের পর পৃথিবীতে আর জনমানব রহিল না। জলময় বিশ্বে প্রথম যখন একটু ডাঙ্গা দেখা দিল, সেই হইল আমাদের শত সাধের পৃথিবী—শত স্বপ্নের ধরিত্রী, যিনি আবার ধারণ করিবেন তৃণ গুল্ম বৃক্ষ লতা, ক্রমশঃ দেখা দিবে চলমান জীবন-স্পন্দন, সরীসৃপ-জীব-জন্তুর সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া অবশেষে বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের প্রধান নায়করূপে আবির্ভূত হইবে মানুষ। বিজ্ঞান-কল্পিত ক্রমবিকাশের পুরাণ-কাহিনীও বিশেষ কিছু অন্য প্রকার নয়।

সৃষ্টির প্রথমে যখন মানুষের সংখ্যা বেশি ছিল না, তখনও জীবন-সংগ্রাম ছিল প্রচণ্ড। মানুষের সংগ্রাম ছিল বহিঃপ্রকৃতির সহিত—প্রখর সূর্যতাপের সহিত, তুষার ঝড়বৃষ্টি প্লাবনের সহিত, মানুষের সংগ্রাম ছিল হিংস্র জন্তুর সহিত—সর্প ব্যাঘ্র বন্যহস্তীর সহিত, খাদ্যের জন্য, আশ্রয়ের জন্য, সঙ্গী নির্বাচনের জন্য মানুষের সহিত মানুষের সংগ্রামও সৃষ্টির সমবয়সী। মানবাবির্ভাবের প্রথম দিনেই না হউক নিশ্চয় দ্বিতীয় দিনে—শ্যামলা অথবা ধূসরা ধরিত্রী ভ্রাতৃরক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল। সে দিন হইতে আজ পর্যন্ত ইহার বিরাম নাই। দুইটি সন্তানের একটিকে গৃহে ফিরিতে দেখিয়া প্রথমা জননী যখন প্রশ্ন করিলেন, 'ভাইকে কোথায় ফেলিয়া আসিলি?' উত্তর আসিয়াছিল, 'আমি কি আমার ভাইএর রক্ষক?'

তারপর কতদিন গিয়াছে, কত রাত্রি গিয়াছে—মাস বর্ষ যুগ অতিক্রান্ত হইয়া পৃথিবীর বয়স বাড়িয়াছে, কিন্তু মানুষের সংখ্যা কখনও বাড়িয়াছে, কখনও কমিয়াছে। পৌরাণিক কথা বাদ দিয়াও বৈজ্ঞানিক গ্লেশিয়াল যুগের কথাই চিন্তা করা যাক্। সূর্যের চারিদিকে চক্রপথে ঘূর্ণায়মানা পৃথিবীতে পর্যায়ক্রমে আসে হিমযুগ ও তাপযুগ, এক এক যুগের পরিমাণ লক্ষ বর্ষেরও অধিক। যখন হিমযুগ শুরু হয়, তখন সমুদ্রের জল শীতল মেরুপ্রদেশে জমিতে থাকে—অন্যত্র দেখা দেয় ভূমিভাগ, তাপযুগে তুষার গলিতে থাকে, সমুদ্রের জল বাড়িতে থাকে, ভূমিভাগ জলে ডুবিয়া যায়, মেরুপ্রদেশ তুষার-মরুর আকার ধারণ করে। বিজ্ঞানের হিসাব: ৫০০ ফুট জল বাড়িলে পৃথিবীর স্থলভাগ অর্ধেক হইয়া যাইবে, ৫০০ ফুট কমিলে উহা দ্বিগুণ হইবে। আমাদের এই পরিচিত পৃথিবীর মানচিত্রও সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যাইবে!

এই পৃথিবী—নিত্যনবীনা, চিরযৌবনা পৃথিবী, যাহাকে লইয়া আমরা কত কাব্য রচনা করি, তাহাকে মাতৃ-মহিমায় মণ্ডিত করিয়া কত কল্পনা করি, সেই পৃথিবী—মহাপ্রকৃতির হাতে একটি অসহায় পুতুলের মতো,—বৈজ্ঞানিকের চক্ষে একটি লাটিমের মতো—যাহা বনবন করিয়া মহাশূন্যে অবশভাবে অনলসভাবে ঘুরিতেছে! প্রাকৃতিক নিয়মেই জাগে ভূমি-ভাগ, দেখা দেয় জীবকুল, প্রাকৃতিক নিয়মেই আসে মহাপ্লাবন—জলমগ্ন হয় মানুষ ও তাহার সভ্যতা, কোন্ শূন্যে মিলাইয়া যায় তাহার সকল স্বপ্ন! কে

জানে আবার কবে কোথায় জাগিয়া উঠিবে নূতন মানুষ, দেখা দিবে নূতন সভ্যতা ?

এই তো মানুষের অলিখিত ইতিহাস! যেটুকু তাহার লিখিত ইতিহাস সেটুকু ইহার তুলনায় কত তুচ্ছ—যেন বাল-বাচালতা। সেখানে আছে কত পুরাতনের মায়া, বর্তমানের চিন্তা, আবার আছে কত আশা-আকাঙ্ক্ষা, কখনও বা দেখা দেয় অনাগতের আতঙ্ক, ভবিষ্যৎ ভয়ের ছায়াপাত।

বর্তমানের পৃথিবীতে এই ছায়ার দৈর্ঘ্য বাড়িতেছে—তবে কি বিজ্ঞান-ভিত্তিক সভ্যতার সূর্য অস্তগামী ? এই ভয় জাগিয়াছে বৈজ্ঞানিকের মনে, তাঁহারা বলিতেছেন : ক্ষেপণাস্ত্রই বর্তমান সভ্যতার মৃত্যুর পরোয়ানা। এই ভয় জাগিয়াছে সমাজবাদীর মনে, তাঁহারা বলিতেছেন : যে অর্থ ক্ষেপণাস্ত্র-নির্মাণে ব্যবহৃত হয়, তাহা দ্বারা কোটি কোটি অভুক্তের অন্ন-সংস্থান সম্ভব। এই ভয় জাগিয়াছে বিশেষ-ভাবে রাষ্ট্রচালকদের মনে। তাঁহাদের মধ্যে একদলের মত : পৃথিবীর লোকসংখ্যা যে ভাবে বাড়িতেছে—শীঘ্রই প্রচণ্ড খাদ্যাভাব দেখা দিবে। পৃথিবীতে প্রতিদিন ১,৩০,০০০ নূতন শিশু জন্ম-গ্রহণ করিতেছে। এই ভাবে চলিতে থাকিলে এই শতাব্দীর শেষে পৃথিবীর লোকসংখ্যা বর্ত-মানের (২৭৩,৭০,০০,০০০) দ্বিগুণ হইবে।

একদিকে বিজ্ঞান রোগ জয় করিয়া মৃত্যুর হার কমাইতেছে, মানুষের জীবনাকাঙ্ক্ষা বাড়ি-তেছে, ইওরোপের নরনারীর গড় আয়ু ৭২ বৎসর, ভারতে ৩২ (গত ৩০ বৎসরে উহা ৯ বৎসর বাড়িয়াছে), অন্যদিকে সমুদ্রের তরঙ্গা-ঘাতে ও মরুভূমির বালুকণার আক্রমণে চাষের জমি কমিতেছে, এবং স্বাভাবিক নিয়মে জমির উর্বরতাও কমিতেছে ; এই জন্যই দেখা দিয়াছে খাদ্যাভাব, তাইতো উঠিয়াছে লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন। এ আজ ঘরোয়া প্রশ্ন নয়, শুধু জাতীয় সমস্যা নয়—সমগ্র মানবজাতির জীবন-মরণ সমস্যা!

একটি সমস্যা দেখা দিলে বিভিন্ন মানুষ নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী তাহার সমাধান করিতে চেষ্টা করিবে, ইহা স্বাভাবিক। বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন : ডাইক বাঁধিয়া সমুদ্রের ক্ষুধাকে বাধা দাও, বন বসাইয়া মরুভূমির অগ্রগতি বন্ধ কর, জমির উর্বরতা বাড়াইবার জন্য জমিতে রাসায়নিক সার দাও। শুধু তাই নয়—যদি পৃথিবীতে স্থানাভাব হয়—তবে চল রকেট সহায়ে পৃথিবীর আকর্ষণ জয় করিয়া গ্রহান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিতে। একদিন যখন মধ্য এশিয়ায় স্থান-সংকুলান হয় নাই, তখন তো এই ভাবেই আর্যেরা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই তো সেদিন ইওরোপীয়গণ একই কারণে আমেরিকা অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস স্থাপন করিয়াছে। সেদিনের তুলনায় আজ বিজ্ঞানের শক্তি কত বাড়িয়াছে। কেন আমরা পরাজয় স্বীকার করিব ? চল, আমরা গ্রহান্তরেই ছড়াইয়া পড়িব।

কিন্তু সেখানেই যে আমাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত আছে, তাহার কি প্রমাণ ? তাই আর একদল বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন : পৃথিবীতে খাদ্যের অভাব নাই, তবে খাদ্যের অভ্যাস পরিবর্তন করিতে হইবে। মানুষ চিরদিন শস্য-খাদ্য (cereal food) খাইত না। দুগ্ধ ঘৃত ?—সে তো মানুষ সেদিন শিখিয়াছে, কৃষি নির্ভর জীবনের সহিত গো-পালন শুরু হইয়াছে। সর্বত্র প্রায় শস্য ও দুগ্ধ জাতীয় খাদ্যের চাহিদা বাড়াতেই এই খাদ্যের অভাব। এই শতাব্দীর শেষেই বিজ্ঞান লেবরে-টরীতে উদ্ভিদ্ হইতে, জলজন্তু হইতে, এমনকি বাতাস হইতে সংশ্লেষিত (synthetic) ঘনীভূত খাদ্যসার (concentrated protein) প্রস্তুত

করিতে সমর্থ হইবে। তখন আর খাদ্যাভাবের সমস্যাই থাকিবে না।

আশা করা যাক্ বিজ্ঞানের সকল স্বপ্ন সফল হইবে। বৈজ্ঞানিকেরা এই শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সময় চাহিয়াছেন, অর্থাৎ চল্লিশ বৎসর। কিন্তু রাজনীতিকদের জীবন ক্ষণস্থায়ী; মাত্র পাঁচ বৎসর! তাড়াতাড়ি তাঁহাদের কীর্তির সাফল্য দেখাইয়া তাঁহারা পরবর্তী নির্বাচন জিতিতে চাহেন। তাই তাঁহারা তাঁহাদের বুদ্ধি অনুযায়ী লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী। তাঁহাদের ধারণা লোকসংখ্যা কমিলেই বাকী লোক কাজকর্মে লিপ্ত থাকিয়া সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে খাইয়া পরিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে বাঁচিয়া থাকিবে, তাঁহারাও নির্বিঘ্নে নেতৃত্ব করিবেন। কিন্তু তাঁহারা একটা কথা ভুলিয়া যান, 'Figures are not always facts'—সংখ্যা দ্বারাই সর্বদা ঘটনার পরিমাপ হয় না। অনুকূল পরিবেশে দুইজন লোক দশজনের কাজ করিতে পারে। ইহার বিপরীতও সত্য, প্রতিকূল পরিবেশে দশজন লোকও দুইজনের সমান হয় না। রাজনীতিকগণের দৃষ্টি সাধারণতঃ নিজেদের রাষ্ট্রের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র যদি লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করে—তবে একদিন কি তাহারা নিজেদের চাপেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে না? জাপান ও জার্মানি কি এই কারণেই মহাযুদ্ধের সূচনা করে নাই?

পূর্বকালে দুর্ভিক্ষ মহামারী দেশের লোকসংখ্যা দশমাংশে পরিণত করিত। মহামারী যাহা পারিত না, মাঝে মাঝে ব্যাপক যুদ্ধ আসিয়া তাহা করিত, পৃথিবীর লোকভার কমাইয়া দিত। যাহারা বাঁচিয়া থাকিত তাহারা আবার নূতন আশায় জীবন আরম্ভ করিত। কিন্তু ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির হাত হইতে তাহারাও রক্ষা পায় নাই।

বর্তমানে আমরা সকল মহামারককে (great killer) না পারিলেও মহামারীকে (epidemic) নিয়ন্ত্রিত করিয়াছি, কিন্তু যুদ্ধকে আমরা ভয় করিলেও যুদ্ধ-সম্ভাবনা দূর করিতে পারি নাই। কেন?

প্রায়ই আমরা বলি, পৃথিবীর মানুষ আজ কাছাকাছি আসিয়াছে। হয়তো শুধু দেশ-কালের ব্যবধান কমিয়াছে, কিন্তু মনের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখিতে পাই ব্যবধান বাড়িয়াছে।

পরস্পরের মনের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদের যে প্রাচীর উঠিয়াছে—তাহা উল্লঙ্ঘন করিবার কোন বিমান এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। জেট-প্লেনে করিয়া আমরা হয়তো ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবী ঘুরিয়া আসিব, রকেটে করিয়া একদিন হয়তো চন্দ্রলোকেও যাইব, মহাকাশ-যানে (space-ship) চড়িয়া মঙ্গলগ্রহেও হয়তো পদার্পণ করিব, কিন্তু আমার পাশের মানুষটি, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশটি যে ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতেছে। সেখানে পাসপোর্টের কাঁটাবেড়া কেন? আপন পর হইয়া যাইতেছে, বন্ধু শত্রুতে রূপান্তরিত হইতেছে। ইহাই কি বর্তমান সভ্যতার চরম বিফলতা নয়? এবং এই মনোগত দূরত্ব জয় করিবার সাধনা কি মহাকাশ জয় করা অপেক্ষা বড় সাধনা নয়?

যদি আমরা এই সাধনায় জয়লাভ করিতে পারি, তবেই মানবজাতির সম্মুখে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, নতুবা অতীতের পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী।

পারস্পরিক প্রীতির দৃষ্টি লইয়া, মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বে বিশ্বাসী হইয়া যদি এই সংকুচিত পৃথিবীতে নূতনতর নীতি ও নিয়ম রচিত হয়—তবেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব।

কয়েকজন মনীষী তাঁহাদের ভূয়োদর্শনের ফল এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন:

কোন কোন দেশে লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির চাপ বেশী হইলেও অনেক দেশ আছে যেখানে লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম। সকল দেশের সম্পদও এখন পর্যন্ত মানুষ সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাইতে পারে নাই। অতএব সমগ্র পৃথিবীকে অখণ্ড মানবজাতির বাসভূমি মনে করিলে এই বৈজ্ঞানিক যুগে এখনও নূতন করিয়া পৃথিবী-দোহন সম্ভব। বসুমতীর বসু এখনও তাঁহার অনাগত কনিষ্ঠ সন্তানদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে তাঁহার গোপন ভাণ্ডারে।

সমস্যার প্রতিবিধানকল্পে তাঁহাদের প্রস্তাব: জাতিসংঘের মাধ্যমে যদি অষ্ট্রেলিয়া, ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা ও কানাডায় প্রতি বৎসর কিছু কিছু অন্য দেশের লোকের প্রবেশ-ব্যবস্থা হয়, তবে অবশ্যই লোকসংখ্যাবৃদ্ধিজনিত চাপ চতুর্দিকে চারাইয়া যাইবে।

মনীষীদের দ্বিতীয় প্রস্তাব: যাঁহাদের দেশে অধিক ফসল উৎপন্ন হয় তাঁহারা কখনই তাহা নষ্ট করিতে পারিবেন না। জাতিসংঘের মাধ্যমে তাহা সেই দেশে পাঠাইতে হইবে—যেখানে ফসল হয় নাই। শুধু ফসল পাঠানো নয়, প্রয়োজন হইলে দরিদ্র দুর্বল দেশে উন্নত ধরনের বৈজ্ঞানিক কৃষির প্রবর্তন, যন্ত্রপাতি এবং বীজ প্রেরণও করিতে হইবে।

তাঁহাদের শেষ প্রস্তাব: রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, তৎপূর্বে প্রয়োজন অতি উচ্চস্তরের শিক্ষা। তদভাবে ইহার অপব্যবহারই হইবে, হিতে বিপরীত হইবে। উন্নততর মানুষের সংখ্যাই কমিতে থাকিবে, মনের দিক দিয়া নিম্নস্তরের মানুষেই দেশ ভরিয়া যাইবে। তাহাতে দেশের সমস্যা আর এক নূতন বিকট রূপ ধারণ করিবে, বর্তমান রাজনীতিকরা তাঁহাদের সৃষ্ট এই সমস্যার সমাধান করিতে জীবিত থাকিবেন না। যদি আমরা চাই—ভবিষ্যদ্‌-বংশীয়েরা উন্নততর মানুষ হইবে, তবে অবশ্যই আমাদেরই সেই উন্নতির সাধনা শুরু করিতে হইবে!

'লোক'সংখ্যা কমাইবার শ্রেষ্ঠ উপায় 'মানুষে'র সংখ্যা বাড়ানো। সমাজে মানুষের সংখ্যা যত বাড়িবে লোকসংখ্যা-বৃদ্ধিজনিত ভয় ও ভাবনা ততই কমিতে থাকিবে।

এ তো শুধু আজ নয়, চিরদিন পৃথিবীর এই সমস্যা। এই সমস্যা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সমস্যা, এই সমস্যা ভোগ ও ত্যাগের সমস্যা। দেবাসুর-সংগ্রামের প্রতীকে এই কথাই ব্যক্ত হইয়াছে প্রাচীন পুরাণে। সংসারে শান্ত সংযত মানুষ যত বাড়িতে থাকিবে, সমাজে রাষ্ট্রে সুখ ও শান্তি ততই অধিক পরিমাণে দেখা দিবে। দুর্বৃত্ত অহঙ্কারী লোকের সংখ্যা যত বাড়িবে, সংঘর্ষ মারামারি কাটাকাটি ও পারস্পরিক প্রবঞ্চনা ততই বাড়িতে থাকিবে।

উপসংহারে গীতার সেই কথা স্মরণ করি, 'দৈবী সম্পদ্‌ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।' দিব্যগুণ-সম্পন্ন মানুষ পৃথিবীর সুখশান্তির কারণ। অসুর-ভাবাপন্ন মানুষ অহঙ্কারে মত্ত ও ভোগাকাঙ্ক্ষায় স্বার্থপর, তাহারাই দুঃখ ও অশান্তির কারণ, তাহারাই পৃথিবীর ভার!

চলার পথে

'যাত্রী'

ভারতে বৈশাখ আসে নূতন বৎসরকে সঙ্গে নিয়ে। তাই তার জন্ম-লগ্নের প্রারম্ভেই বৈরাগ্যের বহ্নি-বীজ আমাদের সত্তার মাঝে অঙ্কুরিত করে সর্বস্বত্যাগের উদাত্ত আহ্বান। বৈশাখের ঐ তৃষ্ণাতপ্ত আবেদন শুধু এই নূতন বৎসরকেই সঙ্গে করে আনে, তা নয় যাদুর-ঝাঁপির সবকটি ঋতুর খেলাকেই একে একে আমাদের সুমুখে খুলে ধ'রে চমক লাগায়।

বৈশাখের ছোঁয়া-লাগা বৈরাগী-মন আমাদের অজ্ঞাতসারেই গেয়ে ওঠে, 'যা নড়ে তা দিক নেড়ে, যা যাবে তা যাক ঝরে, যা ভাঙা তাই ভাঙবে রে, যা রবে তাই থাক্ বাকি।' সেই সাথে ভারতের কবি-মনের প্রতি অণুতে অণুতে অনুরণন ওঠে, 'হে তাপস, তব শুষ্ক কঠোর রূপের গভীর রসে, মন আজি মোর উদাস বিভোর কোন্ সে ভাবের বশে।' ভারতের এই বহু বিচিত্র পিপাসা তাই মহাজীবন-বোধ থেকে পৃথক নয়।

এর সঙ্গে যদি তুলনা করি ওদেশের 'জানুআরি'তে বৎসরারম্ভের কথা, তাহ'লে তার ঐ তুহিন-শীতল নিস্তব্ধতার তুলনায় আমাদের এই 'চির ব্যথার বনে খেপা হাওয়ার ঢেউ' অনেক বেশী বিস্ময় সংগ্রহ করে। আমাদের কালবৈশাখীকে দেখে স্বতঃই মনে পড়ে, 'ঝড় উঠেছে তপ্ত হাওয়ায়, মনকে সুদূর শূন্যে ধাওয়ায়—অবগুণ্ঠন যায় যে উড়ে।' আর ওদেশের 'জানুয়ারি' সম্বন্ধে বলতে পারি,—'রিক্ত-পাতা শুষ্ক-শাখে, কোকিল তোমার কই গো ডাকে ?'—সেথায় সভা শূন্য, বাণী মৌন, কিন্তু ত্যাগের তৃষা নেই।

তাছাড়া, বৈশাখ ও 'জানুয়ারি'র মধ্যেই ধরা যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঐতিহ্যের বিভিন্নতাকেও। 'জানুয়ারি'র জড়ত্বের মাঝে ওদেশের জড়বাদী মন কেবলমাত্র বাস্তবকেই আঁকড়ে রাখে। জীবনোত্তর কোন কিছুকে ভাব-সাধনার ইঙ্গিতরূপে গ্রহণ না ক'রে কেবলমাত্র জীবনের ভোগ-সর্বস্বতাকে নিঃশেষে পান করতে চায়। জীবন-পারের ঐ মহাজীবনের ডাকে তাই তারা সাড়া দেয় না। কিন্তু আমাদের দুর্ধর্ষ বৈশাখের ভীষণ, ভয়াল রূপের মধ্যে সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের ত্রি সৌন্দর্য-বিধৃত রূপ আমাদিগকে নূতন এক ভাবে উদ্বেলিত ক'রে তোলে। তাই আসক্তির মাঝে নিরাসক্তির, অন্তর্জীবনের পাশে বহির্জীবনের এই কঠিন স্বাতন্ত্র্য-নিষ্ঠায় ভারতীয় দর্শনের একটা চিরন্তন তত্ত্ব-রূপ প্রকাশ পায়।

পুরাতনকে ঝরিয়ে ঐ যে গোপনে নূতনকেই আবার নিজের ধ্বংসের গৃহে সাদর আহ্বান তথা লালন পালন—তার মধ্যেই দেখি ভারতের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি রয়েছে। মৃত্যুর পাশে এই যে জীবন, বিরহের মাঝে এই যে মিলনের স্বাক্ষর—তাদের জড়িয়েই মানব-মনের অচল-শ্রী রূপ নিয়েছে বকুলের হাসিতে ও তার দূরবেধী সৌরভে। ধ্বংসের মাঝে হৃদয়ের এই যে বিরাট বিস্তৃতি—এই যে নবোন্মেষের কোরকটিকে সম্পূর্ণ আগলে রেখে জীবন-মৃত্যুর নৃত্য-লীলায় স্বাধিকার-ঘোষণা তা একমাত্র ভারতই কল্পনা করতে পারে। ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত বলেই ভারত বলতে পারে—'পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদাপরাজয়, তাহা না ডরাক তোমা। চূর্ণ হোক্ স্বার্থ

সাধ নাম, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।' এইখানেই ব্যক্তকে ছেড়ে অব্যক্তের ইশারা—গোচর পেরিয়ে গভীরের মধ্যে, ভূমিকে ছেড়ে ভূমার মাঝে ছন্দিত ও স্পন্দিত হয়ে ওঠে।

পুরাতন বৎসরের সমাধিও রচনা করে বৈশাখ। আবার অন্যদিকে তারই অনাসৃষ্টির মাঝে সে নূতনের ঘুম ভাঙায়। একদিকে যেমন নদী হ্রদ তড়াগকে শুকিয়ে শোষণ ক'রে, শীর্ণ ক'রে তোলে, অন্যদিকে তেমনি সেই জলকণা দিয়েই গড়ে তোলে মেঘের নীলাঞ্জন-সঞ্চারণ। বৈশাখ তার নিজের সৃষ্ট মরুভূ-মায়ার শুষ্ক-নীরস নৈরাশ্যের মাঝে মায়ের স্নেহমাখা মধু-ঢালা আহ্বান জাগিয়ে তোলে। তাই ত বৈশাখকে দেখি তপ্ত বনানীর পিপাসায় ক্ষীণ দগ্ধজীবন পৃথিবীর কথা স্মরণ ক'রে কালো মেঘকে ডাকতে, কদম ও কেতকী ফুটিয়ে নিরাভরণা ধরণীকে আবার পুষ্পিত করতে; —বৈশাখের এই রূপ সর্বত্যাগী সাধুর 'দীনবৎসল রূপ।' * * *

এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের জমাট-বাঁধা রূপ সত্যি এক আবির্ভাব। ভারতের এই একান্ত নিজস্ব রূপ কিন্তু মহাজীবন থেকে পৃথক্ নয়। মহাকালের বুকে মহাকালীর নৃত্য ছন্দের সবখানিই বৈশাখের ঐ শ্মশান-বুকে ধরা পড়েছে। নিজস্ব ধ্বংসের মাঝে ধরণীকে আবার শ্যামল ও সুন্দর করার প্রয়াসও তাই তার প্রাণশক্তির পরিচায়ক। এ যেন মহামায়ার এক মোহিনী রূপ—যে রূপে তিনি সন্তান প্রসব ক'রে, তাকে নিজ স্তন্যে লালন ক'রে আবার তারই রুধির পান করছেন, ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনার সমগ্র রূপটি ধরা পড়েছে এরই মাঝে। বিশ্বাত্মার জন্য ব্যক্তি-সাধনার এ এক অপূর্ব আত্মবলি।

বৈশাখ কবি। তাই সৃষ্টি-নৈপুণ্যের ঐ জীবনীভূত চাতুর্য তার নিজস্ব স্বকীয়তায় স্বাভাবিক। তাই সে পারে তার নির্মেঘ রুক্ষ উষর আকাশে কালবৈশাখীর নিরবদ্য বৈচিত্র্য ফোটাতে। রৌদ্র-স্নাত ধূলার ধূসর-রাঙিমায় তাই সে রচনা করে উন্মাদ-মেঘ-তাণ্ডবের চপলাচকিত নয়ন-বিমোহন রূপ। তাই সে পারে তপন-তাপে তাপিত এবং পথিমধ্যে তপ্ত-ধূলিপটলে-দগ্ধপ্রায় সাপকে তার কুটিল স্বভাব ছাড়িয়ে ময়ূরের পেখমের ছায়ায় টেনে আনতে।

শুধু বহিঃসৌন্দর্য নয়, বৈশাখের এই তাণ্ডবঘন বাহ্য রূপের চাবিকাঠিতে আমাদের আন্তর-লোকের রত্ন-গুহার সকল সম্ভারকেও উৎসারিত ক'রে দেয়। তার এই ভাবাভিব্যক্তির সার্বভৌম রূপের ছোঁয়ায় আমাদের অন্তরের পুঞ্জীভূত দৈন্য কোন্ এক যাদুকরের স্পর্শে কেমন এক প্রাণ-চাঞ্চল্যে উতরোল হয়ে ওঠে। তখনই আমাদের মন-আকাশের সকল দৈন্যের কুজ্ঝটিকা সরে গিয়ে অন্তরের সকল দেবভাব সুমুখে এসে দাঁড়ায়।

চল পথিক, বৈশাখের ঐ আধ্যাত্মিক সাধনার নিগূঢ় রহস্যকে হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে তুলে ধ'রে চিরপ্রশান্তির পাথেয় সঞ্চয় ক'রে চল এগিয়ে। এই যন্ত্রযুগের জীবনে বৈশাখের ঐ ঐতিহ্যবাহী প্রদীপে তোমার ভাব-প্রদীপ প্রজ্বলিত ক'রে নির্বিরোধ উপলব্ধির পথে এগিয়ে চল। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

পঞ্চবটী-মূলে

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

ছায়াঘন বীথিকায় পাষাণের পাদপীঠে আমি
তোমার আসনখানি হেরিতেছি,—অশ্রু আসে নামি
নয়নের প্রান্ত হ'তে গাঢ় বেদনায়। মায়ামেঘে
ঢেকে আছে জীবন-আকাশ। বিজলীর রশ্মি মেখে
মৌন বিভাবরী মোর উঠিছে শিহরি। চিত্তনদী
বহে বেগে, ছল-ছল সুরে তার শুনি নিরবধি
কি যেন অব্যক্ত বাণী! তুমি কবে পঞ্চবটী-মূলে
আপনারে করেছ প্রকাশ সেই স্মৃতি ওঠে দুলে
অন্তরে আমার।

প্রাণদীপ হেথা রেখে নমি তব
লীলাভূমি, স্মরণের পুণ্য ধূলি লয়ে। অভিনব
তত্ত্বকথা শুনায়েছ সদা ব্রহ্ম-পরাশক্তি সাথে
আনন্দ-বিহার করি, অবিজ্ঞেয়! নম্র প্রণিপাতে
পরাণের অর্ঘ্য মম দিতেছি অঞ্জলি। হে দেবতা!
সংসারের সর্বক্ষেত্রে কান পেতে শুনি তব কথা।

তোমার করুণা ধারা মানবের মর্ম-মরুভূমি
দিনে দিনে করেছে শ্যামল। প্রত্যক্ষ হবে কি তুমি
অচিন্ত্য স্বরূপ ত্যজি সেই রূপে ব্রাহ্মণের বেশে?
দেখা দাও হেথায় আবার। আদর্শ-বিহীন দেশে
মোরা প্রভু! অসহায় ধরিত্রীর রাত্রি দিন হ'তে
বিদায় নিয়েছে যেন আনন্দ-সঙ্গীত, দুঃখ-স্রোতে
ভেসে যায় হৃদয়-কুসুম আসন্ন প্রলয়-ক্ষণে,
মর্ত্যকায়া ধরি' এসো, মুক্তি মোর তব দরশনে
হবে জানি, কৃপা করো দয়াময়! পড়ে আসে বেলা,
শেষ ক'রে দাও মোর সংসারের সতরঞ্চ খেলা।

রাগাত্মিকা ভক্তি *

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ.

মাকে যেমন শিশু ডাকে, তেমনি ক'রে ডাকতে হবে। চাই সেই রকম সরলতা। তবেই তো তাঁকে পাবে। ভক্তের প্রাণ ভগবানের প্রিয়। তিনি যে ভক্তাধীন। ভক্তিডোরে তিনি বাঁধা পড়েন। এই প্রেম-ভক্তি, এগুলি হ'ল রাগাত্মিকা ভাব, কিন্তু এমন ক'টি মেলে? প্রেম-ভক্তি-প্রীতির উপর সংসার চাপিয়ে রেখেছি বোঝার মত, এর চাপে সেগুলি তলিয়ে যাচ্ছে। ঠাকুর বলতেন, ভগবান হলেন চুম্বক আর ভক্ত হচ্ছে ছুঁচ। ভগবান নিত্যই ভক্তকে আকর্ষণ করছেন, চুম্বকের ধর্মই হচ্ছে লোহাকে আকর্ষণ করা। বরিশালের অশ্বিনীবাবু ঠাকুরকে প্রশ্ন করছেন, কি ক'রে ভগবানকে পাওয়া যায়? উত্তরে ঠাকুর বলছেন, ছুঁচগুলো কাদা-মাখানো থাকলে চুম্বক তো তাদের টানবে না। আমাদের মনের ওপর যে ময়লার স্তূপ চাপানো রয়েছে, তা সরিয়ে দিলেই ঝকঝকে ছুঁচ দেখা দেবে, তখন সেটি চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হবে। মনের ময়লা দূর হ'লে মন মুখ এক ক'রে, শিশুর সরলতা নিয়ে তাঁকে যে ডাকে সে অবশ্যই তাঁকে পায়।

ধ্রুব সকাম ভক্তি দিয়ে প্রেম ও সরলতার রজ্জু দিয়ে ভগবানকে বাঁধলেন। ইনি চেয়েছিলেন ভগবানের কাছে রাজ্যসম্পদ, কিন্তু কাঁচ খুঁজতে খুঁজতে হীরে পেয়ে গেলেন, রাজ্যসম্পদের পরিবর্তে সাক্ষাৎ ভগবানকে পেয়ে গেলেন। তাঁর সরলতা, তাঁর ব্যাকুলতাই এনে দিল তাঁকে পরমাতৃপ্তি পরাশান্তি।

আবার শিশু জটিলের কথাও আমরা জানি, মায়ের কথায় সরল বিশ্বাসে জঙ্গলের পথে সে যখন মধুসূদন-দাদাকে আহ্বান করেছিল, তখন মধুসূদন-দাদার রূপ পরিগ্রহ ক'রে এসে এই সরল বিশ্বাসী বালক-ভক্তকে পথ দেখানো ছাড়া স্বয়ং ভগবানের গত্যন্তর ছিল না। তিনি ভক্তাধীন। ভক্তের বিশ্বাস আর সরলতাই তাঁকে মর্ত্যে নামিয়ে আনে। এটি কম কথা নয়। যে সরল বিশ্বাসে তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তিনি অভয় দিয়ে তাকে আশ্রয় দেন। ভাবের ঘরে চুরি এতে নেই। এটি খাঁটি ভালবাসা।

ছোট্ট একটি ছেলে খেলাঘরে পুতুলখেলায় মত্ত হয়ে আছে; কোন দিকেই খেয়াল নেই, সব মন তার ডুবে গিয়েছে সেই পুতুলের সংসারে। হঠাৎ কোথা থেকে শব্দ এল, 'খোকা, শীগগির খাবে এস।' শব্দটি কানে যাওয়া মাত্র কোথায় রইল পুতুল, আর তার সংসার! সব ফেলে সে ছুটে চ'লল সেই শব্দটি লক্ষ্য ক'রে। এই শব্দ যে তার চিরচেনা, বড় আপনার—তার মায়ের আহ্বান। এ কি সে উপেক্ষা করতে পারে? আমরাও ঐ ছেলের মত সংসারের খেলাঘরে নানান্ খেলা খেলছি, খেলায় মত্ত হয়ে আছি। কিন্তু মায়ের ডাক শুনে ঐ রকম সব ফেলে ছুটে যেতে পারা চাই। মা তো আমাদের চান, কিন্তু আমরা তাঁর দিকে যাচ্ছি কই? কৃপার বাতাস তো বইছেই, পাল তোলার পরিশ্রম তো আমাদের করতে হবে। এই পরিশ্রমই হচ্ছে ছুঁচের কাদা ধুয়ে মুছে সাফ্ করা। এটি সম্ভব বিশ্বাসে, সরলতায়, নির-

*১১.১১.৫৭ তারিখে আসানসোল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের ধর্মপ্রসঙ্গ—শ্রীআলোক চট্টোপাধ্যায় অনুলিখিত।

ভিমানতায় আর ব্যাকুলতায়। ব্যাকুলতা এলে বোঝা যায় অরুণোদয় হ'ল, তার পরই জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান দেখা দেবেন, ধরা দেবেন। এই তো আকর্ষণ।

প্রহ্লাদের ছিল আর এক ভাব, তাঁর অহেতুকী ভক্তি। কোন কারণ নেই, কোন ভিক্ষা নেই, ভালো মন্দ কোন আকাঙ্ক্ষা নেই, শুধু এক প্রার্থনা তোমায় চাই। তোমাকে ছাড়া আর সব আলুনী—এই ভাব। তুমি আনন্দের আধার, সৌন্দর্যের ঘনীভূত মূর্তি, শান্তির খনি, তোমার দর্শনেই আমার তৃপ্তি। এটি নিষ্কাম ভক্তি—ভক্তিরাজ্যের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। আমরা এটি জানি না, আমাদের ভক্তির পেছনে রয়েছে শত শত কামনা-বাসনা, বহু আকাঙ্ক্ষার রাশি। এতে কি তাঁকে পাওয়া যায়? যঁহা রাম তঁহা কাম নেহি, যঁহা কাম তঁহা নেহি রাম।

সংসারে নিঃস্বার্থ ভালবাসা বেশী নেই। এই নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া আমরা শিখিনি। আমাদের শুধু আদান-প্রদান। সংসারে সুখে থাকবার জন্য আমরা হয়েছি আর্ত ও অর্থার্থী ভক্ত। কিন্তু জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী বা প্রেমিক ভক্ত ক-জন?

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।

আর্ত ও অর্থার্থী ভক্ত বেশী, সংসারে সুখে থাকবে, ভোগ করবে—এই সবাই চায়। কিন্তু সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কচিৎ দু'একজন তাঁকে চায়। আবার এদের মধ্যে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান দু'একজন তাঁকে পায়। এরাই জ্ঞানী বা প্রেমিক ভক্ত। এদের লক্ষণ হচ্ছে সব বিলিয়ে দেওয়া, প্রতিদানে এরা কিছুই আশা করে না। শুধু চায়, শুদ্ধা ভক্তি। ঠাকুরের এই ভাব, তিনি বলছেন মাকে—মা, এই লও তোমার ভাল, এই লও তোমার মন্দ—আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। সব সমর্পণ করছেন তিনি মাকে, শুধু চাইছেন শুদ্ধা ভক্তি, এই ভাব ছিল প্রহ্লাদের।

গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের ভক্তিতে বাঁধা পড়লেন, তাদের অধীন হলেন। এদের হ'ল প্রেমাভক্তি, এই রাগাত্মিকা ভক্তি। এখানে ভক্ত চুম্বক, ভগবান ছুঁচ। তিনিই ছুটে যাচ্ছেন যমুনাপুলিনে রাধারাণীর দর্শন পাবেন ব'লে। কদম্বমূলে তিনি ছুঁচ। ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, গোপিনীদের আসার আশায়। এখানে তিনি হচ্ছেন ছুঁচ আর ভক্ত হচ্ছেন চুম্বক। ভক্তই আকর্ষণ করছেন ভগবানকে। প্রেমে তিনি ছুটে আসছেন। এই প্রেমা-ভক্তি বড়ই দুর্লভ। বহু সাধনার ধন এই প্রেমা-ভক্তি। তাই সাধক কবি গেয়েছেন:

আমি ভক্তি দিতে কাতর হই,
মুক্তি দিতে কাতর নই।

যিনি ত্রিকাল-মুক্ত, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ, তিনি কি সহজে বাঁধা পড়েন? তাঁকে বাঁধা যায় এই প্রেমা-ভক্তির ডোরে। এই আকর্ষণে তিনি আকৃষ্ট হন। ঠাকুর যেমন মায়ের চরণে সর্বস্ব সমর্পণ করেছিলেন, মা বই আর তিনি কিছুই জানতেন না। মীরা যেমন রাজরাণী হয়েও সব ত্যাগ ক'রে গিরিধারীলালকে আশ্রয় করেছিলেন—এই রকম চাই, এই ভাব হ'লে জাগতিক সুখ—ভোগের বস্তু আলুনী লাগে।

'ডাকার মত ডাক দেখি মন। কেমন শ্যামা থাকতে পারে।' তিনিই ছুটে আসবেন, যদি এই ডাক অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ থেকে উৎসারিত হয়। তিনি যে আপনার মা—পাতানো মা তো তিনি নন্। তাই ছেলের ডাক শুনে তিনি কি স্থির থাকতে পারেন? ছোট ছেলে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে যদি কোন বায়না করে, মা কি সেই আবদার না মিটিয়ে পারেন? ঐ কান্নাতেই ছুঁচের সব

কাদা ধুয়ে যায়, মুছে যায় মনের যতো কালিমা-গ্লানি। সাধুসঙ্গ বল, জপ পূজা প্রার্থনা তীর্থদর্শন যাই বল, সবই ঐ কাদাটুকু ধুয়ে ফেলবার জন্য। এই হ'ল উপায়। এটি শিশুর সরলতাতেই সম্ভব।

ঠাকুর বলতেন, এক ধনী জমিদার একবার এক দরিদ্র প্রজার কুটিরে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু প্রজা নিতান্তই অর্থহীন, তাই তার পক্ষে জমিদার প্রভুর সেবাযত্ন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব—এটি বুঝতে পেরে, জমিদার নিজেই নিজের বাড়ী থেকে অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন করবার সমস্ত উপচার প্রজার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন। কারণ তিনি তাঁর প্রজার সামর্থ্য বোঝেন। তাই নিজেই সব ভার নিলেন। ভগবান সত্যি এই রকমই করেন। চাই অনুরাগ, প্রীতি-মাখানো প্রেম। আমরা প্রভুর দীনাতিদীন সন্তান। আমাদের সাধ্য কি তাঁর যোগ্য আরাধনা করা, আমরা পারি শুধু প্রাণভরে ডাকতে—সরলতা নিয়ে, বিশ্বাস নিয়ে, আকুলতা নিয়ে। এই অনুরাগই আসল। এটিই তিনি চান। তখন তিনি সব ব্যবস্থা ক'রে দেন। আমরা তাঁর দিকে এক পা এগোলে তিনি আমাদের দিকে একশ' পা এগিয়ে আসেন।

তাঁর পূজা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

অগ্নির পূজা তাঁহারি তো পূজা
সেই তেজ সেই হুতাশন।
সলিল জীবন, জীবন-বন্ধু
ওতো সেই ভ্রব নারায়ণ।

তিনি তরু-ফুল-গুল্ম-লতায়,
তিনি শিলা, মাটি—নাইকো কোথায় ?
বহুরূপ তিনি বহুবল্লভ,
তিনি কি বটেন ? কি বা নন ?

কতটুকু মোর জ্ঞানের পরিধি ?
ছোট ক'রে তাঁরে করি ধ্যান।
সাগর-শুক্তি কি ক'রে বুঝিবে
নীলাম্বুধির পরিমাণ ?

রূপ নাই তাঁর—মিথ্যা তো নয়,
অচেনা তবুও সবচেয়ে চেনা
পরমাত্মীয় প্রিয়জন।

সাধু

(কবীর-চয়ন)

শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

ধরণী কেবল সহিছে খনন
তরুই ছেদন সয়,
কু-বচন শুধু সহে সাধুগণ—
অন্যেরা করে ভয়!
ইক্ষু যেমন পীড়নেও তার
সুধারস করে দান,
সন্ত তেমন শত্রুজনেরে
আনন্দ দিয়ে যান।
মায়ার আগুনে নর-পতঙ্গ
কেবল পুড়িয়া মরে,
তাহাদের মাঝে সাধুসজ্জন
মায়া হ'তে যান ত'রে।
না চাহিলে তবু ভাস্কর করে
সবারে আলোক দান,
সাধুরা তেমন অযাচিতরূপে
করে জন-কল্যাণ।

চরিত্রোন্নতির সাধনা

অধ্যাপক রেজাউল করীম

রোমান্টিক যুগের বিখ্যাত কবি কোলরিজ একটি সুন্দর কথা বলেছেন: If a man is not rising upward to be an angel, depend upon it, he is sinking downwards to be a devil. He cannot stop at a beast. The most savage of men are not beasts, they are worse, a great deal worse —মানুষ যদি দেবতা হবার চেষ্টা না করে, তবে তাকে শয়তান হয়ে যেতে হবে। পশুত্বের স্তরে থামা চলে না। বর্বরতম মানুষ পশু নয়, তার চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট।

কবির এই উক্তিটি খুব ঠিক। মানুষকে সব সময় প্রতি কাজে বড় হওয়ার সাধনা ক'রে যেতে হবে। আজ মানুষ যে অবস্থায় আছে, আগামীকাল যেন তার থেকেও বড় হতে পারে। সেইভাবে তাকে চেষ্টা করতে হবে—তাকে প্রতিনিয়ত মহৎ, উদার ও পবিত্র হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। এরই নাম মনুষ্যত্ব। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে মহৎ লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য নিযুক্ত করতে হবে। এমনভাবে পৃথিবীতে চলতে হবে যেন আমাদের জীবন সতত উন্নতির পথে, উৎকর্ষের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। তুমি আজ যা আছ, কাল যদি তার চেয়ে বড় হ'তে না পার, তবে তুমি নীচের দিকে পড়তে থাকবে, এবং নীচের দিকে পড়তে পড়তে তুমি শুধু পশুত্বের পর্যায়ে এসে থেমে যাবে না—সেখানে কোন মানুষই দীর্ঘকাল থাকতে পারে না, পশুত্বের পর্যায় থেকে মানুষ একেবারে শয়তানের পর্যায়ে গিয়ে ক্ষান্ত হবে। সবচেয়ে বর্বর মানুষ পশু নয়,—শয়তান।

আজকের যুগে কবির উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। পাশ্চাত্য সভ্যতা মানুষকে ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে। মানুষ যদি তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে পৃথিবীর সুখভোগকে চরমপ্রাপ্তি বলে মনে করে, সে যদি পার্থিব সুখের আশায় মরীচিকার পশ্চাতে অবিরত ছুটে চলে, তবে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এই সভ্যতা মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করতে পারবে না। এ-যুগের মানুষ যদি পাশ্চাত্য সভ্যতার পথে চলে, যদি সে Positive Virtue—সক্রিয় গুণাবলীর উপর জোর না দিয়ে কেবল Negative Virtue—নিষ্ক্রিয় গুণাবলীর উপর গুরুত্ব দিতে থাকে, তবে তার শয়তান (devil) হতে বেশী বিলম্ব হবে না। এই জড়বাদী সভ্যতার সামনে মহামানুষগণ তুলে ধরেছেন মহত্তর জীবন-দর্শন, মানুষের কানে শুনিয়েছেন নূতনতর আশার বাণী। তাঁরা আমাদের নমস্য। ভারতে এমন বহু মহামানবের আবির্ভাব হয়েছে। মানুষ কেমন ক'রে দেবত্বে উপনীত হ'তে পারে সেই আদর্শ তাঁরা স্থাপন করেছেন। তাঁদের সেই আদর্শের প্রতি মানুষ যতই আকৃষ্ট হবে, সেগুলিকে যতই অনুসরণ করবে, ততই তাদের চরিত্রের উন্নতি হতে থাকবে।

একটা কথা মনে রাখা দরকার যে দেবত্বে উপনীত হবার সাধনা কেবল দু'একদিনের ব্যাপার নয়। এ সাধনা জীবনব্যাপী ক'রে যেতে হবে, যেন একটা মুহূর্তও বৃথা নষ্ট না হয়। আবেগের মুহূর্তে একটা ভাল কাজ

করলাম, আর অমনি আমার চরম মোক্ষলাভ হ'ল,—এ ধারণা অনেকের আছে। হয়তো কোন কোন লোকের জীবনে এরূপ ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু ব্যাপকভাবে মানব-সমাজকে উন্নত করতে হ'লে এই ধরনের দৈব ঘটনার উপর নির্ভর করলে চলবে না। বড় বড় কাজ ক-টা করলাম, মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত কয়েকটা স্থাপন করলাম, শুধু এইগুলির উপর কোন লোকের সর্বাঙ্গীণ শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে না। দৈনন্দিন জীবনে ছোট ছোট কাজে মানুষ কতটা মহত্ত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছে তারও হিসাব দিতে হবে। মানুষের আসল পরীক্ষা তো ছোট ছোট কাজেই হয়ে থাকে। এমন বহু লোককে দেখেছি যাঁরা অতিথি-অভ্যাগতের প্রতি খুব সদয় ব্যবহার করেন, কিন্তু বাটীর চাকর-বাকরদের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করতে তাঁদের বিবেকে এতটুকু বাধে না। প্রশ্ন এই, তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের বিচার ক'রব কোন্ কাজ দেখে? সামান্য ব্যাপারে যদি কেউ মহত্ত্বের পরিচয় দিতে না পারেন, তবে তাঁদের জীবনের বহু সাধনার মূল্য কমে যাবে।

সাধারণ মানুষ সংসার-জীবনের চাপে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাদের কেউ কেউ নিজেদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য নানাপ্রকার অন্যায় আচরণও করে। আবার কেউ কেউ—অবশ্য তাদের সংখ্যা কম—তা করে না। তারা একটা আদর্শ অনুসরণ ক'রে চলে। তাতে স্বার্থ রক্ষা হয়, অথচ অন্যায় আচরণকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। যারা সদ্‌ভাবে জীবন-যাপন করে, সংসারের পিচ্ছিল পথে চলাফেরা করে, তারা হয়তো মনে করে যে যখন ভাল হয়েই চলি, তখন আর বেশি কিছু করবার নেই। তারা যথাসময়ে পূজা-অর্চনা করে, দরিদ্রকে সাধ্যমত দান করে, পরচর্চা করে না, সহজে কারও ক্ষতি করে না। সংসার-জীবনে আর কতটুকু ক'রব? —এই হ'ল তাদের ধারণা। কিন্তু প্রকৃত আদর্শ এই যে, ধর্মের পথে যাদের যাত্রা তাদের এখানে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিলে চলবে না। আরও অগ্রসর হতে হবে। আরও বড় হবার জন্য সাধনা করতে হবে। কোলরিজের উপরি-উক্ত কথাগুলি এই শ্রেণীর মানুষকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে। সাধারণ মানুষ যদি নিত্য প্রয়োজনীয় কর্তব্যগুলি পালন ক'রে ভেবে থাকে যে তাদের আর কিছু করবার নেই, তবে তা নিতান্ত ভুল। সাধারণ কর্তব্যগুলি অনেক সময় অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। ইচ্ছা থাক্ আর না থাক্, অভ্যাসবশে মানুষ অনেক সময় ভাল কাজ করে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে প্রত্যেক ভাল কাজের গোড়াতে থাকা চাই ইচ্ছাশক্তি ও সচেতন উৎসাহ। আমি ভাল কাজ করছি, ভাল কাজ করতে উদ্যত, এমন একটা সচেতন বুদ্ধি না থাকলে ভাল কাজটা অভ্যাসে পরিণত হয়। জীবনে অভ্যাসগত ধর্মকর্মের কোন প্রয়োজন নেই, একথা ব'লব না; কিন্তু সেই সঙ্গে প্রয়োজন—বুদ্ধি ও চেতনা-উদ্ভূত ধর্মের। সুতরাং অভ্যাসগত বা স্বভাবগত ধর্মের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকলে চলবে না,—সজ্ঞান ও সচেতন বুদ্ধি-প্রণোদিত ধর্মই মানুষকে উত্তরোত্তর ঊর্ধ্বপথে নিয়ে যায়। দেখা গেছে যে অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যে পড়ে অনেকে ধর্মকর্ম ও অন্যান্য সৎকার্য করে। আবার অবস্থার বিপাকে পড়ে তারাই অধর্ম এবং অপকর্ম করতেও কুণ্ঠিত হয় না, বা অনেক সময় করতে বাধ্য হয়। সেইজন্য সজ্ঞান ও সচেতন ধর্মবোধের একান্ত প্রয়োজন। বহু মানুষ পূজা-অর্চনা ক'র, আবার সেই সব মানুষই পাপকার্য করতে ছাড়ে না। এর প্রধান কারণ—ধর্মকর্ম বা সৎকার্যটি তাদের নিকট এত অভ্যাসগত

হয়ে পড়ে যে অন্যায় কাজ করবার সময় তারা ভাবতেই পারে না যে তারা কোন অন্যায় কাজ করছে। সচেতন ধর্মবোধ এই সব অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারে। সেইজন্য মানুষকে সৎ হবার জন্য সজ্ঞান ও সচেতনভাবে অহরহ সাধনা করতে হবে। মহৎ কাজের প্রেরণা আসা চাই শুভ বুদ্ধি থেকে, মুক্ত মন থেকে। তবেই মানুষ পারবে অহবহ চবিত্রোন্নতির সাধনা করতে। পূজা-অর্চনার দরকার নেই একথা ব'লব না—বরং ব'লব ওসবের খুবই দরকার আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে আমার চরিত্রোন্নতির সাধনার পথে ঐগুলিই সব নয়, আমাকে আরও এগিয়ে যেতে হবে—সারাজীবন ধবে সাধনা ক'রে যেতে হবে—তবেই আমি দেবত্বে উন্নীত হতে পারব।

মানুষের জীবন বহু জটিলতায় ভরা। সংসারে বহু ভাল লোক আছে, তেমনি আছে বহু মন্দ লোক। ভাল লোকের যেমন শ্রেণীভেদ আছে, তেমনি মন্দ লোকেরও শ্রেণীভেদ আছে। অবিমিশ্র ভাল লোক, অথবা অবিমিশ্র মন্দ লোক নেই বললেই চলে। খুব কম লোক আছেন যাঁরা সকল দিক দিয়ে এবং সকল প্রকার মানদণ্ড অনুসারে ভাল ও সৎ। বেশীর ভাগ লোকের মধ্যে কোন না কোন একটা সদ্‌গুণ আছে, কারও মধ্যে দু'একটা সদ্‌গুণের পরিমাণ বেশী ক'রে আছে। কাবও মধ্যে দু'একটা দোষ বেশী ক'রে আছে। একজনের যেগুণ আছে। অপর জনের হয়তো সেগুণ নেই। বরং এই শেযোক্ত লোকের মধ্যে দোষের পরিমাণই বেশী ক'রে আছে। কিন্তু তার এই সব দোষ-ত্রুটির ক্ষতিপূরণ হয় অন্য একটা মহৎগুণের দ্বারা। আমরা দেখি হয়তো কোন ব্যক্তি সত্য কথা বলে, কিন্তু সে মিষ্টভাষী নয়। যে পরোপকার করে, সে হয়তো সত্যবাদী নয়। যে নারীজাতিকে মায়ের মতো ভক্তিশ্রদ্ধা করে, সে হয়তো অপরের টাকা পয়সার ব্যাপারে মোটেই সৎ নয়। এমন অনেক লোক দেখেছি যিনি বিনয়ী মিষ্টভাষী, কিন্তু পরোপকার করতে চান না, এমন কি সত্য কথা বলতেও তিনি কুণ্ঠিত। এইভাবে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ও পরস্পর-বিরোধী দোষগুণের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। আবার অপর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এমন বহু দুষ্ট প্রকৃতির লোক আছে, যাদেব মধ্যে দু'একটা সদ্‌গুণের চরম বিকাশ হয়েছে। কপট মানুষকে দেখছি পবোপকাব করতে। দোষগুণের সমষ্টিতে গড়া এই যে মানুষ তাকে সজ্ঞানে ও সচেতনভাবে অহরহ সাধন ক'রে যেতে হবে। দৈববল অপেক্ষা চরিত্রবল মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করতে অধিকতর সাহায্য করে।

যে সব দোষগুণ দিয়ে মানুষের চরিত্র গঠিত সেগুলি নানাভাবে ও নানাপথে এসে জীবনকে প্রভাবিত করে। আমরা সদ্‌গুণের কিছুটা পাই উত্তরাধিকার-সূত্রে, কিছুটা পাই জ্ঞান চর্চা ক'রে, কিছুটা শিখি শিক্ষক বা গুরুর নিকট, আর কিছুটা শিখি পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে। এই ভাবেই বিবিধ উপাদান দিয়ে মানুষের চরিত্র গঠিত হয়। কিন্তু তবু সকল প্রকাব সদ্‌গুণ পাওয়া যায় না। উপরি-উক্ত পথ দিয়ে যে সব মহৎ গুণ আমরা লাভ কবি, তা চরিত্র গঠনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। যদি আমরা মনে করি যে ঐগুলিই যথেষ্ট এবং ঐগুলিতে থেমে গেলেই চলবে, তবে আমাদের চরিত্রেব ক্রমবিকাশ হবে না। আরও বড় হবার জন্য, যদি আরও অধিক সজ্ঞান সাধনা না করি, তবে হয়তো কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে জীবাণুর মত পাপপ্রবৃত্তি মনটাকে আক্রমণ ক'রে বসবে। শরীরের শ্বেতকণিকাগুলি (Luco-

cytes) অহরহ বহিরাগত জীবাণুর সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে চলে বলেই মানুষ সহজে ব্যাধিগ্রস্ত হয় না। সেইরূপ মানুষের সহজ স্বাভাবিক বোধ-শক্তিকেও পরিবেশের মন্দ প্রভাবের বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম ক'রে যেতে হবে।

Positive বা সক্রিয় সচেতন সদ্‌গুণের অভাব ঘটলে মানুষের দেহমন পাপের সংক্রামক আক্রমণ সহ্য করতে পারবে না। বস্তুতঃ মানুষকে প্রলুব্ধ করবার জন্য জীবাণুর মত পাপের উপাদান-সমূহ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখন কোন্ সময় কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে কোন্ অসদ্‌ভাব পুণ্যের বেশে কখন তার সামনে প্রলোভন দেখাবে, সে কথা কি কেউ বুঝতে পারে? সুতরাং সব সময় হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে হবে। সজ্ঞানে ভাল হবার সাধনা করলে তবেই মানুষ উত্তরোত্তর দেবত্বের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সজ্ঞানে সৎকর্মের প্রচেষ্টা একান্ত প্রয়োজন। এরূপ প্রচেষ্টার অভাবে অনেক ভাল লোক একেবারে মন্দ হয়ে যায়। দেখা গেছে কত ভাল লোক হঠাৎ বিষয় আশয় লাভ ক'রে অথবা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে দুর্দান্ত হয়ে পড়েছে। কেন তা হয়? কারণ এই যে, তাদের মধ্যে যে সব ভাল গুণ ছিল সেগুলির আর বিকাশের চেষ্টা করা হয়নি। তাদের ভাল গুণ সজ্ঞান প্রচেষ্টার দ্বারা বিকশিত হয়নি, অসতর্ক মুহূর্তে প্রলোভনের সম্মুখে তারা তাল সামলাতে পারেনি। তারা আরও ভাল হবার সাধনা ক'রত না বলেই মন্দের প্রভাব এড়াতে পারেনি এবং মন্দের প্রভাবে চরিত্রও ঠিক রাখতে পারে নি। আবার অন্যদিকে দেখা গেছে যে মন্দ লোকও হঠাৎ ভাল হয়ে গেছে। যারা জীবন ধরে মন্দ কাজ ক'রে যাচ্ছিল, অবশেষে এমন এক স্থানে উপনীত হ'ল যে তখন তাদের মনে এল অতীতের দুষ্কৃতির জন্য অনুশোচনা। এই অনুশোচনা সচেতনতার লক্ষণ। মন্দলোক একবার ভালর দিকে অগ্রসর হ'লে সচরাচর মন্দের দিকে প্রত্যাবর্তন করে না। তাদের জীবনে আসে বিপ্লব ও পরিবর্তন। এইভাবে নানা পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্যে চলতে চলতে তাদের জীবনের নীতিরও আমূল সংশোধন হয়ে যায়। তাদের পক্ষে তখন দেবত্বের পথে পাড়ি দেওয়া সহজ হয়ে পড়ে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবে জগাইমাধাই-এর পরিবর্তনের কথা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হজরত ওমরের পরিবর্তন, মেরী ম্যাগডালেনের সংশোধন, এই ধরনের আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের জীবন থেকে আমরা অনেক বিষয় শিক্ষালাভ করিতে পারি। বিশ্বামিত্র দেবত্বে উন্নীত হবার জন্য কতবার কত সাধনা করেছিলেন। প্রলোভনের পর প্রলোভন এসে তাঁর সাধনাকে ব্যর্থ করেছে, কিন্তু তিনি সংকল্প ও সাধনা ছেড়ে দিলেন না। অবিরত সাধনা ক'রে যেতে লাগলেন, এবং অবশেষে দেবত্বে উন্নীত হতে পারলেন। সুতরাং অবিরত সাধনা করতে পারলে বড় হওয়া যে যায়—এ শিক্ষা আমরা তাঁর জীবন থেকে লাভ করি।

মানবচরিত্রে বিশেষজ্ঞ সার্থক শিল্পিগণ পূর্ণ মানব অথবা নিরেট শয়তানের চিত্র আঁকেন না। তাঁদের অঙ্কিত চিত্রগুলি ভাল-মন্দের মিশ্রণ। এইটাই স্বাভাবিক। বিচিত্র এ মানব-জীবন। বিচিত্র পরীক্ষা ও নিরীক্ষার মধ্যে মানব-জীবনের অগ্রগতি হয়ে যাচ্ছে। শিল্পী ছবি আঁকেন ক্রমাগত এগিয়ে-যাওয়া মানুষের। তাঁদের গ্রন্থ পাঠ করলে আমরা বুঝতে পারি যে মানুষকে ক্রমাগত সাধনা ক'রে যেতে হবে। কবি ব্রাউনিং তাঁর 'Rabbi Ben Ezra' কবিতায় মানুষের ক্রমবিকাশের একটি মহৎ আদর্শ ফুটিয়ে তুলেছেন। লোভ, প্রলোভন,

হতাশা, ব্যর্থতা ও পরাজয় জীবনে বহু আসবে। তবু মানুষকে এ সকলের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হবে। হয়তো এ জীবনে সফলতা লাভ ক'রব না। কিন্তু এ জীবনই তো সব নয়, এ জীবন পরজীবনের একটা অংশ মাত্র। কি হতে পেরেছি এটা বড় কথা নয়। আমি কি হতে চেয়েছি, কতবার সাধনা করেছি, কত উচ্চ আশা পোষণ করেছি, এইটাই বড় কথা। জীবনে সফল হই বা না হই, তাতে কিছু আসে যায় না, সাফল্যের জন্য সাধনা করেছি ও বরাবর ক'রে যাচ্ছি, এইটাই মানুষের জীবনের সার কথা। মূল্যের দিক দিয়ে কোলরিজের কথার সঙ্গে ব্রাউনিং-এর আদর্শের বিশেষ পার্থক্য নেই।

প্রশ্ন এই—আমরা কি এই মরজগতের জড়-বস্তুর শত বন্ধনের মধ্যে সাধনা ক'রে দেবত্বে উন্নীত হতে পারব? ব্রাউনিং বলেন, সাধনা করলে সবটা না পেতে পারি, কিন্তু বর্তমান অবস্থা থেকে একটু উচ্চতর অবস্থায় উন্নীত হতে পারব, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই মরজগতে আমরা হয়তো কোনদিন দেবত্ব পাব না, কিন্তু তবু সাধনা করতে হবে। আজ আমি যা আছি, সাধনা ক'রে গেলে কাল তার চেয়ে নিশ্চয় কিছুটা উন্নতি লাভ করতে পারব, এ বিশ্বাস থাকা চাই। সাধনা করলে কিছুটা অগ্রসর হতে পারব, কিন্তু সাধনা না করলে প্রথমে পশুত্বের এবং পরে শয়তানের স্তরে নেমে যাব। সেইজন্য আমাদের অবিরত সজ্ঞানে সাধনা ক'রে যেতে হবে।

সাধারণ লোক কি উপায়ে মহৎ জীবন লাভ পারে সে বিষয়ে দু'একটা কথা ব'লব। প্রধান উপায় হচ্ছে—'সাধু-সঙ্গ ও সৎসঙ্গ'। যাঁরা সংসার ত্যাগ ক'রে কঠোর কৃচ্ছ সাধনার দ্বারা প্রচলিত অর্থে সাধু হয়েছেন, এখানে তাঁদের কথা বলছি না, বরং যাঁরা সংসারে বাস ক'রে সংসারের সমস্ত প্রকার প্রলোভনের ঊর্ধ্বে থেকে মহৎ ভাবে জীবন যাপন করেন, তাঁদের সঙ্গ অপরের জীবনের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। আমরা সাধারণ লোক, আমরা আমাদের মতই সাধারণ লোকের সঙ্গে নিত্য মেলামেশা করি। সাধুসঙ্গ বা সৎসঙ্গ ততটা করি না। সাধুসঙ্গে বহু লোকের জীবনের মোড় ফিরে গেছে। সাধুসঙ্গের মতো মহৎ ব্যক্তির জীবনী পাঠ করাও একান্ত দরকার। তাঁদের প্রদত্ত উপদেশাবলীরও একটা মূল্য আছে। কিন্তু জীবনী-পাঠ আর উপদেশ পাঠ এক বস্তু নয়। একজন সাধারণ মানুষ কেমন ক'রে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে নানা অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে বড় হয়েছেন, সে বিবরণ কোন উপন্যাস থেকে কম চাঞ্চল্যকর নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, কেশবচন্দ্র, গান্ধীজী প্রভৃতি মহামানবের জীবনী নিজেই এক একটা কাব্য। এই জীবনীরূপ কাব্য মানুষের মনের উপর অপার প্রভাব বিস্তার করতে পারে। মহাপুরুষদের জীবনী থেকে আমরা নানা দিক দিয়ে উপকৃত হতে পারি। তাঁদের জীবনী আমাদের সম্মুখে একটা নূতন জগতের দ্বার খুলে দেয়। সৎচিন্তা, সদ্‌গ্রন্থ-পাঠ, এ সবের দ্বারাও মানুষ মহৎ আদর্শ লাভ করে।

পবিত্রভাবে জীবন-যাপনের পশ্চাতে আছে একটা মহৎ যুক্তি। সে যুক্তিটা এই যে, পবিত্র জীবন স্থায়ী বস্তু দান করে। ভ্রান্ত ও অসৎ পন্থায় কখনও কোন স্থায়ী কাজ হয় না এবং স্থায়িভাবে কোন সুফলও পাওয়া যায় না, এই সত্যকে নানাদিক দিয়ে উপলব্ধি করতে পারলে এবং এই যুক্তি অনুসারে চললে মানুষ সজ্ঞান ও সচেতনভাবে সৎপথের দিকে চলতে উৎসাহ বোধ করবে। ব্যক্তিকে বাদ দিলে সমাজ চলে না,

রাষ্ট্রও চলে না। জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছেন, 'The worth of a state is the worth of the individual composing it.' ব্যক্তি-চরিত্রের কার্যকলাপের উপর সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের উন্নতি বহুলাংশে নির্ভর করে। সুতরাং সর্বদাই ব্যক্তিকে সতর্ক হয়ে চলতে হবে। জীবনে সরল আচরণ, মৃদু স্বভাব, নিঃস্বার্থ কার্য, মানুষের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন—এই সব মহৎ গুণ জীবনকে পবিত্র করে, সমাজকে ধারণ করে এবং রাষ্ট্রকে রক্ষা করে। স্বার্থপরতা বর্জন করা, হিংসা-বিদ্বেষ দূর করা, প্রতিপদে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান সঞ্চয় করা, অপরকে সাধ্যমত এই সব দিয়ে সাহায্য করা—এবংবিধ উপায়ে আমরা দেবত্ব লাভ করতে পারব, এবং এই পন্থায় আমরা মরজগৎকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করতে পারব। মস্ত বড় পণ্ডিত হওয়া, বৈজ্ঞানিক বা লেখক হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু একটু চেষ্টা করলে ক্ষমাসুন্দর অন্তরে মানুষের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে মহৎ জীবন লাভ করা সম্ভব হতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই মহৎ জীবন লাভের সাধনা ক'রে যেতে হবে।

শ্রেষ্ঠ ত্যাগী

শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ

গভীর অরণ্য মাঝে সাধু মহাজন
শান্ত সমাহিতচিতে ভজনে মগন,
হেন কালে রাজা আসি প্রণমিয়া পায়
কহে—প্রভু, শ্রেষ্ঠ ত্যাগী তুমি এ ধরায়।

সাধু কন, সত্য নহে তোমার বচন,
মোর চেয়ে বড ত্যাগী তুমি তো রাজন্।
লাজে নতশির নৃপ কহে জোড়পাণি,
কোন অপরাধে, প্রভু, পরিহাস-বাণী ?

শান্ত স্বরে সাধু কন, নহে পরিহাস,
বিচার করিলে মনে, হইবে বিশ্বাস।
আমি তো পরম রত্ন ভগবানে নিয়া,
ভোগ সুখ তুচ্ছ কাচ—দিয়েছি ফেলিয়া।

আর তুমি,—কাচখণ্ড করিয়া গ্রহণ,
হেলায় সে সাররত্ন দেছ বিসর্জন।
এখন ভাবিয়া রাজা দেখ একবার—
কার ত্যাগ শ্রেষ্ঠ হ'ল—মোর, না তোমার ?

মহাপ্রভু-চরণে রঘুনাথ

শ্রীমতী সুধা সেন

আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে ভিক্ষাপাত্র হাতে সিদ্ধার্থও একদিন চলিয়াছিলেন—ভারতের দ্বারে দ্বারে।

আজ চলিয়াছেন দুর্গম পথের শত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া—চৈতন্য-প্রেমে-পাগল রাজপুত্র-সম রঘুনাথ। 'ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য, অপ্সরাসম স্ত্রী' কিছুই তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না—বিশ দিনের পথ মাত্র বারো দিনে অতিক্রম করিয়া নীলাচলে প্রভুর পায়ে আসিয়া লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন রঘুনাথ। অনশনক্লিষ্ট, পথকষ্টে শীর্ণ—কিন্তু প্রভুদর্শনে আনন্দোদ্ভাসিত এই তরুণের মুখের দিকে চাহিয়া স্নেহে করুণায় অভিভূত হইয়া গেলেন প্রভু। তাঁহারই জন্য গৃহত্যাগী রঘুনাথকে এইবার প্রভু বক্ষে তুলিয়া লইলেন। স্বরূপকে ডাকিয়া বলিলেন—স্বরূপ, আজ হইতে আমার 'তিন রঘুনাথ'। ইহাকে আমি তোমার হাতে সমর্পণ করিলাম। পরম স্নেহে ও আগ্রহে স্বরূপ গ্রহণ করিলেন রঘুনাথকে। প্রভুর অকথিত বাণীর অর্থ বুঝিলেন স্বরূপ—রঘুনাথ গৌরের, রঘুনাথের গৌর। কিন্তু দাস রঘুনাথ 'স্বরূপের রঘু' বলিয়াই পরিচিত হইলেন।

প্রভুর আদেশে গোবিন্দ রঘুনাথকে স্নান করাইয়া উত্তম প্রসাদ গ্রহণ করাইলেন। মাত্র ছয় দিন ঐ প্রসাদ গ্রহণ করিলেন রঘুনাথ, সপ্তম দিবসেই গিয়া সিংহদ্বারে দাঁড়াইলেন। পশারী অথবা মন্দির-দর্শনার্থী অপর কেহ বৈষ্ণব দেখিয়া যাহা দিতেন তাহাই গৃহে লইয়া আহার করিতেন রঘুনাথ। গোবিন্দ প্রভুকে জানাইলেন—রঘুনাথ আর প্রসাদ গ্রহণ করে না, সিংহদ্বারে গিয়া ভিক্ষার জন্য দাঁড়ায়। প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন, ঠিকই করিতেছে রঘুনাথ। বৈষ্ণব হইয়া যে জিহ্বার লালসাকে পুষ্ট করে সে বৈষ্ণব নহে, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ। ভিক্ষার অন্নই শুদ্ধ, বৈষ্ণবের গ্রাহ্য।

ভিক্ষার অন্নে পরমানন্দ লাভ করিলেন রঘুনাথ—বারো লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারির ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী। বর্ধিষ্ণু নগর সপ্তগ্রামের অধিপতি দুই ভাই—হিরণ্যদাস ও গোবর্ধন, আর দুই ভাই-এর একমাত্র বংশধর রঘুনাথ। ইঁহাদের সঙ্গে পূর্বাশ্রমে প্রভুর পরিচয় ছিল। প্রভুকে না দেখিয়া, কেবলমাত্র তাঁহার কথা শুনিয়াই রঘুনাথ প্রভুর প্রেমে মগ্ন হইয়াছিলেন। শৈশবে হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন কিছুদিন, গৌরপ্রেম তাহাতে আরও বর্ধিত হইয়াছিল।

সন্ন্যাস লওয়ার পর শ্রীনিত্যানন্দের ছলনায় প্রভু যখন বৃন্দাবন-ভ্রমে শান্তিপুর আসিয়া অদ্বৈত আচার্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন বহু সাধ্য সাধনায় পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের অনুমতি লইয়া রঘুনাথ প্রভুদর্শনে আসিলেন। সেই নবারুণ-বহির্বাসধারী স্বর্ণোজ্জ্বলকান্তি দর্শনমাত্র রঘুনাথ দেহ-মন-প্রাণ প্রভুকে সমর্পণ করিলেন। প্রভু নীলাচলের পথে যাত্রা করিলে রঘুনাথও আপন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু পিতামাতা দেখিলেন—রঘুনাথের পদদ্বয় তাঁহার দেহটিকেই বহন করিয়া আনিয়াছে শুধু, রঘুনাথকে নয়।

সংসারে অনাসক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পিতা-জেঠার চিত্ত বিচলিত হইল, সুন্দরী লক্ষ্মীশ্রী-যুক্তা এক কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন, যদি রঘুনাথের মনের কিছু পরিবর্তন হয়। কিন্তু কিছুই হইল না, রঘুনাথ বার বার গৃহত্যাগ করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং প্রতিবারই ধরা পড়িয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য

হইলেন। প্রহরীর উপরে প্রহরীর সংখ্যা বাড়িয়াই চলিল, মাতা ললাটে করাঘাত করিয়া বলিলেন—বাঁধিয়া রাখ। সকরুণ হাসি হাসিয়া পিতা বলিলেন—'ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য, অপ্সরাসম স্ত্রী' যাহার মন বাঁধিতে পারিল না, সেই চৈতন্যের বাতুলকে তুচ্ছ দড়ির বাঁধনে কি করিবে ?

মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পাঁচ বৎসর পরে বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়া গৌড়ে একবার দর্শন দিয়া গেলেন, কিন্তু কানাইএর নাটশালা পর্যন্ত গিয়া যখন বৃন্দাবন না গিয়াই প্রত্যাবর্তনের নামে শান্তিপুরে আসিলেন, তখন বহু অনুনয়ে জেঠা-পিতার অনুমতি লইয়া রঘুনাথও শান্তিপুরে আসিলেন। গৃহত্যাগের গোপন সংকল্পের কথা প্রভুকে জানাইলে প্রভু বলিলেন :

'স্থির হঞা ঘরে যাহ না হও বাতুল,
ক্রমে ক্রমে পায় লোকে ভবসিন্ধুকূল,
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া,
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া।'

মহাপ্রভুর আদেশ লইয়া গৃহে ফিরিলেন রঘুনাথ শান্ত সমাহিত চিত্তে। সংসারের সর্বব্যাপারে পুনরায় যোগ দিলেন, যথাকর্তব্য সুন্দররূপে নির্বাহ করিতে লাগিলেন। পিতা-মাতার মনে আশার সঞ্চার হইল, পুত্র কি তবে গৃহেই থাকিবে ?

কিছুকাল পরে শ্রীনিত্যানন্দ পানিহাটি গ্রামে আসিয়া হরিনাম—গৌরনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। তখন একদিন রঘুনাথ গিয়া দয়াল নিতাইচাঁদের পায়ে পড়িলেন, নিতাই-এর কৃপা না হইলে গৌর-চরণ লাভ করা সুকঠিন। নিত্যানন্দ রঘুনাথকে বক্ষে ধারণ করিলেন, বলিলেন—চোর! তুমি বারবার পলাইয়া যাও, আজ ধরা পড়িয়াছ, তোমাকে দণ্ড দিতে হইবে। দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া রঘুনাথ আনন্দে আকুল হইলেন, সকল বৈষ্ণবকে 'চিড়াদধি' ভোজন করাইতে হইবে—ইহাই নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশ।

'রাজপুত্র' রঘুনাথ পলকের মধ্যে সর্ব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া দিলেন, ভারে ভারে খাদ্যদ্রব্যাদি আসিতে লাগিল। পরম মঙ্গলময় নাম-সঙ্কীর্তনের পরে সারি দিয়া সহস্র বৈষ্ণব ভক্ত ও গ্রামের লোক ভোজনে বসিলেন। মধ্যস্থলে শ্রীনিত্যানন্দ ও পার্শ্বে রক্ষিত মহাপ্রভুর জন্য আসন। নিত্যানন্দ ধ্যানে বসিলেন—গৌর ছাড়া এই উৎসবের প্রাণদান করিবেন কে ?

ধ্যানভঙ্গে পরমোৎফুল্ল নিত্যানন্দকে দেখিয়া ভক্তেরা বুঝিলেন—মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইয়াছে। হরিধ্বনি করিয়া তাঁহারা আহার আরম্ভ করিলেন, রঘুনাথ সকলকে যথাযোগ্য দক্ষিণা দিয়া তুষ্ট করিলেন, প্রভুদ্বয়ের অবশেষ-পাত্র তাঁহাকে দেওয়া হইল।

রাত্রিতে রাঘব পণ্ডিতের মাধ্যমে আপন অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন রঘুনাথ। নিতাইচাঁদ তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহার মাথায় অজস্র আশীষধারা বর্ষণ করিয়া বলিলেন—প্রভু তো তোমাকে আজ অঙ্গীকার করিয়াছেন, আর ভয় নাই, আর কোনও বাধা নাই, অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় উদ্ধার করিবেন।

আবার গৃহে ফিরিলেন রঘু—উন্মাদ, অশান্ত। অন্দরে যান না, বাহিরে শয়ন করিয়া থাকেন। চোখের জলে বুক ভাসাইলেন মাতা, পিতা করিলেন কড়া পাহারার ব্যবস্থা। কিন্তু প্রভুর বাক্য সফল হইল এবার। প্রভু বলিয়াছিলেন—গৃহত্যাগের সময় হইলে কৃষ্ণই কোনও ছলে তোমাকে বাহির করিবেন। সেই সুযোগই উপস্থিত হইল, গুরুর কার্য করিবার ছলে একাকী বাহির হইবার অনুমতি লাভ করিলেন রঘুনাথ—ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিলেন নীলাচলের পথে। দ্বাদশ দিন পথে কাটিল—মাত্র তিন দিন বুঝি আহার

জুটিয়াছিল, রঘুনাথ নীলাচলে পৌঁছিলেন।

বহু খোঁজ করিয়াও পিতা রঘুনাথের কোন খবর পাইলেন না। চার পাঁচ মাস পরে শ্রীশিবানন্দ সেন ও গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রভুর দর্শনান্তে নীলাচল হইতে ফিরিয়া আসিলে খবর পাইলেন পিতা—রঘু প্রভুর কাছে নীলাচলে আছেন, উদাসীন—রাত্রে সিংহদ্বারে 'খাড়া' হইয়া থাকেন, ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করিতেছেন। অতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ভিক্ষার অন্নে জীবন নির্বাহ করিতেছেন, আর গৃহে এত ঐশ্বর্য! পিতা-মাতা-জ্যেঠার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ ও ভৃত্য কয়েক জনের হাতে চারিশত মুদ্রা দিয়া পুত্রের কাছে নীলাচলে পাঠাইলেন, গৃহে না আসুক, তবু এই অর্থে জীবন ধারণ করুক রঘুনাথ।

রঘুনাথ অর্থ গ্রহণ করিলেন না, কেবল মাসে একবার ঐ অর্থের সামান্য অংশ দ্বারা ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতেন, প্রভুও তাহা গ্রহণ করিতেন। কয়েক মাস পরে নিমন্ত্রণ বন্ধ হইয়া গেল, প্রভু স্বরূপকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে স্বরূপ বলিলেন—'আমার উপরোধে প্রভু নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন মাত্র, কিন্তু ইহাতে তাঁহার মন প্রসন্ন হয় না' ইহাই ভাবিয়া রঘুনাথ নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়াছেন।

প্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন—তিনি তো কিছু বলেন নাই, তবু তাঁহার ইচ্ছা অনুভব করিতেছেন রঘুনাথ। বলিলেন—'বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন' এবং তাহাতে কৃষ্ণ-স্মরণে বিঘ্ন জন্মে।

প্রভু রঘুনাথের দিকে সজাগ দৃষ্টি মেলিয়া রাখিয়াছেন। কয়েকদিন পরে স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আজকাল যেন সিংহদ্বারে রঘুকে দেখিতে পাই না? স্বরূপ জানাইলেন—সিংহদ্বারে আর দাঁড়ান না, ছত্রে মাগিয়া খান রঘু। প্রভু বলিলেন—সিংহদ্বারে ভিক্ষা করা পতিতার বৃত্তির সমান, ভালোই হইয়াছে, রঘুনাথ ইহা ত্যাগ করিয়াছেন।

বিপ্র ও ভৃত্যগণ অর্থ লইয়া হিরণ্যদাস-গোবর্ধনের কাছে ফিরিয়া গেল। হাহাকার করিয়া উঠিলেন আত্মীয়জন, শেষ যোগসূত্রটিও ছিন্ন করিয়া দিলেন রঘুনাথ। রঘুনাথ ইহার পরে ছত্রে মাগিয়া খাওয়াও বন্ধ করিলেন। স্বরূপ একদিন ঘরে গিয়া দেখেন—পূতিগন্ধময় যে অন্ন পশারীরা ফেলিয়া দেয়, গরুতে পর্যন্ত যাহা খায় না, সেই অন্ন—দুই মুষ্টি ঘরে আনিয়া অনেক জল দিয়া ধুইয়া ঘষিয়া ঘষিয়া ভিতরের সামান্য শাঁসটুকু মাত্র লইয়া রঘুনাথ গ্রহণ করিতেছেন। সংবাদ প্রভুর কর্ণগোচর হইল, রাত্রিতে হঠাৎ একদিন রঘুনাথের আহারের সময় প্রভু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রঘুনাথের সেই পর্যুষিত অন্ন হইতে একগ্রাস মুখে উঠাইয়া বলিলেন—এমন অমৃততুল্য বস্তু তুমি রোজ গ্রহণ কর, এ কি অপূর্ব প্রসাদ? প্রভু আর এক গ্রাসের জন্য হাত বাড়াইলে স্বরূপ বাধা দিলেন, আর নয় প্রভু।

প্রভু রঘুনাথের বৈরাগ্য-দর্শনে অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন, আপন-সেবিত গোবর্ধন-শিলা ও গুঞ্জামালা অর্পণ করিলেন রঘুনাথের হাতে। রঘুনাথ সেই শিলা প্রভুর প্রতিনিধি-রূপে বক্ষে ধরিলেন।

দীর্ঘকাল প্রভুর কাছে আছেন রঘুনাথ, কিন্তু প্রভুর সামনে কোনও কথা বলেন না, একদিন স্বরূপকে দিয়া প্রভুকে নিবেদন করিয়া পাঠাইলেন—'আমি কেন আসিলাম, কি আমার কর্তব্য?'—প্রভু তাহা আপন শ্রীমুখে উপদেশ করুন। প্রভু রঘুনাথকে ডাকিয়া আনিলেন, বলিলেন—স্বরূপের হাতে তোমাকে দিয়াছি, তিনিই তোমাকে সব শিক্ষা দিবেন। তবু যদি আমার কথা শুনিতে

তোমার ইচ্ছা হয়, তবে দুই একটি কথা বলিয়া দিই, মনে রাখিও—

ভালো খাইবে না, ভালো পরিবে না। গ্রাম্য কথা কহিও না, শুনিও না। নিজে অমানী হইয়া সকলকে মান দিবে। তৃণের মতো সুনীচ ও তরুর মতো সহিষ্ণু হইয়া সর্বদা হরিসংকীর্তন করিবে।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

রঘুনাথ আপনার সমগ্র জীবন দিয়া প্রভুর শিক্ষা সার্থক করিয়া গিয়াছেন—কঠোর বৈরাগ্য পালন করিয়াছেন তিনি। কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার সান্নিধ্যে কিছু কাল ছিলেন, তিনি লিখিয়াছেন, রঘুনাথ—

'আজন্ম না দিলা জিহ্বায় রসের স্পর্শন।'
'ছিণ্ডা কাঁথা কানি বিনু না পরে বসন।'

পাষাণের রেখার মতো ছিল তাঁহার নিয়ম, দিবস-রাত্রির সাড়ে সাত প্রহরকাল জপ-পূজা-ধ্যানে কাটাইতেন—অর্ধপ্রহর মাত্র আহার-নিদ্রার জন্য নির্দিষ্ট ছিল, তাহাও কতদিন জপধ্যানে কাটিয়া যাইত—হয়তো বা আহার হইত না।

নীলাচলে দীর্ঘ ষোড়শবর্ষ আপন অন্তরের অন্তরতমকে সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন রঘুনাথ। মহাপ্রভুর শেষ দ্বাদশ বৎসরের গম্ভীরা-লীলা প্রতিদিন নিজের চোখে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—তাহাই লিখিয়া রাখিয়াছেন তাঁহার রচিত 'শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তবকল্পবৃক্ষে', এবং কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার মুখ হইতে শুনিয়া প্রভুর অশ্রুত-পূর্ব, অপ্রাকৃত লীলার অনেক চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থে।

স্বরূপ প্রভুর অন্তরঙ্গ আর রঘুনাথ স্বরূপের অন্তরঙ্গ, স্বরূপের সঙ্গে প্রভুর বহু লীলার নীরব দর্শক হইয়াছিলেন রঘুনাথ।

রাধারস-বিভাবিত গৌরসুন্দর যখন ভিত্তিতে মুখ ঘষিয়া, পাথরে মাথা ঠুকিয়া—রক্তধারা ও অশ্রুধারার মিলিত স্রোতে সিক্ত হইয়া আর্তনাদ করিয়া কৃষ্ণকে ডাকিতে থাকিতেন—তখন রায় রামানন্দ ও স্বরূপের সঙ্গে রঘুনাথেরও কি আকুল ব্যথায় বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া পরমধনকে বক্ষের মধ্যে লুকাইয়া রাখিবার ইচ্ছা জাগিত না?

দূর হইতে রঘুনাথ দেখিতেছেন—তাঁহার প্রিয়, তাঁহার দয়িত সিংহদ্বারের কাছে অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন—এক এক হস্ত পদ দীর্ঘ তিন তিন হাত হইয়া গিয়াছে, অস্থি-সন্ধি সব বিচ্ছিন্ন, জীবনের তিলমাত্র আশা নাই—ব্যাকুল স্বরূপ প্রভুর মস্তক আপন ক্রোড়ে উঠাইয়া বেদনার্তস্বরে কর্ণে কৃষ্ণনাম শুনাইতেছেন—তখন রঘুনাথের প্রাণও কি দেহ ছাড়িয়া যাইবার উপক্রম করে নাই?

প্রভুর বিরহ-ব্যথার শত শত তীব্র প্রকাশ রঘুনাথের হৃদয়ে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া রহিল—তাই 'শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তবকল্পবৃক্ষে' লিখিয়াছেন:

'ক্বচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাৎ
শ্লথশ্রীসন্ধিত্বাদ্দধদধিকদৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ।
লুণ্ঠনভূমৌ কাক্বা বিকলবিকলং গদ্গদবচা
রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি ॥'

—কোন একদিন কাশী মিশ্রের গৃহে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের উৎকট বিরহে অঙ্গের শোভা ও সন্ধি-সকল শিথিল হওয়ায় যাঁহার হস্তপদ অধিক দীর্ঘ হইয়াছিল এবং তদবস্থায় ভূলুণ্ঠিত হইতে হইতে অত্যন্ত কাতরতার সহিত যিনি গদ্গদ কাকু-বাক্যে রোদন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন।

আর একদিন চটক-পর্বত দর্শনে গোবর্ধন-শৈলভ্রমে আবিষ্ট হইয়া ভাগবতের এক শ্লোক পাঠ করিতে করিতে প্রভু বায়ুবেগে ছুটিলেন—

গোবিন্দ বা অপর কেহই তাঁহাকে ধরিতে সমর্থ হইলেন না, কিন্তু পথেই স্তম্ভভাব হইল, আর চলিতে পারেন না—

'প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার,
তার উপরে রোমোদ্গম কদম্ব প্রকার,
প্রতিরোমে প্রস্বেদ পড়ে, রুধিরের ধার,
কণ্ঠ ঘর্ঘর—নাহি বর্ণের উচ্চার,
বৈবর্ণ্যে শঙ্খপ্রায় শ্বেত হইল অঙ্গ,
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্র-তরঙ্গ।'

কাঁপিতে কাঁপিতে ভূমিতে পড়িয়া গেলেন প্রভু, তাই পশ্চাদ্বর্তীরা এতক্ষণে তাঁহার নাগাল পাইলেন। সর্বাঙ্গে শীতল জলের ধারা সেচন ও কর্ণে কৃষ্ণনামামৃত বর্ষণ করিতে করিতে প্রভুর অর্ধচেতনা হইল—বলিলেন, এ কি আমাকে তোমরা কোথায় আনিয়াছ ? আমি গোবর্ধন-পর্বতে গেলাম—সেখানে সব ধেনুগণের মধ্যে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ যেই বেণু বাজাইলেন অমনি—বেণুগান শুনিয়া রাধাঠাকুরাণী আসিলেন—তাঁহার রূপসুধামাধুরীর আমি কি বর্ণনা দিব ? কৃষ্ণ রাধাকে লইয়া লীলা করিতে করিতে পর্বত-গুহায় প্রবেশ করিলেন। সুন্দরী হাস্যময়ী সখীরা আমাকে ফুল তুলিবার জন্য বলিলেন। হায়, হায়, নিষ্ঠুর তোমরা কেন আমাকে এই সময় লইয়া আসিলে ? শ্রীরাধাকৃষ্ণের অদর্শন-জনিত বেদনায় প্রভু আকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ব্যাকুল রঘুনাথের ইচ্ছা হইল—প্রভুর নিছনি লইয়া মরিয়া যাই, কিন্তু কিছুই তো করিবার নাই।

প্রভুর গুরুস্থানীয় পুরী-গোঁসাই ও ভারতী ছুটিয়া আসিলেন, তাঁহাদের দেখিয়া প্রভুর কিছু বাহ্য জ্ঞান হইল, বলিলেন—শ্রীপাদ, আপনারা এতদূরে আসিলেন কেন ? পুরী হাসিয়া বলিলেন 'তোমার (মধুর) নৃত্য দেখিবারে'। নিপট্ট বাহ্য পাইয়া প্রভু যেন লজ্জিত হইলেন—'হরি, হরি' বলিয়া সমুদ্রস্নানে গমন করিলেন।

রঘুনাথ আপন বক্ষের রক্ত দিয়া ইহাও লিখিয়া রাখিয়াছেন (অনুবাদ):

যিনি চটক-পর্বত দেখিয়া গিরি-গোবর্ধন-ভ্রমে প্রমত্তের ন্যায় ধাবিত হইয়া স্বজনগণ কর্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন সেই—

'.. প্রমদ ইব ধাবন্নবধৃতো গণৈঃ
স্বৈর্গৌরাঙ্গো হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি'

—শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন।

এমনি করিয়া একদিন নয়, দুইদিন নয়, দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া প্রভুর বিরহ-ব্যথার যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন রঘুনাথ—দেখিয়াছেন শুধু প্রভুকে নয়—কৃষ্ণপ্রেমে সকল-হারা শ্রীমতী রাধিকাকে প্রভুর মধ্যে।

তাই প্রভুর অপ্রকটের পরে ভৃগুপাতে দেহ-ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প লইয়া যখন বৃন্দাবনে গেলেন—তখন অবশ্যই শ্রীরূপ-সনাতন ও অন্যান্য গোস্বামিগণের অনুরোধে দেহত্যাগ করিতে পারেন নাই, কিন্তু সারাদিন ব্রজের কুঞ্জ হইতে কুঞ্জে বিরহিণী রাধারাণীকে খুঁজিয়া ফিরিয়াছেন। যখন বার্ধক্যে আর চলিবার শক্তি ছিল না—তখনও হামাগুড়ি দিয়া—কুঞ্জ হইতে কুঞ্জান্তরে গিয়া কাঁদিয়া ডাকিয়াছেন—কোথায় গো ব্রজবধূ—কৃষ্ণময়ী রাধা! আর তুমি একলা কাঁদিও না, আমাকেও কাঁদাও গো কাঁদাও—তোমার কুঞ্জের ধূলিতলে লুণ্ঠিত হইয়া আমিও একবার ডাকি! হা কৃষ্ণ, হা প্রাণধন,—কোথায় গো তুমি ?

'হা হা সখি, কি করি উপায় ?
কাঁহা করোঁ, কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
কৃষ্ণবিনু প্রাণ মোর যায়!'

প্রজ্ঞা পারমিতা

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

"পারম্ (অন্ত, শেষ) ইতা (গতা)" প্রজ্ঞার নাম প্রজ্ঞা পারমিতা। জ্ঞানের যাহা চরম, বৌদ্ধ শাস্ত্রে তাহাকে 'প্রজ্ঞা পারমিতা' বলা হয়। এই এই জ্ঞান সমাধি-লব্ধ। প্রজ্ঞাপারমিতাকে বৌদ্ধেরা দেবতার ন্যায় পূজা করেন। 'নমস্তস্যৈ ভগবত্যৈ প্রজ্ঞাপারমিতায়ৈ'—ইত্যাদিরূপ স্তুতি-মন্ত্রও আছে।

এই প্রজ্ঞা-পারমিতার স্বরূপ কি? 'যঃ সর্ব-ধর্মাণাম্ অনুপলম্ভঃ, সা প্রজ্ঞা পারমিতা ইত্যু-চ্যতে'—সকল ধর্মের যাহা অনুপলব্ধি, তাহাকে প্রজ্ঞা পারমিতা বলে। বৌদ্ধশাস্ত্রে 'ধর্ম' শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যাহা দুর্গতি হইতে প্রাণিগণকে ধারণ করে, তাহা ধর্ম (পুণ্য)। আবার বস্তুসকল যে রূপে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়, তাহাও ধর্ম। যাবতীয় সমুৎপাদ (Phenomena) ধর্ম। যে জ্ঞানে জাগতিক কোনও সমুৎপাদের উপলব্ধি হয় না, তাহা প্রজ্ঞা পারমিতা।

প্রতীত্য-সমুৎপাদে বুদ্ধ যে ভবচক্রের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার প্রথমেই অবিদ্যা বা অজ্ঞান। অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান (Consciousness), বিজ্ঞান হইতে নাম (সংজ্ঞাদি অরূপস্কন্ধ) ও রূপ (শব্দাদি রূপ-স্কন্ধ), নাম রূপ হইতে ষড়ায়তন (মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়), ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ বা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান, স্পর্শ হইতে বেদনা (সুখ, দুঃখ), বেদনা হইতে তৃষ্ণা (বিষয়-লিপ্সা), তৃষ্ণা হইতে উপাদান (জাগ-তিক দ্রব্য আঁকড়িয়া থাকা), উপাদান হইতে ভব (জন্মের হেতু, কর্ম), ভব হইতে জাতি বা জন্ম, জন্ম হইতে জরা, মরণ, দুঃখ, শোক প্রভৃতি। বুদ্ধ অবিদ্যা বা অজ্ঞানকেই জরা, মরণাদির মূল কারণ বলিয়াছিলেন। অবিদ্যা বা অজ্ঞান হইতে যাহা উদ্ভূত, তাহাকে সত্য বলা যায় না। সুতরাং সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জন্ম, জরা, মরণ কিছুই সত্য নহে। অবিদ্যার নাশ হইলে এ সকলের কিছুই থাকে না।

বুদ্ধের উপদিষ্ট প্রতীত্য-সমুৎপাদের এই ব্যাখ্যা অসঙ্গত নহে। কিন্তু সকলে এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। বৈভাষিক মতে বাহ্য জগৎ ও মানসিক জগৎ—উভয়েরই অস্তিত্ব সত্য বলিয়া স্বীকৃত। সৌত্রান্তিক দর্শনেও উভয়ের অস্তিত্ব স্বীকৃত। বিজ্ঞানবাদ বাহ্য জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। মাধ্যমিক দর্শনে বাহ্য ও আন্তর উভয় জগতের অস্তিত্বই অস্বীকৃত, ইহাই শূন্যবাদ। বাহ্য ও আন্তর সর্ববিধ পদার্থের শূন্যতা বা অনুপলব্ধিই 'প্রজ্ঞা পারমিতা'। সমাধিতে কোন পদার্থের অস্তিত্বই উপলব্ধ হয় না। সেই অনুপলব্ধিকে পরম জ্ঞান মনে করিয়া তাহাকে 'প্রজ্ঞা পারমিতা' বলা হইয়াছে। কিন্তু 'অনুপলম্ভ' অভাববাচক, তাহাকে ভাববাচক 'প্রজ্ঞা' বলা যায় কিনা সন্দেহ। তাই যুক্তি দ্বারাও প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে যে কোনও পদার্থেরই অস্তিত্ব নাই। এই যুক্তি-লব্ধ জ্ঞান ভাবপদার্থ। শান্তিদেবের 'বোধিচর্যাবতার' গ্রন্থে 'প্রজ্ঞা পারমিতা' (নবম) অধ্যায়ে যে সকল যুক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা নিম্নে সংকলিত হইল।

সত্য দ্বিবিধ—সংবৃতি সত্য ও পরমার্থ সত্য। যাহা বুদ্ধির বিষয় নহে, তাহা পরমার্থ সত্য;

যাহা বুদ্ধিগোচর তাহা সংবৃতি সত্য। যাহা নাই, সংবৃতি সত্যে তাহার অস্তিত্ব খ্যাপিত হয়। 'সংবৃতি' শব্দের অর্থ অবিদ্যা। যাহা কৃত্রিম, সংবৃতি সত্যে তাহাই সত্য বলিয়া খ্যাত হয়। এইজন্য ইন্দ্রিয়ে যাহার প্রতীতি হয়, তাহা সংবৃতি সত্য। পরমার্থ সত্য অধিগত হইলে সংবৃতি সত্য মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়। সকল ধর্মের 'নিঃস্বভাবতা' বা শূন্যতাই পরমার্থ সত্য।

সাধারণ লোকে যাহা প্রত্যক্ষ করে, তাহাকে 'সৎ' মনে করে, কিন্তু তাহা যে মায়ার মতো, তাহা বুঝিতে পারে না। রূপাদি বিষয় যাহা প্রত্যক্ষ হয় তাহা প্রামাণিক নহে। সুভূতি বলিয়াছেন, 'হে দেবপুত্রগণ, সমস্ত প্রাণীই মায়োপম—স্বপ্নোপম (তাহাদের সত্য অস্তিত্ব নাই)। সমস্ত ধর্ম, এমনকি সম্যক্‌ সম্বুদ্ধত্ব এবং নির্বাণও স্বপ্নোপম।' বুদ্ধ যদি মায়োপম হন, তবে তাহা হইতে কিরূপে পুণ্য হইতে পারে? ইহার উত্তর—পুণ্যও মায়োপম। মায়োপম বুদ্ধ হইতে মায়োপম পুণ্য হইবার বাধা নাই। যতকাল প্রত্যয়-সামগ্রী (মায়ার হেতু, বৌদ্ধ সাহিত্যে 'প্রত্যয়' শব্দের অর্থ হেতু বা কারণ) থাকে, ততকাল মায়াও থাকে, প্রত্যয়সকলের উচ্ছেদ হইলে মায়ারও উচ্ছেদ হয়।

শরীরের কোনও অংশ (দন্ত, নখ, কেশ, শোণিত প্রভৃতি) 'আমি' নহে, বসা, মেদ, অস্ত্র প্রভৃতিও 'আমি' নহে, মাংস, স্নায়ু প্রভৃতি 'আমি' নহে। ছয় বিজ্ঞান (চক্ষু, কর্ণ, ঘ্রাণ, রসনা, কায় ও মন হইতে জাত বিজ্ঞান) 'আমি' নহে, সুতরাং 'আমি'-প্রত্যয়ের কোনও বিষয় নাই, 'অহং'প্রত্যয় নির্বিষয় শূন্য মাত্র।

শব্দজ্ঞান, রূপজ্ঞান প্রভৃতি আত্মা নহে, বিষয় (রূপরসাদি) হইতে বিচ্যুত যদি কোনও আত্মা থাকিত, তাহা হইতে তাহার স্বরূপ হইত 'জ্ঞানতা' মাত্র, তাহা হইলে সকল পুরুষই 'জ্ঞানতা' বলিয়া সকল পুরুষই এক হইয়া যাইত, কিন্তু তাহা হয় না।

আবার চেতন ও অচেতন পদার্থের 'অস্তিতা' নামক সাধারণ ধর্ম থাকায় উভয় পদার্থ এক, তাহাদের মধ্যে ভেদ নাই। বিশেষই সাদৃশ্যের আশ্রয়। চেতন ও অচেতনের মধ্যে যখন ভেদ নাই, তখন সাদৃশ্যও নাই, সুতরাং চেতন পদার্থের অস্তিত্বই নাই।

আত্মা-নামক পদার্থের অস্তিত্ব নাই। নৈয়ায়িকেরা যে বলেন আত্মা অচেতন, চেতনা-যোগে চেতন হয়, তাহা সত্য নহে। যাহাকে আত্মা বলা হয়, তাহা অবিকারী, অচেতন আত্মার বুদ্ধি-যোগে চেতনারূপে বিকার প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে মূর্ছাবস্থায় যখন চেতনার অভাব হয়, তখন আত্মা নষ্ট হইয়া যাইত। যদি বল আত্মা না থাকিলে কর্মের ফল ভোগ করিবে কে? ইহার উত্তর—কর্মফল সিদ্ধ হয় ভিন্ন আধারে অর্থাৎ অন্য দেহে। তোমাদের মতে আত্মা নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্যাপার। এইরূপ আত্মাদ্বারা কর্মফল সিদ্ধ হইতে পারে না। আত্মা না থাকিলে কৃত কর্মের বিপ্রণাশ ও অকৃতাভ্যাগম হয়—এই আপত্তি সঙ্গত নহে। কেন-না হেতুমান্‌ দ্রব্যই (কর্মকর্তা) যে কৃত কর্মের ফলভোগী হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই। একজন মৃত হয়, অন্য একজন পরলোকে উৎপন্ন হইয়া তাহার কর্মের ফল ভোগ করে। কৃত কর্মের বিপ্রণাশ অর্থাৎ কৃত কর্মের প্রকৃষ্টরূপ বিনাশ—তাহার ফল ভোগ না হওয়া। অকৃতাভ্যাগম অর্থাৎ যে কর্ম যে করে নাই, তাহার সেই কর্মের ফল ভোগ করা। 'আমি' এক নহে। আজিকার 'আমি' আগামী কল্যের 'আমি' হইতে ভিন্ন। এক 'আমি' মৃত হয়, অন্য 'আমি' আবির্ভূত হয়, সেই পরবর্তী 'আমি' পূর্ববর্তী 'আমি'র কর্মের

ফল ভোগ করে। পঞ্চস্কন্ধরূপ ধর্মী-সকলের প্রবাহের একত্বই 'এক কর্তা', 'এক ভোক্তা'। প্রবাহের একত্ব আছে, কিন্তু প্রবাহের অন্তর্গত ধর্মদিগের কাহারও স্থায়িত্ব নাই। প্রতিক্ষণে লীয়মান ও উদয়শীল ধর্মদিগের প্রবাহই আত্মা। সেই প্রবাহের এক অংশে কর্ম কৃত হয়, অন্য অংশে ফলভোগ হয়। 'এক ব্যক্তি'র অর্থ ভিন্ন ভিন্ন উদীয়মান ও লীয়মান ক্রম-সমূহের সন্তান বা প্রবাহ।

চিত্ত অতীত, অনাগত ও বর্তমান—এই তিন রূপে থাকিতে পারে। অতীত চিত্তের অস্তিত্ব তো বর্তমানে নাই। অনাগত চিত্তও এখন পর্যন্ত আবির্ভূত হয় নাই। সুতরাং 'অহং' তাহা নহে। বর্তমান চিত্ত যদি 'অহং' হয়, তবে তাহাও নষ্ট হইয়া যাইবে। কদলীস্তম্ভের খোলা এক এক করিয়া সরাইয়া লইলে যেমন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তেমনি অহং-ভাবকে বিশ্লেষণ করিলেও কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

কোনও সত্ত্বের অস্তিত্ব যদি না থাকে তবে কাহার প্রতি বোধিসত্ত্ব কৃপা করিবেন? এই প্রশ্নের উত্তর—কার্যের ও পুরুষার্থের জন্য স্বীকৃত ও মোহ বা সংবৃতি দ্বারা কল্পিত সত্ত্বের উপর কৃপা করা যায়। কিন্তু 'সত্ত্বই' যদি না থাকে, তবে যে পুরুষার্থ-রূপ কার্য (কৃপা করা) কাহার? উত্তর—কাহারও নহে। পুরুষার্থ সাধনে যে চেষ্টা, তাহা মোহবশেই হয়। কিন্তু কাহার মোহ এবং মোহহীন কে? এ প্রশ্নের উত্তর নাই।

কায় বলিয়া কোন বস্তুরও অস্তিত্ব নাই, শরীরের পাদ জঙ্ঘা কটি প্রভৃতি অঙ্গের কোনও একটি কায় নহে। এই সকল অংশের মধ্যে যে কায় আছে, তাহাও বলা যায় না। সকল অঙ্গের প্রত্যেকের মধ্যে কায় আছে বলিলে যত অঙ্গ তত কায় আছে বলিতে হয়। সুতরাং কায়-করাদি অঙ্গের মধ্যেও নাই, বাহিরেও নাই। সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, কায় বলিয়া কিছুই নাই।

ইহার পরে 'সুখ-দুঃখে'র কথা। সুখ-দুঃখ সত্য নহে। সুখ-দুঃখ যদি সত্য হইত, তাহা হইলে প্রহৃষ্ট ব্যক্তিদের সুখ-কালে দুঃখ হয় না কেন, এবং শোকার্ত ব্যক্তির অন্নপানাদি সুখকর দ্রব্য ভাল লাগে না কেন? অন্য ভাব দ্বারা অভিভূত থাকায় এই সকল অবস্থায় দুঃখ ও শোকের অনুভব হয় না যদি বল, তাহা হইলে তাহার উত্তর এই—যাহা'র অনুভবাত্মতা নাই, তাহার বেদনাত্বও নাই। বিরুদ্ধ হেতুর অস্তিত্ববশতঃ সুখ-কালে দুঃখের অনুভব হয় না, এবং দুঃখ-কালে সুখের অনুভব হয় না—ইহাই যদি বলা যায় তাহা হইলে বলিতে হয় সুখ-দুঃখের বেদনা কেবল কল্পনার সৃষ্টি। দুঃখ উপস্থিত হইলে যদি তাহার বিরুদ্ধ হেতুতে অভিনিবিষ্ট হওয়া যায়, তবে দুঃখের বেদনাই হয় না, বেদনা অভিনিবেশাত্মক। সুখ ও দুঃখ অভিনিবেশের বিরুদ্ধ বিষয়ের ভাবনা করিলে তাহার নিরাস হয়।

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে বেদনার উৎপত্তি বলা হয়, কিন্তু এই সংযোগ অসম্ভব। কেন-না ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের মধ্যে যদি ব্যবধান থাকে, তবে তাহাদের সংযোগ হইতে পারে না। আর ব্যবধান যদি না থাকে, তাহা হইলে তাহারা অভিন্ন। কাহার সহিত কাহার সংযোগ হইবে? পরমাণুর অংশ নাই, তাহারা অচ্ছিদ্র ও সম (নিম্নতা ও উন্নততা-হীন)। সুতরাং অণুর মধ্যে অণুর প্রবেশ ঘটিতে পারে না, সংসক্তি হইতে পারে না। বিজ্ঞান অমূর্ত, তাহার সহিতও সংসর্গ অসম্ভব। সুতরাং বিষয়, ইন্দ্রিয় ও বিজ্ঞানের সংসর্গে বেদনা হয়, ইহা বলিতে পারা যায় না। স্পর্শ যেখানে অসম্ভব, সেখানে বেদনার অস্তিত্বও অসম্ভব।

যেখানে বেদক (বেদনার জ্ঞাতা) নাই, বেদনাও নাই, যেখানে তৃষ্ণারও অস্তিত্ব নাই। চিত্ত স্বপ্নোপম। চিত্ত দ্বারাই বিষয়ের দর্শন ও স্পর্শ হয়। চিত্তের সহিতই তাহা উৎপন্ন হয়। চিত্তই যখন নাই তখন বেদনাও নাই।

মন (চিত্ত) ইন্দ্রিয়দিগের মধ্যে নাই, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের অন্তরালে নাই, অন্তরে বাহিরে অথবা অন্য কোথাও মনকে পাওয়া যায় না, সুতরাং তাহাও কোন বস্তু নহে। অতএব সত্ত্বগণ (প্রাণী) 'পরিনির্বৃত' (মুক্তস্বভাব)।

জ্ঞেয়ের পূর্বে জ্ঞান হইলে তাহার আলম্বন কি? জ্ঞেয়ের সঙ্গে যদি জ্ঞান হয়, তাহা হইলেই বা তাহার আলম্বন কি? জ্ঞেয়ের পশ্চাতেই বা জ্ঞান কিরূপে হইবে? এইরূপে সর্ব 'ধর্মে'র উৎপত্তি প্রতীত হয় না। উৎপত্তি না হইলে নিরোধও হয় না, অতএব 'ধর্ম'দিগের উৎপত্তিও নাই, নিরোধও নাই।

বিনা হেতুতে কোন বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে না। স্বভাবতঃ কিছুই উৎপন্ন হয় না। ঈশ্বর যদি জগতের হেতু হন, তবে সেই ঈশ্বর কে? পৃথিব্যাদি ভূতগণই কি ঈশ্বর? অনেক অনিত্য, নিশ্চেষ্ট, অতিক্রমণীয় ও অশুচি দ্রব্য আছে, তাহারাও তাহা হইলে ঈশ্বর হয়। তাহা হইতে পারে না। আকাশও ঈশ্বর নহে, কেন-না আকাশ অচেষ্ট। যদি বল ঈশ্বর অচিন্ত্য, তাহা হইলে তাহার (সৃষ্টি)-কর্তৃত্বও অচিন্ত্য, সুতরাং তাহা অবাচ্য। ঈশ্বরই যদি সৃষ্টিকর্তা হন, তিনি কি সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন? আত্মা কি? আত্মাও তো ধ্রুব, অসৃষ্ট। পৃথিব্যাদি ভূতগণ, দিক্, কাল ও মনের স্বভাব, ঈশ্বর, জ্ঞেয়োৎপন্ন জ্ঞান—ইহারা সকলেই তো তোমাদের মতে অনাদি, আর কর্ম হইতেই সুখ-দুঃখ হয়। তবে ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন কি? কিছুর অপেক্ষা যখন তাঁহার নাই, তখন তিনি সর্বদা সমস্ত সৃষ্টি করেন না কেন? যদি বল, ঈশ্বর নিমিত্ত-কারণ, তাহা ছাড়া সামগ্রী বা সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণ আছে, তিনি তাহারই অপেক্ষা করেন, তাহা হইলে তিনি সম্পূর্ণ নহেন। তাঁহাকে সর্বশক্তিমান্ বল, সুতরাং তিনি সামগ্রী ও সমবায়ের অপেক্ষা করেন, ইহা বলিতে পার না। ঈশ্বর সমবায়ী কারণের অপেক্ষা করেন বলিলে বলিতে হয় তিনি পরায়ত্ত। স্বেচ্ছায় কার্য করিলেও তিনি ইচ্ছার আয়ত্ত। এতাদৃশ ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব কোথায়?

'প্রধানে'র (সাংখ্য) অস্তিত্ব নাই, কেন-না এক প্রধানের সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন স্বভাব থাকা অসম্ভব। যদি বল ত্রিগুণাত্মক এক স্বভাব না থাকুক, ত্রিস্বভাব তিন গুণ আছে, তাহা বলিতে পার না, কেন-না ত্রিগুণের প্রত্যেকটি ত্রিধা—(ইহা সাংখ্যমতের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা)। কিন্তু এক বস্তুর ত্রি-স্বভাব অযুক্ত। প্রত্যেক বস্তুতে যদি তিন গুণ থাকে তবে অচেতন বস্ত্রাদিতেও তিন গুণ আছে। কিন্তু অচেতন বস্তুতে গুণের ধর্ম সুখ-দুঃখাদি অসম্ভব।

ফল যদি হেতুর মধ্যে থাকে ('সৎকার্য-বাদ' মতে) তাহা হইলে অন্নভোজীও অমেধ্যভোজী (কোন দেহের মধ্যে অন্নের যে পরিণাম হয়, যথা বিষ্ঠা-মূত্রাদি—তাহা অমেধ্য)। কারণের মধ্যে কার্যের অস্তিত্ব আছে যদি বল, তাহা হইলে বস্ত্র না কিনিয়া কার্পাস-বীজ কিনিয়া তাহাই পরিধান কর।

এক ভাব পদার্থের কল্পনা করিয়া তাহার অভাব গৃহীত হয়। কিন্তু ভাব যখন কল্পনামাত্র তখন তাহার অভাবও মিথ্যা।

কোনও পদার্থ অন্য কিছু হইতে আসে না, তাহারা থাকেও না, যায়ও না, সকলই মায়া, মূঢ়েরাই ইহা সত্য মনে করে। যে বস্তু অন্যের (হেতুর) সন্নিধানবশতঃ দৃষ্ট হয়, এবং তাহার

অভাবে দৃষ্ট হয় না, তাহা পরাধীন-বৃত্তি বলিয়া প্রতিবিম্বের মত কৃত্রিম, তাহার সত্যতা নাই।

শতকোটি হেতু দ্বারাও অভাবের বিকার হয় না, অভাব অভাবই থাকে। অতএব অভাবের বিকার ভাবত্ব প্রাপ্ত হয় না। অন্য কিই বা ভাব হইবে? অভাবকালে যদি ভাব না থাকে, তবে যতক্ষণ ভাব না হয়, ততক্ষণ অভাব অপগত হয় না। আবার অভাব অপগত না হইলেও ভাব হয় না, ভাব কখনও অভাবত্ব প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং কিছুর বিনাশ নাই, কিছুব সত্তাও নাই। এই জগতেব উৎপত্তি হয় নাই, সুতরাং বিনাশও নাই।

দেব-মনুষ্যাদি লোকে গতি স্বপ্নোপম। বিচারে তাহা কদলীকাণ্ডের মত নিঃসার প্রতিপন্ন হয়। মুক্ত পুরুষ ও বদ্ধপুরুষের মধ্যে ভেদ নাই।

এবং শূন্যেষু ধর্মেষু কিং লব্ধং কিং হৃতং ভবেৎ?
সংকৃতঃ পরিভূতো বা কেন কঃ সম্ভবিষ্যতি?

কুতঃ সুখং বা দুঃখং বা কিং প্রিয়ং বা কিমপ্রিয়ম্?
কা তৃষ্ণা কুত্র সা তৃষ্ণা মৃগ্যমাণা স্বভাবতঃ?

বিচারে জীবলোকঃ কঃ, কো নামাত্র মরিষ্যতি?
কো ভবিষ্যতি কো ভূতঃ কো বন্ধুঃ কস্য কঃ সুহৃৎ?

—এইরূপে ধর্মসকল শূন্য প্রতিপন্ন হইলে কিই বা লব্ধ হয়, কিই বা হৃত হয়, কে কাহা কর্তৃক সংকৃত বা পরিভূত হয়? সুখ-দুঃখ, প্রিয়-অপ্রিয় কোথায়? স্বভাব ধরিয়া যদি তৃষ্ণার অন্বেষণ করা যায়, তাহা হইলে তৃষ্ণা কি বা কোথায় থাকে? বিচার করিয়া দেখিলে জীবলোক কি? এখানে কেই বা মরে? কে হইয়াছিল? কে হইবে? কেই বা কাহার বন্ধু? এ সমস্তই আকাশের মতো। আমাদের মতো মূঢ় ব্যক্তিরাই এই সকল সত্য মনে করে, এবং কলহে রুষ্ট ও উৎসবে হৃষ্ট হয়।

কিছুরই অস্তিত্ব নাই, দুঃখও নাই, দুঃখভোগীও নাই বলিয়া পরে আবার বলা হইয়াছে, 'অহো এই দুঃখস্রোতে নিমগ্ন প্রাণীদিগের অবস্থা অতি শোচনীয়। তাহারা আপনাদের দুরবস্থা বুঝিতে পারে না, দুঃখের মধ্যে সুখের কামনা করে।'

সুখ নাই, দুঃখ নাই, সুখদুঃখ ভোগ করিবার কেহ নাই, দৃশ্যমান জগতের অস্তিত্ব নাই—সকলই শূন্য, ইহাই যদি চরম প্রজ্ঞা হয়, তবে সে প্রজ্ঞার সাধন করিয়া তাহা লাভ করিবে কে? কাহার জন্য কে এই উপদেশ দিতেছে? এই প্রশ্ন স্বতই উত্থিত হয়। বুদ্ধ ও বোধিসত্বগণ (যাহারা কখনও ছিলেন না, এবং এখনও নাই) কাহাদের দুঃখমুক্তির জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন ও করেন? ইহার উত্তর—অসংখ্য লোককে নির্বাণলাভে সাহায্য করিতে বোধিসত্ব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনও জীবেরই অস্তিত্ব নাই, বন্ধন-মুক্তিও নাই। বোধিসত্ব ইহা বেশ জানেন। কিন্তু তিনি বিচলিত না হইয়া মায়িক ও অস্তিত্বহীন জীবের মায়িক বন্ধন হইতে মায়িক মুক্তির জন্য চেষ্টা করেন। তাঁহার পারমিতাদিগের (অর্জিত গুণের) শক্তিতে তিনি কার্য করিয়া যান, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুক্তি লাভ করিবার কেহ নাই, মুক্তিলাভে সাহায্য করিবাবও কেহ নাই। ইহাই প্রজ্ঞা পারমিতা।

উপরি-উক্ত মতবাদের ভিত্তি বুদ্ধের প্রতীত্য-সমুৎপাদ, যাহাতে অবিদ্যাকেই সংসারের মূল কারণ বলা হইয়াছে। অবিদ্যা-কর্তৃক অভিভূত হইবার কেহ নাই, এবং অবিদ্যা হইতে ক্রমে ক্রমে যে সকল উদ্ভূত হইয়া পরিশেষে জরা মরণ শোক প্রভৃতির উৎপত্তি হয় বলা হইয়াছে, তাহারা সকলেই মায়োপম অস্তিত্বহীন শূন্য। যদি ইহাই পরমার্থদৃষ্টি এবং

এই অস্তিত্বহীনতার উপলব্ধিই পরমার্থ সিদ্ধি বা প্রজ্ঞা পারমিতা হয়, তাহা হইলে প্রজ্ঞা-পারমিতাও মায়োপম, তাহাও শূন্যমাত্র। আত্মা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অস্তিত্ব যদি না থাকে, তবে প্রজ্ঞা-পারমিতা লাভ করিবারও কেহ নাই। পরমার্থ সিদ্ধি যাহাকে বলা হয়, জীবের অস্তিত্ব যদি না থাকে, তবে সে সিদ্ধি লাভ করিবারও কেহ নাই, এবং 'প্রজ্ঞা পারমিতা' সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও বলা হয় নাই বলিতে হয়। অদ্ভুত অবস্থা।

কিন্তু এই সর্বব্যাপী শূন্যবাদ বুদ্ধের মত বলিয়া মনে হয় না। কেন-না তিনি বলিয়াছিলেন: অজ্ঞাত, উৎপত্তিহীন অপিণ্ডীকৃত একজন (অথবা এক পদার্থ) আছেন। শ্রমণগণ। তাহা যদি না থাকিত—তাহা হইলে জাত, উৎপন্ন ও পিণ্ডীকৃত জগৎ হইতে পরিত্রাণ সম্ভব হইত না। অনুভূয়মান জগৎ মিথ্যা, কিন্তু তাহার তলদেশে এক শাশ্বত জগৎ আছে। তাহা অজ্ঞাত, মানুষের ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি-গ্রাহ্য নহে। তাহা অনুভূত হয় না, কিন্তু তাহাকে শূন্য বলা যায় না। সমাধি অবস্থায় জগৎ-প্রপঞ্চ অনুপলব্ধ হইলেও তাহার লয় হয় না। সাধকের ব্যক্তিগত সত্তার তখন বিলয় হয় বলিয়া সমাধির অপগমে তিনি তাহা স্মরণ করিতে পারেন না। তখন সাধকের কোন 'ধর্মে'রই উপলব্ধি হয় না। তখন তিনি নিজে শূন্যমাত্রে পর্যবসিত হন। কিন্তু অনুপলব্ধ হইলেও সেই অজ্ঞাত অস্পষ্ট পদার্থ তখনও বর্তমান থাকে।

এই জ্ঞানই প্রজ্ঞা পারমিতা। ইহাই পরম জ্ঞান।

প্রজ্ঞা পারমিতা

[পরিচয়]

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে বহু পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ হইয়া যান, এবং তাঁহারা অনেকটা উপনিষদের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বৌদ্ধধর্ম ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্মে অন্ততঃ আঠারোটি সম্প্রদায় দেখা দেয়, তন্মধ্যে চারটি বিশিষ্ট দার্শনিক চিন্তাধারা প্রবাহিত হয়, যথা বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক। শেষোক্ত মাধ্যমিক দর্শনের ভিত্তি 'প্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্র'; নাগার্জুন (খৃঃ দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতক?) তাহার শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা। নাগার্জুনের মতানুযায়ী বৌদ্ধদর্শনে জগতে কোন কিছুর সত্তা নাই, সব কিছু মায়িক। পূর্বপক্ষ দ্বারা উত্থাপিত যে কোন মত তিনি যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিতেন, তবে ব্যাবহারিক জগতে তিনি পুনর্জন্ম, নৈতিক জীবন ও কার্যকারণবাদ স্বীকার করিতেন।

মহাযান বৌদ্ধধর্মে প্রজ্ঞা (শ্রেষ্ঠ জ্ঞান) লাভের জন্য পারমিতা (শ্রেষ্ঠ সদ্গুণরাশি)-র অনুশীলন প্রচারিত হয়। সংস্কৃত গ্রন্থাবলীতে ছয়টি 'পারমিতা' উল্লিখিত: (১) দান, (২) শীল, (৩) ক্ষান্তি, (৪) বীর্য, (৫) ধ্যান ও (৬) প্রজ্ঞা; পালিতে আরও চারটি প্রচলিত: (৭) প্রণিধান, (৮) উপায়-কৌশল্য, (৯) বল ও (১০) জ্ঞান।

বৌদ্ধেরা বিশ্বাস করেন বোধিসত্ত্ব পূর্ব পূর্ব জন্মে বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া এই সকল গুণাবলীর অনুশীলন করিয়া শেষ জীবনে সকল গুণের অধিকারী হন। বজ্রযান মতে প্রজ্ঞাপারমিতা বজ্রধর বা বজ্রপাণি বুদ্ধের অভিন্না শক্তি। পরবর্তীকালে এই ভাব প্রকাশক মূর্তি উদ্ভূত হইয়া উপাসিত হইয়াছিল। বজ্রধর শূন্যের প্রতীক, প্রজ্ঞাপারমিতা করুণার, নিবিড় আলিঙ্গনে করুণা 'শূন্যে'ই মিলাইয়া যায়, এবং শূন্যই চরম তত্ত্ব। বেদান্তের ব্রহ্মমায়া, সাংখ্যের প্রকৃতিপুরুষ ও তন্ত্রের শিবশক্তি-তত্ত্বের সহিত ইহার সাদৃশ্য ও বৈষম্য লক্ষণীয়।—উঃ সঃ।

গুরুমুখে 'বিল্বমঙ্গল'-ব্যাখ্যা

ডক্টর শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহ

শিষ্য। গিরিশবাবুর নাটকগুলি আবার পড়ছি।

গুরু। বেশ তো, প্রবন্ধগুলিও পড়ছ তো?

শিষ্য। হ্যাঁ, 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব' সম্বন্ধে প্রবন্ধটি পড়েছি।

গুরু। এছাড়া আরও কতকগুলি প্রবন্ধ আছে, যেমন 'প্রলাপ না সত্য', 'ধ্রুবতারা', 'দীননাথ,' নিশ্চেষ্ট অবস্থা', 'শান্তি', 'রামদাদা', 'পরমহংসদেবের শিষ্যস্নেহ', 'তাও বটে, তাও বটে' ইত্যাদি।

শিষ্য। হ্যাঁ, এর সবগুলি বসুমতী সংস্করণ গ্রন্থাবলীতে নেই, কিন্তু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় সংস্করণ' 'গ্রন্থাবলীতে আছে। সবগুলিই পড়েছি। সবচেয়ে ভাল লেগেছে 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর'।

গুরু। কেন 'নসীরাম', 'কালাপাহাড়'? এ সব নাটকে ঠাকুরের চরিত্র কেমন ফোটানো হয়েছে।

শিষ্য। সে কথা সত্যি। কিন্তু বিল্বমঙ্গলের চরিত্রে আসক্তির কী নগ্নরূপ। কি বৈরাগ্য! চোখ প্রলুব্ধ করছে, অতএব চোখে কাঁটা বেঁধাও। ঠাকুরকে হৃদয়ে থাকতেই হবে, একথা ঠাকুরকে জোর করে বলা—এর আর তুলনা নেই। স্বামী বিবেকানন্দ সত্যই বলেছেন, 'আমি এরূপ উচ্চ ভাবের গ্রন্থ কখনও পড়ি নাই।'

গুরু। জানো বাবা, 'বিল্বমঙ্গল' আমারও খুব ভাল লাগে। পাড়ার সখের থিয়েটারে 'বিল্বমঙ্গল' অভিনয় হ'ত। আমি 'বিল্বমঙ্গলের' ভূমিকায় অভিনয় করতাম।

শিষ্য। আপনার বেলা 'বিল্বমঙ্গল'-অভিনয় অভিনয় মাত্র নয়। আমার বেলা 'বিল্বমঙ্গল' পড়া শুধুই পড়া।

গুরু। এ কাতরতা কেন বাবা? বিল্বমঙ্গলের যে অনুতাপ, তাতে সব পাপ পুড়ে গিয়েছিল, একথার কি তুলনা আছে—

'ভেবে দ্যাখ্ মন,
কত তোরে নাচায় নয়ন!
ছিলি ব্রাহ্মণকুমার—
বেশ্যাদাস, নয়নের অনুরোধে।
পিতৃশ্রাদ্ধ-দিনে,
ধৈর্য নাহি প্রাণে—
ঘোর নিশা
মহা ঝঞ্ঝাবাতে,
তরঙ্গের সঙ্গে রণ,
রহিল জীবন,
শবদেহ আলিঙ্গনে।
সর্পে রজ্জুভ্রম
হেন অন্ধ করেছে নয়ন।
পুরস্কার—
বারাঙ্গনা তিরস্কার!'

শিষ্য। 'মন, হাসি পায়,—
হ'ল তোর বৈরাগ্য উদয়,
চ'লে গেলি
এক বাসে গৃহবাস ত্যজি,
'কোথা কৃষ্ণ'? বলি'
হ'লি উতরোলি—
যেন তোর কত প্রেম।
আরে রে পাগল মন,
ধ্যানে মগ্ন বাপীতটে
সাধুর আকার,—

'শুনি' কঙ্কণ-ঝঙ্কার
চাহিলি নয়ন মেলি ॥
ছাখ্ পুন নয়নের ছলে
কি উন্মাদ দশা তোর।'

গুরু। বাঃ, তোমার যে সব মুখস্থ দেখছি।

শিষ্য। ঐ মুখস্থ পর্যন্তই।

গুরু। তা কেন, প্রতিটি কথাই তো তোমার বেলাতে খাটে। সকলের বেলাতেই খাটে।

'ভেবে ছাখ্ মন,
কত তোরে নাচায় নয়ন।'

নয়নই তো আমাদের সকলকে নাচিয়ে বেড়াচ্ছে। চোখই তো আমাদের নাচাচ্ছে।

'ছিলি ব্রাহ্মণকুমার'—

আমরা প্রত্যেকেই তো ব্রাহ্মণকুমার। কারণ যখনই গোত্রের পরিচয় দিই, তখনই ভরদ্বাজ বা কশ্যপ বা অন্য কোনও ঋষির নাম করি। ঋষি কে? যিনি ব্রহ্ম দর্শন করেছেন—। যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। অতএব আমরা সকলেই ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলাম,—এখন নেই, কারণ

'বেশ্যাদাস, নয়নের অনুরোধে'—

সত্যিই তো বেশ্যাদাস। মনই তো বেশ্যা। একবার 'টাকা টাকা' করছে, একবার 'মান মান' করছে, সব সময়ই চঞ্চল। আর সেই মনের কথাতে উঠছি আর বসছি। সুতরাং বেশ্যাদাস বই কি।

'পিতৃশ্রাদ্ধদিনে,
ধৈর্য নাহি প্রাণে,—

পিতৃশ্রাদ্ধদিন কবে? যেদিন পিতৃপুরুষকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি, সেইদিন পিতৃশ্রাদ্ধদিন। সব দিনই পিতৃশ্রাদ্ধদিন হ'তে পারে। কি ক'রে শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রব? পিতৃপুরুষেরা যা ভালবাসেন তাই ক'রে। ঋষিরা কত খাটতেন। সকালে উঠে দূরে বনে চলে যেতেন। ধ্যান ধারণা সারাদিন ক'রে তবে ফিরে আসতেন।

'ঘোর নিশা
মহা ঝঞ্ঝাবাতে'

সংসারে কেবলই ঝঞ্ঝা; কেবলই অন্ধকার। কেবলই বাধা-বিপত্তি, কেবলই সংশয়, অনিশ্চয়তা।

'তরঙ্গের সনে রণ'

সত্যিই তো সংসার-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। কূল যে পাওয়াই যায় না, অকূল পাথার।

'রহিল জীবন শবদেহ আলিঙ্গনে'—

শরীরই তো শব, সবই তো নশ্বর। ধন জন মান—যে সবকে আশ্রয় ক'রে বেঁচে আছি, সে সব তো অনিত্য।

'সর্পে রজ্জুভ্রম,
হেন অন্ধ করেছে নয়ন।'—

এও তো সত্যি কথা। যেগুলি অবলম্বন ক'রে আমরা সংসারের বাধা উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করছি—সেগুলি তো সবই বাসনার জিনিস। বাসনার বিষ তো আছেই সাপের মতো। কিন্তু আমরা সেটি কিছুতেই দেখছি না, সুতরাং নয়ন তো সত্যিই অন্ধ।

'পুরস্কার—
বারাঙ্গনা তিরস্কার।'

যে মন আমাকে জীবনভোর নাচিয়ে নিয়ে বেড়ালো, এ জিনিসে সে জিনিসে আসক্ত করালো, সেই মনই জীবনের শেষে হিত্ কথা বলে, 'কী করতে এসেছিলে ভবে, আর কী ক'রে গেলে!'

'মন হাসি পায়,
হ'ল তোর বৈরাগ্য উদয়,
চ'লে গেলি
এক বাসে গৃহবাস ত্যজি;
'কোথা কৃষ্ণ'? বলি'
হ'লি উত্তরোলি—
যেন তোর কত প্রেম।'

বিল্বমঙ্গল যে ধিক্কার দিচ্ছেন আমরাও সে রকম ধিক্কার নিজেদের কত সময়ে দিই। এ বিষয়ে দেখবার একটু আছে। মনের বিভিন্ন স্তর আছে। আমরা মনের উপরকার স্তরটা মাত্র দেখে একটা সিদ্ধান্ত ক'রে বসি। নীচেকার স্তরে কী আছে, না আছে—সেটা ভেবে দেখি না। নীচের স্তর যখন উপরে উঠে প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে, তখন—

'আরে রে পাগল মন,
ধ্যানে মগ্ন বাপীতটে
সাধুর আকার,—
শুনি' কঙ্কণ-ঝঙ্কার
চাহিলি নয়ন মেলি।
ঢাখ্‌ পুন নয়নের ছলে
কি উন্মাদ দশা তোর।'

বিল্বমঙ্গল কত দুঃখে যে একথা বলেছেন, তা আব কী ব'লব। প্রতি সাধক-জীবনেই এই উত্থান-পতন আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব দেখা যায়।

শিষ্য। সাধুতে অসাধুতে তবে তফাৎ কি?

গুরু। খ্রীষ্টান প্রবচন আছে—সাধুর দিনে সাত-বাব পতন ঘটে, কিন্তু সাধু আবার ওঠেন। অসাধু পড়েই থাকে। বিল্বমঙ্গল চোখ অন্ধ ক'রে ফেলছেন।

শিষ্য। আমাদের সে তেজ কই? সে পুরুষ-কার কই?

গুরু। কেন, তুমি তো জান তোমার দেহ-মন্দিরে ঠাকুর রয়েছেন। ঝড়ের ধূলো মন্দিরে ঢুকলে মন্দির নোংরা হবে ব'লে দরজা-জানালা যেমন বন্ধ করা হয়, তেমনি ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যের সময় কুদৃশ্য কুবাক্য প্রবেশ করলে তোমার হৃদয় অশুচি হবে ব'লে তুমি তো তেমনি চোখ-কান বন্ধ কর। তফাৎ কোথায় বলো?

শিষ্য। এমন ক'রে বলবেন না। আমার কী সেই মন, যে কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু দেখবই না? মনে পড়ে লাটু মহারাজের কথা, সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে, চোখে হাত চাপা দিয়ে বলছেন, 'আপনি কুথায়?'—ঠাকুরের সাড়া পেলে তবে চোখ খুলবেন। যেমন বৈরাগ্য তেমনি প্রেম। আমার না আছে প্রেম, না আছে বৈরাগ্য।

গুরু। শোনো বাবা, একটা মজার কথা বলি, শোনো। এই প্রেম, এই বৈরাগ্য তো আমাদের নিজস্ব নয়। এগুলি ঠাকুর আমাদের কাজে লাগাবার জন্য দিয়েছেন। আমরা যদি সেগুলি ঠিকভাবে কাজে লাগাই, তখন মনের উপরকার স্তরের কাজ দেখা যায়। আর যদি না লাগাই, তাঁর জিনিস তিনি ফিরিয়ে নিতে পারেন। তখন মনের নীচেকার স্তরের কাজ দেখা যাবে। সুতরাং প্রেম বৈরাগ্য নেই—একথা শুধু এই হিসাবে সত্য যে এসব আমাদের নিজস্ব নয়। তবু আমরা প্রার্থনা চালাতে পাবি, ঠাকুব এগুলি আমাকে ঠিকভাবে ব্যবহার করতে দাও, এগুলি তুমি ফিরিয়ে নিও না। এটা আমাদের হাতে আছে, এবং এতে আর একটা সুফল এই যে যখন আমাদের প্রেম বৈরাগ্য আমাদের কাজে প্রকাশ পায় তখন অন্যের সে রকম নেই ব'লে আমাদের অহংকার আসে না। বরং কখন আমাদেরও থাকবে না—এই ভয়ে মনে দীনতা জাগে, প্রার্থনা নিরন্তর হয়। শ্রীভগবান মঙ্গলময়। তিনি মঙ্গলই করেন, কখনও সফলতা দিয়ে, আবার কখনও বা বিফলতা দিয়ে। সুতরাং সফলতা বিফল-তার কথা ভাবতে যাব কেন? আমাদের চাই শুধু প্রার্থনা আর নির্ভরতা।

আত্ম-কথা

শ্রীনরেন্দ্র দেব

আমার অন্তর-লোকে আমি মহারাজ—হৃদি সিংহাসনে,
সেথায় আনন্দে আছি শান্ত স্নিগ্ধ প্রীত তৃপ্ত মনে।
বিধাতা বিপুল দানে ব্রহ্মাণ্ড আমার পূর্ণ করিয়াছে,
পার্থিব সুখের মোহ—মনে হয় আজ তুচ্ছ তার কাছে।
কামনা বাসনা যত, আকাঙ্ক্ষা-পঙ্কিল পুঞ্জীভূত লোভ,
অবলুপ্ত আজি সব, মর্মে নাহি মোর অপ্রাপ্তির ক্ষোভ।

পরম সন্তোষে আছি। ভাসে চিত্ত সদা চিদানন্দ-সুখে,
যাচনা ছিল না কিছু, কাঁদি নাই তাই না-পাওয়ার দুখে।
অভাব তো আমাদেরই নিজ হাতে গড়া সাধের পসরা,
যা পেয়েছি তাই নিয়ে সুখে আছি আমি, পূর্ণ মোর ধরা।
আমার ভুবনে একা আমি রাজ্যেশ্বর। অর্থী প্রার্থী নহি,
ঔদাস্যের অট্টহাস্যে ভাগ্যবিড়ম্বনা অনায়াসে বহি।

অপরের দুঃখে আমি ব্যথা পাই বুকে, হাসি না গোপনে,
সৌভাগ্য হেরিলে কারো ঈর্ষা নাহি জাগে, সুখী হই মনে।
নাম, যশ, খ্যাতি, মান, ঐশ্বর্য লালসা মূঢ় অবিদ্যায়,
প্রলুব্ধ করিতে মোরে পারে নাই তার মোহিনী মায়ায়।
নাহি কেহ শত্রু মোর, কারো ভয়ে ভীত নহি কোন দিন,
বসুধা কুটুম্ব জানি, আত্মা অবিনাশী, আমি মৃত্যুহীন।

আমার সম্পদ শুধু জন্মগত পাওয়া জ্ঞান বুদ্ধি মন,
বিবেক সতত মোরে সত্যপথে করে সঞ্চালন,
গুরু কেহ নাহি মোর, নাহি তপোবল, ভক্ত শিষ্য কেহ,
তৃপ্তি নাই ভোগে জানি, ক্ষণিকের মোহ, নশ্বর এ দেহ।
কারো মনে ব্যথা দিয়ে করি না আঘাত অসম্মান আমি,
বিচার করি না কারো দোষ গুণ কিছু,—বিচারক-স্বামী?

এসেছি এ পৃথিবীতে কেন যে জানি না, পাঠালো কে মোরে?
জন্মেছি কোথায়—কবে—কতবার আমি—প্রদোষে না ভোরে?
লোকমুখে শুনি কিছু, জন্ম-ইতিহাস স্মরণে আসে না,
ভালোবাসি সবে তাই, বাসে যেবা ভালো, অথবা বাসে না।
দুদিনের খেলা শুধু খেলিতে এসেছি, যেতে হবে জানি,
আসিবে যে দিন ডাক, সে আদেশ লবো হাসি মুখে মানি।

ভূদেব-সাহিত্য-প্রসঙ্গে

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

সম্প্রতি কিছুকাল থেকে বাংলা দেশে লেখক ও পাঠকেরা প্রবন্ধ-সাহিত্যের প্রতি মনোযোগী হয়েছেন। বাস্তবিক বিংশ শতাব্দীর বাঙালী ছোটগল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা ও কবিতার প্রতি যতটা আকর্ষণ অনুভব করে, প্রবন্ধের প্রতি ততটা করে না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান সম্পদ ছিল প্রবন্ধ-সাহিত্য। আর এই প্রবন্ধ-সাহিত্য যাঁদের মনীষার দানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল, তাঁদের মধ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম অবশ্য-স্মরণীয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রমথনাথ বিশী-সম্পাদিত 'ভূদেব-রচনা-সম্ভারের'[১] পাতা উল্‌টাতে উল্‌টাতে এই বিস্মৃতপ্রায় মনীষীর অনেক কথাই মনে নূতন ক'রে জাগছিল। স্বল্প-পরিসরে সেই কথাগুলিই বলব।

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ ভূদেবের দেহান্তের পর লিখেছিলেন: আমি রঘুনাথ ও রঘুনন্দনের ধারায় বাংলার অত্যুজ্জ্বল ব্রাহ্মণপণ্ডিত শ্রেণীর শেষ আদর্শ ভূদেববাবুতে দেখিয়াছি। এই ভূদেব হিন্দুকলেজে রাজনারায়ণ বসু ও মধুসূদন দত্তের সহপাঠী। আধুনিক কালের বাঙালী তরুণ ঐ দুজন সহপাঠী সম্বন্ধে অনেক বেশী সচেতন। কিন্তু বাঙালীর মননভূমি-গঠনে ভূদেবের দান যে এঁদের সমতুল্য—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে ভূদেবের দৃষ্টি এঁদের চেয়ে স্বচ্ছ এবং প্রসারিত। নিবিষ্টচিত্তে যাঁরা ভূদেবের রচনাবলী পড়েছেন, তাঁরাই ভূদেবের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন যে, ভূদেবের চিন্তাধারা জাতীয় জীবনের সবদিকগুলি সম্বন্ধে গভীরভাবে অনুসন্ধানী এবং দূরদৃষ্টি সহায়ে ভবিষ্যৎ ভারতবাসীর সমুজ্জ্বল সম্ভাবনা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত।

এই চিন্তাধারার স্পষ্টতঃ দুটি দিক রয়েছে: এক, তাঁর অতীতমুখী জীবনজিজ্ঞাসা। সেখানে তিনি অতীতের মধ্যেই চিরন্তন সত্যকে খুঁজে পেয়েছিলেন। পিতা ৺বিশ্বনাথ তর্কভূষণ এই অতীতের জীবন্ত প্রতিমূর্তি।[২] বলা বাহুল্য, সে দৃষ্টি আধুনিককালের জীবনধারায় অনেকাংশে বিস্মৃত। আর এক, তাঁর ভবিষ্যৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গী—যে দৃষ্টিতে তিনি ভারতবাসীর সমগ্র জীবন-যাপনকে একটি শৃঙ্খলাসূত্রে আবদ্ধ ক'রে শান্ত-চিত্তে ভবিষ্যৎ নেতার আবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষারত। অতীতে-ভবিষ্যতে অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র স্থাপনাই ভূদেবের প্রতিভার পরিচায়ক।

* * *

মধুসূদনের ধর্মান্তর-গ্রহণ-সংবাদে বন্ধু ভূদেব স্বাভাবিকভাবেই মর্মাহত হয়েছিলেন। বোধ করি, এই ধর্মান্তরগ্রহণের মধ্যে ধর্মপিপাসার কোন পরিচয় না পেয়েই তিনি আহত হয়ে থাকবেন। রাজনারায়ণ ব্রাহ্ম হয়েছিলেন, কিন্তু তখন অবধি ব্রাহ্মেরা মনে-প্রাণে হিন্দু। তাই রাজ-নারায়ণের সঙ্গে একবার ভূদেব 'পিতৃভূমি' কনৌজ ঘুরে এসেছিলেন। কিন্তু স্বধর্মত্যাগী মধুসূদনের প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিয়েও তাঁর প্রতি পূর্বপ্রসন্নতা ফিরে পাননি। এদিক থেকে রাজনারায়ণ আরও উদারচিত্তের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং একথা বুঝেছিলেন যে ধর্মান্তরিত হলেও মধু-

১। প্রকাশক—শ্রীপ্রবোধকুমার পাল। অমরসাহিত্য প্রকাশন।

২। দ্রষ্টব্য—'পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থের উৎসর্গপত্র।

সূদনের অন্তরের সংস্কার হিন্দু ঐতিহ্যেই পরিপূর্ণ।[৩] অবশ্য রাজনারায়ণ এবং ভূদেব সে ঐতিহ্যের সচেতন উত্তরাধিকারী। ভূদেবের ক্ষেত্রে এই ঐতিহ্যের অনুভব গভীরতর। নিজেকে তিনি সুপ্রাচীন বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ বলে গৌরব অনুভব করতেন। অথচ মুসলমান ধর্ম ও ধর্মগুরু মহম্মদ সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধাও আন্তরিক। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, এই হ'ল যথার্থ ভারতীয় ঐতিহ্য। আন্তরিক ধর্মপিপাসা আমাদের কাছে চিরকাল শ্রদ্ধেয়।

ভূদেব-মানসের একটি প্রধান সূত্র মেলে তাঁর ছাত্রজীবনের একটি ঘটনায়: "রামচন্দ্র মিত্র নামক জনৈক শিক্ষক আমাদের পড়াইতেন। আমি যেদিন প্রথম ভর্তি হইলাম, সেইদিন রামচন্দ্র বাবু ভূগোল পড়াইবার সময় পৃথিবীর গোলত্বের বিষয় আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন। ইংরাজী-ওয়ালা মাত্রেই বিশেষতঃ ইংরাজী-শিক্ষকেরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও স্বদেশীয় শাস্ত্রের প্রতি শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিতে বড় ভালবাসেন। আমার পিতা যে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, রামচন্দ্রবাবু তাহা জানিতেন এবং সেই কারণেই পড়াইতে পড়াইতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মত গোল, কিন্তু ভূদেব, তোমার বাবা একথা স্বীকার করবেন না।' আমি কোন কথা কহিলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম। স্কুলের ছুটির পর বাড়ী আসিলাম। কাপড়চোপড় ছাড়িতে দেরী সহিল না, একেবারে বাবার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বাবা। পৃথিবীর আকার কি রকম। তিনি বলিলেন, 'কেন বাবা, পৃথিবীর আকার গোল' এই কথা বলিয়াই আমাকে একখানি পুঁথি দেখাইয়া দিলেন, বলিলেন, 'ঐ গোলাধ্যায় পুঁথিখানির অমুক স্থানটি দেখ দেখি।' আমি সেই স্থানটি বাহির করিয়া দেখিলাম, তথায় লেখা রহিয়াছে—'করতলকলিতামলকবদমলং বিদন্তি যে গোলম্।' বচনটি পাঠ করিয়া মনে একটু বলের সঞ্চার হইল। একখানি কাগজে ঐটি টুকিয়া লইলাম। পরদিন স্কুলে আসিয়া রামচন্দ্রবাবুকে বলিলাম, 'আপনি বলিয়াছিলেন, আমার বাবা পৃথিবীর গোলত্ব স্বীকার করিবেন না। কেন, বাবা তো পৃথিবী গোলই বলিয়াছেন, এই দেখুন তিনি বরং এই শ্লোকটি আমাকে পুঁথিমধ্যে দেখাইয়া দিয়াছেন।' রামচন্দ্রবাবু সমস্ত দেখিয়া ও শুনিয়া বলিলেন, কথাটি বলায় আমার একটু দোষ হইয়াছিল, তা তোমার বাবা বলবেন বৈ কি, তবে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ।"[৪] এই ঘটনাটি ভূদেবের পরবর্তী জীবনের পথনির্দেশক। অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে গিয়ে ভূদেব কোথাও চরম রক্ষণশীল, আবার কোথাও কোথাও আশ্চর্য প্রগতিবাদী—এই মনোভাবের মূলও ঐ ঘটনায় নিহিত।

* * *

সংক্ষেপে ভূদেবের জীবনবৃত্তটি এই রকম: ১৮২৭ সালে ২২শে ফেব্রুআরি ভূদেবের জন্ম। প্রধান শিক্ষাস্থল—হিন্দু কলেজ, কিন্তু প্রধান শিক্ষাগুরু তাঁর বাবা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ। ভূদেবের সত্যিকার শিক্ষা তাঁর কাছেই। দীক্ষাগুরু ভূদেবের আপন জননী, ছাত্রজীবনে বরাবর তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে অগ্রসর হন, কর্মজীবনে শিক্ষকতা অবলম্বন ক'রে ক্রমে ক্রমে স্কুল ইনস্পেক্টর হন। চাকরির পাশাপাশি সমান্তরালভাবে গ্রন্থ রচনা ও সাময়িক পত্র পরিচালনা চলতে থাকে। 'শিক্ষাদর্শন' ও 'সংবাদসার' এবং 'এডুকেশন

৩। আত্মচরিত—রাজনারায়ণ বসু।

৪। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পত্র—যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিত (৩য় সং) পৃ ৬৩৬।

গেজেট' ও 'সাপ্তাহিক বার্তাবহ' তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। 'এডুকেশন গেজেট' বাংলা সাহিত্যে বিশেষ স্মরণীয় পত্রিকা।

ভূদেব-সাহিত্যের প্রধান গুণ চিন্তাশীলতা এবং প্রধান কাজ চিন্তা-উদ্দীপন। একদিকে তাঁর গভীর প্রজ্ঞা ও অসাধারণ মনন-শক্তির নিদর্শন-স্বরূপ প্রবন্ধাবলী—'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'আচার প্রবন্ধ', 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১ম ও ২য়) এবং রূপকাকারে লেখা 'পুষ্পাঞ্জলি', আর একদিকে তাঁর সৃষ্টিশীল কল্পনার অভিনব প্রকাশ—'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' এবং ভাবী উপন্যাস-সাহিত্যের সূচনা 'সফলস্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'।

'পুষ্পাঞ্জলি'-তে কতিপয় তীর্থ-দর্শন উপলক্ষ্যে ব্যাস-মার্কেণ্ডেয়-সংবাদচ্ছলে হিন্দুধর্মের যৎকিঞ্চিৎ তাৎপর্যকথন রয়েছে। বিভিন্ন তীর্থ দর্শনের মধ্য দিয়ে ভূদেব আমাদের জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। ব্যাসদেব একদিন ধ্যানে এক অপূর্বমূর্তি দর্শন ক'রে মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের কাছে সেই মূর্তির স্বরূপ জানতে চান। এ প্রশ্নের উত্তরে মার্কণ্ডেয় তাঁকে নানা তীর্থে নিয়ে গেলেন, কুরুক্ষেত্র থেকে দ্বারাবতী, সেখান থেকে কুমারিকা হয়ে কামাখ্যা। কামাখ্যায় এসে তিনি ব্যাস-দেবকে বললেন, 'এক্ষণে তোমার ধ্যানপ্রাপ্ত দেবীমূর্তির প্রদক্ষিণ সহকারে দর্শনলাভ হইল।' পাশ্চাত্য আদর্শের জাতীয়তা না থাকলেও সমগ্র ভারত যে সুপ্রাচীনকাল থেকেই সাংস্কৃতিক ঐক্যে বিধৃত—এ কথাটি ভূদেব বারংবার তাঁর পাঠকবর্গকে মনে করিয়ে দিয়েছেন। ডিরোজিওর যুগের পর ভারতভূমির সামগ্রিক ধ্যানচেতনা আরও কত গভীর হয়েছে, ভূদেবের রচনাবলী তার উদাহরণ।

'পারিবারিক প্রবন্ধে'র সূচনায় ভূদেব লিখেছেন: "আমাদিগের পারিবারিক ব্যবস্থা আমার চক্ষে ভাল লাগিয়াছে। যেজন্য এবং যেরূপে ভাল লাগিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যদি প্রবন্ধগুলিতে মনের কথা ঠিক করিয়া বলিতে পারিয়া থাকি, তবে স্বজাতীয় অন্য ব্যক্তির মনেও স্ব স্ব পারিবারিক অবস্থা ভাল বলিয়া বোধ হইতে পারিবে, এবং তাহা বোধ হইলে এই পরাধীন, হীনবীর্য, অবজ্ঞাত জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করা বিড়ম্বনা বলিয়া বোধ হইবে না। কারণ, উপাসনাপ্রণালীই বল, আর ধর্মপ্রণালীই বল, সামাজিক প্রণালীই বল, আর শাসনপ্রণালীই বল, এক পারিবারিক ব্যবস্থাই সকলের নিদানীভূত। আমাদের পারিবারিক সুখ অধিক—এটি নিতান্ত অল্প কথা নয়; যদি পারিবারিক সুখ অধিক, তবে ধর্মও অধিক এবং ধর্ম অধিক থাকিলে কখন না কখন অবশ্যই মহিমাশালিতাও জন্মিতে পারে।"

ভূদেব কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে এই পারি-বারিক জীবনসত্যকে দেখেছেন, তা লক্ষণীয়। বর্তমানে ভাঙনের মুখে পারিবারিক স্থিতি প্রায় অন্তর্হিত, অথচ ব্যক্তি ও সমাজ এই পরিবারের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে। ভূদেব তাঁর 'পারিবারিক প্রবন্ধে' বাল্যবিবাহ থেকে আরম্ভ ক'রে বানপ্রস্থ অবধি সর্ববিষয়ে এদেশের পারি-বারিক জীবনের ঐতিহ্যের সঙ্গে বাস্তব জ্ঞানের সংমিশ্রণে একটি আদর্শ পারিবারিক বিজ্ঞানের গ্রন্থ রচনা করেছেন। অবশ্য বাল্যবিবাহের স্বপক্ষে বা বিধবাবিবাহের বিপক্ষে তাঁর মত বিদ্যাসাগরের দ্বারাই ভালভাবে খণ্ডিত, তবু সংসারে সম্প্রীতি স্থাপনের যে সব পন্থা তিনি নির্দেশ ক'রে গেছেন, আজকের দিনেও তারা আমাদের অনুধাবনযোগ্য। মাঝে মাঝে প্রবন্ধ-প্রান্তে তিনি কাল্পনিক কথোপকথন দিয়ে তাঁর বক্তব্য মনোজ্ঞ ক'রে তুলেছেন। এই পরিবার-বন্ধনের গুরুত্বকে তিনি কতখানি মূল্য দিতেন

তার পরিচয় আছে 'ধর্মচর্চা' প্রবন্ধটিতে। গৃহস্থাশ্রমের গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে ভূদেব আমাদের গৃহধর্ম সম্বন্ধে সচেতন হতে বলে ছিলেন। তাই 'পারিবারিক প্রবন্ধে'র সৃষ্টি।

কিন্তু 'আচারপ্রবন্ধ' বর্তমান জীবনধারার সঙ্গে প্রায় অসম্পৃক্ত। বস্তুতঃ কৃষিপ্রধান মধ্যযুগের জীবনধারার সঙ্গে আধুনিক পরিবর্তনশীল যন্ত্রযুগের জীবনধারার পার্থক্য এত বেশী যে সনাতন আচার-পদ্ধতির অনেকাংশই এ যুগে অচল। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে আচারহীনতাই কোন উন্নতির মাপকাঠি নয়। ভূদেবের ভাষায়—'সদাচারের মূল ধর্ম। ধর্ম অর্থে শাস্ত্রীয় বিধির প্রতিপালন।' সদাচারের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা আলোচনা ক'রে ভূদেব দেখিয়েছেন যে এর দ্বারা ব্যক্তির কর্মক্ষমতা বাড়ে, স্বভাব সংযত হয়, শরীর ও মনের উৎকর্ষ হয়, রিপুসংযম হয়। এক কথায় ভূদেবের দৃষ্টিতে আচার-সাধনের অর্থ মনুষ্যত্ব-সাধন। কিন্তু নবযুগের উপযোগী ক'রে আচার সৃষ্টি করার প্রয়োজন ভূদেব খুব কম ক্ষেত্রেই অনুভব করেছেন, তাই 'আচার প্রবন্ধ' অনেকটা ঐতিহাসিক কৌতূহল মেটায় মাত্র।

ব্যক্তিগত আচার-নিষ্ঠা, পারিবারিক সম্প্রীতি ও সামাজিক ঐক্যচেতনা—এ তিনের সম্মেলনে পূর্ণাঙ্গ জাতীয়তার সৃষ্টি। 'সামাজিক প্রবন্ধে' ভূদেব প্রাচীন সমাজব্যবস্থার অনেক ক্ষেত্রে পূর্ণ অনুসরণ করেছেন, আবার নূতন জাতিগঠনের উপযোগী দূরদৃষ্টিরও পরিচয় দিয়েছেন।

ভূদেবের দৃষ্টিতে হিন্দু সমাজব্যবস্থার উদ্দেশ্য সুখের অন্বেষণ নয়, 'শান্তি'-র অন্বেষণ। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য: "বস্তুতঃ আজিকালি ইংরাজদিগের হিতবাদ এবং জর্মনদিগের অনুশীলনবাদ শিখিয়া ইংরাজীশিক্ষিত নব্যদল বুঝিয়াছেন যে, সুখই জীবনের উদ্দেশ্য। সুতরাং শান্তিতে এবং সুখেতে আমি যে প্রভেদ আছে বলিলাম, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা বলিতে পারেন—শান্তি কিসের জন্য। উহাও সুখের জন্য. আমি বলি শান্তি শান্তির জন্য।"[৫] হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে ভূদেবের ধারণা কত উচ্চ ছিল তার নিদর্শন—"হিন্দুসমাজ বড়ই উচ্চ পদার্থ, যে ইহার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই ভাগ্যবান্ পুরুষ। এই সমাজ পৃথিবীর অপর সকল সমাজ অপেক্ষা আধ্যাত্মিক শক্তির অধীন, সুতরাং ইহাতে উপদেষ্টা যাজকবর্গের প্রাধান্য। উপদেষ্টার প্রাধান্য সংযম ও বিদ্যাবত্তার উৎকর্ষে, অতএব ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে সংযমশীল ও বিদ্যাবান্ করিয়া রাখিবার চেষ্টা কর, সকল শুভফল ফলিবে এবং হিন্দুসমাজের সম্যক্ বলবত্তা জন্মিবে।"[৬] উদ্ধৃতির শেষ বাক্যটি সম্বন্ধে বলা যায় যে, কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের উন্নয়নের দ্বারা যদি জাতির উন্নতি হ'ত তাহলে ভারতবর্ষের এই অধঃপতন হ'ত না। বিদ্যা বা অর্থ কোন শ্রেণীবিশেষের করায়ত্ত হ'লেই পরিণামে অকল্যাণকর হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের সমস্যা ব্রাহ্মণের উন্নতির সমস্যা নয়। সমগ্র জাতির উন্নয়নই আমাদের লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন। তবে ব্রাহ্মণের শ্রেয় আদর্শগুলি আজও জাতির পক্ষে সশ্রদ্ধচিত্তে বিবেচনার যোগ্য।

হিন্দুসমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভূদেব কি বিরাট আশা পোষণ করতেন, তার প্রমাণ: "যদি সত্য অসত্য হইতে বলবান, অস্বার্থপরতা স্বার্থপরতা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গ অবিশুদ্ধ ভাবমার্গ হইতে উৎকৃষ্ট হয়, তবে হিন্দুসমাজ অবশ্যই উহার মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে, ভারতবর্ষীয় অপরাপর সকল সমাজগুলিকে আত্মসাৎ করিবে এবং ইউরোপখণ্ডাদি পৃথিবীময় প্রকৃত জ্ঞানের এবং ধর্মের আলোকে বিকীর্ণ করিবে। বেকন,

৫। সুখ ও শান্তি—বিবিধ প্রবন্ধ (২য়)।

৬। সমাজ সংস্কার (বিবিধ প্রবন্ধ—২য় ভাগ)।

ডেকার্ট, কাণ্ট প্রভৃতিরা যে পর্যন্ত জ্ঞানমার্গ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, হিন্দুশাস্ত্রের জ্যোতিঃ তাহা অতিক্রম করিয়া উঠিবে এবং হিন্দু—চীন, জাপান প্রভৃতি এশিয়াখণ্ডকে যেমন ধর্মজ্যোতি দিয়াছে—তাহা অপেক্ষাও বিশুদ্ধতর, তীব্রতর, রমণীয়তর জ্যোতি ইউরোপে বিকীর্ণ করিবে।"[৭] এ যেন স্বামী বিবেকানন্দের ইউরোপ, আমেরিকা বিজয়ের পূর্বাভাষ। অবশ্য স্বামীজী আরও এগিয়ে বলেছেন, "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।" কিন্তু ভূদেব শাস্ত্র ও সমাজকে এক ক'রে ফেলেছেন। হিন্দুশাস্ত্রের উদারতা যদি হিন্দুসমাজে থাকত, তাহলে অনায়াসেই সে সমাজ পৃথিবীর আদর্শসমাজরূপে গণ্য হ'ত। অসংখ্য বিভেদের অর্থহীন জালে বিজড়িত সমাজ আজ অবধি অচল হয়ে আছে শাস্ত্রের উদার উপলব্ধিকে জীবনে প্রতিফলিত না করার অপরাধে। হিন্দুর অধ্যাত্ম-আদর্শ সম্বন্ধে ভূদেবের কল্পনা অবশ্য সত্য হতে চলেছে।

'সামাজিক প্রবন্ধে' ভূদেব ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা ও জাতীয়তাবোধ সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন। জাতীয়তাবোধের জায়গায় ভূদেব 'জাতীয়ভাব' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কেমন ক'রে ভূদেবের অন্তরে জাতীয়ভাবের প্রেরণা জাগে সে ইতিহাস তিনি অন্যত্র বলেছেন, —"যখন হিন্দু কলেজে পড়িতাম, তখন সাহেব শিক্ষক বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুজাতির মধ্যে স্বদেশানুরাগ নাই। কারণ, ঐ ভাবার্থপ্রকাশক কোন বাক্যই কোন ভারতবর্ষীয় ভাষায় নাই। তাঁহার কথায় বিশ্বাস হইয়াছিল এবং সেই বিশ্বাসনিবন্ধন মনে মনে যৎপরোনাস্তি দুঃখানুভব করিয়াছিলাম। তখন 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থ হইতে দক্ষকন্যা সতীর দেহত্যাগ সম্বন্ধীয় পৌরাণিক বিবরণ জানিতাম। কিন্তু সেই বিবরণ জানিয়াও শিক্ষক মহাশয়ের কথার প্রকৃত উত্তর অথবা আপন মনকে প্রবোধ প্রদান করিতে পারি নাই। এক্ষণে জানিয়াছি যে, আর্যবংশীয়দিগের চক্ষুতে বাযান্ন পীঠসমন্বিত সমুদয় মাতৃভূমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বরী-দেহ।"[৮]

ভারতবর্ষের এই মনোময়ী মূর্তি ধ্যান ক'রে ভূদেব হিন্দুসমাজ ও অন্যান্য সমাজের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন—হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমান সমাজব্যবস্থায় মানব-প্রকৃতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে।[৯]

হিন্দুসমাজের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে অপরাপর সমাজের সদ্‌গুণগুলি আমাদের গ্রহণীয়। 'জাতীয়ভাব' সম্বন্ধে ভূদেবের বিশ্লেষণের জন্য 'সামাজিক প্রবন্ধে'র উপসংহারটুকু লক্ষণীয়: "জাতীয়ভাবটি হৃদয়োন্নতি-সোপানের একটি প্রশস্ত ধাপ। (১) নিজের প্রতি অনুরাগ, (২) নিজ পরিবারের প্রতি অনুরাগ, (৩) বন্ধু-বান্ধব স্বজনের প্রতি অনুরাগ, (৪) স্বগ্রামবাসীর প্রতি অনুরাগ, (৫) নিজ প্রদেশবাসীর প্রতি অনুরাগ। এই পাঁচটি ধাপ ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া উঠিয়া তবে (৬) স্বজাতিবাৎসল্য বা স্বদেশানুরাগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থূল কথায় প্রাচীন গ্রীক এবং রোমীয়দিগের অধিকার এই পর্যন্ত। আবার পর্যায়ক্রমে ইহার উপরে (৭) স্বজাতি হইতে অনধিকার ভিন্ন অপর জাতীয় লোকের প্রতি অনুরাগ—অগষ্ট কোমৃতের মতানুযায়ীদিগের প্রকৃত অধিকার এই পর্যন্ত। (৮) মানবমাত্রের প্রতি অনুরাগ—সরলমনা যিশুর এবং মহাত্মা মহম্মদের দৃষ্টির এই সীমা। (৯) জীবনমাত্রের

৭। সমাজ সংস্কার (বিবিধ প্রবন্ধ—২য় ভাগ)।

৮। অধিকারী-ভেদ ও স্বদেশানুরাগ—ঐ।

৯। সামাজিক প্রকৃতি—হিন্দু এবং অপরাপর সমাজ (সামাজিক প্রবন্ধ)।

প্রতি অনুরাগ—বৌদ্ধদিগের এই সীমা। (১০) সজীব নির্জীব সমস্ত প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ—ইহাই আর্যধর্মের সর্বোচ্চ আসন—আর্যেরা তাহারও উপরে, সেই অবাঙ্‌মনসোগোচরে আত্মনিমজ্জন করিতে চাহেন।· ভারতবাসী 'জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়' বলিতেছেন। তিনি সে মহাবাক্য কখনই ভুলিবেন না—পরজাতি-বিদ্বেষ এবং পরজাতিপীড়ন তাঁহার স্বজাতি-বাৎসল্যের অঙ্গীভূত হইবে না। প্রত্যুত পৃথিবীর অপর সকল জাতি তাঁহার নিকটে জ্ঞান এবং প্রীতির ঐ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইবে। কিন্তু সম্প্রতি তিনি অপর একটি মন্ত্রেরও উচ্চারণ করিবেন, —'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'।"

অন্তরে অন্তরে ভূদেব একজন জাতীয় নেতার আবির্ভাব-প্রতীক্ষায় ছিলেন—যে নেতার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ আপন স্বধর্মের বৈশিষ্ট্যে জগৎ-সভায় আসন ক'রে নেবে। অতীত ও বর্তমানের সামঞ্জস্যসাধক এবং ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা সেই নেতার প্রয়োজন যে কতখানি এবং সে নেতার আদর্শ কেমন হবে সেকথা ভূদেব 'সামাজিক প্রবন্ধে'র 'নেতৃপ্রতীক্ষা'-অধ্যায়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রতিটি ভারতবাসীকেই এই নেতার আবির্ভাবের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। বস্তুতঃ স্বামীজী ও গান্ধীজীর মধ্য দিয়ে এই নেতৃশক্তিরই প্রকাশ ঘটেছিল। সুভাষচন্দ্রে সেই নেতৃশক্তির সাম্প্রতিকতম প্রকাশ। ভারতবাসীর উন্নতি যে ভারতীয় নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে ভারতীয় আদর্শের দ্বারাই হবে—এ কথা 'নিমচাঁদে'র ট্র্যাজেডির পর ভূদেব ভাল করেই বুঝেছিলেন।

ইংরেজ রাজপুরুষদের নিকট-সান্নিধ্যে ভূদেবকে অনেকবার আসতে হয়েছে। কিন্তু ভূদেব ইংরেজের রাজমহিমায় কখনও অভিভূত না হয়ে আপন ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা এমন সৌম্যগাম্ভীর্যের সঙ্গে রক্ষা করেছিলেন যে ইংরেজ রাজকর্মচারীরা তাঁকে রীতিমত শ্রদ্ধা করতেন। ভূদেব মনে করতেন যে, ইংরেজের আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান এবং উদ্যমশীলতা ছাড়া আর কিছুই আমাদের গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি মনে মনে বেশ জানতেন যে, আসলে ইংরেজেরা একটি 'যানে'র মধ্য থেকে ভারতভ্রমণ করে, "ঐ যান কাষ্ঠনির্মিত নয়, উহা অহঙ্কার দাম্ভিকতা পরজাতির প্রতি ঘৃণা এবং বিদ্বেষে বিনির্মিত, উহা চর্মচক্ষুর অগোচর পদার্থ—ইংরাজ উহারই ভিতরে বসিয়া সকল দেশে ভ্রমণ করেন এবং ভারতবর্ষে চাকুরি করিয়া ঘরে ফিরিয়া যান।"[১০] "ইংরাজকৃত যাবতীয় কার্যের হাড়ে হাড়ে যে স্বার্থপরতা মিশাইয়া থাকে তাহা তাঁহার অনুমোদিত স্বাধীন বা শুল্কবিহীন বাণিজ্য-প্রণালীর ইতিবৃত্ত এবং তদ্বিষয়ক বিচার-প্রণালীর পর্যালোচনার দ্বারা অতি সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধ হয়।"[১১]

উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলনগুলি উচ্চবর্ণের সমস্যা সমাধানেই নিয়োজিত। জাতিভেদের মত সর্বনাশা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন বা আলোচনা খুবই কম। ভূদেব জাতিভেদের পক্ষপাতীই ছিলেন। বিভিন্ন জাতির মধ্যে কর্মবিভাগের সুবিধা এবং বিদেশীদের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রাচীরের মত বাধাসৃষ্টি —এই দুদিক থেকে ভূদেব জাতিভেদের সুবিধার দিকটাই দেখেছেন। এ বিষয়ে রাজনারায়ণ, দেবেন্দ্রনাথ, ভূদেব প্রভৃতির চেয়ে স্বামী বিবেকানন্দ অগ্রগামী। জাতিভেদের অসঙ্গতির অবসান যে একান্ত প্রয়োজন এবং গণশক্তির অভ্যুত্থানেই যে জাতির মঙ্গল—একথা

১০। হিন্দুসমাজ ও কূপমণ্ডুকতা—বিবিধ প্রবন্ধ (২য়)

১১। স্বাধীন বা অবাধ বাণিজ্য—বিবিধ প্রবন্ধ (২য়)

বিবেকানন্দের মত স্থির প্রত্যয়ের সঙ্গে তখন আর কেউ উপলব্ধি করেন-নি।

জাতিভেদের সমর্থনে ভূদেব কোম্‌তের মতামত উদ্ধৃত করেছেন।[১২] কিন্তু কোম্‌ত ও ভূদেবের সমর্থন সত্ত্বেও জাতিভেদের দিন আজ অবসানপ্রায়। জন্মগত জাতিভেদ সর্ব অবস্থায় নিন্দনীয়। কিন্তু কর্মগত বিভাগ যে জাতির পক্ষে কল্যাণকর, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে সে বিভাগ অনেকটা আপনা থেকেই হয়ে যায়। কোম্‌তের মতামত কিন্তু ভূদেব অন্যত্র বিশেষ গ্রাহ্য করেন-নি। বিশেষতঃ জাতীয়তা এবং মানবত্বাপূজা সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা অনুধরনের ছিল। এ বিষয়ে 'সামাজিক প্রবন্ধের' উপসংহার এবং কবি হেমচন্দ্রের সঙ্গে 'দশমহাবিদ্যা'-সম্পর্কে ভূদেবের পত্রালাপ দ্রষ্টব্য।

বাঙালী সংস্কৃতির পটভূমিতে যুগযুগান্ত থেকে তন্ত্রের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। উনিশ শতকের মনীষীদের মধ্যে ভূদেবই তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করেছেন। 'রাজা রামমোহন রায় ও তন্ত্রশাস্ত্র' প্রবন্ধটি এ বিষয়ে সুন্দর আলোচনা। রামমোহন ও পরবর্তী ব্রাহ্মসমাজ মহানির্বাণতন্ত্রকে কীভাবে গ্রহণ করেছিলেন, সে সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনার ইচ্ছা আছে। এ প্রবন্ধে শুধু ভূদেবের অনুসরণে রামমোহনের সাধনপ্রণালীতে মহানির্বাণতন্ত্রের আদর্শের প্রভাব দেখাবার জন্য একটু উদ্ধৃতি দিই:

পূজনে পরমেশস্য নাবাহনবিসর্জনে।
সর্বত্র সর্বকালেষু সাধয়েদ্ ব্রহ্মসাধনম্‌॥
অস্নাতো বা কৃতস্নানো ভুক্তো বাপি বুভুক্ষিতঃ।
পূজয়েৎ পরমাত্মানং সদা নির্মলমানসঃ॥

রামমোহন-রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত পাঠক-মাত্রেই উদ্ধৃত অংশটির প্রতিফলন রামমোহনের রচনায় দেখতে পাবেন।

তন্ত্রসাধনার পরবর্তী ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে 'বঙ্গসমাজের বিবরণ'[১৪] প্রবন্ধে ভূদেব লিখেছেন: "রাজা রামমোহন রায়ের পর শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাবই প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য। ইনি অতি সরল ভাষায় হিন্দু মতবাদের শাস্ত্রসম্মত সামঞ্জস্য করিয়া যে সকল উপদেশ দিয়াছেন তাহার প্রকৃত অর্থ তাঁহার নিজের জীবনচরিত হইতে বুঝিয়া যদি প্রকৃত তান্ত্রিক সাধনায় বাঙ্গালী ভক্তিপূর্বক রত হয়, তাহা হইলে আবার সমাজমধ্যে একাগ্রচিত্ত, উদ্যমশীল, নির্ভীক, কর্মঠ ও ধার্মিক লোকের বৃদ্ধি অবশ্যই হইবে।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনাদর্শের প্রতি ভূদেবের এই আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁর গভীর মনন-শক্তির পরিচায়ক।

এতক্ষণ আমরা ভূদেব-চিন্তাধারার বিভিন্ন দিকগুলি আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি। মৌলিক চিন্তাশক্তি, যুক্তিনিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গী, বিস্তৃত অধ্যয়ন ও মনন—এই সব কয়টি গুণ প্রবন্ধকার ভূদেবের ছিল। সেইসঙ্গে তিনি যথার্থ সাহিত্য-রসিক। বাংলা উপন্যাসের সূচনায় তাঁর দান আছে এবং সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রেও তাঁর প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় ভূদেবের উত্তরসূরী বিদ্যাসাগর। 'এডুকেশন গেজেটে' ভূদেব 'উত্তরচরিত', 'রত্নাবলী' ও 'মৃচ্ছকটিক' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পরে 'বিবিধ-প্রবন্ধ (১ম)' নামে প্রবন্ধ কয়টি প্রকাশিত হয়। ভূদেবের সাহিত্য-সমালোচনায় সাহিত্যতত্ত্বের চেয়ে ভারতীয় আদর্শই বেশি ফুটেছে। নব্য হিন্দুয়ানির স্রোতে

১২। জাতিভেদ—ঐ।
১৩। বিবিধ প্রবন্ধ (২য়)।
১৪। বিবিধ প্রবন্ধ (২য়)।

'আর্যামি'র দিকে তখনকার দিনে যে ঝোঁক দেখা দিয়েছিল, ভূদেবের এই সমালোচনাগুলির মধ্যেও তার প্রভাব দেখি। এ দৃষ্টিভঙ্গীর অন্তরালেও যে মৌলিক চিন্তা আছে তা 'মৃচ্ছকটিকে'র আলোচনার শেষাংশ উদ্ধৃত করলেই স্পষ্ট হবে। —"মৃচ্ছকটিক-নাটকে যে সকল পাত্রের উল্লেখ আছে তাহাদিগের মধ্যে প্রধান দুইজনের চরিত্র পর্যালোচনা করিয়া সাত্ত্বিক এবং রাজস, হিন্দু আর্য এবং ইউরোপীয় আর্য, এতদুভয়ের মধ্যে যে চিন্তাদর্শ সম্বন্ধীয় লৌকিক ভেদ জন্মিয়া গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। ইউরোপীয় পুরুষ সাহস, নির্ভীকতা এবং স্বৈরাচারকে বীরস্বভাবের প্রধান উপকরণ মনে করেন। তাঁহার মতে যুদ্ধবীরই বীর। সংস্কৃত গ্রন্থকার সাহস এবং নির্ভীকতার গৌরব করিয়াও উহাদিগকে বীরভাবের অতি গৌণ উপাদানই মনে করেন। তাঁহার চক্ষে বীর দেখিতে হইলে দানবীর, সত্যবীর, দয়াবীর, ক্ষমাবীর, ধৈর্যবীর প্রভৃতি প্রথমে উদিত হয়—যুদ্ধবীর সকলের পশ্চাদ্ভাগে আইসেন।" ভারতীয় Heroic Age (ক্ষাত্রযুগ) ও ইউরোপীয় Heroic Age-এর মূল পার্থক্য এখানে সুবিশ্লেষিত।

এই ভারত-গৌরবের অনুভূতিই ভূদেবকে কথাশিল্পের ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছিল। বাংলা উপন্যাসের সূচনার ইতিহাসে ভূদেবের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭) বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এর ভূমিকায় ভূদেব লিখেছেন: "গল্পচ্ছলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকৃত বিবরণ এবং হিতোপদেশ শিক্ষা হয়, ইহা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। ইহাতে দুইটি স্বতন্ত্র উপন্যাস সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহার প্রথমটির সহিত দ্বিতীয়টির কোন সম্বন্ধই নাই। উভয় উপন্যাসেই রাজ্য সম্বন্ধীয় যে সকল কথা আছে, তাহা প্রকৃত ইতিহাসমূলক। অপরাপর যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহার কোন কোন অংশমাত্র ইতিবৃত্তে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাও সর্বতোভাবে প্রামাণিক বলিয়া গ্রাহ্য নহে।"

ভূদেবের 'সফলস্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' উপন্যাস হিসাবে খুব উঁচুদরের রচনা নয়। কিন্তু পরবর্তীকালে বঙ্কিমের মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে পরিণত শিল্পরূপ আমরা দেখতে পাই ভূদেবের এ রচনা দুটি তার শুভসূচনা। কৌতূহলী পাঠক মূলগ্রন্থ পড়ে এর কাহিনীরস উপভোগ করতে পাবেন। বর্তমান প্রবন্ধে আর স্থানবিস্তার অসম্ভব। 'সফলস্বপ্ন' অতি ছোট কাহিনী। সে তুলনায় 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' ছোট হলেও বীজাকারে উপন্যাস। ইতিহাসের সার্থক পটভূমি-রচনায়, চরিত্র-সৃষ্টির নৈপুণ্যে এবং ঘটনা সমাবেশের কৃতিত্বে ভূদেবের প্রতিভার স্বাক্ষর 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে' সুস্পষ্ট। পরবর্তীকালে প্রবন্ধ সাহিত্যে বিশেষভাবে মন না দিলে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্য তাঁর দ্বারা আরও সমৃদ্ধ হ'ত।

সংক্ষিপ্ত পরিসরে ভূদেব-সাহিত্যের রূপরেখা দেবার চেষ্টা করলাম। এই প্রবন্ধে মনস্বী ভূদেবকে তাঁর নিজস্ব চিন্তার মধ্য দিয়েই দেখবার চেষ্টা করেছি। বর্তমান বাংলার সাহিত্যিকেরা মতামতের দিক থেকে যতই ভিন্নপন্থী হন না কেন, ভূদেবের মৌলিক চিন্তাশক্তি, অধ্যবসায়, একাগ্রতা ও গভীরসন্ধানী বিচারশক্তির আদর্শ গ্রহণ করলে বাংলাসাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ বৃদ্ধি পাবে—এই আমাদের বিশ্বাস।

প্রাচীন ভারতের শ্রমিক

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

[লেখক অবসরপ্রাপ্ত সেবায় অফিসার, বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স। এ সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছিল শ্রমিকদের পারিশ্রমিক, সুবিধা, অবসর, পারিবারিক আয়ব্যয়, সংরক্ষণ-তহবিল। উদ্বোধন, আষাঢ়, ১৩৬৪, পৃষ্ঠা ৩০২—৩ দ্রষ্টব্য। উঃ সঃ।]

শ্রমিকদেব বাসগৃহ

আজকাল শ্রমিকদেব বাসের জন্য যে সকল গৃহ নির্মাণ করা হইতেছে তাহাতে দুইটি জিনিসের উপরেই বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়: (ক) কত কম ব্যয়ে বাসগৃহ নির্মিত হইতে পারে। (খ) বৃষ্টি,ঠাণ্ডা ও রৌদ্র হইতে কিভাবে শ্রমিকগণ রক্ষা পাইতে পারে। অর্থাৎ অর্থ ও শরীরের দিকটাই কেবলমাত্র দেখা হয়। ইহা ছাডা আরও যে অধিকতর আবশ্যকীয় একটি দিক আছে, সে সম্বন্ধে বিশেষরূপে নজর দেওয়া হয় না। ইহা পাবিবারিক সুখশান্তি, এই সকল গৃহে বাস করিলে কি করিয়া তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিবে, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয় না।

কৌটিল্য শ্রমিকদের বাসগৃহ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এরূপভাবে গৃহ নির্মাণ কবিতে হইবে যে শ্রমিকরা বৃষ্টি ও বাতাস হইতে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা পায়, অর্থাৎ বৃষ্টির জল ভিতরে না পডে এবং বাতাসে ঘরের চাল যাহাতে বাঁকিয়া, ভাঙিয়া বা উডিয়া না যায় তাহা দেখিতে হইবে ও দরমা-জাতীয় কোন বস্তু চালের উপর ঢাকা দিতে হইবে। এরূপ ব্যবস্থা না থাকা দণ্ডনীয়।

তিনি আরও বলিয়াছেন: একজন শ্রমিকের ঘরের জানালা বা দরজা অন্য জনেব ঘরের সামনা-সামনি নির্মাণ করা দণ্ডনীয়। তবে দুইটি বাস-গৃহের মধ্য দিয়া যদি কোন রাস্তা থাকে, তবেই ঐরূপ নির্মাণ করা চলিতে পারে।

ইহা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে পূর্বে পারিবারিক গোপনীয়তার (Privacy) ও সুখশান্তির দিকে যথেষ্ট নজর রাখা হইত। আজকাল এক লাইনে কতকগুলি ঘর নির্মাণ করা হয়, ও তাহাদের সামনে এক লম্বা বারান্দা থাকে। ইহার ফলে, অবাধে এক ঘর হইতে অন্য ঘরে যাতায়াত করা যায়। শ্রমিকরা এখনও এত শিক্ষিত ও সঞ্চয়ী হয় নাই যে জানালা-দরজায় পরদা ব্যবহার কবিবে। আজকালকার শ্রমিকদের বাসগৃহ-নির্মাণপ্রথায় অবাধ মেলামেশার সুযোগ ঘটায় অনেক সময়ই পারিবারিক শান্তি নষ্ট হয়। শ্রমিকদের মধ্যে সুরাপান এখনও সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয় নাই। সুরাপান একটি সংক্রামক জিনিস। নিকটে একজন সুবাপান করিলেই অন্যজন ঐ কার্যে আকৃষ্ট হয়। এইভাবে এক লাইনে বাসগৃহ নির্মাণ করার ফলে যদি পাবিবারিক সুখশান্তির অভাব হয়, তাহা হইলে অর্থ উপার্জনের ফল কি?

শ্রমিকদের মজুরী

শ্রমিক শব্দটি পূর্বকালে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইত। কৃষিকার্যের মজুর, গো-পালক, তন্তুবায়, স্বর্ণকার, তাম্র-ও দস্তা-কারিকর, কাঁসারি, ফেরি-ওয়ালা, এমনকি গৃহভৃত্যগণও (Vide Indian Culture, 1937) ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাহাদের কার্যানুযায়ী মজুবীর হার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নির্দিষ্ট ছিল। শুক্রাচার্য নিম্নলিখিত হার ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন:

(ক) স্বর্ণকারাদি: স্বর্ণকারের কার্যনৈপুণ্যের উপর মজুরী নির্ভর করিত। উচ্চ শ্রেণীর কার্য হইলে নির্মিত বস্তর মূল্যের ১/৩০ অংশ মজুরী পাইবার নির্দেশ ছিল। যদি মধ্যম শ্রেণীর কার্য হইত তাহা হইলে ১/৬০ অংশ, নিম্ন শ্রেণীর কার্য হইলে ১/১২০ অংশ মজুরী পাইত। কটকী (Bracelet) তৈরী করিলে উহার অর্ধেক মজুরী

আর স্বর্ণ গলাইলে তাহারও অর্ধেক মজুরী পাইবার নিয়ম ছিল। রৌপ্যনির্মিত দ্রব্য—খুব উচ্চ শ্রেণীর কাজ হইলে মূল্যের অর্ধেক মজুরী পাইত। মধ্যম শ্রেণীর কার্য হইলে তাহার অর্ধেক এবং নিম্ন শ্রেণীর কার্য হইলে তাহারও অর্ধেক মজুরী দিবার নিয়ম ছিল। তামা, দস্তা, কাঁসার জিনিস প্রস্তুতের মজুরী মূল্যের অর্ধেক দিবার নির্দেশ ছিল এবং লৌহনির্মিত দ্রব্য প্রস্তুতের মূল্যের ১/৮ অংশ দেওয়া হইত। কৌটিল্য বলিয়া গিয়াছেন—যে স্থলে মজুরী দ্রব্যনির্মাণের পূর্বে নির্ধারিত হয় নাই, সে স্থলে কর্মনৈপুণ্য ও নির্মাণকার্য সমাধান করিতে কতটুকু সময় লাগিয়াছে বিবেচনা করিয়া মজুরী স্থিরীকৃত হইবে।

(খ) কৃষিকার্যের শ্রমিক: কৃষিকার্যের জন্য শ্রমিক নিযুক্ত হইলে যদি নিয়োগের সময় মজুরী নির্ধারিত না হইয়া থাকিত, তাহা হইলে ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন ফসলমূল্যের ১/১০ অংশ মজুরী হিসাবে পাইবে।

(গ) গোপ: গোপগণ যে মাখন তুলিবে সেই মাখনের মূল্যের ১/১০ অংশ পাইবে। নারদ বলিয়াছেন যে—১০০ গরু ১ বৎসর চরাইলে মজুরীস্বরূপ একটি বাছুর এবং ২০০ গরু চরাইলে একটি গাভী পাইবে।

(ঘ) ব্যবসাদার: যে জিনিস বিক্রয় করিবে সে দ্রব্যমূল্যের ১/১০ অংশ পাইবে।

এই সকল হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে মজুরীর হার বেশ উচ্চই ছিল এবং শ্রমিকরা যাহাতে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে পরিবার লইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে, এ বিষয়ে বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখা হইত।

শ্রমিক-সঙ্ঘ

শ্রমিকগণ একত্র হইয়া নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘ (Guild) গঠন করিত। বৌদ্ধ জাতকে অনেক রকম সঙ্ঘের উল্লেখ আছে। রাজ-সরকার এই সঙ্ঘগুলির অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন এবং রাজা তাহাদের দাবিদাওয়া সর্বদাই সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিতেন। 'মুখাপাক্ষা' জাতকে দেখিতে পাওয়া যায় যে রাজা যখন জাঁকজমকের সহিত রাস্তায় বাহির হইতেন, তখন তিনি চারজাতি ও কতকগুলি সঙ্ঘ একত্র করিতেন। কোন কোন জাতকে দেখা যায় যে সঙ্ঘের নেতারা রাজসরকারে উচ্চ পদ লাভ করিতেন ও রাজাদের খুব প্রিয় হইতেন। মন্ত্রীসভায় একজন ব্যক্তি শ্রমিকদের প্রতিনিধিরূপে স্থান পাইতেন। এই সঙ্ঘগুলিই সরকার ও শ্রমিকদের মধ্যে মধ্যস্থের কাজ করিত এবং শ্রমিকদের ব্যক্তিগত অভাব অভিযোগ ও বিবেচনা করিত। বিনয়পিটকে (Vinaya Pitaka IV—p 226) দেখা যায় যে, এই সঙ্ঘগুলি শ্রমিকদের পারিবারিক এমনকি স্বামী-স্ত্রীর কলহও মীমাংসা করিয়া দিত।

উপসংহার

জাগতিক সকল বিষয়ই প্রকৃতির নিয়মশৃঙ্খলে বাঁধা। ঢেউয়ের গতির ন্যায় উত্থান ও পতন সকল বিষয়েই আমাদের চোখে পড়ে। হিন্দু-যুগে শ্রমিকদের অবস্থা উত্তম ছিল। রাজসরকার ও সমাজ তাহাদের সুখসুবিধার বিষয় সততই বিবেচনা করিতেন। মুসলমান-যুগে অবনতি হইতে আরম্ভ হইয়া ইংরেজ-আমলে শ্রমিকদের অবস্থা অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইল। শ্রমিকদের এই দুরবস্থা মহাপ্রাণ স্বামী বিবেকানন্দকে কিরূপ আঘাত করিয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে এবার শূদ্রশক্তির জাগরণ হইবে। শ্রমিকদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দর্শন করিয়া উচ্ছ্বাসের সহিত তিনি (পরিব্রাজকে) লিখিয়া গিয়াছেন: নূতন ভারত বেরুক, বেরুক লাঙ্গল ধ'রে, চাষার কুটীর ভেদ ক'রে, জেলে-মুচী-মেথরের ঝুপড়ীর মধ্য হ'তে, বেরুক মুদীর দোকান থেকে। ভুনাওলার উনানের পাশ থেকে, বেরুক ঝোড় জঙ্গল পর্বত পাহাড় থেকে।'

আমরা দেখিতে পাইতেছি যে এখন শূদ্রশক্তির জাগরণ আরম্ভ হইয়াছে। এই শক্তি সকল শক্তিকে পরাভূত করিয়া আপন মহিমায় বিকশিত হইতেছে। কতদিনে এ-শক্তির পূর্ণ বিকাশ হইবে ও কতদিন উহা উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে, তাহা কেবল যাঁহার শক্তি তিনিই জানেন।

অবতারবাদের শাস্ত্রপ্রমাণ

ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য

অনুশাসনার্থক শাস্‌-ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ষ্ট্রন্‌-প্রত্যয় করিয়া শাস্ত্র-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে,[১] যাহা মানুষকে হিত উপদেশ করে তাহা শাস্ত্র। একদেশীর মতে যে অপৌরুষেয় বা পৌরুষেয় বাক্য মানুষকে ইষ্টপ্রাপ্তির উপায়ে প্রবৃত্ত করে অথবা অনিষ্ট পদার্থের সাধন হইতে নিবৃত্ত করে তাহাই শাস্ত্র।[২] কিন্তু আচার্য শঙ্করের মতে—যাহা লোকে জানে না অথচ ইষ্ট, অনিষ্ট বা ইষ্টানিষ্ট-উপায়ের জ্ঞাপক তাহাই শাস্ত্র। এই শাস্ত্র প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্তঃ শ্রুতি ও স্মৃতি। এখানে স্মৃতি বলিতে বেদমূলক পৌরুষেয় শাস্ত্রমাত্রকে বুঝিতে হইবে। এই শাস্ত্রকে মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি ১৮ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। রঘুনন্দনও প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে ১৮ প্রকার শাস্ত্রের কথা বলিয়াছেন, যথা শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, চারি বেদ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র।[৩] যাজ্ঞবল্ক্য শেষোক্ত চারিটিকে বাদ দিয়া ১৪ প্রকার শাস্ত্রের কথা বলিয়াছেন। ভামতীকার বেদকে পৃথক্‌ রাখিয়া উহার ছয় অঙ্গ, পুরাণ, ন্যায়, ধর্মশাস্ত্র ও মীমাংসা—এই ১০ প্রকার বিদ্যাস্থানের কথা বলিয়াছেন। ইহাদের প্রত্যেকের আবার বহু ভেদ আছে।

যাহা হউক সমস্ত শাস্ত্রকে শ্রুতি ও স্মৃতি এই দুই প্রকার বিভাগের মধ্যে রাখিয়া বিরোধের মীমাংসা করা যায়। মনু বলিয়াছেন বেদই শ্রুতি, আর ধর্মশাস্ত্রই স্মৃতি। ইহারা সমস্ত অর্থের প্রকাশক, প্রতিকূল তর্কের দ্বারা এই শ্রুতি ও স্মৃতির বিচার করিবে না, যেহেতু এই উভয় শাস্ত্রের দ্বারা ধর্ম পরিজ্ঞাত হয়।[৪] ন্যায় ও বৈশেষিক মতে বেদ পৌরুষেয় হইলেও সর্বজ্ঞ ঈশ্বর-রচিত বলিয়া প্রমাণ। সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত মতে, অপৌরুষেয়ত্ব নিবন্ধন বেদের প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ। স্মৃতি অর্থাৎ পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র প্রভৃতি বেদমূলক। শিষ্টগণ কর্তৃক প্রমাণরূপে স্বীকৃত বলিয়া প্রমাণ, যেহেতু ভগবান্‌ গীতামুখে বলিয়াছেন, 'স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে' [গীঃ৩।২১]। কুমারিল ভট্টপাদও বলিয়াছেন শিষ্ট ব্যক্তিরা যাহাকে ধর্ম বা ধর্মের প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা অবশ্যই ধর্ম বা ধর্মের প্রমাণ হইবে, তাঁহারা অবৈদিক কিছু আচরণ করেন না।[৫] শ্রীরামকৃষ্ণও পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতিকে প্রমাণ

১। সর্বধাতুভ্যষ্ট্রন্‌ [পাঃ উণাদিসূত্র]

২। প্রবৃত্তির্বা নিবৃত্তির্বা নিত্যেন কৃতকেন বা।
পুংসাং যেনোপদিশ্যেত তচ্ছাস্ত্রমভিধীয়তে ॥ [ব্রঃ সূঃ ১।১।৪ ভামতীউদ্ধৃত বচন]

৩। অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ। ধর্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দশ ॥
আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো গান্ধর্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ। অর্থশাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তাঃ ॥ [প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব]

৪। শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্মশাস্ত্রন্তু বৈ স্মৃতিঃ।
তে সর্বার্থেষ্বমীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্মো হি নির্বভৌ ॥ [মনুসংহিতা ২।১০]

৫। ধর্মত্বেন প্রপন্নানি শিষ্টৈর্যানি তু কানিচিৎ।
বৈদিকৈঃ কর্তৃসামান্যাৎ তেষাং ধর্মত্বমিষ্যতে।" [মীমাংসা দর্শন—তন্ত্রবার্তিক ১।৩।৩]

স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বাধূ্ল স্মৃতিতেও ভগবান্ বলিয়াছেন—শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়ই আমার অনুশাসন, যে আমার সেই আজ্ঞাকে উল্লঙ্ঘন করে, সে আমার আজ্ঞাভঙ্গকারী ও দ্রোহকারী। আমার ভক্তও যদি তাহা করে, তবে সে প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব নয়।[৬] অতএব সর্বত্র উপাখ্যানভাগগুলিতে প্রামাণ্য না থাকিলেও ঈশ্বর, আত্মা, বন্ধন, মুক্তি, জ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে পুরাণের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। মীমাংসাদর্শনেও স্মৃতির প্রামাণ্য ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।[৭]

ভগবান্ যে শরীরকে আশ্রয় করিয়া লীলা করেন সেই শরীরকে অবতার বলে। অব-পূর্বক তৃ-ধাতুর উত্তর অধিকরণ বাচ্যে ঘঞ্-প্রত্যয় করিয়া অবতার-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।[৮]

নিখিল জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়-কর্তা এক পরমেশ্বরই কেবলমাত্র করুণা-বশতঃ জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত পৃথিবী, স্বর্গ প্রভৃতি লোকে, প্রত্যেক কল্পে ভিন্ন ভিন্ন যুগে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি পুরুষ-মূর্তি এবং দুর্গা, লক্ষ্মী, রাধা, সরস্বতী, সাবিত্রী, কালী প্রভৃতি স্ত্রী-মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া দুষ্টদমন, শিষ্টপালন ও ধর্মস্থাপন পূর্বক ভক্তগণের সহিত লীলা-বিলাস সম্পাদন করেন। যে দেশে, যে কালে, যে ভাবে, যে মূর্তিতে অবতীর্ণ হইলে জীবকল্যাণ সাধিত হয়, সেই দেশে, সেই কালে, সেই ভাবে, সেই মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া ভগবান্ কৃপা বিতরণ করেন।

এই অবতারবাদ চিরন্তন। বেদ, পুরাণ, উপপুরাণ, মহাপুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে এই অবতারের উল্লেখ আছে। বেদে অবতারের সম্বন্ধে বহু প্রমাণ আছে, তাহার দুই একটি উল্লেখ করা হইতেছে।[৯]

শুক্ল যজুর্বেদের শতপথ-ব্রাহ্মণে আছে: ভগবান্ মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রথমে মনুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জলাশয়ে স্থাপন করিতে বলিলেন। মনু সেইরূপ করিলে মৎস্য ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জলাশয়কে ব্যাপ্ত করিল।[১০] অন্যত্র আছে: তিনি কূর্ম হইলেন।[১১] দেবতা ও অসুরগণের বিবাদ উপস্থিত হইলে ভগবান বামনরূপ ধারণ করিয়া অসুরগণকে পরাভূত করিলেন।[১২]

কেনোপনিষদে আছে—ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা ও অসুরগণের সংগ্রামে পরমেশ্বর দেবতাদিগকে যুদ্ধে জয়ী করিয়াছিলেন, দেবতারা অহঙ্কার-বশতঃ নিজেদিগেরই জয়ের অভিমান করায় সেই পরমাত্মা অদ্ভুত রূপ ধারণ করিয়া তাহাদের অভিমান খণ্ডনপূর্বক উমারূপ ধারণ করিয়া ইন্দ্রকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন।[১৩]

গীতাতে ভগবান্ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন, আমি পূর্বে এই যোগ সূর্যকে বলিয়াছিলাম।[১৪]

৬। শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্তামুল্লঙ্ঘ্য বর্ততে। আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্রোহী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ॥ [বাধূ্ল স্মৃতি]

৭। মীমাংসা-দর্শন—১।৩।১।

৮। 'অবে তৃস্ত্রোর্ঘঞ্' [পাণিনি ৩।৩।১২০]

৯। স্থানাভাবে বেশী উল্লেখ করিতে পারা গেল না। প্রয়োজন হইলে ভবিষ্যতে করা যাইতে পারে।

১০। স মৎস্য উপন্যাপুপ্লুবে [শতপথব্রাঃ ১।৮।৫]—সেই মৎস্যরূপী ভগবান জলরাশিকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিলেন। শশ্বদ্ধ ঝষ আস।—তিনি অতিশীঘ্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন।

১১। স কূর্ম আস। [শতপথব্রাহ্মণ]

১২। বামনো হ বিষ্ণুরাস। [শতপথ ব্রাঃ ১।২।৩।৫]

১৩। স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানা মুমাং হৈমবতীম্ [কেন উপনিষৎ ৩।১২]

১৪। ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্। [গীতা—৪।১]

তিনি যে-রূপে সূর্যকে যোগের উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই সূর্যদেবতার অন্তর্যামী রূপের কথা ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, যথা: 'য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়: পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আ প্রণখাৎ সর্ব এব সুবর্ণঃ [ছাঃ উঃ ১।৬।৬]—অর্থাৎ এই যে আদিত্য দেবতার মধ্যে জ্যোতির্ময় পুরুষ দেখা যাইতেছে, তাঁহার শ্মশ্রু সুবর্ণময়, কেশ সুবর্ণময়, নখ হইতে সমস্ত শরীরই সুবর্ণময়।

বিষ্ণুপুরাণের ৪র্থ অধ্যায়ের ৭।৮ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী ভগবানের মৎস্য-কূর্মাদি অবতার সম্বন্ধে শ্রুতি উদ্ধার করিয়াছেন, যথা: 'সোঽপশ্যৎ পুষ্করপর্ণে তিষ্ঠন্, সোঽমন্যত অস্তি চৈতদ্ যস্মিন্নিদমধিতিষ্ঠতি', 'স চ বারাহং রূপং কৃত্বা উপন্যমজ্জৎ, স পৃথিবীমপ আচ্ছর্দ্'—সেই ভগবান্ পদ্মপত্রে অবস্থান করিয়া দেখিতে পাইলেন, তিনি মনে করিলেন—ইহা যাহাতে অবস্থান করে সেইরূপ অধিষ্ঠান আছে। তিনি বরাহরূপ ধারণ করিয়া জলে নিমগ্ন হইলেন এবং পৃথিবীকে জল হইতে উদ্ধার করিলেন।

আবার এই একই পরমেশ্বর নিজ উপাধিভূত মায়ার সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ ভেদে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও শিব রূপ ধারণ করেন। বেদে ব্রহ্মার কথা বহু স্থলে আছে। ব্রহ্মাকে বিধাতা, ধাতা, প্রজাপতি নামে বুঝানো হইয়াছে, যথা: 'ভূরিতি বৈ প্রজাপতিঃ। ইমামজনয়ত' [শতপথ ব্রাঃ ২।১।৪। ১১] 'ধাতা যথা পূর্বমকল্পয়ৎ' [ঋগ্বেদ]। 'ব্রহ্মা দেবানাং পদবীঃ' (নারায়ণ উপনিষদ্ ২।১২)।—অর্থাৎ ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি দেবতার মধ্যে ভগবানের বিভূতির অংশস্বরূপ। অবশ্য হিরণ্যগর্ভ বা বিরাটরূপী ব্রহ্মা ঈশ্বর নহেন। তাঁহারা শ্রেষ্ঠ জীব। ঈশ্বরকোটির ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভাদি হইতে ভিন্ন।

শিবরূপে পরমেশ্বরের অবতারের কথাও বেদে বহুলভাবে কীর্তিত। ঋগ্বেদ প্রভৃতিতে শিবকে রুদ্র নামে প্রচার করা হইয়াছে। শিব এবং রুদ্র যে একই দেবতা—তাহা যজুর্বেদের রুদ্রসূক্তে 'নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ' মন্ত্রে স্পষ্টই প্রকটিত হইয়াছে। বেদে লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং কালী, তারা প্রভৃতি দশমহাবিদ্যা, সাবিত্রী প্রভৃতি স্ত্রী-দেবতার অবতারও কীর্তিত হইয়াছে।[১৫]

বিষ্ণুপুরাণে আছে: এক ভগবান বিষ্ণুই ব্রহ্মা, শিব, কৃষ্ণ আবার মৎস্য, কূর্ম প্রভৃতি মূর্তি ধারণ করেন।[১৬] দেবী ভাগবতে প্রথমে দেবীকেই সর্ব বিশ্বের এমনকি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরেরও নিয়ন্ত্রী—এক অনাদি পরমা প্রকৃতিরূপে বলা হইয়াছে। আবার পরে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে, সমস্ত পুরুষ ও স্ত্রী অবতারই এক পরমাত্মার অবতার। সুতরাং যোগিগণ তাঁহাদের ভেদজ্ঞান করেন না।[১৭]

ঐ গ্রন্থেই বলা হইয়াছে যে দুর্গা, কালী প্রভৃতি শক্তি অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় পরমব্রহ্মস্বরূপ শিব হইতে ভিন্ন নন।[১৮] সুতরাং বিষ্ণু-লক্ষ্মী, শ্রীরামচন্দ্র-সীতাদেবী, শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীরাধা

১৫। কালী, তারা প্রভৃতি দশ মহাবিদ্যা সম্বন্ধে বেদ-প্রমাণ ভবিষ্যতে প্রদর্শিত হইতে পারে।

১৬। অকরোৎ স তনুমন্যাং কল্পাদিষু যথা পুরা। মৎস্যকূর্মাদিকাং তদ্বৎ বারাহং বপুরাস্থিতঃ। [বিষ্ণুপুঃ ৪।৮] অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণু পূর্বকল্পের ন্যায় মৎস্য, কূর্ম, বরাহ প্রভৃতি শরীর অবলম্বন করিয়া অন্য মূর্তি পরিগ্রহ করেন।

১৭। স্বেচ্ছাময়স্যেচ্ছয়া চ শ্রীকৃষ্ণস্য সিসৃক্ষয়া। সাবির্বভূব সহসা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী॥ [দেবীভাঃ ৯।১।১২] ইচ্ছাময় পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছামাত্রে, সৃষ্টির ইচ্ছায় মূল প্রকৃতি ঈশ্বরী সহসা আবির্ভূতা হইলেন। "অতএব হি যোগীন্দ্রৈঃ স্ত্রীপুংভেদো ন মন্যতে" [দেবীভাঃ ৯।১।১১] এই কারণে যোগীন্দ্রগণ ভগবানের স্ত্রীপুরুষভেদ জানেন না।

১৮। সা চ ব্রহ্মস্বরূপা চ নিত্যা সা চ সনাতনী। যথাত্মা চ যথাশক্তির্যথাগ্নৌ দাহিকা স্থিতা॥ (ঐ—৯।১।১০)

ইহারা এক, ভিন্ন নন। শিব ও শক্তি অভিন্ন বলিয়া পরমেশ্বর কখনও বা কেবল পুরুষ-মূর্তিতে, কখনও কেবল স্ত্রী-মূর্তিতে, কখনও বা স্ত্রীপুরুষ উভয় মূর্তিতে আবির্ভূত হন। দেবীপুরাণেও দেবীর সাঙ্গোপাঙ্গ সহিত বিন্ধ্যপর্বতে অবতীর্ণ হওয়ার কথা আছে।[১৯]

যদিও পরমেশ্বরের বাস্তবিক অংশ নাই তথাপি স্বকীয় উপাধিভূত মায়াকে বশীভূত করিয়া সেই শক্তির দ্বারা কখনও পূর্ণরূপে, কখনও অংশরূপে, কখনও অংশকলা যুক্তরূপে, কখনও বা অঙ্গ উপাঙ্গ পার্ষদাদি সমভিব্যাহারে অবতীর্ণ হন। এই সম্বন্ধে আরও কিছু বক্তব্য শেষে বলা হইবে।

দেবী-ভাগবতে দ্রৌপদীকে সীতাদেবীর ছায়া অবতার বলা হইয়াছে।[২০] মূল আদ্যা শক্তিই দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ও সাবিত্রীরূপে পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত হন। যথা:

'গণেশজননী দুর্গা রাধা লক্ষ্মী সরস্বতী।
সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চধা স্মৃতা॥

(দেবী ভাঃ ৯।১)

সুতরাং আমরা সংক্ষেপে এ পর্যন্ত যাহা পাইলাম, তাহাতে দেখা গেল যে এই অবতারবাদ বৈদিক যুগের পরবর্তী কালে উদ্ভূত হইয়াছে—এই সিদ্ধান্ত অপ্রামাণিক। তবে এমন হওয়া সম্ভব যে পৌরাণিক যুগে ইহার প্রচার সাধারণের মধ্যে বহুল ভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল। অতএব এই অবতারবাদ শাশ্বত।

বিষ্ণুপুরাণের 'অকরোৎ স তনুমন্যাং কল্পাদিষু যথা পুরা' এই বচনের দ্বারা অবতারবাদ যে বেদের ন্যায় শাশ্বত তাহাই সুস্পষ্ট হইয়াছে।

শিবপুরাণে এবং শঙ্করদিগ্বিজয়ে শঙ্করাচার্যকে শিবের অবতার বলা হইয়াছে। বায়ুপুরাণে মধ্বাচার্যকে বায়ুর অবতাররূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীরামানুজাচার্য লক্ষ্মণের অবতাররূপে সমধিক প্রসিদ্ধ।

অবতার যে মাত্র দশজন এইরূপ বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতিতে কোথাও নির্ধারণ করা হয় নাই। তবে পুরাণ প্রভৃতিতে দশ অবতারের বর্ণনা বহুল ভাবে বিদ্যমান থাকায়, সাধারণ লোকের ধারণা অবতার দশটি। শ্রীমদ্ভাগবতে ২৩ জন অবতারের উল্লেখ করিয়া অবতার যে অসংখ্য—তাহা স্পষ্টই প্রদর্শিত হইয়াছে।[২১]

সাধুগণের পরিত্রাণ করা, অসাধুগণকে আপাততঃ নিগৃহীত করিয়া পরিণামে তাহাদেরও কল্যাণ করা এবং ধর্ম স্থাপন করা এই তিনটি অবতারের কার্য। মৎস্য কূর্ম প্রভৃতি অবতারেও ভগবান্ শঙ্খাসুর প্রভৃতিকে দমন করিয়া মনু প্রভৃতি শিষ্টগণকে পালন করিয়া বেদরক্ষাদি পূর্বক ধর্মস্থাপন করিয়াছেন।

মৎস্যরূপী ভগবান্ মনুকে ধর্মের উপদেশ দান করিয়া যে ধর্মস্থাপন করিয়াছেন তাহা মৎস্য-পুরাণে উক্ত হইয়াছে। যথা মৎস্য উবাচ:

মহাপ্রলয়কালান্ত এতদাসীত্তমোময়ম্।
প্রসুপ্তমিব চাতর্ক্যমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্॥

ইত্যাদি [২।২৫]

অর্থাৎ মহাপ্রলয়কালে সেই কারণীভূত

১৯। তদা তাঃ সর্বগা ভূত্বা সপ্তদ্বীপাঞ্চ মেদিনীম্। ব্যাপয়িত্বা স্থিতাস্তস্মিন্ বিন্ধ্যে ভূধরসত্তমে। (দেবীপুরাণ—৭।৯৭) তখন দেবীর সেই সকল শক্তি সর্বব্যাপিনী হইয়া সপ্তদ্বীপা মেদিনীকে ব্যাপ্ত করিয়া সেই বিন্ধ্যপর্বতে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

২০। "তচ্ছায়া দ্রৌপদী দেবী দ্বাপরে দ্রুপদাত্মজা" (দেবীভাঃ ৯।১৬।৫৩)

২১। "অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।" [শ্রীমদ্ভাঃ ১।৩।২৬] পরাশরসংহিতাতেও দশের অধিক (ব্যাসদেব প্রভৃতিকে) অবতার বলা হইয়াছে। যথাঃ—দ্বাপরে দ্বাপরে বিষ্ণুর্ব্যাসরূপী মহামুনে।

বেদমেকং সুবহুধা কুরুতে জগতো হিতম্॥

অতর্ক, দুজ্ঞেয়, এক ব্রহ্মই প্রসুপ্তের ন্যায় বর্তমান ছিলেন ইত্যাদি। এইরূপ কূর্মাদি অবতারেও বুঝিতে হইবে।

'মৎস্য হইয়া কথা বলা আজগুবি কল্পনা'—এরূপ বলা চলে না, কারণ ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া ফেলা যে আমাদের পক্ষে বাতুলতা মাত্র তাহা শ্রীমদ্‌ভাগবতই বলিয়াছেন, 'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ' ইত্যাদি। কঠোপনিষদ্ বলিয়াছেন, 'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া' ইত্যাদি।

ভগবানের এই অবতার যে কেবল ভারতবর্ষেই হইয়াছে বা হইবে—ইহা যুক্তিসিদ্ধ নয়। ভগবান্ সমস্ত বিশ্বই সৃজন করিয়াছেন, সুতরাং সমস্ত বিশ্বের জীবের প্রতি তাঁহার করুণা সমান ভাবে অবস্থিত। অতএব জীবের উদ্ধারের জন্য সর্বদেশে যথোপযুক্ত কালে তাঁহার আবির্ভাব হওয়াই যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ হয়। নতুবা ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি দোষের এবং বেদাদি শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য-দোষের আপত্তি হয়। তবে যে অন্য দেশে স্বয়ং ভগবানের অবতার হওয়ার কথা শোনা যায় না, তাহা পরমেশ্বরেরই ইচ্ছা। তাঁহার নিজের কোনরূপ প্রয়োজন নাই। তিনি যেখানে, যে কালে, যে ভাবে প্রখ্যাতরূপে বা ছদ্মরূপে আবির্ভূত হইলে লোকের কল্যাণ সাধিত হইবে—মনে করেন, সেখানে সেই ভাবেই অবতীর্ণ হন। আর তিনি স্বয়ং লোকসমক্ষে তাঁহার অবতার-বার্তা প্রকাশ না করিলে মানুষের কি সাধ্য আছে যে তাহা বুঝিতে পারে।

লোক-কল্যাণের নিমিত্ত নিজের মহিমা প্রকাশ করা বা না করা সম্বন্ধে তিনি যেমন শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করেন, সেইরূপই আচরণ করেন। সুতরাং অন্যান্য দেশবাসিগণ ঈশ্বরের অবতার স্বীকার না করিলেও, ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষরূপে বা তাঁহার পুত্ররূপে বুঝিলেও তাঁহাদের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, আমাদেরও কোন ক্ষতি নাই। আমরা অবতার-রূপে মানিলেই আমাদের কল্যাণ। অতএব যীশু প্রভৃতিকেও শাস্ত্র-অনুসারে অবতার বলা যাইতে পারে। প্রমাণও আছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যীশু, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতিকে ঈশ্বরাবতার-রূপে সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, একথা আমরা 'শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে' পাই।[২২]

এখন ঈশ্বরের এই অবতাররূপে শরীরধারণ, জন্ম, বাল্য, কৌমার, যৌবনাদি অবস্থা, সুখ-দুঃখ অনুভব, কখন কখন অজ্ঞান মনুষ্যের ন্যায় ব্যবহার, আবার জ্ঞানের প্রকাশ, পূর্ণত্ব ও অপূর্ণত্ব, সাধনা ও সিদ্ধিলাভ প্রভৃতি বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ এবং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত, চৈতন্যঘন, পূর্ণকাম ঈশ্বরের জন্ম প্রভৃতি বা কিরূপে সম্ভব হয়—এই সকল প্রশ্নের সমাধানের জন্য গীতামুখে ভগবানের বাণী ও তাহার ভাষ্য-টীকাকার প্রভৃতি আচার্যগণের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

গীতামুখে ভগবান বলিতেছেন: আমার জন্ম নাই, বিনাশ নাই, সমস্ত প্রাণীর ঈশ্বর আমি কাহারও অধীন নই, তথাপি আমি নিজের প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া মায়ার দ্বারা শরীরবিশিষ্টরূপে আবির্ভূত হই।[২৩]

অবতার সম্বন্ধে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্যের সিদ্ধান্ত এই যে—বাজীকর যেমন ভেল্কীর দ্বারা লোকের সমক্ষে আকাশারোহী পুরুষ, তাহার মস্তক ছেদন প্রভৃতি প্রদর্শন করে, অথচ সেই বাজীকর একই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকে, তাহার কিছুই হয় না, সেইরূপ ভগবানও নিজের মায়ার

২২। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ ২য় খণ্ড ৩৩৫ পৃঃ; ৪০০—৪০১ পৃঃ

২৩। অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ গীতা ৪।৬

সাহায্যে লোকসমক্ষে, জন্ম, বাল্য, যৌবনাদি লীলা প্রদর্শন করেন। প্রকৃতপক্ষে জীবের মতো তাঁহার ব্যাবহারিক জন্ম বা কর্মের অধীন শরীর ধারণ প্রভৃতি কিছুই সম্ভব নয়। আর সর্বদাই তাঁহার জ্ঞান, বল, ঐশ্বর্য, তেজ, প্রজ্ঞা প্রভৃতি *পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকে, কখনও অপূর্ণতা* থাকে না।[২৪]

নীলকণ্ঠের মতে ঈশ্বরের শরীর মায়াময় হইলেও মায়ার দ্বারা চিন্ময় শরীর সৃষ্টি করেন বলিয়া তাঁহার শরীর নিত্য।[২৫]

মধুসূদন সরস্বতীর মতে ঈশ্বরের শরীর বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান মায়াময় হইলেও যতকাল মায়া থাকে ততকাল শরীরও থাকে এবং মায়া অনাদি বলিয়া তাঁহার শরীরও নিত্য।[২৬]

শ্রীধর স্বামীর মতেও ঈশ্বরের শরীর বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণময়, জীবের ন্যায় লিঙ্গশরীর বা ভৌতিক স্থূল শরীর সম্ভব নয় এবং তাঁহার জ্ঞান বল প্রভৃতি সর্বদাই অপ্রচ্যুত থাকে।[২৭]

এই সকল আচার্যের মতে কিছু কিছু মতভেদ থাকিলেও ঈশ্বরের শরীরধারণ যে জীবের মতো কর্মের অধীন নয়, এবং মনুষ্যাদি শরীরে অবতীর্ণ *হইলেও তাঁহার জ্ঞান প্রভৃতি কখনও ক্ষীণ বা* কিছুমাত্র অপূর্ণতা তাঁহার থাকে না—এই বিষয়ে উপরোক্ত সকল আচার্যেরই ঐকমত্য আছে।

স্বামী সারদানন্দ মহারাজ কিন্তু 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে' বলিয়াছেন: অবতারগণ মনুষ্য-শরীরে লীলা প্রদর্শন করিলেও তাঁহাদিগকে মনুষ্যের মতই কোন কোন অংশে সাধনাদির দ্বারা পূর্ণতা লাভ করিতে হয়, সর্বদাই তাঁহাদের জ্ঞান প্রভৃতি অনাবৃত থাকে না[২৮]

এই উভয় মতের আপাতবিরোধ-সমাধানে শুধু এইটুকুই স্মরণ করিব, ইহাও সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের লীলা বা ইচ্ছা।

২৪। "স চ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিবলবীর্যতেজোভিঃ সদা সম্পন্ন" ইত্যাদি গীতা ভাষ্য উপক্রমণিকা
"তস্মাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপঃ……শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ……স্বমায়য়া লীলাবিগ্রহং গৃহীত্বা জাত ইব বিগ্রহবানিব" ইত্যাদি [গীঃ ৪।৬ ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকা]

২৫। "তস্মাৎ সিদ্ধং পরমেশ্বরস্য মায়াময়ং শরীরং নিত্যম্" [গীঃ ৪।৬—নীলকণ্ঠ]

২৬। "অনাদি মায়ৈব মদুপাধিভূতা যাবৎকালস্থায়িত্বেন নিত্যা…অতোঽনেন নিত্যেনৈব দেহেন" ইত্যাদি [গীঃ—মধুসূদন সরস্বতী]

২৭। "তথা ঈশ্বরোঽপি কর্মপারতন্ত্র্যরহিতোঽপি…সম্যগপ্রচ্যুতজ্ঞানবলবীর্যাদিশক্ত্যৈব ভবামি। ননু তথাপি ষোড়শকলাত্মক লিঙ্গদেহশূন্যস্য" ইত্যাদি (গীঃ—শ্রীধরস্বামী)

২৮। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ ২য় খণ্ড—৪০, ৪১, ৪২, ৩৬, ৩০ প্রভৃতি পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সমালোচনা

A Modern Incarnation of God—প্রণেতা শ্রীঅধরচন্দ্র দাস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের প্রধান অধ্যাপক। কলিকাতা জেনারেল প্রিণ্টার্স কর্তৃক প্রকাশিত। ডিমাই—৩১০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৫৲ টাকা।

বহু পুস্তক, পুস্তিকা ও মাসিক পত্রের ভাববস্তুকে নিজস্ব ভাবধারায় জারিত ক'রে সুধী লেখক এই পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও অবতার-তত্ত্বকে কেন্দ্র করেই লেখকের এই লেখা মঞ্জরিত হয়ে উঠেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী-আলোচনার পুরাতন পথে না হেঁটে, লেখক নূতন এক পথে চলবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই 'চলা' যে সব সময় সুগম হয়েছে তা নয়, তবে তাঁর এই পথ-চলা তাঁকে যে আদর্শালোকের উদারতায় ও যে শ্রম-নিষ্ঠার প্রসন্নতায় টেনে এনেছে, তা আস্বাদন করতে আমরা সকল পাঠককেই আহ্বান জানাচ্ছি।

আমগাছটার শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্য তার ফলে, তাহলেও তার কাঠকে যদি কেউ সংসারের নানা প্রয়োজনে লাগান, কিংবা তার পাতাকে পূজার মাঙ্গলিক শোভনতার সহায়করূপে ব্যবহার করেন, তাহলে সেটা যে অন্যায়, তা নিশ্চয়ই নয়। তবে সেইটেই আমগাছটার শ্রেষ্ঠ ব্যবহার নয়। তবুও ঐ প্রকার ব্যবহার-নৈপুণ্যেরও একটি সত্যকার মূল্যায়ন আছে। সেই দৃষ্টিতে বিচার করলে, বইটি আমাদের সুমুখে একটি নূতন ইঙ্গিত এনেছে, এ কথা স্বীকার করি।

জগতে কোন কিছুই সম্পূর্ণ পবিত্রতা নিয়ে দেখা দেয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ এই প্রসঙ্গে স্বীকার করেছেন—খাদ না হ'লে গড়ন হয় না। এই পুস্তকের 'খাদ' দেখেও তাই আমরা বিস্মিত হইনি। দু'চারটি মন্তব্য, দু'পাঁচটি ঘটনার বিবরণ-চ্যুতি এবং শ্রীঅরবিন্দ-ব্যবহৃত শব্দ-প্রয়োগে ঈশ্বরতত্ত্ব বোঝানোর আধুনিকতাকে (যদিও বহুলাংশে তা শাস্ত্রসম্মত নয়) আশা করি সকল শ্রেণীর পাঠকই মার্জনা ক'রে নেবেন।

কথাপ্রসঙ্গে শুধু একটি বিষয়ে নির্দেশ দিতে ইচ্ছা করছে : লেখক যে বলেছেন, প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে 'অবতার' স্বীকৃত হয়নি, তার উত্তরে লেখককে শতপথ-ব্রাহ্মণের এবং কেনোপনিষদ প্রভৃতিতে ঐ বিষয়ের ইঙ্গিতগুলি লক্ষ্য করতে বলি, আর করি এই লেখকের ইংরাজী ভাষার স্বচ্ছতা ও সাবলীলতার প্রশংসা। —**মহানন্দ**

সনাতন-ধর্ম ও মানব-জীবন : স্বামী যোগানন্দ প্রণীত। ৫৮ নং কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—২১০, মূল্য দুই টাকা।

সনাতন ধর্ম কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষে সীমাবদ্ধ নয়, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান—ত্রিকালে সত্য, শাশ্বত। আদ্যন্তহীন ও প্রবর্তকহীন সনাতন ধর্ম সৃষ্টির আদি কাল হইতেই আপন গৌরবে উদ্ভাসিত। আর্যঋষিগণ জীবনে সত্য উপলব্ধি করিয়া জীবকল্যাণে তাঁহাদের অমৃত-বাণী শাস্ত্রাকারে নিবদ্ধ রাখিয়া গিয়াছেন।

মানব-জীবনে প্রথম মনুষ্যত্বলাভ, দ্বিতীয়—দেবত্ব, এবং পরিশেষে ব্রহ্মত্ব-অনুভূতি—এই অবস্থাগুলি পরস্পর ভিন্ন নয়, সোপানাবলীর মতো। কিরূপে চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারা যায় আলোচ্য গ্রন্থে তাহা যম-নিয়ম, বৈরাগ্য-বিশ্বাস, অষ্টপাশ-ছেদন, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যক্ত করা হইয়াছে। বর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ পুস্তকটির জনপ্রিয়তার পরিচায়ক। —**জীবানন্দ**

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামী চিদানন্দের দেহত্যাগ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী চিদানন্দ (শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে 'গোঁসাই' নামে পরিচিত) গত ২২শে মার্চ ৬৯ বৎসর বয়সে সিংভূমের অন্তর্গত ধলভূমগড়ের শ্যাম-সুন্দরপুরস্থ ঠাকুরবাড়ীতে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মঠে যোগদান করিয়া তিনি পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট ১৯১৭ খৃঃ সন্ন্যাস গ্রহণান্তে তাঁহার সান্নিধ্যে অবস্থান করেন। এই মধুরস্বভাব সন্ন্যাসী সঙ্গীত-বিদ্যায় বিশেষতঃ তবলা-বাদনে পারদর্শী ছিলেন।

১৯২৪ খৃঃ লাহোরে যখন ভীষণ প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন মঠ হইতে প্রেরিত হইয়া স্বামী চিদানন্দ সেবাকার্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা ভগবৎপদে শাশ্বত শান্তি-লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ। শান্তিঃ॥ শান্তিঃ॥।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

বেলুড় মঠ ঃ গত ২৭শে ফাল্গুন (১১ ৩ ৫৯) বুধবার শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২৪তম শুভ জন্মতিথি-উৎসব বিপুল আনন্দপূর্ণ ও শুচিসুন্দর অনুষ্ঠান-সহায়ে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ভোর ৪-৩০ মিঃ মঙ্গলারতি দ্বারা উৎসবের শুভ সূচনা হইলে একে একে উপনিষদ্-আবৃত্তি, চণ্ডীপাঠ, উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা ও হোম এবং দশাবতারের পূজা, 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ, 'কথামৃত' পাঠ, কালীকীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে সারাদিন ভক্তহৃদয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামাধুরী সঞ্চিত হইতে থাকে। প্রায় ১০,০০০ ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান।

অপরাহ্নে মঠপ্রাঙ্গণে আয়োজিত জনসভায় নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের স্বামী নিখিলানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়।

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের বৈশিষ্ট্য-গুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী অবতার-জীবনের সার মর্ম আলোচনা করিয়া বলেন, শ্রীভগবান মর্ত্যের ধূলিতে বৈকুণ্ঠ রচনা করিতে অবতীর্ণ হন। সভাপতির ভাষণে স্বামী নিখিলানন্দ ইংরেজীতে বলেন ঃ সকলেই আজ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইতেছেন, ভারতের বাণী বেদান্তের বাণী—অধ্যাত্মবাদের বাণী আজ সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে।

সকাল হইতে বহু নরনারী শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিতে আসেন। ভক্তবৃন্দ বিবিধ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া পবিত্র ভাবধারায় বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করেন। রাত্রে দশমহাবিদ্যার পূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা ও হোমের পর রাত্রিশেষে মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ ২৩জনকে সন্ন্যাসব্রতে এবং ২৩ জনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন।

পরবর্তী রবিবার ১৫ই মার্চ সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন মন্দিরের পূর্বদিকে গঙ্গাতীরস্থ প্রাঙ্গণে নির্মিত মণ্ডপে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সুবৃহৎ তৈলচিত্র ও তাঁহার ব্যবহৃত জিনিসপত্র সজ্জিত রাখা হয়। মণ্ডপে ও মঠের অঙ্গনে বিভিন্ন কীর্তনের দল ভজন দ্বারা উৎসব-ক্ষেত্র মুখরিত রাখেন। উষাকাল হইতে সারাদিন ধরিয়া বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং সঙ্গীত বিদ্যুৎ সহায়ে

প্রসারিত হয়। প্রধান মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ-মূর্তি দর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বিভিন্ন কার্যে বহু স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত থাকেন। সন্ধ্যারতির পর বাজি পোড়ানো হইলে উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে। মঠের প্রাঙ্গণে ও রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে দোকানপাটের মেলা বসে। সারাদিনে বহু নরনারী হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। এইদিন প্রায় চার লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল।

বোম্বাই : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গত ১৪ই মার্চ জাহাঙ্গীর-হলে উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন গভর্ণর স্যর এইচ পি মোদীর সভাপতিত্বে ধর্মসভায় বক্তৃতা দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী এস্. কে পাতিল, ডক্টর ডি জি ব্যাস এবং স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ। ১৫ই মার্চ মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, বেদ-আবৃত্তি, দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা প্রভৃতি হয়। সংগীতানুষ্ঠান উৎসবের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল।

১১ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য তিথি পূজা-দিবসে সকাল ৭-৩০ মিঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ নূতন মন্দির ও উপাসনা-গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন। এতদুপলক্ষে ভাষণ-প্রসঙ্গে তিনি বলেন : আধ্যাত্মিকতার ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণই প্রথম দেবমানব, যাঁহার প্রতিকৃতি (ফটোগ্রাফ) রাখা হইয়াছে এবং তাহা পূজা করা হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে বিভিন্ন স্থানে মানব-সেবার যে কার্য হইতেছে, বোম্বাই প্রদেশও যে তাহাতে অংশ গ্রহণ করিতেছে—এজন্য তিনি আনন্দিত।

পাটনা : গত ১১ই হইতে ১৫ই মার্চ (রবিবার) পর্যন্ত পাটনা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২৪তম জন্মোৎসব যথারীতি সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। তিথিপূজার দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ হয় এবং আনুমানিক ১,৫০০ ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। ঐদিন সন্ধ্যায় বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহের সভাপতিত্বে এক সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। নবনালন্দা মহাবিহারের পরিচালক ডক্টর সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়ের লিখিত এক সারগর্ভ ভাষণ পাঠের পর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ-শাস্ত্র বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর নর্মদেশ্বর প্রসাদ ও আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী বীতশোকানন্দ বক্তৃতা করেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সভাপতির ভাষণে বলেন যে, হিংসা-জর্জরিত বর্তমান অশান্ত বিশ্বে শান্তির জন্য আমাদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণের শিবজ্ঞানে জীবসেবা ও প্রেমের বাণী গ্রহণ করিতে হইবে।

১২ই, ১৩ই ও ১৪ই মার্চ আশ্রমের নাটমন্দিরে কীর্তনাচার্য শ্রীসূর্যনারায়ণ ঠাকুরের কথকতা উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে প্রভূত আনন্দ দান করে। উৎসব-সূচীর শেষ দিনে বিখ্যাত হিন্দী ঔপন্যাসিক শ্রীফণীশ্বর নাথ "রেণু" শ্রীরামকৃষ্ণ-বচনামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

কার্যবিবরণী

নাগপুর : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—এই কেন্দ্রের ভিত্তি ১৯২৫ খৃঃ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ স্থাপন করেন এবং আশ্রমের কাজ শুরু হয় ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে। ১৯৫৮ খৃঃ প্রকাশিত ইহার কার্যধারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নরূপ :

গ্রন্থাগার ও পাঠাগার : ইংরেজী, মারাঠী, হিন্দী, বাংলা, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষায় ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, সমাজশাস্ত্র, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের প্রায় ১৪ হাজার পুস্তক আছে। সম্প্রতি নূতন গ্রন্থাগার-ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করা হইয়াছে, এখানে ৫০ হাজার গ্রন্থ রাখিবার ব্যবস্থা

হইতেছে। পাঠাগারে ১০০ দৈনিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা রাখা হয়।

দাতব্য চিকিৎসালয়: আশ্রম কর্তৃক দুইটি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হইতেছে, একটি আশ্রমের মধ্যে এবং অপরটি ইন্দোরায় অনুন্নত লোকেদের বস্তিতে।

বিবেকানন্দ বিদ্যার্থিভবন: দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রগণকে সুশিক্ষা লাভের সুযোগ প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যার্থিভবনে ৩৩ জন ছাত্র ছিল। ছাত্রদের জন্য একটি 'পাঠচক্র' (study circle) গঠন করা হইয়াছে।

প্রকাশন-বিভাগ: নাগপুর আশ্রমে হিন্দী ও মারাঠী প্রকাশন বিভাগ আছে। এখান হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বিষয়ক বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯৫৭ মার্চ হইতে 'জীবন-বিকাশ' নামক একটি মারাঠী মাসিক পত্র প্রকাশ করা হইতেছে।

আলোচনা ও বক্তৃতা: শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও অন্যান্য মহাপুরুষের জন্মতিথি যথাযথভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। আশ্রমে ও বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা ও আলোচনা দ্বারা ভাব-প্রচারও এই আশ্রমের একটি নিয়মিত কার্য।

স্বামী নিখিলানন্দ-সংবর্ধনা

গত ২৯শে মার্চ রবিবার কলিকাতার নাগরিকগণের পক্ষ হইতে নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দকে রামকৃষ্ণ মিশন 'ইনষ্টিটুট অব কালচারে' বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাবেশে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। কলিকাতার পৌরপ্রধান শ্রীত্রিগুণা সেন অভিনন্দন-পত্র পাঠকালে দীর্ঘ ২৮ বৎসর ধরিয়া পাশ্চাত্যে বেদান্ত-প্রচারে স্বামী নিখিলানন্দ যাহা করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী শ্রীমনুভাই শাহ আশা করেন যে, আমেরিকায় ভারতীয় কৃষ্টি-ব্যাখ্যায় স্বামীজীরা আরও সাফল্য লাভ করিবেন। ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ ধন্যবাদ দেন এবং শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় বক্তার পরিচয় প্রদান করেন।

অভিনন্দনের উত্তরে স্বামী নিখিলানন্দ 'আত্মার সন্ধানে মানুষ' এই বিষয়ে ভাষণ-প্রসঙ্গে বলেন: মানবের মধ্যে যে সার্বভৌম ঐক্য বর্তমান, তাহা রাজনীতিক বা বৌদ্ধিক স্তরে উপলব্ধ হয় না, আধ্যাত্মিক স্তরে ইহার উপলব্ধি হয়। ভারত যে সব দুঃখ ভোগ করিতেছে তাহার অন্যতম কারণ আত্মবিস্মৃতি, এই জন্যই ভারত ভিক্ষাপাত্র হস্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়ের অভ্যন্তরে আনন্দময় কোষ রহিয়াছে। বিভিন্ন বিজ্ঞান মানুষকে বিভিন্ন ভাবে দেখিতেছে। বেদান্তই মানুষের অন্তরতম আত্মার সন্ধান দেয়।

আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার

নিউইয়র্ক: রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেণ্টার

স্বামী নিখিলানন্দ এখন ভারতে, স্বামী ঋতজানন্দ প্রতি রবিবার বেলা ১১টার সময় নিম্নলিখিত বিষয়ানুযায়ী আলোচনা করিয়াছেন:

জানুআরি—শ্রীশ্রীমায়ের জন্মদিনে: মাতৃত্ব ও পবিত্রতা, মানুষ: জানা ও অজানা, জড় ও চেতন, মনের শক্তি ও সম্ভাবনা।

ফেব্রুআরি—স্বামীজীর জন্মদিনে: বিবেকানন্দ ও এ যুগের ধর্ম, ধর্মচেতনা (অতিথিবক্তা—ডক্টর ইরাণী), প্রার্থনা ও তাহার উদ্দেশ্য, জীবনের লক্ষ্য—আধ্যাত্মিক মুক্তি।

মার্চ—ঈশ্বরানুভূতি কি সম্ভব? নীরবতার শক্তি, শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মদিনে: শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তরাধিকার, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলনচেষ্টা (অতিথিবক্তা ডক্টর ইয়ুং), Good Friday মৃত্যুর তাৎপর্য, Easter Service অমৃতত্বের অর্থ।

প্রতি মঙ্গলবার রাত্রি ৮॥টায় ভক্তিসূত্র এবং প্রতি শুক্রবার উপনিষদ্ পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে মুকুন্দরামরাও জয়াকর

বিখ্যাত উদারনৈতিক নেতা ডক্টর মুকুন্দরাম-রাও জয়াকর গত ১০ই মার্চ ৮৬ বৎসর বয়সে বোম্বাইয়ে মালাবার হিল-এ তাঁহার বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাসে 'সপ্রু জয়াকর' এই যুগ্মনাম চিরস্মরণীয়। তাঁহাদের বিদ্যা-বুদ্ধি ও প্রতিভার সহায়তা কি বিদেশী সরকার, কি স্বদেশী নেতাগণ সমভাবে লইয়াছেন। অপরের মতকে শ্রদ্ধা করিয়া তাহার সহিত বোঝাপড়া করিবার শক্তির জন্য উভয় পক্ষেই তাঁহাদের সমাদর ছিল।

প্রথমে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে, পরে বিলাতে শিক্ষিত ব্যারিষ্টার জয়াকর ১৯১৬ খৃঃ লখনউ কংগ্রেসে রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৯২৩ খৃঃ বোম্বাই আইন-সভার সদস্য হইয়া পরে কেন্দ্রীয় সভায় স্বরাজ-পার্টির নেতা হন। ১৯৩০ খৃঃ আন্দোলনের সময় তিনি সরকারের সহিত কংগ্রেসের মিটমাট করিবার চেষ্টা করেন। গোলটেবিল বৈঠকে তাঁহার আলোচনা একদিকে তাঁহার দেশপ্রেমের, অন্যদিকে তাঁহার রাজনীতিক দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। হোয়াইট পেপার প্রণয়নকালে পার্লামেণ্টারি কমিটিতে তিনি ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন। ১৯৩৭ খৃঃ তিনি ভারতের ফেডারেল কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইয়া ১৯৩৯ খৃঃ প্রিভি কাউন্সিলের বিচারক-সমিতির সদস্য হন এবং ১৯৪২ খৃঃ তিনি ঐ পদ ত্যাগ করেন। ১৯৪৬ খৃঃ ভারতের সংবিধান-গঠনসমিতির সভ্য নিযুক্ত হন, কিন্তু কিছুদিন পরেই ঐ পদ ত্যাগ করিয়া রাজনীতি লইয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁহার শেষজীবন পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষরূপে (১৯৪৮-৫৬) শিক্ষার ক্ষেত্রেই ব্যয়িত হয়।

আইন ও রাজনীতি তাঁহার বিশেষ ক্ষেত্র হইলেও হিন্দুদর্শনে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত তাঁহার 'কমলা বক্তৃতা' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত জয়াকর রামকৃষ্ণ মিশনের একজন অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন, এবং উহার বোম্বাই কেন্দ্রের সভাপতি ছিলেন।

এই উদারচেতা দেশপ্রেমিক মহান্ ভারত-বাসীর আত্মার চিরশান্তির জন্য প্রার্থনা করি।

পরলোকে ডক্টর ধীরেন্দ্রলাল দে

কলিকাতা উইমেন্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা, অধ্যক্ষ ও সম্পাদক ডক্টর ধীরেন্দ্রলাল দে গত ১৬ই মার্চ রাত্রি ১০টার সময় ৬০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। গত দুই বৎসর যাবৎ তিনি রক্তের চাপজনিত ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন।

ধীরেন্দ্রলাল চট্টগ্রাম জেলার খৈয়াছড়া গ্রামে ১৮৯৯ খৃঃ ২রা ফেব্রুআরি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্রে যথাক্রমে ১৯২২ ও ১৯২৬ খৃঃ এম্ এ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৯৩১ খৃঃ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি এইচ্-ডি লাভ করেন। লণ্ডনে তাঁহাকে দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করিতে হয়।

ডক্টর দে স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহা-রাজের সংস্পর্শেও আসেন। স্বামী বিবেকানন্দ-প্রচারিত ত্যাগ ও সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি যুগপ্রয়োজনে নূতন ভাবে শিক্ষাদান-ব্রতে আত্মনিয়োগ করেন। স্বামীজী ভারতীয় নারীর যে আদর্শ সর্বসমক্ষে ধরিয়াছিলেন, তাহাকেই রূপ-

দান করিতে তিনি বদ্ধপরিকর হন। কলেজের ছাত্রীগণ যাহাতে স্বামীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতে পারে, তজ্জন্য তিনি কলেজ-ভবনে প্রতি বৎসর স্বামীজীর জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করিতেন। এতদুপলক্ষে তিনি ছাত্রীদিগকে স্বামীজী সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করিতে প্রেরণা দিতেন।

অকৃতদার ডক্টর দে রামকৃষ্ণ-সংঘের সন্ন্যাসিগণকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তাঁহার সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, অমায়িক ব্যবহার এবং অটুট আদর্শপ্রীতি সকলকে মুগ্ধ করিত। উইমেন্স কলেজের সেবাতেই তিনি তাঁহার মন-প্রাণ সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেন। ঐহিক জীবনের সাফল্যের দিকে তাঁহার বিন্দুমাত্র দৃষ্টি ছিল না। আমরা এই ত্যাগী শিক্ষাব্রতীর লোকান্তরিত আত্মার চিরশান্তির জন্য প্রার্থনা করি।

উৎসব-সংবাদ

লক্ষ্মীপুর (২৪-পরগণা): গত ১৩ই হইতে ১৫ই ফেব্রুআরি পর্যন্ত লক্ষ্মীপুর 'স্বামীজী সেবাসংঘে' স্বামী বিবেকানন্দ-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ই ফেব্রুআরি উৎসবের উদ্বোধন করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ। সভায় অধ্যাপক শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যায় সংঘের শিশু-বিভাগের পরিচালনায় 'হ-য-ব-র-ল' অভিনীত হয়।

১৪ই ফেব্রুআরি শিশুদের ব্রতচারী নৃত্যের পর অধ্যাপক শ্রীভাগবত দাশগুপ্তের সভাপতিত্বে এক সভায় সংঘের ছাত্রগণ স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করে। শ্রীভবানী চন্দ স্বামীজীর শিক্ষাপ্রসঙ্গ লইয়া সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। সভাশেষে সংঘের বয়স্ক-শিক্ষা বিভাগের পরিচালনায় 'মাটির মা' যাত্রা অভিনীত হয়।

১৫ই ফেব্রুআরি বিকালে বাণীপুর 'জনতা' কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীপ্রফুল্লকুমার হোড় রায় 'রামায়ণী কথা' আলোচনা করেন। পরে বাণীপুর বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীহিমাংশুবিমল মজুমদারের সভাপতিত্বে পুরস্কার-বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্তা মজুমদার কৃতী ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ করেন। সভাশেষে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 'লোক-শিক্ষা পরিষদে'র পরিচালনায় '৪২' বইখানি ছায়াচিত্রে দেখানো হয়। এই উপলক্ষে হাবড়া উন্নয়ন সংস্থার (N.E.S Block) পরিচালনায় এক কৃষি-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। কৃষিজাত শ্রেষ্ঠ ফসলের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়। কুটীরশিল্প, জীবনী-চিত্র এবং সমাজশিক্ষামূলক প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

বারাসত (২৪ পরগণা): গত ১১ই হইতে ১৫ই মার্চ বারাসত শ্রীরামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—পূজা, হোম, ভজন, শ্রীশ্রীচণ্ডী ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি-পাঠ, জনসভায় বক্তৃতা প্রভৃতি কর্মসূচীর মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়াছে। চতুর্থ দিবসে এক জনসভায় স্বামী নিরাময়ানন্দ (সভাপতি), মহকুমা-শাসক শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল, ডক্টর নৃপেন্দ্র রায়চৌধুরী ও শ্রীমতী উমা গাঙ্গুলী 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বর্তমান যুগ' সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। পঞ্চম দিবসে শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে স্বামী শিবানন্দ' সম্বন্ধে বলেন এবং মোবারকপুর মিলন মন্দিরের সভ্যগণ মধুর শ্যামাসংগীত পরিবেশন করেন।

বিবেকানন্দ সোসাইটি (কলিকাতা): গত ২৯শে মার্চ রবিবার সায়াহ্নে ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিট্যুট হলে উক্ত সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত স্বামীজীর ৯৭তম জন্মোৎসব-সভায় সভাপতি ডক্টর রাধাবিনোদ পাল বলেন: ধর্মকে আমরা জীবনের অঙ্গ হিসাবে লইতে পারি নাই, ধর্মকে আমরা যাদুঘরে তুলিয়া রাখিয়াছি। শান্তির জন্য ধর্মবোধ একান্ত দরকার।

প্রধান বক্তা স্বামী মহানন্দ বলেন : ধর্মের মূলবস্তুকে নিরূপণ করিতে হইলে প্রস্তুতি প্রয়োজন। এই প্রস্তুতির ভিত্তি বিশ্বাসের উপর স্থাপিত। বর্তমান বিজ্ঞান, এমনকি অঙ্কশাস্ত্রের মূলানুসন্ধান করিলেও এই বিশ্বাস-স্বীকারের নিদর্শন মেলে। বিবেকানন্দের ধর্মব্যাখ্যা বিশেষ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি নিজে আত্মিক বিকাশের চরমে উঠিলেও এই মাটির পৃথিবীকে কোনদিনই ভুলিতে পারেন নাই। সেই কারণে পৃথিবীর দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইত। তাঁহার সেবাধর্ম সর্ব মানবের আত্মিক দৃষ্টির সমতার উপর প্রতিষ্ঠিত—সেই কারণেই তাহা বড়ই উদার ও আদরের। বর্তমান বিশ্বের এই বিবাদের আলোড়নের দিনে বিবেকানন্দের বাণীই শান্তির সৌরভে উদ্ভাসিত।

এতদুপলক্ষে 'আণবিক যুগে স্বামীজীর বাণী' সম্বন্ধে প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার পুরস্কারও প্রদত্ত হয়।

তেজপুর (আসাম) : শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ২৭শে ফাল্গুন বুধবার শুক্লা দ্বিতীয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২৪তম শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে চণ্ডীপাঠ, পূজা, হোম ও ভোগারতির পর প্রসাদ-বিতরণ হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর এক সভায় প্রবীণ জননায়ক শ্রীমহাদেব শর্মার সভাপতিত্বে প্রবন্ধ পাঠ ও কবিতা আবৃত্তি সকলকে মুগ্ধ করে। পরিশেষে সভাপতি মহোদয়ের ভাষণে সকলে উৎসাহিত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পাঠচক্র (কটক) : ১৯৫৮ খৃঃ জুলাই মাসে বেলুড় মঠের স্বামী অসীমানন্দ মহারাজ কটকে আসিয়াছিলেন। কয়েকজন ভক্তের সহিত ধর্মালাপ করিবার সময় তিনি তাহাদিগকে সপ্তাহে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ করিবার জন্য উৎসাহিত করেন। সেই সময় হইতে কয়েকজন একত্র হইয়া প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতভাবে কথামৃত ও গীতা পাঠ করিতেছেন।

এই পাঠচক্রের একটি বিশেষ অধিবেশনে ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী অসঙ্গানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

গত ৪ঠা ফেব্রুআরি নিউইয়র্ক কেন্দ্রের স্বামী নিখিলানন্দ শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে কিছু বলেন।

প্রাচ্যবাণী : "শক্তি-সারদম্" অভিনয়

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে গত ১৫ই মার্চ, শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবোৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীসারদামণি দেবীর পুণ্য জীবন অবলম্বনে ডক্টর যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী কর্তৃক রচিত বহু সঙ্গীত-সংবলিত সংস্কৃত নাটক "শক্তি-সারদম্" প্রাচ্যবাণী মন্দিরের সদস্য ও সদস্যাগণ কর্তৃক অভিনীত হইয়াছিল, অধ্যক্ষা ডক্টর রমা চৌধুরী প্রযোজনা করেন। মন্দিরের বিরাট চত্বরে এবং চতুষ্পার্শ্বে আর তিল মাত্র লোকধারণের স্থান ছিল না। কয়েক সহস্র লোক নীরবে নিবিষ্টচিত্তে এই নাটকাভিনয় আদ্যোপান্ত দর্শন ও শ্রবণ করেন। ফলহারিণী কালীপূজা, তেলো-ভেলো প্রান্তরে দস্যু ও লছমীনারায়ণ মারোয়াড়ী প্রভৃতির কাহিনী যেন চোখের সামনে সংঘটিত হইতেছিল, ঠাকুরের জননী চন্দ্রমণি ও হৃদয়ের চরিত্র সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

মেদিনীপুর : স্বামী বিশোকাত্মানন্দজীর আহ্বানে এবার প্রাচ্যবাণী মন্দিরের সদস্য ও সদস্যাগণ গত ২২শে মার্চ আশ্রম-প্রাঙ্গণে সংস্কৃত নাটক "শক্তি-সারদম্" অভিনয় করেন। বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ নাটকাভিনয়ের আরম্ভের পূর্ব হইতেই জনাকীর্ণ হইয়া পড়ে এবং মেদিনীপুর, খড়্গপুর প্রভৃতি অঞ্চলের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সমবেত হন। অতি সরল সংস্কৃত ভাষার অভিনয় উপস্থিত সকলকেই মুগ্ধ করে।

ক্ষুদ্র শিল্প প্রদর্শনী :

গত ১৫ই মার্চ কলিকাতায় ময়দানের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে একটি অভিনব মণ্ডপে মার্কিন ক্ষুদ্র শিল্প প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। ভারতের আর্থনীতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র শিল্পের উপযোগিতা লক্ষ্য করেই মার্কিন যন্ত্রশিল্পীদের সহযোগে মার্কিন উদ্যোগেই প্রদর্শনীটি সংগঠিত। এমন সব যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম এখানে দেখানো হয়েছে, যেগুলি দেশের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করবে। এসব যন্ত্রপাতি হাতেই চালানো যায়, সহজে স্থানান্তরে বহন ক'রে নিয়ে যাওয়া যায়, ছোট-খাটো ব্যবসায়ীরা সহজেই এগুলি ক্রয় করতে পারেন।

প্রদর্শনীর প্রাঙ্গণে ঢুকলে প্রথমেই চোখে পড়ে সৌরশক্তি কাজে লাগানোর যন্ত্রগুলি : সৌর চুল্লীতে (Solar Furnace) ৩০০০°C পর্যন্ত তাপ উৎপন্ন হয়, এতে ধাতু গলানো যায়। রান্নাবান্নার জন্য আছে সৌর উনান (Solar Oven) ও সৌর কুকার (Solar Cooker), রেডিও এবং টেলিফোন চালাবার জন্য আছে সোলার ব্যাটারি, দিনের বেলা এতে সৌর শক্তি সঞ্চয় ক'রে রাখা যায়।

শ্রমশিল্প-বিষয়ক বিরাট মণ্ডপে ২০টি ছোট-খাটো কারখানা আছে : মেটাল স্পিনিং, গোল্ড প্লেটিং, মোটর বিল্ডিং, গ্রাইণ্ডার, বোরিং মেসিন প্রভৃতি, কাঠের কারখানা, স্বয়ংক্রিয় রঁ্যাদা, কাচ বা হীরা কাটার জন্য এবং সূক্ষ্ম প্যাকিং বা ধাতুর ছাঁচ তৈরীর জন্য আল্‌ট্রাসোনিক তরঙ্গ-চালিত যন্ত্র—সবই বিস্ময়কর এবং কার্যকারী।

শিশুদের বিচিত্র খেলনা ও অভিনব পোষাক আসবাব-পত্র আকর্ষণের বস্তু।

পরলোকে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী

বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সাধক সুপণ্ডিত মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী তাঁহার গড়িয়া-হাটা (কলিকাতা) স্থিত বাসভবনে গত ৪ঠা এপ্রিল রাত্রি ৯-৩৫ মিঃ ৮১ বৎসর বয়সে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে পরলোকগমন করেন।

তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা তথা ভারতের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ও সুধীর তিরোধান ঘটিল। সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এই মনীষী তাঁহার মধুর ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। মালদহ জেলার হরিশ্চন্দ্রপুরে প্রসিদ্ধ বংশে তাঁহার জন্ম হয়। কাশীতে তিনি সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করেন। শান্তিনিকেতনের প্রায় প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই তিনি ইহার সহিত জড়িত ছিলেন এবং অধ্যাপকরূপে বিশেষ শ্রদ্ধা অর্জন করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয়-পাত্র ছিলেন। তাঁহার রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি :

ন্যায়প্রকাশ, আগমশাস্ত্র, পালিপ্রকাশ, প্রাতি-মোক্ষ, মিলিন্দপ্রশ্ন, যোগাচারভূমি, শতপথ-ব্রাহ্মণ, চতুঃশতক, The Historical Introduction to the Indian Schools of Buddhism, The Basic Concept of Buddhism.

নানাস্থানে উৎসব

নিম্নলিখিত স্থানগুলি হইতে আমরা উৎসবের সংবাদ পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি :

ঢাকুরিয়া ও কলাইঘাটা (২৪ পরগনা), নীরদগড (হুগলী), খেপুত (মেদিনীপুর)।

উদ্বোধন

বুদ্ধ-ভাবনা

এবমাকাশনিষ্ঠস্য সত্ত্বধাতোবনেকধা।
ভবেয়মুপজীব্যোঽহং যাবৎ সর্বে ন নির্বৃতাঃ॥

*　　*　　*

পরান্তকোটিং স্থাস্যামি সত্ত্বস্যৈকস্য কারণাৎ॥

করুণাবতার শ্রীবুদ্ধের হৃদয় প্রতিটি প্রাণীর জন্য মৈত্রী-ভাবনায় পূর্ণ ছিল। জীবের দুঃখে ব্যথিত হইয়া তিনি সর্বদা সকলের কল্যাণচিন্তা করিতেন। নিজের সকল সাধনা ও সিদ্ধির বিনিময়ে সর্বপ্রাণীর নির্বাণ-প্রার্থনা বুদ্ধ-হৃদয়ের বৈশিষ্ট্য।

তিনি বলিতেছেন: অনন্ত জগতে যত জীবলোক আছে, এবং তাহাতে যত জীব আছে, যতদিন পর্যন্ত তাহারা নির্বাণ-লাভ না করে—ততদিন নানারূপে নানাভাবে আমি তাহাদের আশ্রয় ও অবলম্বন হইব, সাহায্য করিব।

একটি মাত্র প্রাণীর জন্যও সৃষ্টির শেষ পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিব, দুঃখী দুর্গতদের পরিত্যাগ করিয়া আমি একা মুক্তি চাহি না।

কথাপ্রসঙ্গে

আমাদের ভাষা-সমস্যা

বহু বিচিত্র সমস্যার ভিড় ঠেলিয়া, ভাষা-সমস্যা আবার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে,—এবার একটু পরিবর্তিত আকারে। ভারতের বহু সমস্যার মতোই ভাষা সমস্যাটিও জটিল। জোর করিয়া উহার জটিলতা দূর করিতে গেলে উহা আরও জড়াইয়া যাইবে। অনেক সমস্যার সমাধানই নির্ভর করে সময়ের উপর, মনে হয় ভাষা-সমস্যা তাহাদেরই একটি। এক্ষেত্রেও তাড়াহুড়া করিতে গেলে এমন জটিলতার সৃষ্টি হইবে যে জাতীয় জীবনে অন্য কঠিনতর সমস্যার উদ্ভব হইবে। অতএব ভাবিয়া চিন্তিয়া, অপেক্ষা করিয়া, চারিদিক দেখিয়া সমাধানের পথে প্রথম পদক্ষেপ করা উচিত।

ভাষা-সমস্যার সমাধান হয় নাই, তাই বলিয়া আমরা জলে পড়িয়া নাই—রাষ্ট্রযন্ত্রও অচল হইয়া যায় নাই। অতএব ব্যস্ত হইবার কি আছে? বরং দেখা যাইতেছে, যখনই পরিবর্তনের কথা উঠিতেছে তখনই দেশের কোন না কোন অঞ্চল হইতে তীব্র প্রতিবাদ উঠিতেছে। ভাষার মতো একটি হৃদয়ের ব্যাপারে সামান্য সংখ্যাধিক্যের জোরে কিছু চালু করা হইলে ভবিষ্যৎ অসন্তোষের বীজই বপন করা হইবে।

ভাষা-সমস্যাটি চারিদিক দিয়া বুঝিতে গেলে (১) সর্বপ্রথম জানিতে হইবে—ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মোটামুটি তুলনামূলক সংখ্যা। (২) দ্বিতীয়তঃ জানিতে হইবে সংবিধানে (Constitution) ভাষা-সমস্যার কি ইঙ্গিত বা নির্দেশ পাওয়া যায়।
(৩) সরকারী ভাষা-কমিশন (Official Language Commission) কি সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন?
(৪) সর্বশেষ দেখিতে হইবে—এবিষয়ে লোকসভা কমিটি (Parliamentary Committee) কি সুপারিশ করিতেছেন।

শেষের পরেও অশেষ আছে। লোকসভার বাহিরেও চিন্তাশীল মানুষ আছেন, যাঁহারা দেশকে ভালবাসেন—ভাষাকে ভালবাসেন, বিভিন্ন কমিটি এবং কমিশনেও সকলে একমত হন নাই; যাঁহারা ভিন্ন মত পোষণ করেন তাঁহাদের চিন্তাও অবহেলা করা চলিবে না।

এবার সভা-সমিতি বা সম্মেলন করিয়া প্রতিবাদ বিজ্ঞাপিত হয় নাই, বরং দেখা যাইতেছে, দিনের পর দিন পত্র-পত্রিকায় ব্যক্তিগত মতামত প্রবল বন্যার মতো আসিতেছে। হইতে পারে বন্যার জল ঘোলা, কিন্তু উহাতেই আছে যথেষ্ট পলিমাটি, যাহা থিতাইয়া পড়িয়া আমাদের মানসভূমি উর্বর করিবে। ঝড় শান্ত হইলে আমরা সমাধানের ফসল কাটিতে পারিব।

(১) পরিসংখ্যান

১৯৫১ সেন্সাস অনুসারে ভারতে মোট ৮৪৫টি ভাষা ও উপভাষা আছে, তন্মধ্যে হিন্দী, বাংলা প্রভৃতি ১৪টি প্রধান। শতকরা ৯১ বা ৩২.৩ কোটি লোক এই ভাষাগুলির অন্তর্গত। বাকীগুলি শতকরা ৯ জন অর্থাৎ ৩২ কোটি লোকের ভাষা, তন্মধ্যে ২৩টি* উপজাতীয় সাঁওতালী (tribal) প্রভৃতি ভাষা বলে ১.১৫ কোটি, এবং ২৪টি* উপভাষা (dialect) মারোয়াড়ী প্রভৃতি ভাষা বলে ১.৭৭ কোটি জন। এতদ্ব্যতীত ৭২০টি বিভিন্ন ভারতীয় উপভাষায় কথা বলে মোট ২৮,৬১,০০০ জন। বাদ বাকী লোকে কথা বলে ইংরেজী* প্রভৃতি ১৩টি অভারতীয় ভাষায়।

---

*এই ভাষাগুলির প্রত্যেকটিতে কথা বলে লক্ষাধিক লোক।

১৪টি প্রধান ভাষার মধ্যে হিন্দী (হিন্দুস্থানী, উর্দু, পাঞ্জাবী সহ)-ভাষীর সংখ্যা ১৫ কোটি অর্থাৎ শতকরা ৪২ জন।

ভারতীয় সংবিধানের ১৪টি ভাষা

১। শুদ্ধ হিন্দী ভাষীর সংখ্যা		৯ ০৬ কোটি	অর্থাৎ	২৭	শতকরা
২। তেলুগু	,,	৩ ৩	,,	১০ ২	,,
৩ মারাঠী	,,	২ ৭	,,	৮ ৩	,,
৪। তামিল	,	২ ৬৫	,,	৮ ২	,,
৫। বাংলা	,,	২ ৫	,,	৭ ৮	,,
৬। গুজরাতী	,,	১ ৬৩	,,	৫ ১	,,
৭। কন্নাড়া	,,	১ ৪৫	,,	৪ ৫	,,
৮। উর্দু	,,	১ ৩৬	,,	৪ ২	,,
৯। মালায়ালাম্	,,	১ ৩৪	,,	৪ ১	,,
১০। ওড়িয়া	,,	১ ৩১	,,	৪ ০	,,
১১। আসামী	,,	৫০	,,	১ ৫	,,
১২। পাঞ্জাবী	,,	০৮	,,	২	,,
১৩। কাশ্মীরী	,,	০৫	,,	১৫	,,
১৪। সংস্কৃত	,,	'০১	,,	০৩	,,

(২) সংবিধানে

সংখ্যাধিক্য জন্য দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হিন্দীকেই সরকারী ভাষা (official language) বলা হইয়াছে, কিন্তু ১৯৬৫ পর্যন্ত সরকারী কাজ-কর্মে ইংরেজী চলিবে, ইতিমধ্যে হিন্দীও ব্যবহৃত হইতে পারে। ১৫ বৎসর পরে যদি ইংরেজীর পরিবর্তে পরিপূর্ণভাবে হিন্দী ব্যবহার করা সম্ভব না হয়, তবে যতদিন এবং যে বিষয়ে প্রয়োজন বোধ হইবে ইংরেজী ব্যবহৃত হইবে। ১৪টি প্রধান ভাষা জাতীয় (National Languages) ভাষারূপে স্বীকৃত হইয়াছে, এগুলি বিভিন্ন রাজ্যে আঞ্চলিক ভাষারূপে ব্যবহৃত হইবে। এগুলির মধ্যে পরস্পর সাদৃশ্য আছে।

উর্দু ব্যতীত সকল উত্তর-ভারতীয় ভাষার বর্ণমালাই ভারতীয় স্বর-পদ্ধতির অনুযায়ী, এবং দেবনাগরী লিপিতে লেখা সম্ভব। বার তেরটি স্থানীয় উপভাষায় রূপান্তরিত হইয়া হিন্দী প্রায় ১১টি রাজ্যে কথিত হয়। উনবিংশ শতাব্দী হইতে হিন্দীর রূপান্তর 'খরিবোলি' প্রামাণ্য ভাষারূপে গৃহীত, এবং অধিকাংশ লেখক এই ভাষাতেই লেখা পছন্দ করেন।

(৩) সরকারী ভাষা কমিশন

সর্বভারতীয় 'সরকারী ভাষা'প্রসঙ্গে এবার ভাষা কমিশনের বক্তব্য শোনা যাক। ১৯৫৭ আগষ্ট মাসে ইহা প্রকাশিত হয়। এই কমিশনে ২০ জনের মধ্যে ১৮ জনের মত: ইংরেজীর পরিবর্তে হিন্দীকে সরকারী ভাষা করাই যুক্তিযুক্ত এবং সম্ভব। অপর দুইজন সদস্য—ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর সুব্বারাও ভিন্ন মত ব্যক্ত করেন। তবে অধিকাংশ সদস্যেরই মত: ১৯৬৫ খৃঃ মধ্যেই হিন্দীকে সরকারী ভাষা-রূপে চালু করা সম্ভবও নয়, প্রয়োজনও নাই। যত শীঘ্র সম্ভব এই পরিবর্তন আনয়ন করার জন্যই চেষ্টা করা উচিত। এই পরিবর্তনের পরেও বহির্বিশ্বের সহিত আদানপ্রদানের জন্য ইংরেজী দ্বিতীয় ভাষারূপে ব্যবহৃত হইবে।

অধিকাংশ সদস্যের প্রধান প্রধান সুপারিশ:

১। অফিসে: সরকার সরকারী কর্মচারীদের হিন্দীভাষা শিখিতে বাধ্য করিতে পারিবেন।

২। আদালতে: সুপ্রীম কোর্টে ও হাইকোর্টে হিন্দীতে এবং তন্নিম্ন কোর্টে আঞ্চলিক ভাষায় রায় দিতে হইবে।

৩। শিক্ষার ক্ষেত্রে: মাধ্যমিক স্তরে হিন্দী অবশ্য পাঠ্য। (হিন্দীভাষীদের অন্য একটি ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করা বিষয়ে রাধাকৃষ্ণন কমিশনের প্রস্তাব তাঁহারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন)।

৪। বিশ্ববিদ্যালয় ও সর্বভারতীয় চাকরি-পরীক্ষায় ইংরেজী বা হিন্দী (বিকল্পরূপে) ব্যবহৃত হউক।

৫। হিন্দী ও আঞ্চলিক ভাষাসমূহের উন্নতির জন্য জাতীয় ভাষা পরিষদ গঠিত হউক।

৬। রেলওয়ে, ডাক, শুল্ক প্রভৃতি সর্বভারতীয় বিভাগে হিন্দীর ব্যবহার বাড়ানো হউক, সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষাও থাকিবে—(should evolve a measure of permanent bilingualism).

সংখ্যাল্প সদস্যদের অভিমত :

১। সংবিধান সংশোধন করিয়া ইংরেজীর ব্যবহার সুদীর্ঘ দিনের জন্ত বহাল রাখা হউক।

২। ভাষা লইয়া সাম্প্রতিক বিক্ষোভ লক্ষ্য করিয়া মনে হয় হিন্দী চালু হইলে জাতীয় একতা ক্ষুণ্ণ হইবে। হিন্দী ভারতের অন্তান্ত অনেক ভাষা হইতে অপরিণত।

(৪) পার্লামেণ্টারি কমিটি

ভাষা-কমিশনের সুপারিশগুলি পরীক্ষা করিবার জন্য ৩০ জন সদস্য লইয়া পার্লামেণ্টারি কমিটি (২০ জন লোকসভার, ১০ জন রাজ্যসভার) গঠিত হয়। গত ২২শে এপ্রিল এই কমিটি লোকসভায় তাঁহাদের সুদীর্ঘ রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন, তাহাতে যাহা সুপারিশ করা হইয়াছে তাহার সার মর্ম : ১৯৬৫ খৃঃ পর হইতে হিন্দীই প্রধান সরকারী ভাষা হউক, পার্লামেণ্টের নির্দেশানুসারে যেক্ষেত্রে যতদিন প্রয়োজন ইংরেজী চলিবে। আঞ্চলিক ভাষাগুলি নিজ নিজ রাজ্যে স্ব স্ব উন্নয়নে সমর্থ। ইংরেজী হইতে হিন্দীতে পরিবর্তন জোর করিয়া, সহসা না করিয়া ধীরে ধীরে করা হইবে।

উক্ত কমিটির ছয় জন ভিন্ন মত পোষণ করিয়া নিজ নিজ মন্তব্য পেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে পাঁচ জনের মত—শীঘ্রই হিন্দী প্রবর্তিত হউক। ষষ্ঠ মিঃ ফ্রাঙ্ক এণ্টনি সমগ্র রিপোর্টটির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া বলেন : ভাষা-প্রশ্নে তাঁহার মৌলিক মত-পার্থক্য রহিয়াছে। তাঁহার মত—ইংরেজী একটি বিশিষ্ট সংখ্যালঘু ভারতীয় সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা, অতএব ইংরেজী ভাষাকে পঞ্চদশ জাতীয় ভাষারূপে স্বীকার করা হউক। ইংরেজী জাতীয় ভাষারূপে স্বীকৃত হইলে উহাকে আর বিদেশী ভাষা বলা চলিবে না। এখানে দ্রষ্টব্য—ইংরেজী যাহাদের শৈশবের ভাষা ভারতে এরূপ লোকের সংখ্যা মাত্র ১,৭২,০০০ হইলেও ভারতে শিক্ষিত শত করা ১৬ জনের মধ্যে ১ জন অর্থাৎ মোট প্রায় ৩৫ লক্ষ লোক ইংরেজী বলিতে বা বুঝিতে পারেন, এবং তাঁহারাই বর্তমানে সর্বভারতীয় গঠনমূলক ব্যাপার-পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতেছেন।

কমিটি সাধারণ ভাবে কমিশনের সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া কয়েকটি বিষয়ের উপর জোর দিয়াছেন, দু'একটি বিষয়ে আংশিক মতানৈক্য প্রকাশ করিয়াছেন। সরকারী ভাষা ইংরেজী হইতে হিন্দীতে পরিবর্তন ধীরে ধীরে এবং নিয়মিত ভাবে করিতে হইবে—যেন সকল পক্ষকে স্বল্পতম অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, অহিন্দী অঞ্চলের অধিবাসীরা কতটা হিন্দী আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রথম প্রথম ইংরেজীর সহিতই হিন্দী ব্যবহার করিতে হইবে। ক্রমশঃ স্বাভাবিকভাবে ইংরেজী উঠিয়া যাইবে।

ইংরেজীর সহিত সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা চলিবে না, উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষায় ও আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ইংরেজী প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দীকে এমনভাবে উন্নত করিতে হইবে—যেন উহা সর্বভারতীয় ভাবের ও কৃষ্টির বাহন হইতে পারে। এতদুদ্দেশ্যে হিন্দীকে তাহার কিছু 'শুদ্ধতা' (purism) ত্যাগ করিতে হইবে, পরিবর্তে প্রয়োজন—স্বচ্ছতা ও সরলতা।

বিজ্ঞান ও আইনের পরিভাষা অনুবাদের ক্ষেত্রে অন্যান্য জাতীয় ভাষার সহিত হিন্দীকে একযোগে কাজ করিতে হইবে, তাহাতে জাতীয় ঐক্য সংহত হইবে। এতদুদ্দেশ্যে বিশেষজ্ঞ লইয়া প্রতিনিধিমূলক একটি স্থায়ী কমিটি গঠিত হইতে পারে, ঐ কমিটি সময় সময় সমগ্র দেশের জন্য সাধারণ পরিভাষা (common terminology) প্রস্তুত করিবেন। বর্তমানে যথেচ্ছ অনুবাদে বহু দুর্বোধ্য ও হাস্যোদ্দীপক শব্দের আবির্ভাব ঘটিতেছে।

কমিটি কমিশনের সহিত একটি প্রধান বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই, কমিটির মতে উচ্চতর চাকরির ক্ষেত্রে হিন্দী-ভাষাভাষীকে হিন্দী ছাড়া অন্য একটি ভারতীয় ভাষাতেও সমপর্যায়ের জ্ঞান অর্জন করিয়া পরীক্ষা দিতে হইবে, তদুপরি ইংরেজীরও প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা চাই। পরীক্ষার বিকল্প ভাষা হিসাবে যথাশীঘ্র হিন্দী চালু করিতে হইবে।

কি কি ভাষা শিখিতে হইবে ?

'সরকারী ভাষা' সমাধানের এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়—সাধারণ ভারতবাসীকে তিনটি ভাষা শিখিতেই হইবে: (১) আঞ্চলিক বা মাতৃভাষা, (২) হিন্দী, (৩) ইংরেজী। হিন্দী-ভাষীদের দুইটি ভাষা শিখিলেই চলিবে—যদি তাঁহারা অপর একটি ভারতীয় ভাষা শিখিতে না চান। সংবিধানান্তর্গত সমানাধিকারের প্রশ্ন এখানে উঠিতেছে। সকলে সমান সুবিধা পাইতেছে না। হিন্দী-ভাষীদের অপর একটি (সর্বাগ্রে প্রতিবেশী অঞ্চলের) ভাষা শিক্ষা আবশ্যিক করিয়া দিলে এই প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ভাব আদানপ্রদানের পথ প্রশস্ত হইয়া সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়।

সংস্কৃত ভাষার প্রশ্ন

অতঃপর আর একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে: প্রাচীন (classical) ভাষা—বিশেষতঃ সংস্কৃতভাষা শিক্ষার স্থান কোথায় ? নানা কারণে—প্রধানতঃ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ধর্ম প্রভৃতির জন্য একটি প্রাচীন ভাষা শিক্ষা প্রায় প্রত্যেক সভ্যদেশের বিশ্ববিদ্যালয়েই অনুমোদিত। সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে একথা আরও বেশি প্রযোজ্য, কারণ সংস্কৃত এমনই একটি ভাষা—যাহা বায়ুর মতো অলক্ষ্যে থাকিয়াও (কথ্য ভাষা না হইয়াও) ভারতের প্রায় সকল ভাষায় প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে এবং করিতেছে! সংস্কৃত ভাষার ভাব ও মর্যাদা আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। এ সম্বন্ধে বহু মনীষী তাঁহাদের মত পৃথক্‌ভাবে 'সংস্কৃত কমিশন' মারফৎ সরকারকে জানাইয়াছেন। কেহ কেহ এমন মতও ব্যক্ত করিয়াছেন যে সংস্কৃত ভাষার মধ্যে ভারতের সরকারী ভাষা হইবার শক্তিও রহিয়াছে। এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে সংস্কৃত বহু দিন ধরিয়াই সর্বভারতীয় ভাষা, হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত সর্বত্র সর্বস্তরে না হউক, কোন না কোন স্তরে—কেহ না কেহ সংস্কৃত জানে ও বোঝে। ইংরেজী-প্রচলনের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে—কি ধর্মজগতে, কি দর্শনে, কি সাহিত্যে পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষাতেই ভাব বিনিময় করিয়াছেন, তাহার সাক্ষ্য ১৮শ শতাব্দীতে পর্যন্ত নূতন নূতন সংস্কৃত গ্রন্থ-রচনায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

লেখ্য 'সংস্কৃত' কখনও কথ্য ভাষা ছিল কি না, তাহা বিতর্কের বস্তু। কোন ভাষায় কথা বলা বা না বলা হইলেই যে ঐ ভাষা জীবিত বা মৃত হয়—এও কোন কথা নয়। মৃত ভাষাও যে উজ্জীবিত হইয়া রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে, তাহার সাম্প্রতিক প্রমাণ ইস্রায়েলের হিব্রু ভাষা।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করার মতো দুরাশা আমরা পোষণ করি না; তবে সংস্কৃতকে বর্জন করার, অবহেলা করার, অবনমিত করার যে প্রয়াস দেখা যায়, তাহাও আমরা সমর্থন করি না। সংস্কৃত চিরদিন সংস্কৃতির বাহন। যদি আমরা চাই জনসাধারণের ভাব ও ভাষা উন্নত হউক, জনগণ ভারতীয় ঐতিহ্যের যথার্থ উত্তরাধিকারী হউক, তবে অবশ্যই সাহিত্য ও দর্শনের অনুবাদগুলির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সম্মুখে মূল গ্রন্থগুলিও ধরিতে হইবে। রামায়ণ এবং মহাভারত—না হয় অনুবাদই

পড়িলাম, কিন্তু গীতা-উপনিষদের অনুবাদে কি মূলের শক্তি আছে? মানসিক অনুশীলনের জন্য সংস্কৃত ভাষা অপরিহার্য, ভাষা-বিজ্ঞানের বিচারেও সংস্কৃত একটি পরিপূর্ণ সার্থক ভাষা, যাহা চর্চা করিলে অপর ভাষার শিক্ষাও সম্পূর্ণ হয়। সর্বোপরি সংস্কৃত ভাষা দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতীয় ঐক্যের প্রতীক। ইহাকে ক্ষুণ্ণ করা হইলে ভারতীয় ঐক্যের মূলেই কুঠারাঘাত করা হইবে।

চারটি না তিনটি ভাষা শিক্ষণীয়?

শিক্ষাবিদ্‌গণের মতে বিদ্যালয়ে একসঙ্গে তিনটির বেশি আবশ্যিক ভাষা শিক্ষা দেওয়া ঠিক নহে। সর্বপ্রথম মাতৃভাষা ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে হইবেই, তার পর সর্বভারতীয় ব্যবহারের উপযোগী কোন ভাষা। তাহা হিন্দী, না ইংরেজী, না সংস্কৃত? সে উদ্দেশ্যে যদি সর্বত্র জোর করিয়া হিন্দীকেই আবশ্যিকরূপে শেখানো হয়, তখন আসিবে বিজ্ঞানের ও আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে ইংরেজীর পালা। তারপর আর আবশ্যিক ভাষা হিসাবে সংস্কৃতের পালা আসিবে কি?

ইংরেজীর দ্বারাই যদি সর্বভারতীয় ভাষার কাজ হইয়া যায়, তবে পরবর্তী স্তরে ছাত্রেরা স্বেচ্ছায় হিন্দী শিখিয়া লইতে পারে। ভাল করিয়া প্রথমে মাতৃভাষা শিখিলে পরে হিন্দী শেখা নিশ্চয় শক্ত হইবে না। বিদ্যালয়ের নিম্নস্তরে ভাষাশিক্ষার অত্যধিক চাপ কমানো একান্ত প্রয়োজন।

সংস্কৃতকে বাদ দিয়া হিন্দী শিক্ষার বিরুদ্ধে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দৃঢ়ভাবে তাঁহার মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, জোর করিয়া ভাষা-সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে। নদী যেমন ধীরে ধীরে নিজেই তাহার পথ করিয়া লয় ভাষার ক্ষেত্রেও জাতীয় প্রতিভা কালক্রমে তাহাই করিয়া লইবে। এখন স্থিতাবস্থা রাখিয়া সরকারী ব্যাপারে ইংরেজী চালু রাখাই কর্তব্য। প্রাথমিক স্তরে আঞ্চলিক বা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা আবশ্যিক করিয়া শিক্ষার মান ও হার উন্নত করা উচিত। মাধ্যমিক স্তরে যেমন আছে ইংরেজী ও সংস্কৃত শিখাইয়া উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে যখন মাতৃভাষা সম্যক আয়ত্ত হইয়া গিয়াছে, তখন সরল হিন্দী শিক্ষা দিলেই—এবং প্রথমে হিন্দীভাষী অঞ্চলে হিন্দীকে সরকারী ভাষা-রূপে চালু করিয়া পরীক্ষা করিলে ভবিষ্যতের পথ প্রস্তুত হইবে, তবেই স্বল্পতম বাধার পথে জাতীয় জীবন অগ্রসর হইতে থাকিবে। নতুবা ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা যেমন দেশকে বিভক্ত করিয়াছে, তেমনই ভাষার নামে প্রাদেশিকতা আমাদিগকে আরও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিবে। এখনই তাহার পূর্বাভাস দিকে দিকে দৃশ্যমান। সাবধানতা অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ প্রস্তুতি।

A common language would be a great desideratum, but the same criticism applies to it—the destruction of the vitality of the various existing ones

The only solution to be reached was the finding of a great sacred language of which all the others would be considered as manifestations, and that was found in Sanskrit.

—*Swami Vivekananda*

চলার পথে

'যাত্রী'

শিশু মায়ের কোলে উঠে আকাশের চাঁদকে মুঠোর ভেতরে ধরতে চায়, পাবে না। আশা-নিরাশার বারিধি-দোলায় তখন তার ছোট্ট মনটি হয়ত ঢেউ-এর মতই ভাঙে আর গড়ে। কিন্তু বড় হয়েও যে আমরা চাঁদকে ধরতে ছুটি—তার নিদর্শন তো ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের কবিতায়, কাব্যে, গানে, এক কথায়, সাহিত্যের সর্বমানবিক আঙিনায়।

শুধু কি তাই ? মানুষ তার জীবনের সবটুকু পরিসরকেই শশিকলার ক্ষয়-বৃদ্ধির গজকাটিতে মেপে নিতে চেয়েছে। তাইতো মানবের জীবনে পূর্ণিমা-অমাবস্যার জোয়ার জাগে, ধর্মাচরণের অনেক কিছুই চাঁদকে ঘিরে অনুষ্ঠিত হয়,—রচিত হয় কত স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিকথা। এই রকম এক পূর্ণিমাকে ঘিরেই শ্রীবুদ্ধের অলৌকিক জীবন ও বাণী মূর্ত হ'য়ে উঠেছিল। বুদ্ধ-পূর্ণিমার এই দিনটিতেই দেবদহের শালবনেতে শ্রীবুদ্ধের জন্ম, কুশীনারায় তাঁর মহাপ্রয়াণ ও বোধগয়ায় তাঁর নির্বাণ জড়িয়ে গিয়ে মানুষের মনের অনেক গ্রন্থিকেই খুলে দিয়ে গেছে।

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর আগেকার কথা। কুশীনারার (বর্তমান কুশীনগরের) শালবনে পূর্ণচন্দ্রের আলোকবন্যা সেদিন বাঁধ ভেঙ্গে উপচে পড়ছে। সেই নির্জন বনানীতে পাঁচ শতাধিক ভিক্ষুর গৈরিক আভায় কেমন এক অপার্থিব করুণা পড়ছে ঝরে। গৈরিকের লাল আভা ও চাঁদের রূপালী আলোক সেই মহানির্বাণ-যাত্রীর নিঃসীম মৌনতায় জড়িয়ে করেছে এক অভূতপূর্ব আবেশের সৃষ্টি। বনের মাথার উপরের ঐ আলোক-বন্যা আর-এক বিশ্রুত-জ্ঞানের আলোক-ঝর্ণার সঙ্গে মিশে প্রবাহিত করেছে এক অপূর্ব ভাবস্রোতকে। আর তার মাঝে ঐ ভাব-উৎসের কেন্দ্রমণি শ্রীবুদ্ধ আজ মরজগতের দেনাপাওনা মিটিয়ে দিয়ে মহাপরিনির্বাণের জন্য প্রস্তুত।

রাত্রি শেষ হ'য়ে আসছে। চাপা কান্নার মর্মন্তুদ বেদনা নিয়ে শ্রীবুদ্ধের পাশে বসে রয়েছেন প্রিয় শিষ্য 'আনন্দ'। তথাগতের শায়িত দেহের দক্ষিণপার্শ্বমাত্র কাষায় বস্ত্রের উপর পরিলম্বিত। পদযুগলের একটি অপরটির উপর পূর্ণ মিলনের অপূর্বতায় স্তম্ভিত। মুখে মনোরম হাসির প্রশান্ত দীপ্তি। এমন সময়ে তিনি আবার তাঁর অমৃতময় বাণী উচ্চারণ করলেন—বললেন, 'জেনে রাখ আনন্দ, এই পাঁচশত শিষ্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিহীনেরও আসবে মহাজ্ঞানের নির্দেশ, এদের মধ্যকার সর্বাপেক্ষা জ্ঞানহীনও লাভ করবে নির্বাণকে।' আশীর্বাদের এই মহাসমতার আলোড়নে সকলেরই শোকার্ত মনে জাগল মহাজাগরণের প্রাণ-স্পন্দন। মহা-আশ্বাসের ঐ ওজস্বিতা বনানীর প্রতিটি শালগাছের তীক্ষ্ণ ঋজুতার সাথে মিশে একলক্ষ্য হ'য়ে উঠল।

বুদ্ধ আবার বললেন, 'মনে রেখো, এই মাটির পৃথিবীর সব কিছুকেই মৃত্যু এসে মুছে দেবে, শুধু চিরভাস্বর থাকবে সেই অমৃতের বাণী—সেই মহাজ্ঞানের দীপান্বিতা—যা মৃত্যুকে মুছে দিয়েও শাশ্বত আলোক-বর্তিকাকে ধ'রে রেখেছে।' মহাপরিনির্বাণের পূর্বমুহূর্তে শ্রীবুদ্ধের এই বাণী এই জগতের জন্য এক অনুপম অভী-মন্ত্র রেখে গেল।

এ কথা যিনি শুনালেন তিনি কি কখন শূন্যবাদী হ'তে পারেন ? ঐ মহা-শাশ্বতকে ধ'রেও তিনি কি কখন নাস্তিকের মতো বলতে পারেন, আমি শূন্যকে ধরেছি ? এ সব প্রশ্নের মীমাংসার জন্য এ যুগের মহাপরিনির্বাণী শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শোনা যাক্। তিনি বলেছেন, 'নাস্তিক কেন ? নাস্তিক নয়, মুখে বলতে পারে নাই। বুদ্ধ কি জান ? বোধ-স্বরূপকে চিন্তা ক'রে ক'রে তাই হওয়া, বোধস্বরূপ হওয়া।' (কথামৃত, ৩।২৫।১)

প্রাচীন শাস্ত্রের দিকে তাকালেও একথা বুঝতে পারি। শ্রীবুদ্ধ নির্বাণকে 'সু-দুর্দর্শ' (মজ্‌ঝিম নিকায়, ১।১৬৭) বলেছেন, কঠোপনিষদেও (১।২।১২) ব্রহ্মকে 'দুর্দর্শম্' বলা হয়েছে। বুদ্ধদেব যাকে বললেন 'নির্বাণ নিষ্প্রপঞ্চ' (সংযুক্ত নিকায়, ১২), বেদান্তে তাকেই বলেছে 'প্রপঞ্চোপশমং শান্তম্'—(মাণ্ডূক্য, ৭)। তাছাড়া বুদ্ধদেবের 'মহাশূন্য'-উক্তি (ধম্মপদ, ৯২) উপনিষদের 'সঃ অয়ং শুদ্ধঃ পূতঃ শূন্যঃ', কিংবা মৈত্রায়ণী উপনিষদের (২।৪) 'সঃ বৈ এষঃ শুদ্ধঃ পূতঃ শূন্যঃ শান্তঃ'-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই বৌদ্ধ 'নির্বাণ' ও বেদান্তের 'তুরীয়-ব্রহ্ম' সেই একই নিষ্পত্তিকে ধরেছে। এই স্বীকারোক্তি স্বামীজীর কথাতেও রয়েছে : It (Nirvana) is exactly the same as the Brahman of the Vedantists (C W II, p. 194)

তবে এটা ঠিক—সেই মহানন্দের, মহাবিকাশের ও মহাসত্যের রাজত্বের সূর্যহীন, নিশ্চন্দ্র, তারকা-শূন্য বিদ্যুদ্-বিহীন অগ্নি-হারা মহা-আলোকের আনন্দোৎসবে সবারই জন্য সমান আহ্বান ভেসে আসছে। সেই আহ্বানে কি সাড়া দেবে না, পথিক? সেই আলোকের রাজত্বে, সেই আনন্দের প্রশান্ত অতিশয়তায়, সেই চিরস্থিরের মৃত্যুহীন সীমাহীনতায় চল পথিক, এগিয়ে চল। সেখানে গেলে সত্যই দেখবে 'ন তত্র সূর্যো ভাতি, ন চন্দ্রতারকং, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।' আজকের এই বুদ্ধ-পূর্ণিমার দিনে চল, চল পথিক, সেই জ্যোতিঃস্নান ক'রতে চল। শ্রীবুদ্ধের আশীর্বাদে ভরে নাও তোমার জীবন। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ !**

সে আলো

শ্রীশান্তশীল দাশ

সে আলো মাঝে মাঝে জ্বলে দেখি উজল হ'য়ে
ঘুচিয়ে দিয়ে সকল কালো ;
সে আলোর তুলনা কই ? অনেক ঘন অন্ধকারে
জানি নাতো কে জ্বালালো !

সে আলো দেখি শুধু চেয়ে চেয়ে, আশ মেটে না,—
দেখি শুধু নয়ন ভরে ;
সে আলো অঙ্গে মাখি যতন ক'রে, মন ভ'রে নিই,
সব অবসাদ যায় যে সরে।

সে আলো কোন বারতা নিয়ে আসে দিব্যলোকের,
স্বর্গ রচে এই ধরাতে ,
সে আলো অমৃতময়, স্নিগ্ধ আরাম দুর্বিষহ
আধি-ব্যাধির যন্ত্রণাতে।

সে আলো হারিয়ে যে যায় ; রাখবো তারে আপন ক'রে,
সে-মন্ত্রটি কোথায় যে পাই—
সে আলো ধরা দিয়েও দেয় না ধরা, পলায় দূরে ;
পেয়েও তাকে আবার হারাই।

আমাদের মা

শ্রীমতী মৃন্ময়ী রায়

আকাশ ও পৃথিবী—কোথায় কেন তারা এক হয়েছে কেউ তা জানে না। তবু উভয়ে তারা উভয়ের পরিপূরক। একজন ছাড়া আর এক জনকে কল্পনা করা যায় না। মা ও মেয়ে —সন্তান যখন মায়ের নামে মায়ের কাছে ছুটে চলে, কোন বাধা কোন বিপত্তি সে মানে না। আবার নিত্যসম্বন্ধে মিলেছে নদী ও সমুদ্র। সমুদ্র অহরহ তার বিশাল উদাত্ত কণ্ঠে নদীকে ডাকছে—ওরে, আয়, ওরে আয়। নদীও মুহূর্তের জন্য দ্বিধা না ক'রে নিজের অস্তিত্ব লুপ্ত ক'রে ছুটে চলেছে সমুদ্রের পানে। সমুদ্রের বুকে সে পাবে চরম ও পরম শান্তি। শুধু নদী তো অপূর্ণ—সমুদ্র ব্যতীত। সমুদ্রেরও প্রয়োজন আছে নদীতে।

যেমন আকাশ ও মাটি, যেমন নদী ও সমুদ্র, তেমনি একত্র বাঁধা আছে আমাদের হৃদয় জুড়ে দুটি নাম—শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদামণি। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদামণি নাম দুটি মিলে সেই মিলনকেন্দ্র হতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে—এক বিগ্রহমূর্তি, পরিপূর্ণ সার্থক। সে বিগ্রহে না আছে কোন অপূর্ণতা, না আছে কোন অভাব। সে মূর্তিতে প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে—সত্য, শিব ও সুন্দর। ঠাকুর ও মায়ের যুগ্ম সাধনায় এক মঙ্গলময় সুন্দর সত্যের অভিব্যক্তি ঘটেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদামণি এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। শুধু যে শ্রীসারদাই শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া অপূর্ণ তা নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ণতার জন্যও শ্রীসারদামণি সমভাবেই প্রয়োজনীয়। শ্রীমাকে বাদ দিলে শ্রীশ্রীঠাকুরের অঙ্গহানি ঘটবে। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন শক্তির পূজারী, পরমারাধ্যা শক্তিময়ীর উপাসনায় তিনি দেহমন সমর্পণ করেছিলেন, নিমগ্ন হয়েছিলেন কঠিন সাধনায়।

আর সেই সাধনার শক্তি ও প্রেরণা যুগিয়েছিলেন মা সারদা। আমাদের এই আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান ভারতে যুগ-যুগান্ত ধরে নারীকে শক্তিরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। নারীর মধ্যে আছে সেই মহাশক্তি, যে শক্তির উৎস অনুসন্ধান করতে গেলে আমরা এই পার্থিব জগৎ ছাড়িয়ে চলে যাব উচ্চতর লোকে। পুরুষ কর্তা, সে সম্পাদন করে কর্ম, নারী পুরুষের শক্তি—সে তাকে যোগায় প্রেরণা। এই সত্যের প্রকাশ ঘটেছে শ্রীমার জীবনে। তিনি যেন সৃষ্টির অমোঘ বিধানে শ্রীরামকৃষ্ণকে এই শক্তি ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করবার জন্যই এই ধরণীতে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। এই যে তাঁর চিরকালের কর্তব্য। তাঁর ভাগ্য যে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে অদৃশ্য সূত্রে গাঁথা আছে, তাঁর দেবী-মন সে কথা পূর্বাহ্নেই তাঁর মুখ দিয়ে বলিয়েছিল। তাঁর স্বয়ম্বরা হবার ঘটনাটি সুপ্রসিদ্ধ। শিশু সারদামণি যে সেদিন বরণ করেছিলেন, বেছে নিয়েছিলেন বহু লোকের মধ্য হতে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিটিকে। সে তাঁর বিচার-বিবেচনার ফল নয়, বিচার ক'রে কর্তব্য নির্ধারণের বয়স তখনও তাঁর হয়নি। তাঁর এই নির্বাচনের মূলে ছিল এক দৈবী শক্তি—যে শক্তি শিশু সারদার ক্ষুদ্র অঙ্গুলি নির্দেশের মাধ্যমে তাঁরই ভাগ্যকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করেছিল। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে যুগাবতার

শ্রীরামকৃষ্ণের মর্ত্যলীলাসহচরী, প্রেরণাদায়িনী সারদামণি তাঁর দৈব-নির্দেশিত পথে প্রথম পা বাড়ালেন; এই প্রেরণা যোগানোর কাজটি সহজসাধ্য ছিল না,—কারণ শ্রীমা শুধু প্রেরণা যোগানোর কাজটুকুই সম্পাদন করেননি, আপনার হাতে পথ নির্মাণ ক'রে, সেই পথ অতিক্রম ক'রে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রেরণাদানের উপযোগী হয়ে কাছে এসেছিলেন। এই শতলোকের মধ্য হতে পতি-নির্বাচনের শুভক্ষণ থেকে তার জন্য পথ প্রস্তুতের কাজে হাত দিয়েছিলেন শ্রীমা। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণ সাহায্য করেছেন সর্বদা তাঁর প্রেরণাদাত্রীর এই আগমনের কাজে। অতি সাধারণ মানুষ আমরা, লীলাময় ঠাকুর কি ভাবে সাহায্য করেছিলেন তাঁর ঐশ্বরিক শক্তিরূপিণীকে পথ নির্মাণ ক'রে তাঁর শুভ আগমনে, তার প্রকৃত স্বরূপ আমাদের ধারণার অতীত। তবে তার প্রথম বাহ্য প্রকাশ ঘটেছিল মনে হয় সেদিন, যেদিন চতুর্বিংশতি বর্ষে উপনীত ঠাকুর মাত্র পঞ্চমবর্ষীয়া ভাবী বধূর সম্বন্ধে বলেছিলেন: 'জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখুজ্যের বাড়ীতে দেখগে, ক'নে সেখানে কুটো-বাঁধা আছে।' সেই পূর্বনির্দিষ্ট ক'নের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের বিবাহ হয়ে গেল—প্রেরণা যোগানোর পথ বেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের আরও নিকট সান্নিধ্যে এসে দাঁড়ালেন মা।

তারপর এল সেই শুভদিন। দুর্গম শৈল-পথের সকল বাধা কাটিয়ে তরঙ্গিণী এবার সহজ পথে ছুটল সমুদ্রের পানে—পথশ্রমে ক্লান্ত অসুস্থ সারদামণি বহুদিনের অদর্শনের পর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণপ্রান্তে দক্ষিণেশ্বরে এসে পৌঁছলেন। সমাদরে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন ঠাকুর—ঔষধপথ্যের বিশেষ ব্যবস্থা ক'রে, দেখাশুনা ক'রে যত্ন করলেন তাঁকে। সারদামণি সুস্থ হয়ে উঠলে দক্ষিণেশ্বরের নহবতে তাঁর বাসস্থান নির্দিষ্ট হ'ল শ্বশ্রূমাতা চন্দ্রাদেবীর সঙ্গে। একাদিক্রমে তিন-চার বছর শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন বা তাঁর কাছ থেকে কোন প্রকার আহ্বান না পেয়ে সারদা ভেবেছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে ভুলেই গেছেন বুঝি বা। আজ তাঁর স্নেহপূর্ণ আন্তরিক ব্যবহারে তিনি বুঝলেন যে তাঁর দেবতা আগের মতই আছেন। সারদামণির প্রতি তাঁর ঐকান্তিক স্নেহ এতটুকুও হ্রাস পায়নি, তাঁদের অন্তরের যোগাযোগ ক্ষুণ্ণ হয়নি।

একদিন একান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি আমাকে সংসারের পথে টেনে নিতে এসেছ?' সারদামণি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'তোমাকে সংসারের ভেতর টানব কেন? তোমার জীবনের ব্রতে সহায় হ'তে এসেছি।' এই কথাবার্তার শুভ মুহূর্তে শক্তিরূপিণী মা সারদা শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরমধ্যে প্রবেশ করলেন। শুধু কি তিনি দক্ষিণেশ্বরেই এসেছিলেন রামকৃষ্ণের ব্রতে সহায়তা করতে? জগতে তাঁর আবির্ভাবই যে এই জন্য। উত্তরকালে অসুস্থ অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাকে বহুবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, এর পর শ্রীমাকে আরও অনেক দায়িত্ব নিতে হবে, ভক্ত-জননী সঙ্ঘ-জননীরূপে অনেক কর্তব্য তাঁর জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমা যে কঠিন ব্রতে ব্রতী হয়েছিলেন, তাতে উভয়ের জন্য নির্দিষ্ট সব কর্তব্যগুলি সমাপন করলে তবে না তাঁদের ব্রত সুষ্ঠুভাবে উদ্যাপিত হবে। সে কি সহজ ব্রত, সে কি সাধারণ সঙ্কল্প। একটা দেশ মানসিক অবনতির পথে ধাবমান, একটা জাতি তলিয়ে যাচ্ছে দুর্নীতির অতলান্ত পঙ্কে, বৈদেশিক-তার মোহে দলে দলে লোক দৃঢ় করে ছিন্ন করছে আপন সমাজ, সংস্কার, ধর্মনীতি—সব বন্ধন, সেই অবনতির বন্যাস্রোতের মুখে বাধা হয়ে দাঁড়ানো—সে কি মুখের কথা, সে কি সহজ কাজ?

তারই প্রস্তুতিতে আজ তাই নবজীবনের

আহ্বান শ্রীমা অতি সহজেই গ্রহণ করলেন। তাঁর অন্তর্মূর্তিটি শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনমার্গে শক্তিময়ী হয়ে প্রকাশ পেল, আর সেই সঙ্গে তাঁর বহির্মূর্তিটি নিয়ত ব্যাপৃত রইল ঠাকুরের সর্ববিধ পরিচর্যায়। নহবতের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে অসূর্যম্পশ্যা হয়ে থেকে স্বামীর সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন তিনি। শুধু সাধনার ক্ষেত্রে প্রেরণারূপে নয়, শুধু সঙ্কল্পিত ব্রতে নীরব পার্শ্বচারিণীরূপে নয়, কঠোর ও অত্যুগ্র সাধনে জীর্ণ শীর্ণ শ্রীঠাকুরের নশ্বর দেহটিকে একটু সুস্থ রাখার জন্যেও শ্রীমায়ের সেবামূর্তিটি আবশ্যক ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীসারদামণিকে দেবীজ্ঞানে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে যখন সারদা প্রশ্ন করেছিলেন, 'আচ্ছা, আমি তোমার কে ?' চিন্তামাত্র না ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিয়েছিলেন, 'যে মা মন্দিরে আছেন, জন্মদাত্রী যে মা সম্প্রতি নহবতে আছেন, তুমি আমার সেই মা আনন্দময়ী।' সত্যই শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীসারদামণিকে জগন্মাতারই মানবী মূর্তি বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং সারদামণির প্রতি তাঁর আচার-ব্যবহারও তার প্রমাণ দিত। এই কথার তাৎপর্য যে তাঁর কাছে কত গভীর ছিল, কত নিগূঢ় ছিল তার চরম প্রকাশ ঘটেছিল জ্যৈষ্ঠের সেই শুভ অমাবস্যা তিথিতে, যেদিন ফলহারিণী কালিকা পূজা এক নবরূপ পরিগ্রহ করেছিল।

মন্দিরে সেদিন ফলহারিণী কালীপূজা। শ্রীরামকৃষ্ণের মনে এক নূতন ভাবের জোয়ার এল। হৃদয়কে ডেকে বললেন, তাঁর নিজের ঘরে দেবীপূজার ষোড়শোপচার আয়োজন প্রস্তুত করতে। শ্রীসারদামণিকে পূজাকালে উপস্থিত থাকবার জন্য খবর পাঠালেন। তারপর অমাবস্যা তিথির প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত হ'লে শ্রীসারদামণিকে ডাকিয়ে আনলেন ঠাকুর। পূজার আয়োজন তখন সুসম্পূর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের ইঙ্গিতে আলপনা দেওয়া পিঁড়ির উপর শ্রীসারদাদেবী পশ্চিমাস্যা হয়ে উপবেশন করলেন। তাঁর সম্মুখে পূজকের আসনে পূর্বাস্য হয়ে বসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে মন্ত্রপূত বারি দ্বারা অভিষিক্ত করলেন। তাঁর অন্তরস্থিত দিব্য শক্তিকে জাগ্রত করবার জন্য, উদ্বুদ্ধ করবার জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন।

সারদাদেবী বাহ্যজ্ঞানশূন্যা, সমাধিস্থা। শ্রীরামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে তাঁর পূজা করলেন। ভোগ নিবেদন ক'রে কিয়দংশ দেবীর মুখে দিলেন। মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে তিনিও সমাধিমগ্ন হলেন। অপার্থিব উচ্চতর লোকে, দেহাতীত আত্মার জগতে উন্নীত হয়ে, কুসুম-পবিত্র দুটি হৃদয় আত্ম-স্বরূপে একীভূত হয়ে গেল। অর্ধবাহ্যদশায় প্রত্যাবর্তন ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবীর চরণে আত্মনিবেদন করলেন—সুদীর্ঘ সাধনার ফলরাশির সঙ্গে জপের মালাও তাঁর পাদপদ্মে চিরকালের জন্য বিসর্জন দিয়ে প্রণাম করলেন। —'মূর্তিমতী বিদ্যারূপিণী মানবীর দেহাবলম্বনে দেবী-উপাসনায় শ্রীরামকৃষ্ণের সকল সাধনা শেষ, আর সারদাদেবীর শুদ্ধ দেহ ও মনের আধারে যুগধর্মপালনী মহাশক্তি শ্রীশ্রীমায়ের জীবন আরম্ভ।'

প্রাত্যহিক ব্যবহারেও শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমার সঙ্গে অত্যন্ত সসম্মানে কথা বলতেন। শ্রীমা তাঁর জন্য যখন খাবার নিয়ে আসতেন 'মা ব্রহ্মময়ী, মা ব্রহ্মময়ী' বলে তিনি উঠে পড়তেন। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্রাম করছেন দেখে মা নিঃশব্দে চলে যাচ্ছিলেন, এমন সময় লক্ষ্মী (ভ্রাতুষ্পুত্রী) মনে ক'রে ঠাকুর চোখ বুজেই বললেন, 'দোরটা ভেজিয়ে যাস্।' শ্রীমা বললেন, 'আচ্ছা'। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে ঠাকুর লজ্জিত ও ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। বারবার বলতে লাগলেন, 'আহা তুমি! আমি ভেবেছিলুম

লক্ষ্মী, কিছু মনে কোরোনি।' পরদিনও নহবতে গিয়ে বলছেন, 'ত্থাখ গো, সারা রাত ভেবে ভেবে আমার ঘুম হয়নি, কেন এমন কথা বলে ফেললুম।' মা ঠাকুরের পায়ে হাত বুলিয়ে দিলে তিনি শ্রীমাকে নমস্কার করতেন।

আবার শ্রীমার আধ্যাত্মিক উন্নতির সর্বপ্রকার দায়িত্ব ঠাকুর নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। যে আধ্যাত্মিকতা শ্রীমার অন্তরে সুপ্ত ছিল শ্রীঠাকুব তাকে জাগ্রত করলেন। তিনি তাঁকে উধ্বর্তর লোকের মাধুর্য সম্বন্ধে বলতেন। তিনি শ্রীমাকে হাতে ধরে সর্বপ্রকাব সাধনা শিখিয়েছিলেন। প্রথম থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ছিল শ্রীসাবদামণিকে আপনার দুরূহ ব্রত উদ্যাপনের সহকারিণীরূপে গড়ে তোলা। তারই প্রস্তুতিতে শ্রীমার সাধনা চলেছিল। প্রত্যহ প্রত্যুষে তিনি নিবিষ্ট চিত্তে ধ্যান-জপ করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ লক্ষ্য বাখতেন, শ্রীমা ধ্যানে বসেছেন কিনা। প্রতিদিন পঞ্চবটীতে যাবাব পথে তিনি খোঁজ নিতেন। সেই যে উষাকালে শয্যা ত্যাগ ক'রে ধ্যানে বসা অভ্যাস হয়েছিল, শ্রীমা জীবনের শেষ পর্যন্ত সে অভ্যাস রক্ষা করেছিলেন। অসুস্থতার জন্যও কোনদিন কোন ব্যতিক্রম হয়নি।

শ্রীরামকৃষ্ণের সুযোগ্যা সহধর্মিণী শ্রীশ্রীমা সর্বপ্রকার অধ্যাত্ম সাধনায় সিদ্ধি লাভ কবেছিলেন। ভাবসমাধি ছিল তাঁর করতলগত। কিন্তু নিজের উপর সংযমের বাঁধ শ্রীমাব এত সুদৃঢ় ছিল যে, তাঁর ভাবসমাধি প্রায় কেউই কখনও দেখতে পেত না।

শ্রীরামকৃষ্ণেব তিরোধানের পব শ্রীসারদামণি কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হয়ে বহুকাল কাটান। একদিন ধ্যানকালে তাঁর যে আনন্দময় অনুভূতি হয়, তিনি তা সখীস্বরূপা যোগীনমার কাছে ব্যক্ত করেন: দেখলাম যেন কতদূরে চলে গেছি, সকলেই আমাকে ভালবাসছে, কি রূপ আমার। ঠাকুরও রয়েছেন। সকলে কি যত্নে আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে দিলে। কি আনন্দ হচ্ছিল, সে আর ভাষায় বলতে পারি না। যখন মন নেমে এল, দেখলাম শরীরটা পড়ে রয়েছে, ভাবছি কি ক'রে ওটার ভেতর ঢুকব? খানিক পরে শরীরের চেতনা ফিরে এল।

শ্রীশ্রীমায়ের ওপর ঠাকুর অনেকখানি নির্ভর করতেন। নহবতের অতি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে হৃদযের যে বিশাল দ্বার ধীবে ধীরে উন্মুক্ত হয়েছিল, যে কল্যাণ হস্ত-দুটি জগৎজনকে অঙ্কে নিতে প্রসারিত হয়েছিল, সেই বিশ্বজননীর ওপর বহু সুকঠিন দায়িত্ব দেবার আকাঙ্ক্ষা রাখতেন শ্রীঠাকুর। তাই পাছে তাঁর লীলাসংবরণের পব শ্রীশ্রীমায়েরও সেই ইচ্ছে হয়, তাই শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন তাঁকে বলেছিলেন: আমার শরীরটা চলে গেলে তুমিও যেন শরীব ছেড়ে চলে যেও না। শুধু কি আমারই দায়? তোমারও দায়' এই যে লোকগুলো ঈশ্বরকে ভুলে অন্যায় কাজে লিপ্ত রয়েছে—পাপের অন্ধকারে পোকার মত কিল্ বিল্ করছে, কত দুঃখ ভোগ করছে। তুমি তাদের দেখবে, কেমন ক'রে ঈশ্বরকে ডাকতে হয় শেখাবে, শক্তি দেবে, ভক্তি দেবে। দুজনে এক কাজ করতে এসেছিলাম। আমি কিই বা কবেছি? তোমাকে তার অনেক বেশী করতে হবে, তুমি আমার বাকী কাজ পূর্ণ কোরো।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেহরক্ষা করবার পর তাঁর অদর্শনে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন দুঃসহ হয়ে উঠল। ঠাকুবের সেবায় অমানুষিক পরিশ্রম করাটাই শ্রীমায়ের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এই দীর্ঘ দিনে। তাই ঠাকুর-হীন জীবন তাঁর বুকে পাথরের মতো ভারি বোধ হ'ল। তখন মাঝে মাঝে তাঁর মনে হ'ত—'কি হবে এত কষ্ট সহ্য ক'রে? চলে যাই তাঁর কাছে।' একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেখা

দিয়ে বললেন, 'না তুমি থাক, অনেক কাজ বাকী আছে।'

শ্রীঠাকুরের কথা সার্থক করতে শ্রীমা এই ধরাধামে রইলেন। তাঁর অগণিত সন্তান-মধ্যে তিনি স্নেহময়ী জননীরূপে বিরাজ করতে লাগলেন। তাদের সংশয় করলেন দূর, তাদের শোনালেন শান্তির বাণী, যোগালেন শক্তি ও প্রেরণা। সেই মাতৃদেবীর স্নেহাঞ্চল-ছায়ায় সন্তানগণ পেলেন নির্ভয় নিশ্চিন্ত আশ্রয়, আর গড়ে তুললেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘ।

শ্রীমায়ের আশীর্বাদের প্রেরণা নিয়ে পূজ্যপাদ স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তা বহন ক'রে আমেরিকায় যান। তার আগেই একদিন মায়ের দর্শন হয়: শ্রীরামকৃষ্ণ ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে গঙ্গায় মিশে গেলেন, আর নরেন্দ্রনাথ সেই জল দিকে দিকে ছিটিয়ে দিতে দিতে বলছেন, 'জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ'—অমনি অগণিত নর-নারী মুক্তি লাভ করছে, ধন্য হচ্ছে। নরেন্দ্রের জীবনের সুমহৎ ব্রত বুঝতে শ্রীমায়ের দেরি হ'ল না, দেখলেন ঠাকুর তাঁর শ্রীহস্তে স্বামীজীকে ধরে আছেন। তাই মাদ্রাজ থেকে মায়ের আশীর্বাদ ও অনুমতি প্রার্থনা ক'রে যখন তিনি চিঠি দিলেন, তখন স্নেহশীলা জননী প্রিয়তম পুত্রটিকে দূর বিদেশে যেতে অনুমতি দিয়ে অজস্র আশীর্বাদে তাঁর বিজয়-পথ সুগম ক'রে দিলেন। উত্তরকালে স্বামীজী বলেছেন: মায়ের আশীর্বাদেই এক লাফে হনুমানের মত সাগর ডিঙিয়েছি। মায়ের কৃপা আমার ওপর বাপের কৃপার লক্ষ গুণ অধিক।

শ্রীমা আপনাকে গোপন রেখেছিলেন চিরদিন। তাঁর ধ্যান-ধারণা, তাঁর চিন্তার খুব অল্প অংশই তিনি প্রকাশ ক'রে বলেছেন। তবুও যেটুকু উপদেশ, যেটুকু কল্যাণবাণী তিনি শুনিয়েছেন, তার পরিমাণ করা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে অসম্ভব। মায়ের শেষ উপদেশ: যদি শান্তি চাও মা, কারো দোষ দেখ না, দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার ক'রে নিতে শেখ। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।—এই শেষ বাণীর মাঝেই শ্রীমায়ের সমগ্র জীবন ও সাধনা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে।

তিনি ছিলেন অদোষদর্শিনী, ক্ষমা-স্বরূপিণী। মাতা সন্তানের সহস্র অপরাধ ক্ষমা করেন। মাতৃত্বের এই মহাসাধনা বলেই মা সকলকে আপনার করেছিলেন। সকলেই ছিল তাঁর সন্তান। তিনি ছিলেন সকলের সত্যিকারের মা। শ্রীমায়ের অগণিত সন্তানের মধ্যে নিবেদিতা একজন। নূতন দেশের নূতন মাটিকে আপনার করবার মহান্ মন্ত্র নিয়ে তিনি এদেশে এসেছিলেন, আর এসে যে 'নতুন মা'টিকে পেয়েছিলেন তাঁর স্নেহ-পক্ষপুটে তিনি পেয়েছিলেন সুকোমল আশ্রয়। সে আশ্রয় তাঁর সামনে শান্তিময় আনন্দনিকেতনের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছিল।

সিষ্টার নিবেদিতা শ্রীমা সম্বন্ধে বলেছেন, 'নারীর আদর্শ সম্বন্ধে সারদাদেবীই শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কথা।' শ্রীমা ছিলেন পুরাতনের শেষ প্রতীক ও এক নূতনের সার্থক সূচনা। *

* ৬ ৪. ৫৯ তারিখে সারদাসংঘের বার্ষিক অধিবেশনে সংঘের সভানেত্রীর ভাষণ।

সম্যক্ স্মৃতি

[বৌদ্ধ সাধনা]

শ্রীবাসমোহন চক্রবর্তী, বিদ্যাবিনোদ

বুদ্ধদেব নির্বাণ-প্রাপ্তির জন্য যে অষ্টাঙ্গ সাধন-মার্গের উপদেশ দিয়াছেন, তাহার সপ্তম সাধনটির নাম 'সম্যক্ স্মৃতি' (সম্মা সতি, Right Mindfulness)। 'স্মৃতি' বা 'সতি' কাহাকে বলে? যদ্দ্বারা কুশল আলম্বন স্মরণ করা যায় তাহাই 'স্মৃতি'। যাহার যেটি সাধ্য বস্তু তাহাকে নিয়ত স্মরণে রাখা, আদর্শকে সতত স্মৃতিপটে সমুজ্জ্বল রাখা এবং সেই আদর্শের পথে দৃঢ় পদবিক্ষেপে প্রতিনিয়ত অগ্রসর হওয়া—ইহাই 'সম্যক্ স্মৃতি' সাধনার তাৎপর্য। ভগবদ্‌ভক্তের পক্ষে যেমন 'অবিস্মৃতিস্তচ্চরণারবিন্দয়োঃ' একান্ত আবশ্যক, তেমনি নির্বাণ-পথগামী বৌদ্ধ সাধককেও সতত বুদ্ধ ও ধর্মের কুশল আলম্বনে চিত্তকে যুক্ত রাখিতে হয়। আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে অভীষ্ট বস্তুতে ঐকান্তিক নিষ্ঠা, আদর্শের প্রতি সতত জাগরূকতা, নিয়ত আলম্বন-অভিমুখিতা—ইহারই নাম 'সম্যক্ স্মৃতি'। কোনও অবস্থাতেই আদর্শকে পরিত্যাগ না করা, অবিস্মৃতিময় সতর্কতা সহকারে আদর্শানুগত হইয়া চলা এবং এই আদর্শ নিষ্ঠা দ্বারা যাবতীয় অকুশল ধর্ম হইতে চিত্তকে সতত সংরক্ষণ করা—ইহাই 'সম্যক্ স্মৃতি' সাধনার লক্ষ্য।

ভগবান তথাগত বলিয়াছেন, 'সতিং খাহং ভিক্‌খবে সব্বত্থিকং বদামীতি'।—হে ভিক্ষুগণ। আমি স্মৃতিকে সর্ববিধ কুশল উদ্দেশ্যের সিদ্ধি-দাত্রী বলিয়া থাকি। কর্ণধারহীন তরণী ও স্মৃতিহীন চিত্ত—একই প্রকারে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া থাকে। মহাকবি ও মহাদার্শনিক আচার্য অশ্বঘোষ বলেন :

দ্বারাধ্যক্ষ ইব দ্বারি যস্য প্রণিহিতা স্মৃতিঃ।
ধর্ষয়ন্তি ন তং দোষাঃ পুরং গুপ্তমিবারয়ঃ॥

(সৌন্দর-নন্দ-কাব্যং—১৪।৩৬)

—যেই রক্ষিত পুরের দ্বারে দ্বারাধ্যক্ষ নিযুক্ত রহিয়াছে, শত্রুগণ যেমন তাহা আক্রমণ করিতে পারে না, সেইরূপ যাহার চিত্তে 'স্মৃতি' অব্যাহত আছে তাহাকে দোষে অভিভূত করিতে পারে না।

শরব্যঃ স তু দোষাণাং যো হীনঃ স্মৃতি-বর্মণা।
রণস্থঃ প্রতিশত্রূণাং বিহীন ইব বর্মণা॥

(ঐ—১৪।৩৮)

—যেমন বর্মহীন সৈনিক সমরস্থিত হইয়া প্রতি-দ্বন্দ্বী শত্রুর শরের লক্ষ্য হয়, তেমনি স্মৃতিরূপ বর্মহীন হইলে সাধক সমস্ত দোষের লক্ষ্য হইয়া থাকে।

আচার্য শান্তিদেব 'বোধিচর্যাবতার' গ্রন্থে স্মৃতির পরিচয় প্রসঙ্গে বলেন : এই চিত্তরূপ মত্ত মাতঙ্গ যদি উন্মুক্ত থাকে তবে কখন কাহার কী সর্বনাশ করে, তাহার স্থিরতা নাই। যদি ইহাকে স্মৃতিরূপ রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিতে পার, তাহা হইলে আর কোনও ভয় ভাবনা থাকে না, তখন সর্ববিধ কল্যাণ করায়ত্ত হয়।

বদ্ধশ্চেৎ চিত্তমাতঙ্গঃ স্মৃতি-রজ্জ্বা সমন্ততঃ।
ভয়মস্তং গতং সর্বং কৃৎস্নং কল্যাণমাগতম্॥

(বোধিচর্যাবতার—৫।৩)

তস্মাৎ স্মৃতির্মনোদ্বারান্নাপনেয়া কদাচন।
গতাপি প্রত্যুপস্থাপ্যা সংস্মৃত্যাপায়িকীং ব্যথাম্॥

(ঐ—৫।২৯)

—অতএব স্মৃতিকে মনোদ্বার হইতে কদাপি অপ-

নীত করিবে না। স্মৃতি অপগত হইলে দুর্গতির ব্যথা স্মরণ করিয়া পুনশ্চ তাহাকে উপস্থাপিত করিবে।

স্মৃতির সাধনার সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট সাধনান্তরের নাম 'সংপ্রজন্য'। মুহুর্মুহু কায় ও চিত্তের অবস্থা প্রত্যবেক্ষণ করার সাধনাই 'সংপ্রজন্য' নামে অভিহিত।

এতদেব সমাসেন সংপ্রজন্যস্য লক্ষণম্।
যৎ কায়-চিত্তাবস্থায়াঃ প্রত্যবেক্ষা মুহুর্মুহুঃ॥
(ঐ—৫।১০৮)

মদমত্ত মাতঙ্গ-সদৃশ দুর্জয় চিত্তকে বশীভূত করিতে হইলে 'স্মৃতি ও সংপ্রজন্য' এই দুইটি সাধনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। সাধক-প্রবর শান্তিদেব বলেন:

চিত্তং রক্ষিতুকামানাং ময়ৈষ ক্রিয়তেঽঞ্জলিঃ।
স্মৃতিং চ সংপ্রজন্যং চ সর্বযত্নেন রক্ষত॥
(বোধিচর্যাবতার—৫।২৩)

—যাঁহারা চিত্ত রক্ষা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে আমি অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া বলিতেছি যে, তাঁহারা যেন স্মৃতি ও সংপ্রজন্যকে সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করেন।

সংপ্রজন্যং তদায়াতি ন চ যাত্যাগতং পুনঃ।
স্মৃতির্যদা মনোদ্বারে রক্ষার্থমবতিষ্ঠতে॥
(ঐ—৫।৩৩)

—মনোগৃহের দ্বারে যখন রক্ষার নিমিত্ত 'স্মৃতি' দ্বারী হইয়া অবস্থান করে, তখনই 'সংপ্রজন্য' আসে এবং একবার আসিলে আর যায় না।

দীঘ-নিকায়ের 'মহাসতিপট্ঠান'-সুত্তে এবং মজ্ঝিম-নিকায়ের 'সতিপট্ঠান'-সুত্তে সম্যক্ স্মৃতির সাধনা বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। মহা-সতিপট্ঠান-সুত্তের প্রারম্ভেই ভগবান তথাগত বলিতেছেন:

একায়নং ভিক্খবে মগ্গো সত্তানং বিসুদ্ধিয়া, সোকপরিদেবানং সমতিক্কমায়, দুক্খ-দোমনস্সানং অত্থঙ্গমায়।

—ভিক্ষুগণ! জীবগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-সন্তাপ হইতে মুক্তির জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্যের বিনাশের জন্য ইহাই 'একায়ন মার্গ' অর্থাৎ সম্যক্ স্মৃতির সাধনাই সংসার হইতে নির্বাণে যাইবার একমাত্র পথ। বস্তুতঃপক্ষে বুদ্ধদেব দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশের জন্য যে সাধনমার্গের নির্দেশ দিয়াছেন, তাহার রহস্য 'স্মৃতি-প্রস্থানে'র (সতিপট্ঠান) ভিতর বিশেষভাবে নিহিত রহিয়াছে। এই কারণে বৌদ্ধ সাধকসমাজে 'সতিপট্ঠান'-সুত্ত বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত পঠিত ও আলোচিত হইয়া থাকে।

'সতিপট্ঠান' স্মৃতি-প্রস্থান বা স্মৃতি-উপস্থান শব্দের অর্থ মনের দ্বারে 'স্মৃতিকে' প্রহরীরূপে স্থাপন করা। যেমন নিপুণ প্রহরী অপ্রমত্ত হইয়া দ্বারে দণ্ডায়মান থাকে, অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে কখন প্রবেশ করিতে দেয় না, কে ভিতরে প্রবেশ করিল এবং কে বাহির হইয়া গেল তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রয়োগে তাহা সর্বদা লক্ষ্য করিয়া থাকে, ঠিক তেমনি সাধককেও মনের দ্বারে 'স্মৃতি'কে প্রহরী-রূপে স্থাপন করিতে হইবে। চিত্তে কখন কি চিন্তা উদিত হইতেছে ও লয় পাইতেছে 'স্মৃতি' তাহা সতর্কতার সহিত লক্ষ্য রাখিবে এবং তাহা-দিগকে নিয়ন্ত্রণ করিবে। উঠিতে বসিতে, আসিতে যাইতে, ভোজনে পানে—এমনকি নিদ্রাকালেও স্মৃতি জাগরূক থাকিয়া প্রহরীর কার্য চালাইয়া যাইবে। 'বোধিচর্যাবতার' গ্রন্থে আচার্য শান্তিদেব এই চিত্তপ্রত্যবেক্ষণ সম্বন্ধে যে সকল উক্তি করিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য:

কুত্র মে বর্তত ইতি প্রত্যবেক্ষ্যং তথা মনঃ।
সমাধানধুরং নৈব ক্ষণমপ্যুৎসৃজেদ্ যথা॥
(বোধিচর্যাবতার—৫।৪১)

—আমার মন কোথায় আছে, ইহা পুনঃ পুনঃ প্রত্যবেক্ষণ করিতে হইবে, এই সমাধান-পরায়ণতা যেন ক্ষণমাত্রও ত্যাগ না হয়।

নিরূপ্যঃ সর্বযত্নেন চিত্তমত্তদ্বিপস্তথা।
ধর্মচিন্তামহাস্তম্ভে যথা বদ্ধো ন মুচ্যতে ॥

—চিত্তরূপ মত্তহস্তী এরূপ ভাবে প্রত্যবেক্ষণীয় যে, তাহা যেন সতত ধর্মচিন্তারূপ মহাস্তম্ভে আবদ্ধ থাকে এবং কদাপি তাহা হইতে মুক্ত না হয়।

'সম্যক্ স্মৃতি'র সাধনা দ্বারা নিজ চিত্তকে জয় করিতে পারিলেই সাধক সর্বজয়ী হইতে পারেন।

কিয়তো মারয়িষ্যসি দুর্জনান্ গগনোপমান্।
মারিতে ক্রোধচিত্তে তু মারিতাঃ সর্বশত্রবঃ ॥
(ঐ—৫।১২)

—দুর্জন অসংখ্য, তাহাদের কয়জনকে মারিবে? নিজের ক্রোধচিত্তকে মারিতে পারিলে সমস্ত শত্রুকেই মারা হইয়া গেল।

ভূমিং ছাদয়িতুং সর্বাং কুতশ্চর্ম ভবিষ্যতি।
উপানচ্চর্মমাত্রেণ ছন্নং ভবতি মেদিনী ॥
বাহ্যা ভাবা ময়া তদ্বচ্ছক্যা ধারয়িতুং ন হি।
স্বচিত্তং ধারয়িষ্যামি কিং মমান্যৈর্নিবারিতৈঃ ॥
(ঐ—৫।১৩, ১৪)

—সমস্ত ভূমিকে ঢাকিবার মত চর্ম কোথায় পাওয়া যাইবে? জুতার চর্মমাত্র দ্বারাই পৃথিবী আচ্ছাদিত হয়। সেইরূপ বাহিরের প্রতিকূল ভাবসমূহকে নিবারণ করিতে আমার সামর্থ্য নাই। অতএব নিজের চিত্তকেই ধারণ করিব, অন্য সকলকে নিবারণ করিয়া আমার কাজ কি?

তুমি এস প্রাণে

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী

হৃদয়ের যত অভাব মিটাতে
তোমারে হৃদয়ে নাহি চাই,
তাই তোমা হ'তে তিল তিল ক'রে
দূরে দূরে আমি সরে যাই।

অশান্তি মাঝে খুঁজি শান্তিরে,
সত্য ছাড়িয়া পূজি ভ্রান্তিরে,
মৃগ-তৃষ্ণিকা-মায়ায় অন্ধ,
নাহি জানি আমি কোথা ধাই।

হৃদয়ের যত অভাব মিটাতে
তোমারে হৃদয়ে নাহি চাই।

নাম ও রূপের মায়ায় ভুলেছি,
বহুত্বে মোর ডুবে মন,
বহির্মুখিনী গতি মোর হায়,
বুঝিনাক কভু কে আপন।

জীবন ভরিয়া কত কি চাহিনু,
অভাব দিয়াই হৃদয় ভরিনু,
অপূর্ণ মোর সকল কামনা,
কেঁদে মরে তাই সদা খ'ন।

তুমি এসে প্রাণে কর এইবার
সকল অভাব নিরসন।

মানসপুত্র

স্বামী অচিন্ত্যানন্দ

'মানসপুত্র'—বলেছিলেন জগন্মাতা, শুনেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

মনে উঠেছিল ঠাকুরের: 'মা, ইচ্ছে করে, একটি শুদ্ধসত্ত্ব ত্যাগী ভক্ত ছেলে, আমার কাছে সর্বক্ষণ থাকে'। তারই ফলে দেখেছিলেন দিব্য চক্ষে—মা একটি ছেলে এনে কোলে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'এইটি তোমার ছেলে'।

সংসারী ভাবের ছেলে—ঠাকুরের কল্পনাতে কখনও ছিল না। তাই মায়ের কথা শুনে ঠাকুর শিউরে উঠেছিলেন। তাঁর ভাব দেখে মা হেসে বলেছিলেন, 'সাধারণ সংসারী ভাবের ছেলে নয়, ত্যাগী মানসপুত্র'।

'মানসপুত্র' কথাটি মানুষের রচিত নয়, জগন্মাতার উচ্চারিত কথা। ঠাকুরের মন দিয়ে নিখুঁত ভাবে গড়া যেন এই ছেলে, তিনি যেমনটি চেয়েছিলেন—ঠিক তেমনটি। তাই বুঝি মা বলেছিলেন, 'মানসপুত্র'।

পুত্র হয় পিতার সম্পদের অধিকারী। সাধারণ বিষয়ীদের সঙ্গে কথা ব'লে অস্থির হয়ে ঠাকুর চেয়েছিলেন এই পুত্র। কারণ বিষয়ীর মধ্যে নিজের ভাবের উত্তরাধিকারীর সন্ধান পাচ্ছিলেন না। যখন রাখাল এলেন তাঁর কাছে দক্ষিণেশ্বরে, তখন চিনতে পারলেন—'এই সেই'।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কোলে বসিয়ে দিয়েছিলেন জগন্মাতা মানসপুত্রকে, যেমন শিশুপুত্রকে বসিয়ে দেয়। ঠাকুরের কোলে বসা—এই ভাব, শিশুপুত্রের ভাব, চিরকাল ছিল রাখালচন্দ্রের। ঠাকুরের কাছে যখন যেতেন, তখন তাঁর ঠিক যেন চার বছরের ছেলের ভাব হ'ত। ঠাকুরকে মায়ের মতো দেখতেন। থেকে থেকে দৌড়ে গিয়ে তাঁর কোলে বসে পড়তেন। ঠাকুরকে পেলে, আত্মহারা হয়ে কি যে বালকভাবের আবেশ হ'ত, তা ব'লে বোঝাবার নয়। ঐ ভাব যে দেখত সেই অবাক্ হয়ে যেত। ঠাকুরও ভাবাবিষ্ট হয়ে তাঁকে ক্ষীর ননী খাওয়াতেন, খেলনা দিতেন, কখনও কখনও কাঁধে চড়াতেন। এসব সত্ত্বেও রাখালচন্দ্রের মনে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ হ'ত না। একবার মা ভবতারিণীর মন্দির থেকে প্রসাদী মাখন ঠাকুরের ঘরে এলে, ছোট ছেলের মতো, ব্রজের রাখালের মতো, রাখাল তুলে নিয়ে খেলেন। ঠাকুর তাতে বকলেন। বকুনি পেয়ে ছোট ছেলেরই মতো, তিনি ভয়ে জড়সড় হয়ে গেলেন। চিরকালের জন্য ওরূপ করা ছাড়লেন। তা দেখে ঠাকুর বলতেন, 'ওকে কিছু বলো না, ও দুধের ছেলে'। ঠাকুর যদি তাঁকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসতেন, হিংসা হ'ত রাখালচন্দ্রের। তিনি তা সহ্য করতে পারতেন না। অভিমানে মন ভরে যেত তাঁর। ঠাকুর তাঁর সে ভাব দূর ক'রে দিয়েছিলেন।

কোলের ছেলে যেমন নিশ্চিন্ত—মায়ের ওপর নির্ভরশীল থাকে, সেই রকমই নিশ্চিন্ত—ঠাকুরের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন রাখালচন্দ্র। পিতার বন্ধন, পারিবারিক বন্ধন, বিষয়ের বন্ধন, কত বন্ধনই না ছিল তাঁর। কিন্তু ঠাকুরকে দেখার পর থেকে, সে-সবের কোন চিন্তাই ছিল না তাঁর মনে। ঘুচে গেল ও-সব অতি সহজেই, ঠাকুরের কৃপায়।

'শুদ্ধসত্ত্ব' সংসারে থাকতে পারবেন না, তাই রাখাল চলে এলেন ঠাকুরের কাছে।

ঠাকুরের কাছেই কাটালেন চিরকাল। কোনও প্রকার বিষয়বুদ্ধি স্পর্শ করতে পারেনি তাঁকে কোন কালে। নিত্য মুক্ত—তাই পড়েননি মায়াজালে। ঈশ্বরকোটি—তাই সদাই বিচরণ করতেন এক ভাবের রাজ্যে। যদিই বা মন নামত সাধারণ ভূমিতে—ক্ষণেকের জন্য, পরক্ষণেই আবার উঠে যেত সেই উচ্চ ভূমিতে, স্বাভাবিক ভাবেই। তাই বুঝি অত বড় জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ, স্পর্শমাত্রে অন্যের মধ্যে জ্ঞানসঞ্চারে সক্ষম, শ্রীশ্রীঠাকুর যাঁকে সব দিয়ে ফকির হয়েছিলেন, সেই স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত বলেছিলেন, 'আধ্যাত্মিকতায় রাখাল আমাদের সকলের চেয়ে বড়'।

শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে একদিন গঙ্গার দিকে চেয়ে দিব্য দৃষ্টিতে দেখলেন, গঙ্গায় একটি শতদল পদ্ম ফুটে উঠল। অপূর্ব শোভা তার। কমলের দলে দলে কিশোর কৃষ্ণের হাত ধ'রে কিশোর বালক নৃত্য করছেন। দেখে ঠাকুর ভাবে বিভোর হয়ে গেলেন—কৃষ্ণসখা, ব্রজের রাখাল, রাখালরাজ দর্শন ক'রে। তারপর এলেন রাখালচন্দ্র, স্থূল দৃষ্টিতে দেখলেন ঠাকুর। ওদিকে দিব্য দৃষ্টির দর্শন, এদিকে স্থূল চোখের দেখা। ব্রজের রাখাল, রাখালচন্দ্র। দুইই এক, পূর্ণ সাদৃশ্য—অবিকল সেই কিশোর বালক।

তাই ছিল ব্রজের দিকে তাঁর টান। ভয়ে আকুল হতেন ঠাকুর এই টান দেখে। যাঁর সম্বন্ধে বলতেন, 'ওর মুখপানে চাও, দেখতে পাবে ঠোঁট নড়ছে, অন্তরে অন্তরে সদাই ঈশ্বরের নাম জপ করে'—যাঁকে দেখলে 'গোবিন্দ! গোবিন্দ!' বলে মহাভাবে মগ্ন হয়ে যেতেন—যাঁকে না দেখলে, 'মা, আমার রাখালরাজকে এনে দে!' ব'লে জগন্মাতার কাছে কেঁদে আকুল হতেন—সেই রাখালচন্দ্র, যেথান থেকে এসেছেন সেখানে—ব্রজধামে গেলে, পাছে আর না ফেরে, তাই ভেবে ভয় পেতেন ঠাকুর। মায়ের কাছে প্রার্থনা করতেন, 'যেতে চায় দুদিনের জন্য যাক্, কিন্তু চিরদিনের জন্য যেন না যায়', বলতেন, 'রাখাল সত্যি ব্রজের রাখাল। যে যেথান থেকে এসেছে শরীর ধারণ ক'রে, সেখানে গেলে প্রায়ই তার শরীর থাকে না'। রাখালচন্দ্র শ্রীবৃন্দাবনে গেলে ঠাকুর নিশ্চিন্ত থাকতে পারেননি। ভক্তদের একে তাকে বলতেন, খোঁজখবর নিতে, চিঠি লিখতে। কতই ভয়, পাছে তাঁকে ছেড়ে চলে যায়—নিজের ধামে, পাছে আর না ফেরে। সেখানে তাঁর অসুখ হয়েছে শুনে, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে মার কাছে বলতেন, 'মা কি হবে? তাকে ভাল ক'রে দে'।

কিছুকাল বাইরে কাটিয়ে সুস্থ হয়ে ফিরে এলেন রাখালচন্দ্র। তারপর কতবার ব্রজে গেছেন, কত তপস্যা করেছেন। কখনও বৃন্দাবনে, কখনও কুসুম-সরোবরে, কখনও শ্যাম-কুণ্ড-রাধাকুণ্ডে, কখনও গিরিগোবর্ধনে। আহারের, বস্ত্রের, বাসস্থানের, তীর্থভ্রমণের ও তপস্যার কঠোরতা স্বেচ্ছায় বরণ করেছেন। এরই মধ্যে দিনের পর দিন ব্রজধামে ধ্যানে কাটিয়েছেন। ধ্যানের ভাবে উঠেছেন, বসেছেন, খেয়েছেন, শুয়েছেন, চলেছেন, ফিরেছেন।

সাধক রাখালচন্দ্র, কখনও কখনও ঠাকুরকে পর্যন্ত বলতেন, 'সময় সময় তোমাকেও আমার ভাল লাগে না'। তাই দূরে সরে গিয়ে, গভীর ধ্যানে ডুবে গিয়ে সব ভুলে যেতে চাইতেন। কিন্তু ঠাকুর সে রাজ্য থেকে ফিরিয়ে আনতেন তাঁকে। ছেলে যে—লোকে দেখবে, ছেলেকে দেখে তাঁকে দেখবে—স্থূল শরীরের অদর্শনের পর। কখনও ভুলতে পারতেন না, কখনও ছেড়ে যেতে পারতেন না ঠাকুরকে রাখালচন্দ্র। পিতাপুত্রে, আদর-আবদারের মধ্যে, মান-অভিমানের পালাও

চলত; কখনও কখনও চরমে উঠত। অভিমানে ফুলে তখন দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে, ঠাকুরকে ছেড়ে, চলে যেতে চাইতেন রাখালচন্দ্র। যেতেনও খানিক দূর। কিন্তু ঐ পর্যন্ত, আর এগোতে পারতেন না। ফিরে আসতে হ'ত আবার সেই ঠাকুরের কোলে। এমনি টান ছিল।

পিতার গুণ পুত্রে পায়, অন্ততঃ খানিকটা। ঠাকুরের গুণ পেয়েছিলেন রাখালচন্দ্র অনেকখানি। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব হ'ত মুহুর্মুহু, রাখালচন্দ্রও সর্বদা ভাবে মগ্ন থাকতেন। দক্ষিণেশ্বরে, বলরাম-মন্দিরে, বেলুড়মঠে, কাশীতে, বৃন্দাবনে কখনও তা গভীর ভাবে পরিণত হয়েছে। একবার বেলুড় মঠে কালীকীর্তন শুনে এত দীর্ঘকাল-স্থায়ী গভীর ভাব হয়েছিল যে, মা-ঠাকরুণ এসে মাথায় হাত বুলালে তবে ভাবের উপশম হয়।

তাঁর কাছে যাঁরা আসতেন, শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের সকলকে এমন ভালবাসতেন যে প্রত্যেকেই ভাবতেন, ঠাকুর তাঁকে অন্যের চেয়ে বেশী ভালবাসেন। পুত্রও এই গুণ অনেকাংশে পেয়েছিলেন। ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ, সন্ন্যাসী-গৃহী, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, প্রত্যেকেই ভাবতেন মহারাজ তাঁকে যেমন ভালবাসেন, অন্যকে তেমন ভালবাসেন না।

ঠাকুরের ছিল মিষ্ট ব্যবহার, এত মিষ্ট যে সে ব্যবহার যিনি পেতেন, তিনিই মুগ্ধ হয়ে যেতেন। (রাখাল) মহারাজেরও ছিল অতি ভদ্র বিনয়-নম্র ব্যবহার। সে ব্যবহারে প্রাণ জুড়িয়ে যেত।

যেখানে যেখানে ঠাকুর যেতেন, সেখানকার আশে পাশের যত দেবস্থান তিনি দর্শন করতেন ও যথাসাধ্য পূজা দিতেন। মহারাজও কোথাও গেলে, সেখানকার দেবমন্দিরে দেবদর্শন ও পূজা নিবেদন ক'রে, তবে অন্য কাজ করতেন।

মন্ত্র-উচ্চারণ, সামগ্রী-নিবেদন ও যাবতীয় অনুষ্ঠানের দ্বারা যাতে দেবপূজা নিখুঁত ভাবে হয়, সে দিকে ঠাকুরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। মহারাজও পূজার প্রত্যেক অঙ্গ ও খুঁটিনাটির দিকে বিশেষ নজর রাখতেন, এবং সেগুলি ঠিক ঠিক শাস্ত্রীয় ভাবে, শুদ্ধ আচারে, যাতে অনুষ্ঠিত হয়—তার ব্যবস্থা করতেন।

ঠাকুর ছিলেন ত্যাগী-রাজ, মহারাজও ছিলেন সর্বত্যাগী। ঠাকুরের মন অনুক্ষণ ভগবদ্‌রাজ্যে বিচরণ ক'রত, মহারাজ ঘন ঘন ভগবদ্‌ভাবে মগ্ন হতেন। সংসারের অনেক উর্ধ্বে ঠাকুর বিচরণ করতেন, মহারাজও ছিলেন সর্ব প্রকারে সংসারে নির্লিপ্ত।

ঠাকুর বলতেন, 'সত্যকথা কলির তপস্যা—' ভুলেও মিথ্যা বলতেন না। মহারাজ ঠাট্টার ছলেও মিথ্যা বলতে নিষেধ করতেন এবং সেইরূপ আচরণ করতে উপদেশ দিতেন। অন্যের পীড়া হয়, কষ্ট হয়, উদ্বেগ হয়, এরূপ আচরণ বা কথাবার্তা ঠাকুর পরিহার করতেন। মহারাজও কারও মনে কখনও কষ্ট দেননি, কাউকে কখনও ব্যতিব্যস্ত করেননি। এ সব শিক্ষা তাঁর শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে।

একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন, 'রাখাল একটা রাজ্য চালাতে পারে।'—শুনেই স্বামীজী তাঁর নাম দিলেন 'রাজা' এবং এই নামেই তাঁকে ডাকতেন। এই জন্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলী তাঁকে 'রাজা মহারাজ' বলেন। 'মহারাজ' নামেই তিনি সুপরিচিত। স্বামীজী রাখালচন্দ্রকে শুধু 'রাজা' নাম দিয়েই ক্ষান্ত হননি, তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের অধ্যক্ষ ক'রে সে নাম সার্থক করেছিলেন। এমনকি আমেরিকা থেকে ফিরে এসে, টাকাপয়সা

যা এনেছিলেন, সমস্ত মহারাজকে দিয়ে বলেছিলেন, 'রাজা, এ সমস্ত তোর, আমি কেউ নই'।

শ্রীশ্রীঠাকুর বুঝেছিলেন, ভক্ত-হৃদয়ে তিনি যে রাজ্যের বিস্তার আরম্ভ ক'রে গেলেন, সে রাজ্য পরিচালনা করতে রাখালরাজাই সমর্থ। ঠাকুর জানতেন, তিনি যে 'শিবজ্ঞানে জীব-সেবা'র আদর্শ দিয়ে গেলেন, তাকে অবলম্বন ক'রে নানা স্থানে কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হবে। তাঁর উপদেশ জীবনে অনুশীলন ক'রে দেখাবার জন্য স্থানে স্থানে সাধুদের মঠ হবে, সে উপদেশ বিস্তারিত ক'রে লোকের সামনে ধরবার জন্য দেশবিদেশে প্রচার-কেন্দ্র গড়ে উঠবে। এই ভাবে প্রসারিত তাঁর ভাব-সাম্রাজ্য নিয়মিত ও যথাযথভাবে পরিচালিত করতে রাখালরাজাই পারবেন। তাই ঠাকুর রাখাল-চন্দ্রকে সেই ভাবে শিক্ষিত করেছিলেন। শুধু নামেই 'রাজা' নয়, কাজেও রাজা হতে হবে রাখালচন্দ্রকে, তাই এই শিক্ষা।

তাই দেখা যায় কত ভক্ত—কেহ বা সাধু, কেহ বা গৃহী, স্ত্রী-পুরুষ, যুবা-বৃদ্ধ, নানা দেশের, নানা ভাষাভাষী, তাঁর কাছে এসেছেন ধর্মলাভ করতে। আর মহারাজও তাঁদের প্রত্যেকের অন্তরের কথা, এমন প্রাণস্পর্শী ভাষায় ব'লে দিয়েছেন যে তাতেই তাঁরা সন্ধান পেয়েছেন নিজের ভেতরে—যথার্থ ধর্মের। এরই ফলে চিরকালের জন্য কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হয়েছেন তাঁরা মহারাজের প্রতি, রাজার ন্যায় তাঁকে নিজেদের পরিচালক জ্ঞান করেছেন, রাজ-আদেশের ন্যায় তাঁর আদেশ পালন ক'রে গেছেন। মহারাজও তাঁদের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ ক'রে যাতে তাঁদের কল্যাণ হয়, উত্তরোত্তর আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়—তার জন্য চেষ্টা করেছেন।

বেলুড়ে, কাশীতে, আলমোড়ায়, মাদ্রাজে এবং আরও নানা স্থানে, শ্রীশ্রীঠাকুরের মঠ প্রতিষ্ঠিত হ'লে, যাতে ঠাকুরের আদর্শে, ত্যাগ-তপস্যার ভাব নিয়ে সে সব মঠ চলে, সে দিকে দৃষ্টি রেখেছেন, সে বিষয়ে উৎসাহ দিয়েছেন। মঠবাসী সাধুদের জীবন যাতে এই আদর্শ অবলম্বনে উন্নত-তর হয় তার জন্য অনেক উপদেশ দিয়েছেন। আবার নিজে ক'রে দেখিয়েছেন, কিভাবে সে আদর্শ কার্যে পরিণত করতে হয়।

যখন কাশীতে ও কনখলে কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন সেখানে বাস ক'রে অনুভব করেছেন—জীবরূপী শিবের সেবা সেখানে হচ্ছে। কর্মীদেরও সে সত্য অনুভব করতে বলেছেন। সে-সব কর্মও ভগবৎসাধনা, তাতেও ভগবান লাভ হয়, সবই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ—এই সত্য বারংবার প্রকাশ ক'রে, কর্মীদের মন থেকে সন্দেহ ও অবসাদ দূর ক'রে বিশ্বাস ও উদ্দীপনা এনে দিয়েছেন। যেখানে যেখানে কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে-সব জায়গাতেই এই আদর্শে কেন্দ্র-গুলি গড়িয়ে তুলেছেন, কর্মীদের জীবন গঠিত করিয়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবে—ত্যাগ-তপস্যার, শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শে।

মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমে, উদ্বোধনে, মাদ্রাজ মঠে, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব-প্রচারের উদ্দেশ্যে—স্বামী-জীর গ্রন্থাবলী ও 'উদ্বোধন' 'প্রবুদ্ধ ভারত' প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন যখন হয়েছে, তখন তিনি দেখেছেন ভগবান শ্রীরাম-কৃষ্ণের বাণী এ যুগের বেদ, স্বামীজীর মধ্য দিয়ে তার ভাষ্য প্রকাশিত হয়েছে। ঠাকুরের শিষ্যদের অনেকের মধ্য দিয়ে সে বাণী প্রচারিত হবে বিভিন্ন ভাবে। অনেকে আলোচনা করবে, ব্যাখ্যা করবে সে বেদবাণী, সে ভাষ্য—সে বিভিন্ন ভাব—নানা দেশে, নানা দিক থেকে। সে-সব জেনে লোকের কল্যাণ হবে। এ যুগের বাণী ভগবান কি জন্য কি ভাবে দিয়েছেন, বুঝে আলোর

সন্ধান পাবে। সে আলো জীবনের অন্ধকার দূর করবে, জীবন ধন্য করবে। এই ভাবে দেখে তিনি সে-সব পরিচালনা করার নির্দেশ দিতেন ও গড়ে তুলতেন।

এই ভাবে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবরাজ্যের পরিচালনা এবং প্রসার অক্ষুণ্ণ রেখে ঠাকুরের আদর্শে, তাঁর ভাবে, সে রাজ্যকে সুগঠিত করেছিলেন। এই রাজ্যের মধ্যে ছিল প্রাণঢালা ভালবাসা, অকৃত্রিম স্নেহ। সে স্নেহ, সমস্ত বাধাবিঘ্নকে ভেঙে চুরে সরিয়ে, নিজের গতিকে অব্যাহত রেখে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ ক'রে চলে যেত। ফলে দেখি তাঁর দিকে আকৃষ্ট সকল কর্মী, সন্ন্যাসী ও ভক্ত—শুধু বাংলায় নয়, ভারতের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমে, ভারতের বাইরে—সিংহলে, ব্রহ্মদেশে, আমেরিকায়, ইংলণ্ডে, আরও কত দেশে। আনন্দে তাঁরা ছড়াতে লাগলেন এই ভাব মহারাজকে কেন্দ্র ক'রে। গড়ে উঠল এই ভাবে এক সাম্রাজ্য। যার সূচনা ক'রে গিয়েছিলেন পিতা, তাকে গড়ে তুললেন উপযুক্ত পুত্র—তাঁর 'মানসপুত্র' স্বামী ব্রহ্মানন্দ। পরিষ্কার ক'রে দিয়ে গেলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব সকলের সামনে। মেনে নিলেন সকলে অবনত মস্তকে সে-সব। দীর্ঘকাল নিকট সাহচর্যবশতঃ পুত্র পিতার ভাব জানতেন। ঠাকুরের কাছে কাছে অনেকদিন থাকায় মহারাজ জানতেন তাঁর ভাব ভাল করেই। তাই মহারাজ দিতে পারলেন একটি ছাঁচ, ঠাকুরের ভাব-পরিচালনার, ভক্ত-পরিচালনার, কর্ম পরিচালনার—শুধু পরিচালনার নয়, গঠনের। যে ছাঁচে ফেলে এখনও চলেছে কাজ চারিদিকে।

পুত্র তাঁরই কাজ করছেন—একথা স্থূল শরীরের অদর্শনের পরও শ্রীশ্রীঠাকুর জানিয়ে দিয়েছিলেন—দিব্য শরীরে দর্শন দিয়ে দিব্য বাণীতে কথা ব'লে, শুধু নিজের সন্ন্যাসী শিষ্যদের বাছা বাছা কাউকে নয়—অতি সাধারণ লোককেও। একবার এক বাল-বিধবা—জীবনে কিছুই হ'ল না, জীবন বুঝি বৃথা গেল ভেবে আকুল হয়ে কাঁদছিলেন কদিন ভগবানের কাছে। দেখলেন এই সময়, বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর গভীর রাত্রে দেখা দিয়ে, 'কাঁদছিস্ কেন? বাগবাজারে আমার ছেলে রাখাল আছে, সেখানে যা, শান্তি পাবি'। কে ঠাকুর? কে রাখাল? কিছুই জানা ছিল না তাঁর। নিজের মায়ের কাছে সন্ধান নিয়ে গেলেন বাগবাজারে—উদ্বোধন কার্যালয়ে স্বামী সারদানন্দের সমীপে, সেখান থেকে প্রেরিত হ'য়ে বলরাম-মন্দিরে মহারাজের কাছে গেলেন তিনি। দুপুরে খাওয়ার পরে বিশ্রামের সময় বালিকাটি হাজির। মহারাজ তাঁর সব কথা শুনে, উপদেশ ও দীক্ষাদি দিয়ে জীবনে শান্তি দান করলেন, সেদিন আর বিশ্রাম করা হ'ল না। চিনলেন বালিকা শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে, চিনলেন তাঁর ছেলে রাখাল—তাঁর মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দকে। এই ভাবে অনেকেই চিনেছিলেন তাঁদের।

শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীমূলে, এক সময় ভাবচক্ষে যে বালককে দেখেছিলেন, সেই বালকভাবেই কাটিয়ে গেলেন মহারাজ চিরকাল। শ্রীমা মঠে এলে মহারাজ তাঁর কাছে কাছে ঘুরতেন। কাশীধামে শ্রীমা যেখানে থাকতেন, সেখানেও মহারাজ ঐ ভাব নিয়ে যেতেন। ছেলেকে শ্রীমাও ভাল কাপড় দিতেন। শ্রীমা জয়রামবাটী থেকে আসছেন শুনে শিশুর মতই মহারাজ দেখা করতে যেতেন। এই রকম শিশুভাবে এমন ডুবে থাকতেন যে, যিনি দেখতেন তিনিই ভাবতেন যেন ছোট্ট ছেলেটি। তখন তাঁর মধ্যে অধ্যক্ষ, মহারাজ, গুরু, রাজা—এদের কাউকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হ'ত। এই ভাব নিয়েই মানসপুত্র কাটিয়ে গেছেন সারাজীবন।

দালাই লামা

তিব্বতে ও মঙ্গোলিয়ায় প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের এক রূপান্তর লামাধর্ম। প্রথমে খৃঃ ষষ্ঠ শতকে পরে নবম শতাব্দীতে বিশেষভাবে ভারত হইতে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়, ক্রমশঃ ইহাতে স্থানীয় নানা রীতিনীতি ও বিশ্বাসের সহিত তন্ত্রসাধনাও মিশ্রিত হইয়া যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ৎসং-খা-পা লামা (বা সন্ন্যাসী)-দের নিয়মশৃঙ্খলা বাঁধিয়া দিয়া লামাধর্মকে একটি রূপ দেন। আত্মরক্ষার জন্য এই ধর্মকে দেশের ঐহিক ব্যাপারেও হাত দিতে হয়, এবং ক্রমে সর্বশক্তি লামাদের করতলগত হয়, গুরু শিষ্যানুক্রমে তাঁহাদের উত্তরাধিকারও প্রতিষ্ঠিত হয়, সর্বোপরি দুইজন মহান্ লামার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়, লাসায় দালাই লামা 'মহান্ সমুদ্রস্বরূপ', শিগাৎসিতে পাঞ্চেন লামা 'উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ'। বৌদ্ধদের বিশ্বাস একজন মহান্ লামার দেহত্যাগ হইলে অন্যজন ইঙ্গিত দিতে পারেন, মৃত লামা কোথায় পুনরায় দেহধারণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দুই মহান্ লামাকেই রাজনীতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইয়াছিল, ১৯৫২ খৃঃ হইতে তাঁহারা চীনাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে শাসন-ব্যবস্থা চালাইতেছিলেন।

এই পৃথিবীতে সশরীরে বাস করিয়া দালাই লামার মতো সম্মান ও শ্রদ্ধা কেহই পান না, তিব্বত, লাদাক, নেপাল, ভুটান ও সিকিমের লামা ও গৃহস্থগণ তাঁহাকে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া মনে করেন। বোধিসত্ত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেনঃ মানবকল্যাণে, মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তিনি বারংবার জন্মগ্রহণ করিবেন। 'দালাই লামা' কথাটির অর্থঃ ত্যাগী সন্ন্যাসী, যিনি সমুদ্রের মতো সকলকে ঘিরিয়া রহিয়াছেন তাঁহার কল্যাণ-ভাবনা দ্বারা। পদবীটি পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। ইহা ঠিক উত্তরাধিকার নয়, নির্বাচনও নয়। বহু অনুসন্ধানের পর কতকগুলি নির্দিষ্ট ইঙ্গিত-সহায়ে দালাই লামা 'আবিষ্কৃত' হন। লামাধর্মীদের বিশ্বাস দেহত্যাগের পর দালাই লামার আত্মা কোন নবজাত শিশুর দেহ আশ্রয় করে।

দালাই লামার দেহত্যাগ তিব্বতের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যতদিন না নূতন দালাই লামা আবিষ্কৃত হন ততদিন দেশে বিশেষ চাঞ্চল্য লক্ষিত হয়। অনেক সময় দেহত্যাগ-কালেই দালাই লামা ইঙ্গিত দিয়া যান কোথায় তিনি দেহধারণ করিবেন। দালাই লামার দেহ পোটালা পর্বতশিখরে সমাধিস্থ করার তিন চার বৎসর পরে বিভিন্ন মঠের লামারা, সম্ভ্রান্ত সদস্যেরা এবং শাসন-পরিচালকেরা মিলিত হইয়া প্রাপ্ত ইঙ্গিতের ব্যাখ্যা করিয়া স্থির করেন—'দালাই লামা' কোন্ দিকে জন্মিয়াছেন।

প্রথমে লাসার দৈববাণীর বক্তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি ভাবস্থ অবস্থায় ইঙ্গিত দেন—কোন্ অঞ্চলে দালাই লামা আবির্ভূত হইয়াছেন। এই ইঙ্গিত-সহায়ে পাঞ্চেন-লামা ও অন্যান্য প্রতিনিধিগণ দালাই লামার সন্ধান শুরু করেন। যে সকল শিশুর শরীরের লক্ষণসমূহ দিব্যভাবাপন্ন—বিশেষতঃ ভ্রূ ও চক্ষু যাহাদের ঊর্ধ্বগামী, কর্ণ দীর্ঘ ও করতলে শঙ্খ-চিহ্ন আছে—তাহাদের নিকট অন্যান্য জিনিসের সহিত পূর্ববর্তী দালাই লামার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি রাখা হয়, যে শিশু নির্ভীকভাবে অবলীলাক্রমে দালাই লামার ব্যবহৃত

দ্রব্যাদি তুলিয়া লয়, তাহাকেই নূতন দালাই লামা বলিয়া স্বীকার করা হয়।

মাতাপিতা ও ভ্রাতাভগ্নীর সহিত এই শিশুকে লাসায় আনা হয়। পরিবারের সকলকে রাজকীয় সম্মানে প্রাসাদে রাখা হয়, এবং পিতাকে 'কুং' এই সম্মানে ভূষিত করা হয়। অতঃপর শুরু হয় দালাই লামার শিক্ষা, যাহাতে তিনি পরবর্তীকালে সাম্য ন্যায় ও কল্যাণবুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া দেশ শাসন করিতে পারেন।

দালাই লামাকে ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করিতে হইবে, মাদকদ্রব্য তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ, তবে অত্যধিক শীতের দেশ বলিয়া আমিষ আহার নিষিদ্ধ নয়। নির্জনে তিনি সরল জীবন যাপন করেন, এবং লামারা তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম, দর্শন, ধ্যানধারণা, রাজ্যপরিচালনা—সব শিক্ষা দেন। যতদিন না তিনি বয়স্ক হইতেছেন, ততদিন একজন প্রতিনিধি তাঁহার নামে দেশ শাসন করেন।

বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে লামাধর্মে দীক্ষিত করা হয়, তখন তাঁহার নামকরণ হয়—সে নামের অর্থ: পবিত্র আত্মা, শান্ত মহত্ত্ব, বাক্‌শক্তি-পরায়ণ, শুদ্ধমনা, দিব্যজ্ঞানী, ধর্মরক্ষক, সমুদ্রের মতো ব্যাপক।

* * *

বর্তমান দালাই লামা যেভাবে আবিষ্কৃত হইয়াছিলেন, তাহা বিশেষ চমকপ্রদ। ১৯৩৩ খৃঃ যখন মহান্ ত্রয়োদশ দালাই লামা স্বর্গধামে গমন করেন, তখন সকলে তাঁহার শীঘ্র পুনরাবির্ভাবের জন্য প্রার্থনা করিতে থাকে। উত্তর-পূর্ব কোণে তিনি দেহধারণ করিবেন সে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সমাধিস্থ করিবার সময় মহান্ ত্রয়োদশ দালাই লামার মুখ ছিল দক্ষিণ দিকে, পরে সমাধি খুলিয়া নূতন আরক দিবার সময় দেখা যায় মুখ উত্তরপূর্ব কোণে, তাছাড়া মেঘের গতি এবং রামধনু ঐ দিকই নির্ণয় করিতেছিল।

প্রতিনিধি ঐ দিকে তীর্থভ্রমণে গিয়া হ্রদের স্থির নির্মল জলে যে দিব্য দৃশ্য দেখিলেন ও যে শব্দ শুনিলেন, তাহা দ্বারা চালিত হইয়া যথাস্থানের ইঙ্গিত পান। অনুসন্ধানকারীর দল পূর্ব তিব্বতের যে অংশ ১৯১০ খৃঃ চীনারা অধিকার করিয়া লয় সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইল। তদানীন্তন পাঞ্চেন-লামা তাহাদের তিনটি সম্ভাবিত নাম বলিয়া দিয়াছিলেন। দেখা গেল প্রথম নামের শিশুটি পূর্বেই মৃত। দ্বিতীয় শিশুটি দালাই লামার দ্রব্যাদি দেখামাত্র ছুটিয়া পলাইয়া যায়। অনেক অনুসন্ধানের পর ১৯৩৭ খৃঃ অক্টোবর মাসে কোকোনর প্রদেশে (চীনাদের দ্বারা অধিকৃত) তৃতীয় শিশুর সন্ধান পাওয়া গেল, তাহার মাতাপিতা চাষী, খাঁটি তিব্বতী। সকল লক্ষণ মিলাইয়া সন্ধানকারীরা সন্তুষ্ট হইলেন। একজন লামা ছদ্মবেশে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। দুই বৎসরের শিশু বলিয়া উঠিল, 'লামা, লামা', যে মঠ হইতে ঐ লামা আসিয়াছিল তাহার নামও সে বলিয়া দিল, অবশেষে পূর্ববর্তী দালাই লামার ব্যবহৃত জিনিসপত্র হইতে অনেকগুলি সে বাছিয়া লয়।

অনুসন্ধানকারীরা নিশ্চিন্ত হইল, তাহারা যথার্থ দালাই লামাকে খুঁজিয়া পাইয়াছে। কিন্তু কিভাবে তাহাকে লাসায় আনা যায়? কোকোনরের কুয়োমিংটাং প্রদেশপাল ছাড়-পত্রের জন্য অনেক টাকা চাহিলেন। বাধ্য হইয়া তিব্বতকে তাহার দালাই লামার জন্য ঐ টাকা দিতে হইল। ১৯৩৯ খৃঃ সেপ্টেম্বরে বোধিসত্ত্বের নবতম প্রকাশ চার বৎসরের শিশু লাসায় আসিলেন, এবং তিব্বতের নববর্ষে

১৯৪০ খৃঃ ফেব্রুআরি মাসে চতুর্দশ দালাই লামা রূপে অভিষিক্ত হইলেন।

সিংহাসনে আরোহণ করিবার পরই বেশ গুরুগম্ভীর ভাবে সেই পঞ্চমবর্ষীয় শিশু লামা-দের সকলের প্রণাম গ্রহণ করেন এবং সকলকে বেশ সহজভাবেই আশীর্বাদ করেন। ১৯৫২ খৃঃ তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হন।

চতুর্দশ দালাই লামা মনোমুগ্ধকর ব্যক্তি, গাম্ভীর্যের সহিত তীক্ষ্ণবুদ্ধি মিশিয়া তাঁহাকে অপূর্ব ব্যক্তিত্বে ভূষিত করিয়াছে; তাঁহার পূর্বগামীদের মতো তিনি গোঁড়া নন। অনেক পুরাতন রীতি তিনি লঙ্ঘন করিয়াছেন, তিনি নিজের ফটো তুলিতে দিয়াছেন, নিজেও ক্যামেরা ভালবাসেন। বর্তমান বিজ্ঞানের বিশেষতঃ বিদ্যুৎ-বিজ্ঞানের এবং মানুষের শ্রম-লাঘবকারী যন্ত্রপাতির তিনি অনুরাগী। তাঁহাকে উপহৃত একটি ক্যামেরা ও প্রজেক্টারের অংশগুলি পৃথক করিয়া সেগুলি তিনি আবার মিলিত করিতে পারিয়াছেন।

১৯৫৫-৫৭ খৃঃ বুদ্ধদেবের দ্বি-সহস্র জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে তাঁহার ভারতে আগমন সকলের চিরকাল মনে থাকিবে। যুবকের উৎসাহ লইয়া তিনি ভারতের বিভিন্ন শহরে গিয়াছেন এবং সরল শিশুর আগ্রহ লইয়া তিনি সব কিছু দেখিয়াছেন ও জিনিসপত্র কিনিয়াছেন। বিশেষ অতিথি না হইয়া কলিকাতায় এক হোটেলেই তিনি ওঠেন, তাঁহার অনুচরেরা হোটেল-কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে: মাননীয় দালাই লামার বাসগৃহের উপরতলা খালি করিয়া দিতে হইবে, তাঁহার উপরে কেহ থাকিবে না। হোটেল-কর্তৃপক্ষ একটু মুস্কিলে পড়িলেন। বিষয়টি ক্রমশঃ দালাই লামার কানে পৌঁছিল, তিনি তৎক্ষণাৎ অনুচরদের ঐ পুরাতন রীতি বর্জন করিতে বলিলেন। এইরূপে নানা কাজের ভিতর দিয়া সে-বার তিনি নিজেকে ভারতের প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিলেন।

১৯৫৭ খৃঃ ১৯শে জানুআরি এই প্রিয়দর্শন ধর্মগুরু—পাঞ্চেন-লামা ও অন্যান্য সহযাত্রী সহ বেলুড় মঠে আসেন, তাঁহার নম্র ব্যবহার ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা সকলকে মুগ্ধ করে। (এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ উদ্বোধন: ১৩৬৩-ফাল্গুন, ১৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

বর্তমানে রাজনীতিক কারণে তাঁহাকে লাসা ছাড়িয়া ৮০ জন অনুচরসহ দুর্গম পার্বত্য প্রদেশ অতিক্রম করিয়া ভারতে আসিতে হইয়াছে। প্রথমে উত্তরপূর্বাঞ্চলের তোয়াং বৌদ্ধমঠে উঠিয়া সামান্য বিশ্রাম গ্রহণের পর তিনি তেজপুর হইয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রীর সহিত আলাপ-আলোচনার জন্য মুসৌরি গিয়াছেন ও সম্প্রতি তাঁহার অনুচর-গণসহ সেখানেই অবস্থান করিতেছেন।

সর্বনাম-বিশ্লেষণ

['আমি', 'তুমি', 'ইহা' প্রভৃতি সর্বনাম-পদের বিশ্লেষণ করিয়া এই প্রবন্ধে দেখানো হইয়াছে আধ্যাত্মিক চেতনার প্রয়োজনীয়তা।]

অধ্যাপক শ্রীশিবপদ চক্রবর্তী

ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ উন্মেষের মধ্যে জ্ঞাতৃরূপ ছাড়া আরও কিছু নির্দেশ আছে, আর সেটি হচ্ছে প্রেমের বা মূল্যবোধের দিক।

মানুষ জ্ঞাতা তো বটেই, আর জ্ঞাতা-রূপেই সে বিভিন্ন বিজ্ঞানের আবিষ্কর্তা। জ্ঞান মানেই বিষয়জ্ঞান, আর সুসংস্কৃত বিষয়জ্ঞানই বিজ্ঞান। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিদ্যা, মনোবিজ্ঞান—এমনকি গণিতও জ্ঞাতৃ-নিরপেক্ষ, জ্ঞাতা-অতিরিক্ত অর্থাৎ জ্ঞাতা-ভিন্ন যে বিষয়—তারই এক এক বিভাগের প্রকৃষ্ট, সুমার্জিত জ্ঞান। গণিত অবশ্য নিরীক্ষিত বিষয়ের জ্ঞান নয়, কিন্তু এও এমন বিষয়ের (সংখ্যা, পরিমাণ) জ্ঞান যা নিশ্চয়ই জ্ঞাতা নয়। এমনকি মনোবিজ্ঞানে যে জ্ঞান হয়, তাতেও জ্ঞাতা নিজের মানসিক ঘটনাগুলিকেই বিষয় করে, আর এই মানসিক বিষয়গুলি প্রকৃতিরই অংশ, অর্থাৎ জ্ঞাতা-ভিন্ন। সাংখ্য-দর্শনের ভাষায় জ্ঞাতাকে 'পুরুষ' বলা হয়েছে, আর জ্ঞেয় বিষয়কে বলা হয়েছে 'প্রকৃতি'। এই পুরুষ কখনই প্রকৃতির অংশ হয় না, আর তাই জ্ঞাতা কখনই বৈজ্ঞানিক অর্থে জ্ঞেয় বিষয় হতে পারে না। কিন্তু জ্ঞাতাকে না জানলেও তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হতে পারে না, কারণ জ্ঞাতাই যদি সন্দিগ্ধ হয়, তবে শুধু জ্ঞান আত্মলাভ করতে পারে না। জ্ঞান জ্ঞাতাকেও চায়, আবার জ্ঞেয়কেও আকাঙ্ক্ষা করে। অর্থাৎ 'ঘটজ্ঞানে' আমি যদি জ্ঞাতা হই, ঘট আমার জ্ঞেয় পদার্থ, আর এই জ্ঞানের মধ্যেই আমি ওই বিষয়ের (ঘটের) আমা-ভিন্নত্ব টের পাই। তাই বিষয়জ্ঞানে বিষয়ীর নির্দেশ থাকলেও তার সম্বন্ধে জ্ঞান নেই, কারণ জ্ঞাতার সম্বন্ধে জ্ঞান হ'লে জ্ঞাতা জ্ঞেয়ই হয়ে বসবে। তখন সব বিজ্ঞানই যদি বিষয়জ্ঞান হয়, তবে বিজ্ঞানমাত্রই জ্ঞাতৃনিরপেক্ষ বিষয়ের জ্ঞানই দেবে—বিষয়ীর খবর বিজ্ঞান রাখতে পারে না। আমরা স্বভাবতই বিষয়াভিমুখে ধাবিত হই, প্রকৃতির রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধময় বিভিন্ন বিষয়ের খবর লই, আর মানুষের এই স্বভাবজ বিষয়মুখিতাই বিভিন্ন বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছে। বিষয়ীর খবর বিজ্ঞান রাখে না ব'লে বিজ্ঞানে মানুষের পূর্ণ পরিচয় নেই, অর্থাৎ বলতে চাই যে সমস্ত বিজ্ঞানকে কুক্ষিগত করেও আমি আমার স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকতে পারি। বিজ্ঞানের বহির্মুখিতা থেকে ভিন্ন এক ধরনের অন্তর্মুখিতা না হ'লে মানুষের পূর্ণ পরিচয় অসম্ভব।

বলদর্পী বিজ্ঞানের আধুনিকতম যুগে মানুষের আত্মিক মূল্যের প্রতি আমরা উদাসীন হয়ে পড়ছি। অধ্যাত্ম বিষয় এখন যেন বিদগ্ধসমাজের বিদ্রূপের স্থল হয়ে পড়েছে। বহু দার্শনিকও আজকাল বিজ্ঞানের ধ্বজাধারী, ঐন্দ্রিয়িক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বাইরে কোন আধ্যাত্মিক জগতের খবর তাঁরা রাখতে চান না। জড়-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আত্মিক মূল্যবোধের অভাব মানুষের এক চরমতম দুর্দিনের সূচনা করছে। বিজ্ঞান যতটা অগ্রসর হচ্ছে, ঠিক ততটাই আত্মিক দৈন্য হচ্ছে প্রকট।

নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও ধর্মের মূল্য অবহেলিত হচ্ছে ব'লে মানুষ আজ দেউলে হয়ে যাচ্ছে। তাই আজ নতুনভাবে বিজ্ঞানের মূল্য কষে নেবার বিশেষ প্রয়োজন। জড়বিজ্ঞান মানুষের ব্যক্তিত্বকে দেহসর্বস্ব বলেই মনে করতে বাধ্য। মানুষের মনোবৃত্তিগুলিও দেহেরই ক্রিয়াকলাপ বা ব্যবহারে পর্যবসিত হচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞান যে-হেতু বিষয়জ্ঞান সে-হেতু বৈজ্ঞানিক বর্ণনা খণ্ডিত হতে বাধ্য।

বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান বা বুদ্ধির মধ্য দিয়ে একটি সার্বিক আকার পাওয়া যায়, যার সংকেত দেখি 'আমি—ইহা' সম্বন্ধের মধ্যে। বিষয়জ্ঞানে যে 'আমি' জ্ঞাতা, তার বাইরে থাকে বিষয়, আর যে কোন বিষয়ই 'ইহা' বা 'ইদম্'-পদবাচ্য। অবশ্য জ্ঞাতারূপে আমি বা 'অহম্' বিষয় বা ইদম্-বিযুক্ত হয়ে থাকি না, কারণ জ্ঞাতা শুধু বিষয়েরই জ্ঞাতা, আর বিষয়ও জ্ঞাতার নিকট উপস্থিত কোন জ্ঞাতা ভিন্ন ইদম্-মাত্র। 'আমি—ইহা' বা 'অহম্-ইদম্'-এর একটি ছাড়া অন্যটি সম্ভব নয়, কিন্তু তবু 'ইদম্' 'অহম্' নয়, আর এমন বোধ বিষয়জ্ঞানের মধ্যেই নিহিত। জ্ঞানের স্তরে 'পুরুষ-প্রকৃতি' বা 'আমি-ইহা' পরস্পর বিরুদ্ধ ও বিজাতীয় তত্ত্বের সমাবেশ। এই জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবলে 'ইহা' অনেক দূরে, আমার সঙ্গে বা 'অহম্'-পদবাচ্য তত্ত্বের সঙ্গে তার কোন আত্মীয়তা নেই। জ্ঞানের দৃষ্টিকোণটি জ্ঞাতাগ্রাহ্য বিষয়ের বা 'ইদমে'র দৃষ্টিকোণ, তাতে 'অহমে'র সংকেত থাকলেও তার খবর নেই।

এর প্রধান প্রমাণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বা সত্যগুলির নৈর্ব্যক্তিকতা। এ জ্ঞানে—এক বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে, কতকগুলি নৈর্ব্যক্তিক সর্বগত সত্যের সন্ধান পাই, আর এ সত্য—ব্যক্তির বিশেষ আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-নিরানন্দের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলতে চায়। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সত্য ব্যক্তিবিশেষের ওপর আশ্রিত না হয়ে বিষয়গত ও পক্ষপাতশূন্য হতে চায়, আর তা না হ'লে তা'র বৈজ্ঞানিক মূল্যই যায় উবে। এই কারণেই 'আমি-ইহা' সমাবেশে 'ইহা'র সঙ্গে আমার যোগাযোগ বা নিবিড় আত্মীয়তা নেই, এ যেন একটা নিরপেক্ষ, নৈর্ব্যক্তিক, বহুদূরস্থিত তথ্য। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে তাই ব্যক্তি, পুরুষ বা তার 'অস্মিতা' বাদ পড়ে। সত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করলেও সকলেই সত্যকে বিষয়মুখী ব'লে স্বীকার করেন। আত্মমুখী হ'লে বা অস্মিতাকে আশ্রয় করলে বৈজ্ঞানিক সত্যের রূপহানি হয়। সকল বিজ্ঞানের বিষয়-মুখী দৃষ্টি তাই অস্মিতা বা ব্যক্তিকে আবরিত করে, আচ্ছন্ন করে। অথচ বিষয়ী যদি অসন্দিগ্ধ হয়, তবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পূর্ণ কি না—সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে। বিষয়ী, 'আমি' বা অস্মিতার খবর পেতে হ'লে জ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করতে হবে, আর অন্য কোন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হবে।

আমাদের সাধারণ জীবনে ও ব্যবহারে এমন এক আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে যাকে অস্বীকার করা অযৌক্তিক, এমনকি অবৈজ্ঞানিকও বটে। জ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী যেমন 'আমি-ইহা' সমাবেশে সূচিত হয়, তেমনি 'আমি-তুমি' সমাবেশে আর এক প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী পাওয়া যায়। যখন অন্য কোন ব্যক্তিকে আমি 'তুমি' ব'লে সম্বোধন করি, অথবা যখন কোন বিষয়ের প্রতি আমার 'তুমি' সম্বোধনে নির্দিষ্ট মনোভাব বর্তমান থাকে, তখন সেই ব্যক্তি বা বিষয়ের সঙ্গে আমার আত্মিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। 'আমি-ইহা' ও 'আমি-তুমি'-রূপ দৃষ্টিভঙ্গী দুটি সম্পূর্ণ বিজাতীয়, আর এদের পার্থক্য বুঝতে

পারলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানেরও উর্ধ্বে এক আত্মিক জগতের খবর পাওয়া যায়। একজন ব্যক্তি অপর একজন ব্যক্তিকেই 'তুমি' ব'লে সম্বোধন বা নির্দেশ করতে পারে। 'আমি-তুমি' সমাবেশে 'তুমি'র সঙ্গে 'আমি'র ব্যবধান, 'আমি-ইহা' সমাবেশে 'ইহা'র সঙ্গে 'আমি'র ব্যবধানের মতো নয়। 'আমি-তুমি'তে আত্মার সঙ্গে আত্মার আত্মীয়তা হয়, 'আমি-ইহা'তে দূরস্থ 'ইদম্' আমার দ্বারা জ্ঞাত হয় মাত্র। 'আমি-ইহা' জ্ঞানের সমাবেশ, 'আমি-তুমি' প্রেমের বা ভালবাসার সমাবেশ। এর অর্থ 'তুমি'ও একপ্রকার 'আমি'। 'আমি-তুমি' সমাবেশে, 'আমি-আমি' বা 'তুমি-তুমি' সমাবেশেরই অধিকতর বাঙ্ময় ও স্ফুট রূপ। অথচ 'আমি-ইহা' শুধু আমি-ইহাই, এ সমাবেশ কখনও 'আমি-আমি' বা 'ইহা-ইহা' রূপ নিতে পারে না। 'আমি' কখনও আমার জ্ঞানের বিষয় হয় না। আর তাই 'আমি-আমি' জ্ঞানীয় সমাবেশ হতে পারে না। পরন্তু 'ইহা' কখনও 'ইহার' জ্ঞাতা হয় না ব'লে 'ইহা-ইহা'ও জ্ঞানের দিক থেকে অর্থহীন। জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে 'আমি-ইহা'কে ওলটপালট করা যায় না—'ইহা'র নৈর্ব্যক্তিকতা অস্মিতায় পর্যবসান করা যায় না। কিন্তু 'আমি-তুমি' সমাবেশটি—'আমি-আমি' বা 'তুমি-তুমি' সমাবেশের বিরুদ্ধ হয় না। 'তুমি' ব'লে যাকে সম্বোধন করি, তার সঙ্গে আমার জাতীয় মিল অনুভব না করলে 'তুমি' সম্বোধন অসম্ভব ও নিরর্থক হয়। যে ব্যক্তি আমার কাছে 'তুমি', সেই আবার বিপরীত দিক থেকে 'আমি' হয়ে আমাকে 'তুমি'তে পর্যবসান করতে পারবে। 'আমি' যদি এক ব্যক্তি হই, 'তুমি'ও এক ব্যক্তি হতে বাধ্য, আর 'আমি-তুমি'তে অস্মিতারই সমাবেশ। আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য এ সমাবেশ অস্মিতা-দ্বয়ের সমাবেশ, কারণ এক অর্থে আমি 'তুমি' নই বা তুমিও 'আমি' নও। 'আমি-তুমি' সমাবেশেও যেন 'তুমি'র সঙ্গে 'আমি'র কিছুটা ব্যবধান থাকে, তবে এখানে 'আমি-ইহা' সমাবেশের মতো ব্যবধান থাকে না। 'ইহা' একেবারেই ইদম্, একান্তই দূর—'অহমে'র মতো একেবারেই নয়, ছিটেফোঁটাও নয়। 'তুমি', 'আমি' না হলেও আমারই মতো। তাই বোধ হয় অদ্বৈতবাদী শঙ্কর 'আমি-তুমি'কে 'আমি-আমি' রূপেই দেখতে চেয়েছেন, তাঁর মতে ব্রহ্ম আর জীবে কোন তফাৎই নেই। রামানুজাচার্য 'আমি-তুমি'র কিছুটা ব্যবধান মানলেও ঐ ব্যবধানকে অদ্বৈতেরই স্ফুরণ ব'লে স্বীকার করেছেন।

'আমি-তুমি' সমাবেশের ঐক্য 'আমি-ইহা' সমাবেশগত ঐক্যের উর্ধ্বে। এ ঐক্য জ্ঞানীয় ঐক্য নয়। প্রেমে, ভক্তিতে, সপ্রশংস মনোভাবে, শ্রদ্ধায় বা মূল্যগ্রহণের আঙ্গিকে কোনও ব্যক্তিকে 'তুমি'রূপে উপস্থিত করি 'আমি', আমার সঙ্গে তোমার রয়েছে নিবিড়, চিন্ময় আত্মীয়তা, তুমি দূর নও, আপন। 'আমি-তুমি' সংকেত, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, পুরুষের সঙ্গে পুরুষের, আত্মার সঙ্গে আত্মার, জীবের সঙ্গে ভগবানের বিভিন্ন, ব্যক্তিগত ও ব্যক্তি-সাপেক্ষ সম্পর্কের নির্দেশ মাত্র। 'আমি-ইহার' 'ইহার' মতো নৈর্ব্যক্তিক, সর্বগত, অপক্ষপাত তথ্য 'আমি-তুমি'র 'তুমি' হতে পারে না। 'আমি-তুমি সমাবেশে আমি এক স্বাধীন ব্যক্তি রূপ নিতে বাধ্য হই, আর এই 'তুমি' ঠিক আমার 'আমি'র মতোই স্বতোমূল্যবান। আমি যদি তোমাকে বা যে কোন 'তুমি'কে আমার স্বার্থসিদ্ধির উপায়রূপে গ্রহণ করি, তবে সেইক্ষণেই আমি তোমাকে বা যে কোন 'তুমি'-কে 'ইহা'রূপে পরিবর্তিত ক'রে ফেলব। দাসপ্রথা ও দাসব্যবসায় পরিহার ক'রে আমরা

সভ্যতার উচ্চতর ভূমি লাভ করেছি, কারণ দাসপ্রথায় প্রভু দাসকে 'ইহা'রূপে গ্রহণ ক'রত, 'তুমি' রূপে নয়। দাস বা দাসী শুধু প্রভুর স্বার্থ-সিদ্ধির উপায়—তার নিজের কোন স্বতোগ্রাহ্য মূল্য নেই। নৈতিক চেতনায় কোন ব্যক্তিকেই উপায়রূপে গ্রহণ করা যায় না, নীতিবোধে ব্যক্তি, 'তুমি'রূপেই গৃহীত হবে। কিন্তু উপবের দৃষ্টান্ত থেকে এই প্রমাণ হয় যে, 'তুমি'কে 'ইহা'-রূপে গ্রহণ করাও সম্ভব। ছোট বড, সম্ভব অসম্ভব, দূর নিকট, জড প্রাণ, মন প্রত্যয়, আবেগ, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, আত্মা ঈশ্বব প্রভৃতি প্রত্যেকেই 'আমি-ইহা'ব 'ইহা' হতে পারে, অর্থাৎ জ্ঞানীয় সমাবেশে প্রবেশ করতে পারে। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান প্রত্যেকেই 'ইহা'। কিন্তু যে মুহূর্তে 'আমি-তুমি'র 'তুমি' 'ইহা'রূপে উপ-স্থাপিত হয়, সেই মুহূর্তেই 'তুমি'র মূল্যহানি আর রূপহানি হয়। সে আর স্বতোমূল্যবান, স্বাধীন ব্যক্তি বা পুরুষ থাকে না, সে দূরস্থ হয়ে অস্মিতার নৈকট্য হারায়। মৃতব্যক্তি বা মৃত-দেহের প্রতি আমার মনোভাব 'আমি-ইহা' সমাবেশে প্রকাশিত হয়। সম্মোহিত, মোহাচ্ছন্ন, জড়বুদ্ধি, অজ্ঞান—এমনকি গভীর নিদ্রাভিভূত ব্যক্তির প্রতি আমার মনোভাব 'আমি-ইহা'রই প্রকারভেদ। এইরূপ ব্যক্তিব প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গীকে—একখণ্ড শিলার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তুলনা করা চলে। কিন্তু যে ক্ষণে নিদ্রামগ্ন ব্যক্তি জাগরিত হয়ে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে, সেই পরমলগ্নে তার প্রতি আমার মনোভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে, আমাকে 'আমি-তুমি'র স্তরে উন্নীত করে। নিদ্রাভিভূত, সম্মোহিত বা মৃত ব্যক্তির কাছে যে গোপন বাক্য আমি উচ্চারণ করতে পারি বা যে কর্ম অনুষ্ঠান করতে পারি, তা কোন বুদ্ধিমান, আমা-প্রতি অভিনিবিষ্ট ব্যক্তির কাছে আমি করতে পারি না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি সজ্ঞানে তাই আমার সমপর্যায়ে আর তার সঙ্গে আমার 'আমি-তুমি' সম্বন্ধ। তাই 'আমি-তুমি'-রূপ অস্মিতার নৈকট্য—'আমি-ইহা'-রূপ জ্ঞানীয় সমাবেশের বিরোধী। 'আমি-তুমি' আত্মিক যোগাযোগের সমাবেশ, প্রেম, ভক্তি ও নৈতিক চেতনার সমাবেশ। 'আমি-তুমি'কে জ্ঞানীয় স্তরে বিধৃত করলে সে 'আমি-ইহা' রূপে বিনষ্ট হয়।

তাই একথা অনস্বীকার্য যে, আমাদেব দৈনন্দিন জীবনে 'আমি-তুমি' আর 'আমি-ইহা' নামক দুই দৃষ্টিভঙ্গীই বর্তমান। প্রথমটি আত্মিক ভূমি, দ্বিতীয়টি জড়ভূমি। প্রথমটি প্রেম, দ্বিতীয়টি বিষয়-জ্ঞান। কবিচিত্তে, মরমিয়ার প্রাণে—'তুমি' একটি রহস্যময় দিব্যপ্রকাশ, বৈজ্ঞানিকেব ক্ষুরধার বিশ্লেষণের মুখে 'ইহা' একটি নৈর্ব্যক্তিক, মূল্যহীন পিণ্ডপ্রকাশ মাত্র। রবীন্দ্রকাব্যে সকলেই—এমনকি সমগ্র বিশ্বজগৎই 'তুমি' রূপে প্রকট, আর সেই জগদম্বস্যূতা বিচিত্ররূপিণীই তো অযুত আলোকে দেদীপ্যমান জীবনদেবতা। এর অর্থ এই যে, 'তুমি'কে যেমন 'ইহা'রূপে দেখা যায়, তেমনি যে কোন 'ইহা'কেও 'তুমি'রূপে দেখা যায়। এটা শুধু দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ। জ্ঞাতৃচেতনায় যে 'ইহা' বা 'সে' সেই আবার নৈতিক চেতনায় বা মূল্যবোধে 'তুমি'। যে কোন মানুষ, যে কোন জীব, এমনকি যে কোন জড়বস্তুও 'তুমি'রূপে প্রকট হতে পারে। প্রেমিক, দয়িত বা বন্ধু যেমন 'তুমি', তেমনি পোষা পাখীটিও তো 'তুমি', এমনকি উপাস্য দেবতার মূর্তিটিও উপাসকের কাছে 'তুমি' হয়ে যায়। মৃন্ময় মূর্তিটি যখন 'তুমি' হয়ে উপস্থিত হয়, তখন তার মৃৎসংজ্ঞার পেছনে এক অমব সংজ্ঞা ভাস্বর হয়ে ওঠে। অর্থাৎ 'আমি-তুমি' চেতনায় যে কোন বিষয় বা অবস্থাই এক বিরাট, মহিমময় 'তুমি' বা ভগবানের প্রতীক। 'আমি-

তুমি'র আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ঈশ্বরের দিব্যাঙ্গুলি স্পর্শে সমগ্র বিশ্বজগতের বীণা কেঁদে কেঁদে ওঠে। আবার সবকিছুই যখন জ্ঞানীয় 'ইহা'রূপে আমার দৃষ্টি ব্যাহত করে, তখন সবকিছুর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিন্ন হয়। 'আমি-তুমি' তাই আত্মিক চেতনার প্রতিলিপি, 'আমি-ইহা' জ্ঞেয় বা জড়চেতনার প্রতিলিপি। 'আমি-তুমি'র মনোভাবে আমরা 'আমি-ইহা' ছাড়িয়ে ঊর্ধ্ব-লোকে প্রয়াণ করি। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীকেই স্বীকার না ক'রে নিলে মানুষের অনুভূতির অপ-লাপ করা হয়। তাই শুধু বিজ্ঞানকেই আশ্রয় করলে মানুষ ইষ্টলাভ করবে কি ক'রে? তার বৈজ্ঞানিক চেতনার যেমন বিকাশ চাই, তেমনি তার আত্মিক চেতনারও চাই জাগরণ। বিজ্ঞানের দৃষ্টি ও ব্যাখ্যা খণ্ডিত চেতনার ফল। বিজ্ঞানের সুচিরস্থায়ী নৈর্ব্যক্তিক সত্যগুলিকে একমাত্র 'সৎ' ব'লে ভাবলে আত্মিক মূল্যজগতের গ্লানি হওয়া আশ্চর্য নয়। তাই বর্তমান পরমাণু-যুগে ধর্মের গ্লানি দেখা যাচ্ছে। মানুষ যতদিন না তার সামগ্রিক স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, যত-দিন না তার আত্মিক চেতনা জড়চেতনার সঙ্গে রফা ক'রে নিচ্ছে, ততদিন তার শান্তি নেই, ততদিন সে ভীত, সন্ত্রস্ত ও আত্মবোধের অভাবে পঙ্গু হয়ে থাকবে।

'সে', 'তিনি' প্রভৃতি শব্দও ব্যক্তিবাচক সর্বনাম। 'আমি-সে' বা 'আমি-তিনি' সমাবেশে 'আমি-ইহা' সমাবেশেরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। উভয় ক্ষেত্রেই আধ্যাত্মিক উজ্জীবনের অভাব আছে। ব্যক্তি যখন 'সে' বা 'তিনি', তখন ব্যক্তি দূরস্থ, জ্ঞানের বিষয়মাত্র। 'সে' বা 'তিনি', 'তুমি'রূপে উপস্থাপিত হ'লে আত্মিক জগতের দাবিদার হয়ে পড়ে। এক অর্থে 'আমি-ইহা' সমাবেশের সকল 'ইহা'ই জড়রূপী 'ইহা', কারণ 'ইহা' জ্ঞাতা-ভিন্ন বা জ্ঞাতা-অতিরিক্ত। জড়বস্তু একটা দৃষ্টিভঙ্গীর 'সন্তান'—জ্ঞানীয় বোধে তার উপস্থিতি। 'আমি-ইহা' দৃষ্টিভঙ্গী, 'আমি-তুমি' দৃষ্টিভঙ্গীতে রূপান্তরিত হ'লে, জড়ভূমি অতিক্রান্ত হয়ে অধ্যাত্মভূমিতে মানুষের পদপাত হয়। 'আমি-তুমি'র 'তুমি' অবিষয় ব'লে সে তার জড়ত্ব পরিহার করে, আর আমার আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের উপর নির্ভর করে। এটা কিছু একটা অদ্ভুত বা অযৌক্তিক কথা নয়।

মানুষের ব্যক্তিত্বে যেমন জ্ঞান রয়েছে, তেমনি রয়েছে প্রেম ও নৈতিক চেতনা। একটা মানুষের মতামতের জীবন, আর একটা ব্যবহার বা ভালমন্দ বোধের জীবন। প্রথমটি নিরপেক্ষ, দ্বিতীয়টি ব্যক্তিসাপেক্ষ। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গী, অন্ততঃ মানুষের পরিচ্ছিন্ন অস্তিত্বে, পরস্পর বিরোধী ও বিজাতীয়। মহামতি ইম্যানুয়েল্ কাণ্ট্ এই জ্ঞানজীবন ও কর্মজীবনের মধ্যে বৈজাত্য স্বীকার করেছেন। জ্ঞানের বিষয়গত নৈর্ব্যক্তিক জগতে কোথাও কোন স্বাতন্ত্র্য নেই—সব কিছুই কার্যকারণের অমোঘ নিয়মে বাঁধা। 'আমি-ইহা' তাই শৃঙ্খলিত, কিন্তু 'আমি-তুমি' স্বচ্ছন্দ, স্বাধীন। এখানে আত্মার সঙ্গে আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত মিলন, অস্মিতায় অস্মিতার প্রবেশ, বন্ধন থেকে গ্লানিহীন উদার মুক্তি বা কৈবল্য। এ দুটি বিজাতীয় ধারার মধ্যে শুধু একটির ওপর জোর দিয়ে বিজ্ঞানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব এক রকমের অন্ধতারই সামিল। বিপথগামী বিজ্ঞানের সহিংস ডমরুর হুঙ্কার এখন প্রেমের বংশীধ্বনিতে কমনীয় ক'রে নেবার দিন এসেছে। নৈতিক চেতনায়, প্রেমে, ধর্মবোধে আর রসানুভূতিতে মানুষকে তার কঠোর, ব্যক্তিনিরপেক্ষ বিজ্ঞানের মূল্যে কষে নিতেই হবে।

পরম শেষের অন্বেষণে

শ্রীমতী সংযুক্তা মিত্র

একদিকে মত্ত সিন্ধুর গর্জন, অন্যদিকে শ্যামলিম তটের আভাস। একদিকে শুধু ভেঙে যাওয়া, শুধু স্বপ্নের সমাধি, অপরদিকে বালুকা-বেলায় তাসের ঘরের স্বপ্নবাঁধা। এই তো জীবন। উত্তাল তরঙ্গের উত্থান পতন। সানাই-এর বিচিত্র রাগিণী—লহরীর পর লহরীর বিচিত্র তানে সে বাজে, আর তারই ভিতরে বাজে অচঞ্চল এক তান। কে যেন সানাই-এর 'পোঁ' ধ'রে থাকে। আর থাকে বলেই তো সুরের সঙ্গতি। নটুয়ার হাতের পুতুল আঁধারের পারে দূর দিগন্তের দিকে মেলে ধরে তার অসহায় দৃষ্টি। সেদিকে খোঁজে আলোর আশ্বাস। কে জানে ধ্রুবতারা কোন্ দিকে? তবু একথা সত্য যে ধ্রুবতারা আছে। সে আছে বলেই বেঁচে আছে অধ্রুব এই প্রাণ—মানুষ যার নাম। সত্তার গভীরে সে কান পেতে শোনে কিসের প্রেরণা। কে দেয় তাকে আশ্বাস, বরাভয়। এই বিধৃতিটুকু না থাকলে কবে ভেসে যেত তার বালির প্রাসাদ—এই জীবন। ভারতের প্রাণের শোণিতে নিত্য প্রবহমাণ এই সনাতন বিধৃতি। যাদের কান আছে তারা শোনে এর আহ্বান। তারা ভাষা দেয়, রূপ দেয় তাকে। নগর যাদের কলঙ্কিত করেনি, বিষিয়ে দেয়নি যাদের সভ্যতা—সেই অজ্ঞাত বাউল ফকীর তাদের ছড় টানে বীণায়, ঝঙ্কার তোলে একতারায়। কে রাজ্য পেল আর কে গেল—এরা তার খবরও রাখে না। এরা জানে শুধু প্রাণপাখীর খবর, জানে জীবন-নদীর জেলের আর তার জালের খবর।

যে প্রাসাদে বাস করি, তার ভিত্তির খবর রাখি কি? যে থাকে অন্তরালে, তাকে না জানলে ক্ষতি কি? কেই বা জানে। যারা জানে, আমরা তাদেরও জানতে চাই না। তাই যে বিধৃতিটুকুর উপর দাঁড়িয়ে থাকে জীবন, তাকে কত অবাস্তরভাবে কল্পনা করি। না-বোঝার স্বল্পালোকে মন আঁকে কত কল্পনা ধর্ম সম্বন্ধে—যে বিধৃতির উপর জীবন দাঁড়িয়ে থাকে তারি সম্বন্ধে।

অনেকে বলেন দেবালয়ে অর্ঘ্য দাও, নিজের হাতে সাজাও পঞ্চপ্রদীপ, কামনা কর, প্রার্থনা কর—এই ধর্ম। কিন্তু ধর্ম কথাটির অর্থ কি এতই সংক্ষিপ্ত?—এতই সীমাবদ্ধ? অর্চনা তো উপাসনামাত্র—ধর্মোপলব্ধির অঙ্গ। পাতঞ্জল দর্শনে চরম উপলব্ধির জন্য সমাহিত চিত্তের প্রয়োজন। ঝড়ের দোলায় যদি তোমার চিত্ত কাঁপে, তবে কেমন ক'রে ধরবে সেই অকম্পিত প্রশান্তির সমুদ্রকে? তাই চিত্তশান্তির অন্যতম পন্থা ঈশ্বরের উপাসনা। পাঁজিপুঁথির নক্ষত্রের রাশি মিলিয়ে জীবনের ছক আঁকো। অতি সাবধানী পা ফেলে ফেলে চল। বিধি-নিষেধের কড়া পাঁচিল তুলে গড়ে তোল নিশ্চিন্ত তোমার অচলায়তন। অনেকে বলেন এই-ই ধর্ম। পল্লীর বহু সামাজিক ইতিহাসের পাতায় এর কলঙ্কিত কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। অন্ধ চোখ দেখল না—পাঁচিলের তলায় মনুষ্যত্বটাই গেল তলিয়ে। 'ধর্ম কি আছে রে বাপু'—এ-কে উদ্দেশ্য করেই স্বামীজী বলেছিলেন: ধর্ম গিয়ে ঢুকেছে ভাতের হাঁড়িতে। এক-মাত্র ধর্ম এখন ছুৎমার্গ। আর মন্ত্র—ছুঁয়ো না,

ছুঁয়ো না। বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর দূর-সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে—

'যারে তুমি পিছে ফেল
　　সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে।
পশ্চাতে ফেলেছ যারে
　　সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।'

বিশ্বাস করিনি আমরা, তাই ইতিহাসও আমাদের ক্ষমা করেনি।

'ধর্ম বার্ধক্যের সাথী। এখনই তাকে চেয়ো না। এখন শুধু তোমার জীবনপাত্র সুধায় ঢেলে নাও। ভোগ কর তাকে। তারপর সন্ধ্যার ধূসর লগ্নে হরিনামের মালা হাতে অপেক্ষা কোরো অন্তিম ক্ষণের।' —এমন মতও আমরা অধিকাংশই পোষণ করি, অর্থাৎ যেন মালা ঘোরানোটাই ধর্ম। ভোগলিপ্সু অপটু শিথিল মনকে অন্যমনা করিয়ে সান্ত্বনা দেওয়াই তার সার্থকতা। ধর্ম যেন অবাস্তব অলীকের স্বপ্ন। কোন কোন বিজ্ঞ জন বলেন: সভ্যতার কোন্ আদিম উষায় নিষ্ঠুর প্রকৃতির ক্রোড়ে অসহায় মানুষের মনের ভয় হতে সৃষ্টি হয়েছিল যে ধর্মের, আজকের বিংশ শতাব্দীর প্রখর বৈজ্ঞানিক আলোকে আর মৃত্যুই কাম্য। কিন্তু এ কথা কি তাঁরা বিস্মৃত হন যে দর্শনেতিহাস একে কোন দিন ধর্ম বলেনি। এটা দেশ-কালগত আদিম উপাসনামাত্র। ধর্মকে এ উপাসনা করায়ত্ত করেনি। ধর্ম একে অতিক্রম ক'রে বহু উর্ধ্বে উঠে গেছে।

নানা অস্পষ্ট এবং ভ্রান্ত ধারণার ফলশ্রুতি এই যে, আজকের দিনের যুক্তিবাদী বিজ্ঞানী মন কতকগুলি সংস্কারকে স্বীকার করতে নারাজ। এ যুগ পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ। তাই সে মনে করে যার ব্যাবহারিক জীবনের সাথে কোন কার্যকারিতা নেই, সংযোগ নেই—তাকে মৃতবৎ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। সমাজের অগ্রগতির পথে সে অন্তরায়। আধুনিক অনেকের বিশ্বাস: Religion is the opium of mankind. —ধর্ম আফিমের নেশা।

উপনিষদের জন্মস্থান ভারত-ভূমিতে এ ধারণা বেদনাদায়ক। ভারতীয় চিন্তাধারায় ধর্ম কোন দিনই একটি অবাস্তব অলৌকিক অদ্ভুত কোন অস্তিত্বরূপে স্বীকৃত হয়নি, সীমাবদ্ধ হয়নি এর গতি লোকাচার আর দেশাচারের গণ্ডিতে, পঙ্গু হয়নি অন্ধবিশ্বাসের শৃঙ্খলে। ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে অজ্ঞ সমাজই তাকে বিকৃত করেছে, পাঁচিল তুলেছে সে বার বার—আর বার বার সে পাঁচিলে মরেছে সে মাথা কুটে। শান্তির পথ দূরেই রয়ে গেছে চিরদিন।

ধারণাত্মক 'ধৃ' ধাতু হতে ধর্ম কথাটির উৎপত্তি। সমাজকে, জীবনকে—নিখিল মৈত্রী, বিশ্বপ্রেম, অনন্ত করুণা, সৌহার্দ্য ও একাত্মতার পাদপীঠে যে ধারণ ক'রে থাকে তাই ধর্ম। তাই প্রকৃত ধর্মের উপলব্ধি মানবকে মানবতার ক্ষুদ্র গণ্ডির উর্ধ্বে দেবত্বের পথে নিয়ে যায়। ধর্মের সঙ্গে অন্তরের আছে নিবিড় সম্বন্ধ—ব্যাবহারিক জীবনেও তার তেমনি আছে প্রকাশ। এ না হ'লে পৃথিবীর ক্ষুদ্র মাটির ঘরে মানুষের ঠাকুরালি কি কখনও সম্ভব হ'ত? এক কথায় স্বামীজীর ভাষায়: Religion is the manifestation of divinity that is already in man—অর্থাৎ মানুষের অন্তরে দেবত্ব রয়েছে-ই, তার প্রকাশসাধন ধর্ম। ভারতের শাশ্বত চিন্তাধারা মানুষকে ছোট করেনি, খর্ব করেনি তার মনুষ্যত্ব। পরন্তু তারই ক্ষুদ্র হৃদয়ে দেবত্বের পূর্ণ অস্তিত্বকে সে স্বীকার করেছে। ক্ষুদ্র মাটির প্রদীপে দেখেছে সে জ্যোতির্ময় প্রভার আভাস। এই চির-কালের বাণীটিকেই আবার নূতন ক'রে শুনিয়ে গেলেন স্বামীজী। তিনি বললেন: Each soul is potentially divine The goal is

to manifest this divine within by controlling nature external and internal ··· This is the whole of religion Doctrines or dogmas or rituals or books or temples or forms are but secondary details প্রতি আত্মা স্বরূপতঃ দিব্য। বাহ্য এবং আন্তর প্রকৃতিকে সংযত ক'রে এই দিব্য সত্তাকে প্রকাশ করাই লক্ষ্য। এইটিই ধর্মের মর্ম। নিয়ম বা নীতি, সংস্কার বা আচার, গ্রন্থাদি বা মন্দির গৌণ। অজ্ঞানের অন্ধকার এই দিব্য সত্তাকে আবৃত ক'রে রাখে। যে শক্তি এই আবরণ সবিয়ে সামান্য মানবকে বিশ্বমানবের বেদীতে নিয়ে যায়, তাকে মৃত বা 'নেশা' বলি কোন্ অর্থে?

ভারতের দার্শনিক চিন্তাধারা ভগবত্তাকে সমাজের বহু উর্ধ্বে এমন এক দুষ্প্রাপ্য দুর্লভ আসনে বসিয়ে রাখেনি—যেখানে প্রণাম পাঠানো যায়, কিন্তু দু'হাত বাড়িয়ে তাকে হৃদয়ে গ্রহণ করা যায় না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অণুতে পরমাণুতে, প্রতি প্রাণীতে, স্থাবরে জঙ্গমে একই অনন্ত এবং অদ্বৈত বিশ্বসত্তার অবস্থিতি স্বীকার করেছে সে। সে বলেছে, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন: 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।' ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়েই বিরাজ করেন। সকল প্রাণী তাঁরই বিভিন্ন প্রকাশ। বেদে আছে: 'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি, ত্বং কুমার উত বা কুমারী।' তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার অথবা কুমারী। এক কথায় সর্বজগৎ তোমাময়। এই বিশ্বাসে এই সর্বব্রহ্মময়ত্ব যিনি স্বীকার করেন, তাঁর কাছে কোন সঙ্কীর্ণতা—কোন ক্ষুদ্রতাই থাকতে পারে না। তাঁর উন্মুক্ত অবারিত হৃদয়ে তখন নিখিল জগৎ এসে কোলাকুলি করে। এত বড় সর্বজনীন সৌভ্রাত্রবোধ কখনও বস্তুতন্ত্রবাদের দ্বারা সম্ভব নয়। বস্তুতন্ত্রবাদ রুটির অভাব মেটাতে পারে। কিন্তু 'মানুষ তো শুধু রুটি খেয়েই বাঁচতে পারে না।'

গতিশীল মনোধর্ম সক্রিয় চেতন আদর্শের প্রয়াসী। তাই বিশ্বপ্রেম ও সৌভ্রাত্রবন্ধন একমাত্র সেই ধর্মের দ্বারাই সম্ভব যে ধর্ম শিক্ষা দেয় সর্বাত্মকত্ব, সৌভ্রাত্রবন্ধনকে মানবতার গণ্ডির মধ্যে না নামিয়ে ধর্ম তাকে তুলে ধরে এক উর্ধ্বগামী চেতনার বিস্তৃতিতে। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, বন্ধু, পরিজন সকলেই আমার একান্ত আত্মীয়, কারণ যে আত্মা আমার হৃদয়ের গোপনে বিরাজিত তাকেই দেখি অপরের সত্তার অন্তঃস্থলে। এই বোধে তাই কোন স্বার্থ, দ্বেষ, হিংসার স্থান নেই। ব্যাবহারিক জীবনে এর চেয়ে বড় মিত্র আর কাকে বলি?

এই বিশ্বমানবত্ব বোধ বা নিখিল চিত্তের সঙ্গে আত্মার আত্মীয়তা কল্পনামাত্র নয়। বারে বারে সমাজে এসেছেন সেইসব মহাপুরুষ, জীবনই যাঁদের বাণী। যাঁরা প্রচলিত অন্ধ সংস্কারের আবর্জনা সরিয়ে প্রকৃত ধর্মের স্বচ্ছ সুন্দর সত্য শিব রূপটি তুলে ধরেছেন লোকসমাজে। আমরা তাই দেখেছি শ্রীচৈতন্যকে—যবন হরিদাসের প্রতি তাঁর প্রেম—আচণ্ডাল দ্বিজে তাঁর ভালবাসা। দেখেছি সেই যুগাচার্যকে—সেই বিশ্ববিজয়ী বৈদান্তিক স্বামী বিবেকানন্দকে। কি বিপুল তাঁর মানবপ্রেম! এক দিনের ইতিহাস—স্বামীজী তাঁর ঘরে বসে এক শিষ্যকে বেদবেদান্তের দুরূহ তত্ত্ব বোঝাচ্ছেন। এমন সময়ে ঘরে ঢুকলেন নাট্যগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ—তাঁর প্রিয় জি সি। তাঁকে দেখে পরিহাসপ্রিয় স্বামীজী বললেন, 'কিহে জি সি, তোমার এ-সবে প্রয়োজন নেই? কি বল।' গিরিশচন্দ্র নিরুত্তর, কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বললেন, 'বেদবেদান্ত তো অনেক পড়েছ। ক্ষুধিতের অন্নের জন্য হাহাকার, দরিদ্রের দুঃখ,

·আরো কত রকম অন্যায়, অবিচার ও দুঃখ—এর কোন প্রতিকার তোমার বেদবেদান্ত লেখে কি ?' এর পর একে একে বর্ণনা করতে লাগলেন বহু প্রত্যক্ষ ঘটনা—মর্মান্তিক, অসহ্য। স্তব্ধ, গম্ভীর হয়ে রইলেন স্বামীজী। বিশাল তাঁর দুটি চোখে এল অশ্রুর জোয়ার। তারপর এক সময় উঠে গেলেন—ভাব সংযত রাখতে না পেরে। তখন গিরিশচন্দ্র শিষ্যকে বললেন, 'দেখলি কত বড় হৃদয়। ওকে আমি ওর যশ-পাণ্ডিত্যের জন্য ভালবাসি না। মানুষের দুঃখকষ্টের জন্য যে হৃদয় বেদনার্ত হয়, সেই উদার বিশাল হৃদয়ের জন্যই ভালবাসি। তোদের স্বামীজী একাধারে মহাজ্ঞানী ও মহাভক্ত।'

বিশুদ্ধ অদ্বৈত দৃষ্টিতে মানবপ্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসের নবীন মন্ত্র দিয়ে গেলেন স্বামীজী—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।' আপনার মুক্তি এবং জগতের কল্যাণের জন্য সন্ন্যাস-গ্রহণ। এ যুগের নব 'কর্মযোগ' শোনালেন তিনি : So long as a single dog in my country remains without food, my whole religion will be to feed it এই যে নিখিলপ্রাণের বেদনায় বেদনাবোধ—এইটিই ধার্মিকের প্রধান লক্ষণ।

ধর্মকে তাই ভারতীয় চিন্তাধারা পূজার ঘরের নিভৃতে লুকিয়ে রাখেনি, রাখেনি তাকে দেশাচারের লোকাচারের গণ্ডির মধ্যে, তাকে এনে দিয়েছে প্রাত্যহিক জীবনের ছায়াতরুরূপে, দিক্-নির্দেশকরূপে। প্রকৃত ধর্মজ্ঞান প্রাত্যহিক জীবনে আনে তাই অনাবিল শান্তি ও নিঃস্বার্থ প্রেম, আনে নিষ্কাম কর্মের প্রেরণা। কাজ হয় তাই সেবা। ধর্ম সংসারেরই বহু পরিজনের মধ্যে ভগবৎসত্তার সন্ধান করতে শিখিয়েছে একদিকে, অন্যদিকে দেবতাকেই সন্তানরূপে, মাতারূপে, পিতারূপে, বন্ধুরূপে পাবার কামনা দিয়েছে। তাই তো কবির মুখে শুনি :

'তোরা শুনিস কি শুনিস নি তাঁর পায়ের ধ্বনি,
সে যে আসে—আসে—আসে।'

ভক্তের বাণীতে দাবি করেছেন :

'আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা
আমায় ঘিরে চলছে রসের খেলা,
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।'

অলীক, অলৌকিক নয়—সংসারের বহুজনের মাঝেই পরিব্যক্ত তাঁর রসের লীলা। বহুর মাঝে সেই পরম একের প্রকাশের কথাই কবি বলেছেন :

জগতের মাঝে কত বিচিত্র রূপে হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।

নিরন্ন, বুভুক্ষু, অতিথি শুধু নর মাত্র নয়, নররূপী নারায়ণ। এই *দৃষ্টিটিই* নতুন ক'রে আবার জাগিয়ে দিয়ে গেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। যে সেবাধর্ম তিনি প্রচার ক'রে গেলেন তার বীজ ছিল তাঁর গুরুদেবের কথায়—জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীব সেবা। তারই প্রতিধ্বনি শুনি স্বামীজীর কণ্ঠে : তোমরা শাস্ত্রে পড়েছ—মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব। আমি বলি—আর একটু সংযোগ কর—দরিদ্রদেবো ভব। দরিদ্র তোমার দেবতা হউন। —এই তো শিবজ্ঞানে জীবসেবার মূলকথা। পরবর্তী যুগে গান্ধীজীর হরিজন-আন্দোলনের অনুপ্রেরণার উৎসও এইখানেই। স্বামী বিবেকানন্দ দৃপ্তস্বরে বলেছিলেন :

বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

—এই বোধই প্রকৃত ধর্ম। তাই যিনি প্রকৃত মানবপ্রেমিক তিনি ঈশ্বরবাদী না হলেও ধার্মিক ব'লে স্বীকৃত ও সম্মানিত হয়েছেন আমাদের

দেশে। উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার-যুগের অগ্রণী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সমাজ তাঁকে বলেছে বিদ্রোহী, জেহাদ্ তাঁর ধর্মের নামে প্রচলিত অধর্মের বিরুদ্ধে। শত শত নির্যাতিত গণদেবতার চোখের জলে লোনা হয়ে গিয়েছিল তাঁর জীবন-সমুদ্র। আর সেই সমুদ্রমন্থন ক'রে তিনি হয়েছিলেন করুণার অমৃত। তৃপ্ত হয়েছিল লাঞ্ছিত আত্মা। ধার্মিকশ্রেষ্ঠ তাই বিদ্যাসাগর। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। গীতা ভক্তের লক্ষণ নির্ণয় করেছেন :

'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।'

—সর্ব প্রাণীর প্রতি দ্বেষবিহীন, মৈত্রী এবং করুণাযুক্ত। মহাকবি কালিদাস তাঁর রঘুবংশের প্রস্তাবনাতে বলেছেন : তিনি এমন এক রাজবংশের মহিমা কীর্তন করবেন, যে রাজবংশের রাজন্যবৃন্দ আজন্ম শুদ্ধ, যথার্থ ভক্তিমান্, প্রার্থীকে অভীষ্টদানকারী, ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যপরায়ণ, অনলস কর্মী, ত্যাগের জন্যই অর্থের সঞ্চয়কারী, মিত ও সত্যভাষী এবং প্রজার মঙ্গলের জন্যই সংসারাশ্রমী। ভারতের ব্যাবহারিক জীবনের ঈপ্সিত ধর্মের রূপ এইটিই।

যে বোধ ভোগে আনে ত্যাগের প্রেরণা, বিলাসে আনে বিরতি, অহংকারকে বিস্তার করে বিশ্বজনীনতায়, কর্মে আনে সেবার আনন্দ, মানবত্বের লীলাভূমিকে করে দেবত্বের পাদপীঠ—তাই ধর্ম। আত্মচেতনায় এর জন্ম, সার্বভৌম উপলব্ধিতে এর পরিণতি। তাই আমাদের ধর্মবোধের প্রথমে ঋষিরা বলেছেন : আত্মানং বিদ্ধি—নিজেকে চেন। আপনার অন্তঃস্থলে আছে যে পরিপূর্ণ দেবত্ব, তাকে উপলব্ধির দ্বারা জাগ্রত কর। পূর্ণ শতদলে বিকশিত কর। জীবন হোক মধুময়। সমাজ হোক কল্যাণবর্ষী।

হে মহাশিল্পী !

কাজী নুরুল ইসলাম

হে মহাশিল্পী, সযতনে তব কালজয়ী তুলিকায়
সৃষ্টির এই অক্ষয় রূপ গড়েছিলে নিরালায়।
তোমার রচিত প্রদর্শনীর মাঝে
অগণিত ছবি সাজানো সুচারু সাজে,
মোরা দর্শক, যত দেখি তত আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায়।
প্রভাতে সূর্য পবিত্র বেশে পূর্ব গগনে ওঠে,
নীরবে খুলিয়া শোভার কৌটা বনে বনে ফুল ফোটে।
পাহাড়ের গায়ে তুষারের আলোয়ান,
যায় রথে চড়ি মেঘেদের অভিযান,
ফেনিল উর্মি সাগর-উঠানে পাগলের মত ছোটে।
রাতে নীলাকাশে চন্দ্রের পাশে ভিড় জমে তারকার,
নীহার-কন্যা মনে হয় যেন ছিঁড়িয়াছে মণিহার।
রচনা তোমার চির-জীবন্ত প্রভু,
যুগ যুগ হেরি সাধ মিটিবে না প্রভু,
হে মহাশিল্পী, দিও বার বার দেখিবার অধিকার।

সাধু শ্রীআপ্পার্

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

দাক্ষিণাত্যের তেষট্টি জন নয়নার্-এর মধ্যে চারজন ছিলেন বিশেষ প্রসিদ্ধ। সাধু শ্রীআপ্পার্ এই চারজনের মধ্যে অন্যতম, ইনি 'কার্য' বা 'দাস' মার্গের আচার্য নামে খ্যাত। এঁর সুদীর্ঘ অশীতিবর্ষ জীবন ঘটনাবৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে শ্রীআপ্পার্ মাদ্রাজ প্রদেশের দক্ষিণ আর্কট জেলার অন্তর্গত ত্রিভামুর গ্রামে এক ভেল্লালা (বিখ্যাত কৃষক) পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল পুগালনার (বিখ্যাত ব্যক্তি) এবং মাতার নাম ছিল মাথিনীয়ার। আপ্পার্ ছিলেন এঁদের দ্বিতীয় সন্তান। পিতামাতা এঁর নাম রেখেছিলেন মারুনিকীয়ার অর্থাৎ অন্ধকার-বিদারক। তিরুনাভুকারসু বা 'বাগীশ' ছিল তাঁর ঈশ্বরপ্রদত্ত নাম, এর অর্থ জিহ্বার ঈশ্বর। তিনি যে কোনও স্থানে, যে কোনও সময়ে এবং যে কোনও অবস্থায় স্তবস্তুতি রচনা করতে পারতেন। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ভক্তির গভীরতা ও উচ্ছ্বাস ঐ সব স্তবস্তুতির মাধ্যমে প্রকাশিত হ'ত এবং ঐগুলি 'তেবারম্' নামে প্রসিদ্ধ। ঐ সব তেবারম্ দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত শিবমন্দিরসমূহে প্রত্যহ অশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে গীত হয়ে থাকে। দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেক ধার্মিক মাতাপিতা—তাঁদের ছেলেপুলেরা যাতে শৈশবকাল হতেই তেবারমের অংশবিশেষ কণ্ঠস্থ করে ও প্রত্যহ পাঠ করে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

আপ্পার্-এর জ্যেষ্ঠা ভগিনী তিলকবতীয়ার্ কালীপাগাইয়ার নামে এক পল্লব-সেনাপতির সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। এর অল্পকাল পরেই আপ্পার্-এর স্নেহময় পিতা পরলোক গমন করেন এবং মাতা সহমরণে যান। আপ্পার্ তখন ছেলেমানুষ। তিলকবতী সমস্ত স্নেহ দিয়ে ছোট ভাইটিকে লালনপালন করেন। দুঃখের বিষয় অল্পকাল পরেই তিলকবতীর স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রে অশেষ বীরত্ব প্রকাশপূর্বক শত্রুহস্তে প্রাণ বিসর্জন করেন। পতিশোকে মুহ্যমানা তিলকবতী প্রথমে সহমরণে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন, কিন্তু পরম আদরের অনাথ ছোট ভাইটির সজল নয়ন ও করুণ মুখের দিকে চেয়ে সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। তাঁর অবশিষ্ট জীবন ঈশ্বর-আরাধনায় এবং ছোট ভাই-এর রক্ষণাবেক্ষণে অতিবাহিত করবেন, এইরূপ স্থির করেন।

তখনকার দিনে জৈন ও বৌদ্ধদের প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশী। মন্ত্রোচ্চারণ, মারণ, উচাটন, ঝাড়ফুঁক প্রভৃতির সাহায্যে তারা ক্রমশঃ জনসাধারণের চিত্ত জয় করতে থাকে, এমনকি অনেক রাজাও তাদের কবলে প'ড়ে হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ ক'রে জৈনধর্মে দীক্ষিত হন। রাজার সহানুভূতি ও অনুমোদনক্রমে অনেক হিন্দুমন্দির ভেঙে ফেলা হয় এবং বহু জৈনমন্দির নির্মিত হয়। কিশোর-বয়সে আপ্পার্ এদের হাতে পড়েন এবং পাটলিপুত্র নগরে জৈন আশ্রমে নীত হন ও জৈনধর্ম গ্রহণ করেন। আপ্পার্-এর হৃদয় ছিল ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ এবং ধর্মাচরণে তাঁর আন্তরিকতা ছিল অতি গভীর। কাজেই জৈনধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর তিনি অন্তরের সহিত ঐ ধর্ম গ্রহণ করেন, অনেক পুস্তকাদিও রচনা করেন এবং অচিরেই সকলের দৃষ্টি তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়। জৈনরা তাঁকে

'ধর্মসেনা' নামে অভিহিত করেন। পল্লব-সম্রাট মহেন্দ্র বর্মা তাঁর পাণ্ডিত্য ও ভক্তিভাব দেখে মুগ্ধ হন এবং কথিত আছে—রাজকুমারীকে তাঁর হস্তে অর্পণ করেন। কিন্তু আপ্পার্-এর পারিবারিক জীবন সুখের হয়নি। কালক্রমে জৈন শ্রমণদের আন্তরিকতার অভাব দেখে তাঁর অন্তর অত্যন্ত ব্যথিত হয় এবং স্নেহময়ী ভগিনীর কথা মনে পড়ে। তিলকবতীও এদিকে ভ্রাতার মতির পরিবর্ত্তনের জন্য নিয়মিত শিবমন্দিরে হৃদয়ের আকুতি জানাতে থাকেন। হঠাৎ আপ্পার্ পেটের ব্যথায় (colic pain) অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লে জৈন শ্রমণরা নানারূপ মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক তাঁকে সুস্থ করার বিফল প্রয়াস পান। এদিকে ভগিনীর সান্নিধ্য লাভ করার জন্য আপ্পার্-এর হৃদয় অস্থির হয়ে ওঠে এবং একদিন সুযোগ বুঝে তিনি পলায়ন করেন ও কোনও ক্রমে ভগিনীর কাছে উপস্থিত হন এবং তাঁর পদতলে পতিত হয়ে স্বীয় দুষ্কৃতির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করেন। ক্ষমাশীলা ধর্মপরায়ণা ভগিনীও তাঁর সব দোষ ভুলে গিয়ে তাঁকে হৃদয়ে জড়িয়ে ধরেন। ভগিনীর আকুল প্রার্থনায় ও সেবা-শুশ্রূষায় কিছুদিনের মধ্যে আপ্পার্ সুস্থ হয়ে ওঠেন। অতঃপর তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে মগ্ন হন শিবের আরাধনায়। অনুতপ্ত চিত্তে অপরাধ ক্ষালনের জন্য ডুবে যান তিনি গভীর তপস্যায়। দীর্ঘ সাধনার পর শিবমাহাত্ম্য ও শৈবধর্ম প্রচারের জন্য তিনি বাকী জীবন উৎসর্গ করবেন, এই সংকল্প গ্রহণ করেন।

জৈনরা কিন্তু এদিকে আপ্পার্-এর অনুসন্ধানে রত হন এবং তখনকার পল্লব-রাজা জৈনধর্মাবলম্বী কাডবের সহায়তায় আপ্পার্কে খুঁজে বের করেন এবং তাঁর উপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু হয়। প্রথমে আপ্পার্কে হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় জ্বলন্ত ইঁটের পাঁজার উপর নিক্ষিপ্ত করা হয়। ভগবানের কৃপায় রক্ষা পাওয়ার পর তাঁকে খাওয়ানো হয় তীব্র বিষ। কিন্তু 'রাখে কৃষ্ণ মারে কে'? যতই বিপদে পড়তে থাকেন, দেবাদিদেব শিবের প্রতি তাঁর ঐকান্তিকী ভক্তি, অটুট শ্রদ্ধা ও শিশুর মতো নির্ভরতা ততই বর্ধিত হতে থাকে। জৈন-ধর্ম-ধ্বজীরা এতেও ক্ষান্ত হয় না। অতঃপর তাঁকে মত্তহস্তীর পদতলে ফেলে দেওয়া হয় এবং শেষ-কালে তাঁর গলায় পাথর বেঁধে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। এই অত্যাচারের কাহিনী স্বতই আমাদের ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যখনই আপ্পার্কে মারবার কোন না কোনও উপায় অবলম্বিত হয়, তখনই তিনি প্রশান্তচিত্তে তাঁর ইষ্টদেব মহাদেব সম্বন্ধে একটি স্তব রচনা করেন, এই সকল স্তব চেষ্টা ক'রে রচনা করা নয়, এগুলি স্বতঃস্ফূর্ত।

ঘোর বিপৎকালীন ঐ সব রচনা অপূর্ব ও অতুলনীয়। ঈশ্বরের প্রতি অটুট অনুরাগ,গভীর ভালবাসা ও ঐকান্তিক আত্ম-সমর্পণের সুরে ঐ স্তবগুলি পরিপূর্ণ। ঐগুলি পাঠে অবিশ্বাসীর হৃদয় ভরে যায় জ্বলন্ত বিশ্বাসে, ঘোর নাস্তিক পরিণত হন আস্তিকে এবং অভক্তের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে পরম ভক্তিতে। তামিল সাহিত্যে ঐ গীতিকাব্যগুলি অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে। সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর তিনি যা গেয়েছিলেন তাঁর অমর ছন্দে তার অর্থঃ

যদি 'নমঃ শিবায়' এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র দ্বারা আমরা অহরহঃ সেই আদিদেবের আরাধনা ও পূজা করি, তবে গলায় পাথর বেঁধে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিলেও সেই পাথর শোলার মত আমাদের ভাসিয়ে তীরে নিয়ে আসবে।

সমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়ার পর যে স্থানে তিনি প্রথম তীরে ওঠেন সেই স্থানটি শৈবদের একটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে;

উহা বর্তমান কাডালোর শহরের অন্তর্গত কারায়েরাভিট্টনকুপ্পম্ (the hamlet of landing) নামে খ্যাত।

কূলে আসার পর তিনি ভগিনী তিলকবতীর নিকট গমন করেন এবং তাঁর ইষ্টদেব 'তিরুবট্টিগাই বিরাট্টনম্' নামক মহাদেবের সেবাপুজায় নিরত হন। পল্লব-সম্রাট আপ্পার্-এর জীবনরক্ষার কথা মুগ্ধবিস্ময়ে শুনে গভীর অনুশোচনাগ্রস্ত হন এবং তাঁর পদতলে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। অতঃপর তিনি পুনরায় শৈবধর্মে দীক্ষিত হন।

ভগবানের কৃপা লাভ ক'রে আপ্পার্ তীর্থভ্রমণে নির্গত হন এবং প্রধান প্রধান শিবমন্দিরসমূহ দর্শনে পরম পরিতোষ লাভ করেন। একদা ভ্রমণকালে তিনি শুনলেন যে সাধু জ্ঞানসম্বন্ধর্ সেদিকে আসছেন। বয়সে জ্যেষ্ঠ হলেও তিনি ছুটে গিয়ে বালসাধু জ্ঞানসম্বন্ধর্-এর পদতলে পতিত হন। জ্ঞানসম্বন্ধর্ তখনই তাঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রে পরম স্নেহে উঠিয়ে সম্বোধন ক'রে বলেন, 'আপ্পার্'। তদবধি তিনি 'আপ্পার্' নামে খ্যাত হন এবং সেই নামেই সকলে তাঁকে সম্বোধন করতে থাকে। তামিল ভাষায় পিতাকে 'আপ্পা' বলা হয়। তিনি জ্ঞানসম্বন্ধর্-এর প্রায় পিতার বয়সী ছিলেন। গঙ্গাযমুনার মিলনস্বরূপ সেই দুই শ্রেষ্ঠ ভক্তের মিলন ছিল এক অপূর্ব দৃশ্য। উভয়ের অসংখ্য অনুরাগী ভক্ত সেই দৈব মিলন দর্শনে চক্ষু সার্থক করেন। তিরুপ্পূগালুর নামক স্থানে তাঁরা প্রথম মিলিত হন। অতঃপর উভয়ে কয়েকটি তীর্থক্ষেত্রে গমনপূর্বক তথাকার মাহাত্ম্য বর্ধিত করেন। সম্বন্ধর্ মাদুরায় গমন করেন এবং আপ্পার্ পালেয়ার, তিরুপ্পাইনিলি প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শনপূর্বক ত্রিচিনাপল্লীর নিকট তিরুপুনাতুরুথিতে গ্রামের শিবমন্দিরে অবস্থান করতে থাকেন।

মাদুরায় জৈনদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ক'রে তথায় জ্ঞানসম্বন্ধর্ লুপ্তপ্রায় হিন্দুধর্ম তথা শৈবধর্মকে স্বমহিমায় পুনঃ প্রতিষ্ঠাকরত আপ্পার্-এর সহিত মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে তিরুপুনাতুরুথি অভিমুখে রওনা হন। জ্ঞানসম্বন্ধর্-এর আগমনবার্তা শুনে আপ্পার্ অতীব পুলকিত হন এবং তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে বহু ভক্ত ও শিষ্য সমভিব্যাহারে এগিয়ে যান। দূর থেকে জ্ঞানসম্বন্ধর্-এর পালকি দেখেই আপ্পার্ ছুটে গিয়ে সেই পালকি বইতে আরম্ভ করেন। বয়সে জ্যেষ্ঠ এবং ভক্তিতেও কিছুমাত্র ন্যূন না হলেও আপ্পার্-এর হৃদয়ে অভিমানের লেশমাত্র ছিল না। 'তৃণাদপি সুনীচ' এবং 'তরোরিব সহিষ্ণু' এই উভয়গুণে তিনি ভূষিত ছিলেন। এদিকে জ্ঞানসম্বন্ধর্ জানতেও পারলেন না যে স্বয়ং আপ্পার্ তাঁর পালকি বহন করছেন। গ্রামের কাছাকাছি এসে পালকির মধ্য থেকেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহাপুরুষ আপ্পার্ এখানে কোথায় থাকেন?' আপ্পার্ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করলেন, 'প্রভু, আমি অতীব আনন্দ ও গৌরবের সঙ্গে তোমার পালকিতে কাঁধ লাগিয়েছি।' এই কথা শোনামাত্র জ্ঞানসম্বন্ধর্ পালকি হতে লাফিয়ে নেমে পড়ে আপ্পারের পদতলে পতিত হলেন। কিন্তু তৎপূর্বেই আপ্পার্ ভূম্যবলুণ্ঠিত হয়েছেন। দুই মহাপুরুষের সেই দৈব মিলন এক অপার্থিব দৃশ্য। জ্ঞানসম্বন্ধর্ কিছুকাল আপ্পার্-এর সপ্রেম আতিথ্যে পরমানন্দে কাটিয়ে পুনরায় তীর্থভ্রমণে নির্গত হলেন।

আপুথি আডিগল্ নামে এক ব্রাহ্মণ আপ্পার্-এর নাম শুনে তাঁর প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হন এবং নিজের বাড়ীতে ছেলেপুলের ঐ নাম রাখেন, যাতে অহরহঃ তাঁর কথা স্মরণ হয়। যতই আপ্পার্-এর কথা চিন্তা করেন, ততই আডিগলের অন্তর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে

ওঠে। শেষ পর্যন্ত তাঁর দর্শনলাভের জন্য ব্রাহ্মণ অত্যন্ত ব্যাকুল হন। অবশেষে একদিন খবর এল আপ্পার্ সেই দিকেই আসছেন। যাঁর মূর্তিকে এতদিন হৃদয়ে ধ্যান ক'রে এসেছেন, আজ তাঁকে সত্যই সশরীরে দেখবেন এই আশায় ব্রাহ্মণের অন্তর যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে ভরে ওঠে। সেই শুভ মুহূর্ত এসে পৌঁছল—ব্রাহ্মণের দরজায় আপ্পার্ উপস্থিত। পরম সমাদরে প্রাণপ্রিয় অতিথির অভ্যর্থনা ক'রে তাঁকে তিনি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। ছেলেপুলেদের পরিচয় করিয়ে দিলে তারাও সকলে ভক্তিভরে সাধুকে প্রণাম ক'রল। ব্রাহ্মণের মনে আজ আর অন্য কোনও চিন্তার অবকাশ নেই, কেবল কি ক'রে তাঁর আরাধ্য দেবতার আদর-আপ্যায়ন করবেন ও তাঁকে সুখী করবেন, এই তাঁর একমাত্র চিন্তা।

ভোজনের সময় উপস্থিত হ'লে পুত্রকে তিনি পাঠালেন কলাবাগানে—পাতা কেটে আনতে। দুঃখের বিষয় বাগানে এক বিষধর সর্প ছেলেটিকে দংশন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ দারুণ সংবাদ শ্রবণ করেও আড়িগল্ বিচলিত হলেন না, কারণ অতিথি-সেবার সময় সমাগত। পুত্রের মৃত্যুসংবাদ গোপন ক'রে আপ্পার্‌কে আহারে বসবার জন্য আড়িগল প্রার্থনা জানালেন। আহারে বসেই আপ্পার্ ছেলেটিকে ডাকতে বললেন। ব্যাপারটি আর গোপন রাখা সম্ভব হ'ল না। আপ্পার্ ব্রাহ্মণের সঙ্গে কলাবাগানে গিয়ে দেখলেন, মৃত অবস্থায় ছেলেটি পড়ে রয়েছে। তাঁর প্রতি আড়িগলের ভক্তি-ভালবাসা দেখে আপ্পার্ অবাক্ হয়ে গেলেন এবং তাঁর আরাধ্য দেবতা শিবের উদ্দেশ্যে এক সকরুণ স্তব রচনা ক'রে প্রার্থনা করতে লাগলেন। ঈশ্বরের মহিমা বোঝা মানুষের সাধ্যাতীত। স্তব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তাধীন ভগবানের কৃপায় ছেলেটি বেঁচে উঠল। আড়িগলকে প্রাণভরে আশীর্বাদ ক'রে আপ্পার্ বিদায় গ্রহণ করলেন। সত্যই আড়িগলের ভক্তির কথা ভাবলে বিস্ময়ে মন অভিভূত হয়ে যায়।

আপ্পার্ হিমালয় হতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত প্রধান প্রধান শৈব তীর্থক্ষেত্রসমূহ দর্শন করেন। শেষ বয়সে তাঁর কৈলাসে গিয়ে কৈলাসপতি-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়। পদব্রজে তিনি যাত্রা শুরু করেন। শরীরের বার্ধক্য হেতু কিছুদিন চলার পরে তাঁর পায়ে ঘা হয়। কিন্তু হৃদয়ের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষাকে দমন করতে না পেরে তিনি হামাগুড়ি দিয়ে চলতে আরম্ভ করেন। অল্পকাল পরে তাঁর হাতেও ঘা হয়ে যায়। যতই বাধা আসতে থাকে ইষ্টদেবের দর্শন-লালসা ততই তীব্রতর হতে থাকে। কথিত আছে, হাত-পা অপটু হয়ে পড়া সত্ত্বেও দমিত না হয়ে তিনি গড়াগড়ি দিতে দিতে অগ্রসর হন। তাঁর ভক্তির আতিশয্য ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখে ভক্তের ভগবান আর স্থির থাকতে পারলেন না। এক সাধুর বেশে তাঁর সামনে এসে বললেন, 'ভাই, তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। তুমি নিকটস্থ পুষ্করিণীতে স্নান করলেই কৈলাসের—তথা কৈলাসপতির দর্শন পাবে।' সাধুর কথায় পূর্ণ আস্থা রেখে পুষ্করিণীতে স্নান করামাত্র আপ্পার্ তাঁর বহুদিনের ঈপ্সিত কৈলাস ও কৈলাসপতির দর্শনে ধন্য হলেন, তাঁর সংকল্প সার্থক হ'ল। যে স্থানে তাঁর এই দর্শনলাভ ঘটে সে স্থানের নাম তিরু-বায়ার, তাঞ্জোর শহর হতে দশ মাইল দূরে অবস্থিত।

আপ্পার্ ৮০ বৎসর বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং শেষ জীবন তিনি তাঞ্জোর জেলার অন্তর্গত তিরুপুগালুর নামক স্থানে অতিবাহিত করেন।

ঐ গ্রামের বিখ্যাত শিবমন্দিরেই তাঁর অধিকাংশ সময় কাটত। তিনি হাতে একখানি নিড়ানি নিয়ে মন্দিরে যেতেন এবং তার দ্বারা ঘাস উঠিয়ে মন্দিরের অঙ্গন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতেন। মন্দির-প্রাঙ্গণ ঝাড়ু দেবার সময় কোনও মণিমুক্তা চোখে পড়লেও খোলামকুচির মতো তিনি তা ফেলে দিতেন, কাঞ্চনের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্রও আসক্তি ছিল না। কথিত আছে—সাধনকালে অপ্সরাগণ তাঁকে প্রলোভন দেখিয়েছিল, কিন্তু ঈশ্বরই একমাত্র কাম্য এবং তাঁর দর্শনই জীবনের একমাত্র ব্রত, এই দৃঢ় সংকল্পের ফলে ঈশ্বরকৃপায় তিনি সে প্রলোভন সহজেই জয় করেন। পরিশেষে তিরুপুগালুর মন্দিরেই তিনি ৬৮১ খৃষ্টাব্দে শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হন।

আপ্পার্ ৩১২টি দশ-পঙ্‌ক্তির স্তব রচনা করেন। সেগুলি ভক্তিরসে পরিপূর্ণ। স্তবের মাধ্যমে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য, মানব-জীবনের উদ্দেশ্য, সাধনপন্থা প্রভৃতি অতি সুন্দরভাবে তিনি প্রচার ক'রে গেছেন।

ঈশ্বর সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে, 'ঈশ্বর সাকার ও নিরাকার দুই-ই। তিনি পরম জ্যোতি ও অন্তর্জ্যোতি—তিনি প্রত্যেকের ভিতরে আবার বা'ইরে। তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর এবং তিনিই শিব—সমস্ত প্রাণীর পরিচালক, পশুপতি। শিবই সর্ববস্তুর সার—সঙ্গীতের তিনি মধুর ঝঙ্কার, ফলের তিনি সুমিষ্টত্ব ও পুষ্পের তিনি সৌরভ। এই শরীর তাঁর সচল মন্দির, মন ভক্তি, সত্যকথা পবিত্রতা এবং অন্তরের প্রেমই পূজা। বিচাররূপ ঘি দিয়ে অন্তরে জ্ঞানের আলো জ্বালালে সেই আলোকে তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়।'

আপ্পার্ বলেন, 'যিনি কাঞ্চন এবং কামকে দূরে সরিয়ে ফেলে ইন্দ্রিয়গ্রামকে জয় করতে পারেন, তিনিই শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হন। মুক্তির পথে প্রধান অন্তরায় 'অহং। এই অহংরূপ পাহাড়ে ধাক্কা লেগে আধ্যাত্মিকতারূপ জাহাজ নিমজ্জিত হয়। জীব যদি একাগ্রচিত্তে ও ভক্তি-সহকারে 'নমঃ শিবায়' এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করে, তবে শিবের করুণা নিশ্চয়ই লাভ করবে। ব্রহ্মরন্ধ্রে বিকশিত পদ্মোপরি অবস্থিত মহাদেবের রাতুল চরণে মন নিয়োজিত করতে পারলেই মুক্তি করতলগত।'

তিনি কৃষকের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ব'লে অনেক স্তবে কৃষি-সম্পর্কিত উদাহরণ দিয়েছেন। একটি স্তবে তিনি বলেছেন, 'যদি কোন সাধক সত্যের চাষ ক'রে তাতে ভক্তিবীজ বপন করেন ও মিথ্যারূপ আগাছা উপড়ে ফেলে ধৈর্যবারি সিঞ্চন করেন এবং সততার বেড়া দিয়ে ফসলকে ঘিরে রাখেন, তবে তাঁর আত্মানুভূতি হয় ও তিনি শিবলোক প্রাপ্ত হন।'

আপ্পার্ তাঁর ধর্মান্তরের কথা স্মরণ ক'রে বলতেন, 'অসত্য আচরণের ফলে পাপ-পঙ্কে পতিত হয়ে যখন সাপের মুখে ব্যাঙের ন্যায় অহরহঃ মৃত্যুযাতনায় ভুগছিলাম, সেই সময় কপালমোচন পবিত্র পঞ্চাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে তবে রক্ষা পাই।' তিনি বলেন, 'কেউ যদি তার দুষ্কার্যের জন্য সত্য সত্য অনুতপ্ত হয়ে আন্তরিক প্রার্থনা জানায় ও ভগবানের মহিমা কীর্তন করে, তবে সে তাঁর রাতুল চরণে স্থান পায়।'

নিজের অঙ্গকে সম্বোধন ক'রে তিনি বলছেন, 'হে আমার শির, তুমি ভক্তিভরে তাঁরই চরণে নত হও, হে আমার চক্ষু, তুমি প্রাণভরে তাঁরই মোহন রূপ দর্শন কর; হে আমার কর্ণ, তুমি নিবিষ্টচিত্তে তাঁরই গুণগান শ্রবণ কর, —কারণ তিনি আমাদের পরম প্রিয় ও পরম

আত্মীয়, যখন মৃত্যু এসে দরজায় করাঘাত করে, তখন কোথায় যায় সব জাগতিক আত্মীয়বৃন্দ। সেই সন্ধিক্ষণে সকলে যখন পরিত্যাগ করে, তখন সেই নটরাজ শিবই পরম আত্মীয়ের ন্যায় আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান, সুতরাং সব ছেড়ে দিয়ে তাঁরই আশ্রয় গ্রহণ কর, তাহলে তাঁকেই পাবে।' বার বার আপ্পার্ এই প্রার্থনাই করেছেন এবং ভগবানও তাঁর অন্তরের আকুতি শুনেছেন. তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছেন ও দর্শনদানে তাঁর জীবন ধন্য করেছেন।

উৎসর্গ

শ্রীমতী মালা রায়

ছড়ানো এ মন
হেথা হোথা জানো,
তোমার পায়েতে
করো তা জড়ো।

আমি ডাকি তোমা
তুমি শোন কানে,
সাড়া দাও, মোর
চিত্ত ভরো।

তুমি ডাকো প্রভু,—
পশে মোর কানে
সাড়া দিই, ধাই—
এমনই করো।

শুধু তোমা চাই
সব ভুলে যাই
আমারে তোমার
আপন করো।

প্রিয়তম হও,
মোরে প্রিয় করো,
হৃদয়ে কৃপার
প্রদীপ ধরো।

আলোকিত প্রাণ
পুলকিত মন
মনের মতন
তাহারে গড়ো।

বিশ্বভুবনে
তোমাব মহিমা
হেরি যেন ছবি
মধুরতর।

ব্যর্থ না হয়
জনম আমার,
জীবন আমাব
সত্য করো।

সার্থক হোক্
হেথা আগমন
গতানুগতিক
সকল হরো।

দেহ মন প্রাণ
করি সমর্পণ,
করো আকর্ষণ,
করুণা করো।

নিবেদিত হোক্
সকল আমার,
তুলসীর প্রায়
আমায় করো।

নিঃশেষে যেন
পারি আপনারে
তোমা দানিবারে,
গ্রহণ করো।

গ্রামীণ শিক্ষা

অধ্যাপক শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায়

গ্রামীণ শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে গেলে প্রথমে হয়তো প্রশ্ন আসবে: এর কথা আবার পৃথক্ ক'রে কেন? যে শিক্ষাব্যবস্থা সারা দেশে চালু আছে, তাতেই কি চলে না? গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার কথা আবার বিশেষ ক'রে কেন?

তার উত্তরে বলতে হয় যে গণতন্ত্র-বিশ্বাসী স্বাধীন দেশে একটা জিনিস থাকা চাই—তা হ'ল সবার জন্য সুযোগ-সুবিধার সকল অধিকার। সুযোগ-সুবিধার মধ্যে শিক্ষা একটা মস্ত বড় সুযোগ। এ সুযোগ যাতে সবাই—সমস্ত নাগরিক, সহজে সমানভাবে পায়, সেটা একটা অবশ্য করণীয় বিষয়। কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষার এই সুবিধা শহরের দিকেই রয়েছে, আর গ্রামের দিকে সে সুবিধা খুবই সামান্য। এতে দেশের এক বৃহৎ জনমণ্ডলী—গ্রামের লোকেরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, আর শহরের লোকেরাই শিক্ষার অধিকারী হচ্ছে বেশী। এর ফলে গ্রামের যুবশক্তির একটা বড় অংশ শহরের দিকে ছুটছে শিক্ষার জন্য। ফলে শহরে যে শিক্ষার ভিড় বেশী হচ্ছে শুধু শিক্ষা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে তাই নয়, গ্রামাঞ্চলগুলিও ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছে। ক্ষীণ হবার কারণ—শিক্ষা নেই। তারপর শিক্ষার জন্য গ্রামের যুবকরা অর্থাৎ গ্রামের যুবশক্তি ক্রমে ক্রমে শহরে চলে যাচ্ছে এবং শেষে সেখানেই বাস করছে। এ ছাড়া, শিক্ষার ফলে যুবশক্তি থেকে যে নেতৃত্ব বা নেতার দল গড়ে উঠতে পারে, তার সুফল গ্রামগুলি তো পাচ্ছে না। গ্রামে—যেখানে চালনাশক্তি বা নেতৃত্ব করবার মতো লোকের আরও বেশী প্রয়োজন, সেখানেই এর ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। সেই জন্যই বলেছি যে শিক্ষার সুযোগসুবিধার অভাবে গ্রামগুলি ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে, এত ক্ষীণ যে গ্রামে এখন কিছু কল্যাণমূলক ব্যবস্থা করাও কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে গ্রামীণ শিক্ষার উদ্দেশ্যের কোন পার্থক্য আছে কিনা। উদ্দেশ্যে এবং লক্ষ্যে কোন পার্থক্য থাকা উচিত নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য যা, তা সব ব্যক্তিকে নিয়ে—শহরের কি গ্রামাঞ্চলের সেটা বড় কথা নয়। মানুষকে গড়ে তোলা, তার ব্যক্তিত্বকে স্ফুরিত করা, বিশেষ ক'রে আমাদের এই গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সচেতন থাকা—এই হ'ল শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য। সেটা শহরের লোকের জন্য যেমন ঠিক, গ্রামের লোকের পক্ষেও তেমনি সত্য। অতএব উদ্দেশ্যের কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য তবু থাকবে, সে হ'ল কিসে বেশী জোর দেব, আর কিসে নয়।

গ্রামীণ শিক্ষায় কয়েকটি বিষয়ে জোর দেওয়া হয়। প্রথমটি হ'ল অন্নবস্ত্র, কারণ এই অর্থনৈতিক ব্যাপারটা সর্বত্র মূল সমস্যা। দ্বিতীয় হ'ল স্বাস্থ্য—ঘরবাড়ী, পরিচ্ছন্নতা, রোগনিবারণ ইত্যাদির কথা। তৃতীয় হ'ল শিক্ষার দিক। তারপর সমাজের কথা, আর আছে সাংস্কৃতিক বিষয়। অর্থাৎ জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগাযোগ রেখে শিক্ষা। গান্ধীজীর বুনিয়াদি

শিক্ষা-পরিকল্পনা এই উদ্দেশ্যই কাজ করেছে, এবং এই জীবনের সঙ্গে যোগাযোগের তাগিদেই হাতের কাজ ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়েছিল।

গ্রামীণ শিক্ষার কার্যক্রমের প্রথম পর্যায়—বুনিয়াদি শিক্ষা। মাধ্যমিক পর্যায়ে উত্তর-বুনিয়াদি কিংবা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার কার্য-সূচী। গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক পর্যায়ে বুনিয়াদি শিক্ষা—একটা স্বীকৃত ব্যাপার এখন। মাধ্যমিক পর্যায়ে কিছু উত্তর-বুনিয়াদি এবং কিছু উচ্চ মাধ্যমিক থাকবে। এখন উচ্চ শিক্ষার কথা। এ সম্বন্ধে ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে ভারত সরকার চারজন সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। তিন মাস পরে তাঁরা যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন, তার নির্দেশ অনুযায়ী এখন গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষার কাজ চলেছে।

গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষার জন্য ভারতে এ পর্যন্ত দশটি পরিষদ (Institute for Rural Higher Education) খোলা হয়েছে। এগুলি সব আবাসিক এবং গ্রামাঞ্চলে উপযুক্ত মনোরম জায়গায় প্রতিষ্ঠিত। ছাত্রছাত্রীদের এবং অধ্যাপকদের এখানেই বাস করতে হবে। গ্রাম-সংগঠনের ব্রতে যে সব মহৎ প্রতিষ্ঠান এ যাবৎ দেশে কাজ ক'রে আসছে, সেখানেই এগুলি স্থাপিত হচ্ছে। তা ছাড়া অন্যান্য গ্রাম-উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে এই সব পরিষদগুলির ঘনিষ্ঠ যোগ থাকবে, বিশেষ ক'রে সমাজ-উন্নয়ন ব্লকগুলির সঙ্গে। বাংলাদেশে শ্রীনিকেতনে এই রকম একটি পরিষদ স্থাপিত হয়েছে।

এই সব পরিষদে নিম্নলিখিত বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে: গ্রামীণ সেবাকার্যে একটা তিন বছরের ডিপ্লোমা, একটা এক বছরের শিক্ষণ-বিষয়ে ডিপ্লোমা এবং একটা সার্টিফিকেট্, মহিলা-স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য একটা দু বছরের সার্টি-ফিকেট্, আর কৃষিকার্যে দু-বছরের সার্টিফিকেট্।

অবশ্য এখন যে কটা পরিষদ ভারতে স্থাপিত হয়েছে, তাতে সব কটি কোর্সের যে ব্যবস্থা আছে, তা নয়। সাধারণতঃ তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্স রয়েছে—যাতে সমাজসেবা, কৃষিকার্য বা গ্রামীণ শিল্পবিজ্ঞানে বিশেষ পাঠ নেওয়া যায়।

সমাজসেবার ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য উচ্চ মাধ্যমিক বা উত্তর বুনিয়াদি পাশ করা চাই। শুধু স্কুল ফাইনাল পাশ হ'লে তার এক বছর হাতে কলমে কাজ করার অভিজ্ঞতা চাই। এই সব কোর্সের পরীক্ষার মাপকাঠি গতানুগতিক লিখিত পরীক্ষায় ততটা বিচার্য হবে না, যতটা হবে পরিষদে থাকাকালীন তার হাতের কাজ, উৎসাহ, কর্মপ্রবণতা ইত্যাদির পরিমাপ থেকে।

কিন্তু এই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-বহির্ভূত গ্রামীণ শিক্ষারও একটা ব্যবস্থা থাকা চাই। অর্থাৎ যারা গ্রামীণ এই সব পরিষদে গেল না, তাদের শিক্ষার কী ব্যবস্থা হবে? এখানে সমাজ-শিক্ষার কথা আসছে। এজন্য সমস্ত সমাজ-উন্নয়ন ব্লকগুলিতে আজ পুরুষ এবং মহিলা সমাজ-শিক্ষা-সংগঠক রয়েছেন। এঁদের কাজ হ'ল—উন্নততর জীবনের জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলা গ্রামের জনমণ্ডলীর মধ্যে। তার জন্য নিরক্ষরতা-দূরীকরণ, পাঠাগার-পরিচালনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী, সিনেমা, শিক্ষা-শিবির প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। সমাজ-শিক্ষার মাধ্যমে যদি একটা আগ্রহ এবং সচেতনতা আনা যায়, তাহলে গ্রামীণ শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক যে সব ব্যবস্থা আছে, তাতে লোকের আরও বেশী সাড়া পাওয়া সম্ভব। এ ছাড়া আছে জনতা-কলেজগুলি। এখানে গ্রামীণ নেতৃত্বের শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। গ্রামের জীবনে নেতৃত্বের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। গ্রামের পুন-রুজ্জীবনের জন্য আদর্শবাদী এবং বৈজ্ঞানিকভাবে

শিক্ষিত নেতার দরকার। জনতা-কলেজ এবং এই সব গ্রামীণ পরিষদগুলি গ্রামের অনেক যুবক-যুবতীর মধ্যে সেই নেতৃত্বশক্তি এনে দেবে, যা গ্রামের সামগ্রিক উন্নতির জন্য বিশেষ দরকার।

গ্রামীণ শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষার মান বা standard সম্বন্ধে আমাদের অবহিত থাকতে হবে। শহরাঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় আজ একটা সর্বভারতীয় মান আসছে। গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষার মান ওরই মতো করতে হবে। তা না হ'লে, শহর এবং গ্রামের বৈষম্য দূর না হয়ে আগের মতোই থেকে যাবে—অর্থাৎ সব বিষয়ে গ্রামবাসীর হীনম্মন্যতা। ধনী পরিবারে একজন গরীব হ'লে তার যা অবস্থা হয়, দেশের সামগ্রিক শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রামীণ শিক্ষারও সেই দশা হবে। এই গ্রামীণ শিক্ষা-পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে তার মান সম্বন্ধেও যেন আমরা সচেতন থাকি।*

* রেডিওতে প্রদত্ত বক্তৃতার ভাবাবলম্বনে লিখিত।

প্রকৃতি ও মানবাত্মা

স্বামী মৈথিল্যানন্দ

আদিম মানব বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে ভয় ও বিস্ময়ের বস্তুনিচয় দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিল। বহিঃপ্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত ঝড়, বাত্যা, বজ্রপাত, প্লাবন, অতিগ্রীষ্ম, অতিশীত, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী প্রভৃতি ভয়ের বস্তুগুলি হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য মানব বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিবার প্রয়াস পাইল। আদিম যুগ হইতে বর্তমান সভ্যতার যুগ পর্যন্ত সে প্রয়াসের বিরাম নাই। বহিঃপ্রকৃতিতে সঙ্ঘটিত কালের দুর্বার গতি, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, নভোমণ্ডলে নক্ষত্ররাজির গতিবিধি, সূর্য চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ এবং উপগ্রহগণের সঞ্চরণ, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ, জলপ্রপাত, গগনস্পর্শী পর্বতমালা প্রভৃতি বিস্ময়ের বস্তুগুলির গবেষণাতে আদিম মানব নিজেকে নিযুক্ত করিল। সে গবেষণারও আজ পর্যন্ত বিরতি নাই, বরং বিজ্ঞানের আলোকপাতে বিস্ময় হইতে অধিকতর বিস্ময় মানব-মনীষাকে আপ্লুত করিতেছে।

অন্তঃপ্রকৃতি হইতে সঞ্জাত মানব-অন্তরে রাগ, দ্বেষ, কলহ, বিরহ ও বিয়োগ প্রভৃতি বৃত্তিগুলির উদ্দাম গতি মানব-মনকে অবসন্ন করে। আদিম সভ্যতার যুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত মানব উহাদের ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত হইয়া শান্তির সন্ধানে ফিরিতেছে। কোন কোন মহামানব অদম্য চেষ্টায় অলৌকিক উপায়ে উহাদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে মানবের সহিত মানবের দ্বন্দ্ব পৃথিবীতে রক্তপাত, বিরোধ, এবং বহু অশান্তিকর ঘটনা ঘটাইয়াছে। মানব-বুদ্ধির অবিশ্রান্ত গতিতে লক্ষ মানবের উচ্ছেদ ও বিলোপ সাধন করিবার যে সব দুর্নীতি, কপটতা, ও মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা মানব-সমাজে ভয় ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করিয়াছে। বর্তমান যুগ মানব-প্রকৃতির বর্বরতায় সভ্যতার মুখে কালিমা লিপ্ত করিয়াছে।

কিন্তু এই প্রকৃতির স্বরূপ কি? মহাকবি কালিদাস তাঁহার কবি-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অবদান

'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকে খুব অল্প বাক্যে প্রকৃতির সংজ্ঞা করিয়াছেন : 'যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা'—যিনি সৃষ্টিকর্তার আদি সৃষ্টি, 'যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্'—যিনি সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্তা রহিয়াছেন, 'যামাহুঃ সর্ববীজপ্রকৃতিরিতি'—মনীষিগণ যাঁহাকে সকল বস্তুর উৎপত্তিস্থল বলিয়া কীর্তন করেন, 'যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ'—যাঁহা দ্বারা প্রাণিগণ প্রাণবিশিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করে, 'প্রত্যক্ষাভি তনুভিঃ অষ্টাভিঃ'—যিনি প্রত্যক্ষরূপে অনুভূতা ক্ষিতিময়ী, জলময়ী, অগ্নিময়ী, বায়ুময়ী, চন্দ্র-সূর্যময়ী, ও যজমানরূপা অষ্টমূর্তিতে বিরাজমানা।

এই সংজ্ঞায় কালিদাস ইহাও সংকেত করিয়াছেন যে প্রকৃতিদেবী সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরেরই বিবিধ দ্যুতিতে দ্যোতমানা, তিনি চৈতন্যরহিতা জড়প্রকৃতি নহেন।

এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য মনীষী ও কবিগণের উক্তিগুলি প্রণিধানযোগ্য। বিশ্ববিশ্রুত জার্মান পণ্ডিত Goethe বলিয়াছেন : 'Nature is the living visible garment of God'—প্রকৃতি শ্রীভগবানের জীবন্ত দৃশ্যমান আবরণ। মার্কিন ঋষি Emerson বলেন : 'Nature is too thin a screen ; the glory of One breaks in everywhere'—প্রকৃতির অতি পাতলা পর্দার ভিতর দিয়া ভগবানের মহিমা সর্বত্র বিচ্ছুরিত হইতেছে। ইংলণ্ডের ঋষি Carlyle প্রকৃতিকে এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :

'Nature is the time-vesture of God that reveals Him to the wise and hides Him from the foolish.'

—প্রকৃতিদেবী পরমেশ্বরের কাল-রূপ বস্ত্র পরিপরিধান করিয়াছেন। জ্ঞানীর কাছে তিনি তাঁহাকে প্রকটিত করেন এবং অজ্ঞের নিকট হইতে লুক্কায়িত রাখেন। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Newton কবির ভাষায় বলিয়াছেন :

'Not only the splendour of the sun, but the glimmering light of the glow-worm proclaims His glory.'

—সূর্যের সমুজ্জ্বল জ্যোতি শুধু নয়, জোনাকি পোকার অস্ফুট আলোও শ্রীভগবানেরই মহিমা প্রকাশ করে। সুবিখ্যাত সাহিত্যিক Charles Kingsley বলেন : 'Study nature as the countenance of God.'—প্রকৃতিকে ভগবানের মুখমণ্ডল বলিয়া দেখ।

পাশ্চাত্য কবিদের মধ্যে Wordsworthই প্রকৃতির প্রশস্তিতে তাঁহার কবিতা পূর্ণ করিয়াছেন। তিনি বলেন :

'...The anchor of my purest thoughts, the nurse, The guide, the guardian of my heart and soul, Of all my moral being.'

—হে প্রকৃতি! তোমার নিকট হইতে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ পবিত্র চিন্তা পাইয়াছি। তুমি আমাকে ধাত্রীর ন্যায় পালন করিয়াছ, জীবনপথে তুমিই পথ দেখাইয়াছ, তুমি আমার অন্তরকে চালিত করিয়াছ, তুমি আমার নৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছ।

পাশ্চাত্য কবি Coleridge প্রকৃতিকে আহ্বান করিয়া গাহিয়াছেন :

'It may indeed be phantasy when I
Essay to draw from all created things
Deep, heartfelt, inward joy
that closely clings,
And trace in leaves and flowers
that round me lie
Lessons of love and earnest piety
So let it be ; and if the wide world rings
In mock of this belief, it brings
Nor fear, nor grief, nor vain perplexity.
So will I build my altar in the fields,
And the blue sky my fretted dome shall be,

And the sweet fragrance
that the wild flower yields
Shall be the incense I will yield to thee,
The only God! and thou shalt not despise
Even me, the priest of this poor sacrifice.

—আমি যখন সৃষ্ট বস্তুনিচয় হইতে গভীর অন্তরতম আনন্দ হৃদয়ে অনুভব করিবার চেষ্টা করি এবং আমার চতুর্দিকে পত্র ও পুষ্পের মধ্যে প্রেম ও আন্তরিক ধর্মের তত্ত্ব শিক্ষা করি, তখন লোকে উহা কল্পনাপ্রসূত অলীক বস্তু বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারে। সমস্ত জগৎ যদি এই বিশ্বাসকে উপহাস করে, তাহাতে আমার কোন ভয়, কষ্ট বা অনর্থক মস্তিষ্ক বিকার ঘটাইবে না। আমি আমার প্রতীতি অনুসারে সুবিস্তীর্ণ মাঠের মাঝে পূজার মন্দির নির্মাণ করিব। উপরে নীল আকাশ মন্দিরের সুতুঙ্গ চূড়া হইবে এবং সহজ-জাত ফুলগুলির সুগন্ধ, হে প্রকৃতি, আমি ধূপের ন্যায় তোমাকে দিব। হে আমার একমাত্র ঈশ্বরী! তুমি এই সামান্য যজ্ঞের পুরোহিত আমাকে অগ্রাহ্য করিবে না।

পাশ্চাত্য কবি Coleridge কি গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে প্রকৃতির সকল বস্তু নিরীক্ষণ করিতেন, উপরে উদ্ধৃত কবিতাটি হইতে তাহা সহজেই অনুমেয়।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অপূর্ব ভাষায় প্রকৃতির স্পন্দন নিজের ভিতরে এইভাবে অনুভব করিয়া লিখিয়াছেন :

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণতরঙ্গমালা রাত্রি দিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে, সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে, বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু সমুদ্র-দোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার-ভাঁটায়।
করিতেছি অনুভব, সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান্॥
সেই যুগযুগান্তের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্তন॥

এই সকল উক্তিগুলির মধ্যে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে প্রকৃতি মানব-সত্তার মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া মানবের গঠন, পালন, ও অবশেষে পর্যবসানের ব্যবস্থা করেন। শুধু তাই কি? মানব-জীবনে প্রকৃতির সহানুভূতি অপরিমেয়। মার্কিন ঋষি Emerson তাঁহার এক প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছেন, 'Nature sympathises' যখন মানুষ দুঃখ বিরহ এবং যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পড়ে তখন প্রকৃতিদেবী ধাত্রীর ন্যায় মানবের অন্তরে অশেষ শান্তি ও সান্ত্বনা দিয়া থাকেন। শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতাবিরহে মুহ্যমান হইয়া লক্ষ্মণের সঙ্গে বনে বনে সীতার সন্ধান করিতেছিলেন তখন বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রের মুখে এই আর্তি প্রকাশ করিয়াছেন :

অপি কচ্চিত্ত্বয়া দৃষ্টা সা কদম্বপ্রিয়া প্রিয়া।
কদম্ব যদি জানীষে শংস সীতাং শুভাননাম্॥
স্নিগ্ধপল্লবসংকাশা পীতকৌষেয়বাসিনী।
শংসস্ব যদি বা দৃষ্টা বিল্ব বিল্বোপমস্তনী॥
অথবার্জুন শংস ত্বং প্রিয়াং তামর্জুনপ্রিয়াম্।
জনকস্য সুতা ভীরু যদি জীবতি বা ন বা॥

—অয়ি কদম্ব! তুমি সেই কদম্বপ্রিয়া আমার আমার প্রিয়া কোথায় আছেন, দেখিয়াছ? যদি জান, তাহা হইলে সেই শুভাননার কথা আমাকে বলিয়া দাও। অয়ি বিল্ব! সেই বিল্বসদৃশস্তনী, পল্লবতুল্য কান্তিমতী, পীতকৌষেয়-পরিধানা সীতাকে যদি দেখিয়া থাক, বল। অথবা হে অর্জুন! প্রিয়া তোমায় অতিশয় ভাল-

বাসিতেন। সেই ক্ষীণতনু জনকদুহিতা জীবিত আছেন কি না বল।

এইরূপে শ্রীরামচন্দ্র ককুভবৃক্ষ, বনস্পতি, তিলকবৃক্ষ, অশোক, তাল, জম্বু, কর্ণিকার, পনস, বকুল, দাড়িম্ব প্রভৃতি বৃক্ষদিগের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। শুধু বৃক্ষ নয়, হস্তী ব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদ জন্তুদেরও নিকট গিয়া সীতার সন্ধান করিতে লাগিলেন।

বিরহসন্তপ্তা গোপীগণ সারারাত্রি বনে বনে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন :

দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বত্থ। প্লক্ষ। ন্যগ্রোধ। নো মনঃ।
নন্দসূনুর্গতো হৃত্বা প্রেমহাসাবলোকনৈঃ॥
কচ্চিৎ কুরবকাশোকনাগপুন্নাগচম্পকাঃ।।
বামানুজো মানিনীনামিতো দর্পহরস্মিতঃ॥
কচ্চিৎ তুলসি। কল্যাণি। গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্ দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ॥
মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে? জাতিযূথিকে।।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ॥

—অশ্বত্থ। হে প্লক্ষ। হে বট। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ প্রেমহাস্যবিকসিত অবলোকনের দ্বারা আমাদের মন অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন, তোমরা মহান্, তোমাদের কৃষ্ণসান্নিধ্য লাভের সম্ভাবনা আছে, তাঁহাকে তোমরা দেখিয়াছ কি? হে কুরবক। হে অশোক, হে নাগ। হে পুন্নাগ। হে চম্পক। তোমরা পুষ্পাদির দ্বারা পরোপকার করিয়া থাক, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব, যাঁহার হাস্য মানিনীগণের মান দূর করে, সেই বলরামের কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ এই স্থান দিয়া গমন করিয়াছেন কি?

—হে তুলসি। হে ভাগ্যবতি। শ্রীকৃষ্ণের চরণ তোমার প্রিয়, অলিকুলের সহিত তিনি তোমাকে ধারণ করিয়া থাকেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করা তোমার পক্ষে সম্ভব, তোমার অতি প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে তুমি দেখিয়াছ কি? হে মালতি। হে মল্লিকে। হে জাতিকে। হে যূথিকে। করস্পর্শের দ্বারা তোমাদের প্রীতি জন্মাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে গমন করিতে দেখিয়াছ কি?

কালিদাস তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকে শকুন্তলার পতিগৃহে গমনকালে বীতরাগ কণ্বমুনির মুখে বলিতেছেন :

ভো ভোঃ সন্নিহিতবনদেবতাস্তপোবনতরবঃ।
পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা,
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রবৃত্তিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ,
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম্॥

—হে বনদেবতাগণ ও আশ্রমস্থিত বৃক্ষসকল, তোমাদিগের সলিলসেক না করিয়া যে শকুন্তলা অগ্রে জলপান করিতে অভিলাষ করিত না, অলঙ্কার ভালবাসিলেও স্নেহবশে যে শকুন্তলা তোমাদের একটিমাত্র পল্লব ছেদন করিত না এবং তোমাদের কুসুম ফুটিলে যাহার আনন্দোৎসব হইত, সেই শকুন্তলা আজ পতিগৃহে গমন করিতেছে, তোমরা এ বিষয়ে সকলে অনুমতি দাও।

দুঃখের ও সুখের সময় প্রকৃতিদেবী তাঁহার সন্তানগণকে শান্ত ও নন্দিত করেন। ইহা সাধারণ লোকের হৃদয়গম্য না হইলেও তীক্ষ্ণমেধা ও হৃদয়বান্ ব্যক্তিদের হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়া থাকে, তাই পাশ্চাত্য কবি Wordsworth বলিয়াছেন :

Nature never did betray
The heart that loved her.

—প্রকৃতিকে যিনি ভালবাসিয়াছেন, প্রকৃতি তাঁহাকে কখনও ত্যাগ করেন নাই।

সমালোচনা

মহান ভারত (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব)। লেখক : শ্রীভিক্ষু, প্রকাশক : শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, ভারতী-প্রকাশ, ৩০ আশুতোষ চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা—৩১, পৃষ্ঠা : প্রথম পর্ব—২৮৪+২৪, দ্বিতীয় পর্ব—৩২৯+১৭, মূল্য : প্রতি পর্ব ৭৫০ টাকা।

"যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে, যাহাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে—যদি এমন কোন দেশ থাকে, যেখানে সবাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে, তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তাহা আমাদের মাতৃভূমি এই ভারতভূমি।" ভারতবর্ষ সম্পর্কে কিছু বলিতে গেলে স্বামী বিবেকানন্দের এই উক্তিটি স্বতই আমাদের মনে ভাসিয়া উঠে।

শত সহস্র যুগ ধরিয়া নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া সংগ্রথিত এই ভারত-ইতিহাস। ইহাকে জানিতে গেলে অবশ্যই কিছু পশ্চাতে তাকাইবার প্রয়োজন আছে। কোন দেশকে জানা মানে, শুধুমাত্র উহার ইতিহাস-ভূগোল, দর্শন-সাহিত্য, বিজ্ঞান-বাণিজ্য বা রাষ্ট্রনীতি-অর্থনীতি জানাই নহে—উহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে খুঁজিয়া পাওয়া। ভারতবর্ষেরও সঠিক পরিচয় পাইতে হইলে তাহার চিন্তাধারা ও জীবনধারার গতিপথ অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হওয়া দরকার। এই জীবনাদর্শের সন্ধান-প্রসঙ্গেই মিলিবে ভারত-ভারতীর যথার্থ স্বরূপ।

সত্য-শিব-সুন্দর—ইহাই ভারতীয় সমাজের আদর্শ-মন্ত্র। ভূমিতে অবস্থান করিয়াও ভূমাকেই শিরোধার্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করা—ভারতের সনাতন জীবন-ব্রত। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময় এই জগৎকে ভারত অবহেলা করে নাই, বরং এই জগতের সকল স্তরেই—রাষ্ট্রে, সমাজে, শিল্পে, কাব্যে, সঙ্গীতে, শিক্ষায় ও সম্পদে—আবার উৎসবে-পার্বণে, বিবাহে-বিরহে, জন্মে-মৃত্যুতে, সকল অবস্থাতেই এক সর্ব-মহত্তম চেতন বস্তুর অভিব্যক্তি আবিষ্কার করিতে সে প্রয়াসী হইয়াছে।

কিন্তু কালদোষে বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে আধুনিক ভারত-সন্তান তাহার আত্মপরিচয় ভুলিতে বসিয়াছে। প্রাচীন শাস্ত্রাদি পড়িবার মত অবসর, সামর্থ্য ও সুযোগ আজকালকার মানুষের নাই। গ্রন্থাদির দুষ্প্রাপ্যতা, সংস্কৃত শিক্ষার বিলোপ এবং সর্বোপরি দুর্বহ অন্নচিন্তা আমাদের যে-কোন প্রকার বলিষ্ঠ চিন্তার প্রতিকূল। অথচ এই বাহির-সর্বস্বতার যুগে আমাদের জাতীয় শিক্ষা-দীক্ষাকে পুনরায় ভারত-মুখী করিতে না পারিলে সামাজিক বিপর্যয় অনিবার্য।

এ-হেন পরিস্থিতিতে বেদ-উপনিষদ্ ও স্মৃতি-পুরাণাদি হইতে ভারত-ঐতিহ্যের দ্যোতক ছোট-বড় বিভিন্ন অংশকে সাধারণের বোধ্য সহজ সরল ভাষায় যুগোপযোগী করিয়া জনসমাজে উপস্থাপনের অত্যন্ত প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। বাংলা ভাষায় এইরূপ একটি সংগ্রন্থনের অভাব ছিল।

শ্রীইন্দুমাধব ভট্টাচার্য (শ্রীভিক্ষু) প্রণীত আলোচ্য 'মহান ভারত' গ্রন্থদ্বয় এ-অভাব মোচনে অনেকখানি সহায়তা করিবে। সুপণ্ডিত গ্রন্থকারের বর্তমান প্রয়াস সত্যই অভিনন্দনযোগ্য। প্রাচীন ভারতের এমন সুরুচিপূর্ণ একখানি আলেখ্য প্রস্তুতির জন্য লেখককে যে অপরিসীম

ধৈর্য ও শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে—তাহার নিদর্শন গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় মিলিবে। প্রথম পর্বে তিনি ভারতের অধ্যাত্ম-চিন্তার ক্রমবিকাশ, বৈদিক ও ঔপনিষদিক তত্ত্ব এবং পৌরাণিক ঐতিহ্যের নানা খুঁটিনাটি তথ্যকে অতি নিপুণ-ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, প্রয়োজনবোধে নূতনতর ব্যাখ্যাও দিয়াছেন। আর দ্বিতীয় পর্বে চিত্রিত হইয়াছে সনাতন ভারতীয় সাধনার মর্মকথা—শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, কর্মকাণ্ডের নানা শাখা ও মত, আখ্যায়িত হইয়াছে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রের বহু বিচিত্র গতি। ভারতের দর্শন, শিল্প, কাব্য, সঙ্গীত, আনন্দ-উৎসব, শাসন-পদ্ধতি, সমাজ-সংগঠন ইত্যাদি কোন দিকই বর্ণনাপ্রসঙ্গে উপেক্ষিত হয় নাই।

গ্রন্থের ভাষা সরল সুন্দর, প্রকাশভঙ্গীও প্রাণস্পর্শী। পুস্তকে কয়েকটি বৈদিক মন্ত্র ও শান্তিপাঠ সন্নিবেশিত হইয়াছে। মন্ত্রগুলি সুনির্বাচিত ও উহার কাব্যানুবাদও ভাবানুগ। উভয় পর্বেই সংযোজিত বিস্তৃত বিষয়-সূচী পাঠকের খুবই সহায়ক হইবে সন্দেহ নাই। ছাপা ও কাগজ ভাল এবং প্রচ্ছদপট প্রশংসনীয়। প্রুফ সংশোধনে আরও কিঞ্চিৎ সতর্ক হইলে ভাল হইত। আমরা এই গ্রন্থের উভয় পর্বেরই বহুল প্রচার কামনা করি। —**অজজানন্দ**।

বনের ডাক: স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ প্রণীত। প্রকাশক: শ্রীঅরুণকুমার দে—৬৫।১।১, মানিক-তলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। পরিবেশক: এম-সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স্ প্রাইভেট লিমিটেড—১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, পৃঃ ২২৪, মূল্য পাঁচ টাকা।

'বনের ডাক' বইটির প্রচ্ছদপট ও নামটির মধ্যে বিজ্ঞানের চেয়ে কাব্যই এসে আগে ধরা দেয়। তার জন্য দুঃখ নেই, কারণ এটি উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের একটি 'পাঠ্যপুস্তক'ও নয়। এক মাসের মধ্যেই এই সুলিখিত বইখানি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সমালোচকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রথম দিকেই বনভোজনের মাধ্যমে নিপুণ শিল্পী লেখক যে পটভূমিকা প্রস্তুত করেছেন—তাতেই তাঁর উদ্দেশ্য নিশ্চয়-সফলতার দিকে পা বাড়িয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে ছেলেমেয়েদের মনের একটি প্রীতির সংযোগ-সূত্র বাঁধা হয়েছে, যার সাহায্যে তাদের মনে জাগবে জ্ঞানের তৃষ্ণার সঙ্গে সৃজন-প্রবণতা ও পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা। নিরক্ষর চাষীরাও পাবে এর থেকে তাদের প্রাঙ্গণে নানা গাছপালা লাগাবার প্রেরণা। বৃক্ষজগৎ নিয়ে অবসর-বিনোদনেরও অনেক ইঙ্গিত পাওয়া যাবে এই অভিনব পুস্তকটি থেকে। আবালবৃদ্ধবনিতার উপযোগী হলেও বিশেষ ক'রে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-দের খুবই কাজে লাগবে বইখানি।

শিশুর স্বভাব খেলা ও অনুকরণ করা, তারই মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে সে কেমন ক'রে জ্ঞানের পথে এগিয়ে যেতে পারে—তার অনেক নিদর্শন বইখানিতে পাওয়া যাবে। তাই এই বইখানি প্রথমে শিশুকে বা শিক্ষার্থীকেই পড়তে হবে না, পড়তে হবে তাদের শিক্ষককে। আর শিক্ষার্থী এই বই-এর অন্তর্গত হাতের কাজগুলি ক'রে মিলিয়ে নেবে আদর্শের সঙ্গে বাস্তবকে। তাতেই সে পাবে আত্মপ্রসাদ, অনুভব করবে আত্মশক্তি।

এই জাতীয় পুস্তক—যাতে রয়েছে জীবনের যোগ এবং বিবিধ হাতের কাজের সঙ্গে বিচিত্র জ্ঞানের সমন্বয়—শিক্ষার্থীর মনে শুধু আনন্দই দেবে না, শিক্ষাকে সম্পূর্ণ ক'রে তুলতে পারবে, তাদের মধ্যে স্বতঃপ্রণোদিত নিয়মনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা ক'রে এবং সৃজন-ও পালনশীল দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ক'রে।

জনসাধারণের সঙ্গে শিক্ষকসমাজ ও শিক্ষা-বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই সত্যিকারের নতুন বইটির প্রতি।

পরলোকে ভক্ত কিরণচন্দ্র সিংহ

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত ৮ই মে শুক্রবার সন্ধ্যা ৫-৫৭ মিঃ সময়ে ৬৮ বৎসর বয়সে পরম ভক্ত কিরণচন্দ্র সিংহ শিবপুরে তাঁহার বাসভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বহুদিন ধরিয়া তিনি ডায়াবিটিস রোগে ভুগিতেছিলেন। গত ২১শে ফেব্রুআরি হইতে তিনি মস্তিষ্কের ব্যাধিতে (থ্রম্বোসিসে) শয্যাগত ছিলেন। শেষ কয়দিন তাঁহাকে চরণামৃত ছাড়া অন্য কোন খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করানো যায় নাই।

১৮৯২ খৃঃ এক দরিদ্র পরিবারে ননীভূষণ সিংহের পুত্ররূপে তিনি মাতুলালয় হরিপালে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের পূর্বপুরুষ তারকেশ্বরের নিকট নালিকুল হইতে শিবপুরে আসিয়া বসবাস করেন। ৮ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগের পর মাতা ও ভগিনীর ভরণপোষণের জন্য কিরণচন্দ্রকে ১৫ বৎসর বয়সেই চাকরি গ্রহণ করিতে হয়। বহুকাল পূর্বে শিবপুরেই তিনি পূজ্যপাদ স্বামী বিরজানন্দের সঙ্গলাভ করেন। ইহার কিছুদিন পর তিনি জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর শ্রীচরণ দর্শন করেন। ১৯৪০ খৃঃ কালিম্পঙে স্বামী বিরজানন্দের নিকট তিনি দীক্ষালাভ করেন, এ বিষয়ে তাঁহার ধর্মপ্রাণা সহধর্মিণীর আগ্রহও কম ছিল না। তিনি পূর্বেই স্বামী বিবজানন্দ মহারাজের কৃপালাভ করিয়াছিলেন।

১৯১৮ খৃঃ হইতে চাকরির সঙ্গে সঙ্গে কিরণচন্দ্র ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন। প্রথমে মোটরের তেল বিক্রয় হইতে শুরু করিয়া মোটরের সাজসরঞ্জামের বিরাট ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন তাঁহার ঐহিক জীবনের স্মরণীয় কীর্তি।

জীবন-সায়াহ্নে তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি কামারপুকুরে গিয়া বাস করিবার বাসনা হয়; এতদুদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের বসতবাটীর সংলগ্ন এক টুকরা জমি কিনিয়া চালা ঘর করিয়া মাঝে মাঝে তিনি সেখানে বাস করিতে যাইতেন। ক্রমশঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মস্থানে মন্দির-প্রতিষ্ঠার কথা উঠিলে তিনি সানন্দে অর্থাদি সাহায্যে অগ্রসর হন। ইষ্টদেবতার প্রস্তর-নির্মিত মন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন হইতে মন্দিরে মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া নানা বিষয়ে তিনি সাহায্য করিতেন। পরে নাটমন্দির নির্মাণেও তাঁহার সাহায্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নব্য বঙ্গে 'বাউলের দল' প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার প্রচার তাঁহার আর এক বিশেষত্ব, কীর্তন করিয়া তিনি কামারপুকুর পরিক্রমা করিতে ভাল-বাসিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ও শ্রীশ্রীমায়ের জন্মভূমির উপর তাঁহার প্রবল আকর্ষণ ছিল। কেহ চারিধামে তীর্থভ্রমণের কথা তুলিলে তিনি বলিতেন: 'কামারপুকুর, জয়রামবাটী, দক্ষিণেশ্বর ও কাশীপুর—এই আমার চার ধাম।' বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতেও তিনি প্রায়ই আসিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের উপর তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত।

শিবপুরে শ্রীশ্রীমায়ের নামে ঘাট, সাধারণের জন্য পাঠাগার, দরিদ্র-ভাণ্ডার প্রভৃতি স্থাপন তাঁহাকে শিবপুরে সকলের প্রিয় করিয়াছিল। বহু প্রতিষ্ঠান পরিবারকে গুপ্তভাবে তিনি কত যে দান করিতেন, তাহার কোন হিসাব নাই। এই মহানুভব ভক্ত ইষ্টচরণে চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, এখনও তাঁহার ৮৭ বৎসরবয়স্কা জননী জীবিতা আছেন। এই অসহনীয় শোকে ভগবান এই বৃদ্ধা জননীকে, তাঁহার ধর্মনিষ্ঠ সহধর্মিণীকে ও শোক সন্তপ্ত আত্মীয় স্বজনকে সান্ত্বনা দিন। ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

রহড়াঃ রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমে স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে কীর্তন, ধর্মসভা, কথকতা, রামায়ণ-গান, যাত্রাভিনয় ও বিভিন্ন প্রকার লোকসঙ্গীতের আয়োজন হয়। নিম্ন ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়, কারিগরী বিদ্যালয়, শিল্পবিদ্যালয়, মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয় ও বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষার্থিবৃন্দের চিত্রশিল্প এবং বিভিন্ন প্রকার হস্তশিল্পের এক শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে নানারূপ কুটীর-শিল্পেরও এক প্রদর্শনী খোলা হয়। লক্ষাধিক লোক এই প্রদর্শনী অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে দর্শন করে।

১৮ই মার্চ প্রাতে মঙ্গলারতি, উপনিষদ্ ও গীতা পাঠের ভাবগম্ভীর পরিবেশে উৎসব আরম্ভ হয়। সকালে প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। সন্ধ্যায় এক মহতী ধর্মসভায় শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী পর্যালোচনা করেন। রাত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার সৌজন্যে 'রেজা' গান হয়।

১৯শে প্রাতে প্রভুপাদ দ্বিজপদ গোস্বামী ভাগবত পাঠ করেন। সন্ধ্যায় সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যাপক ডক্টর আশুতোষ দাসের সভাপতিত্বে এক ছাত্রসভায় বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্র 'স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান ভারত' সম্পর্কে বক্তৃতা করে। সভাপতি মহাশয়ের ভাষণের পর আশ্রম-বালকগণ 'রাখালরাজা' কীর্তনাভিনয় করে।

২০শে প্রাতে শ্রীঅবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 'শিবায়ন' কীর্তন হয়। অপরাহ্নে 'মণি-মেলা'-পরিচালক 'মৌমাছি'র সভাপতিত্বে শিশু-সম্মেলন হয়। সন্ধ্যায় এক বিচিত্রানুষ্ঠানে বিখ্যাত শিল্পিগণ সকলকে আনন্দ দেন।

২১শে প্রাতে মিশনের ক্রীড়াঙ্গনে আঞ্চলিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের ক্রীড়া-প্রতি-যোগিতা এবং দ্বিপ্রহরে নারায়ণসেবা হয়। অপরাহ্নে এক ধর্মসভায় ডক্টর রমা চৌধুরী শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-দর্শন আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় আশ্রম-বালকগণ কর্তৃক 'মুক্তিযজ্ঞ' নাটক অভিনীত হয়।

২২শে প্রাতে শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী রামায়ণ গান করিয়া ভক্তগণের মনোরঞ্জন করেন। বেলা ১০ ঘটিকায় কলিকাতার 'সুহৃদ্ ক্লাব' কর্তৃক 'কালীকীর্তন' হয়। অপরাহ্নে ধর্মসভায় শ্রীতামসরঞ্জন রায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শন' আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় বিখ্যাত যাত্রাপার্টি 'আর্য অপেরা' কর্তৃক 'রামপ্রসাদ' নাটক অভিনীত হয়।

২৩শে প্রাতে আশ্রম-কর্মিবৃন্দের এক সম্মেলন হয়। সন্ধ্যায় ব্যায়ামবীর বিষ্ণু ঘোষের ছাত্রবৃন্দ ব্যায়াম প্রদর্শন করেন। তাঁহাদের বিভিন্ন প্রকার জিম্‌নাষ্টিক্ ও পেশীসঞ্চালন বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল। রাত্রে 'ছায়াবাণী'র সৌজন্যে 'কাবুলিওয়ালা' চিত্র প্রদর্শিত হয়।

২৪শে প্রাতে মহাসমারোহে দোল-উৎসব উদ্‌যাপিত হয় এবং বালকগণ নগর-সঙ্কীর্তনে যোগদান করে। অপরাহ্নে প্রদর্শনীতে অংশ-গ্রহণকারী শিল্পিবৃন্দকে 'প্রশস্তিকা' প্রদান করা হয়। সন্ধ্যায় সিঁথি অমৃত-সঙ্ঘ 'মহিষাসুর' যাত্রাভিনয় করেন। সপ্তাহব্যাপী উৎসবে এদিকে জনসাধারণের মধ্যে বিরাট আনন্দ ও উৎসাহের সাড়া পড়িয়া যায়।

আসানসোল : শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২৫শে হইতে ৩০শে মার্চ বিভিন্ন কার্যসূচীর মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ও স্বামীজীর স্মরণোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

এই উপলক্ষে প্রথম দুইদিন সন্ধ্যায় বাঁকুড়ার বিখ্যাত রামায়ণগায়ক শ্রীসুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রামায়ণ গান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। ২৭শে মার্চ উৎসবের প্রথম দিন প্রভাতে মঙ্গলারতির দ্বারা উৎসবের সূচনা হয়। সকাল সাড়ে ছয়টায় বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ ও ভক্তমণ্ডলীর এক মিলিত শোভাযাত্রা ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি সহ শহর পরিক্রমা করে। মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম ও ভজনাদি অনুষ্ঠিত হয়। বৈকালে এক মহতী সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর আলোচনা করেন স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীভবরঞ্জন দে, হিন্দী-বক্তা শ্রীশিববালক রায় এবং স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী সভার কার্য পরিচালনা করেন। পরদিবস শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পূত চরিতকথা আলোচনা-সভায় সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপিকা ডক্টর সতী ঘোষ। শ্রীশিববালক রায়, স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ ও স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করেন। সভার শেষে হাওড়া 'মায়ের মন্দিরে'র সভ্যবৃন্দ 'রামপ্রসাদ' লীলাকীর্তন পরিবেশন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে আনন্দ দান করেন।

উৎসবের তৃতীয় দিবস সকালে পূর্বোল্লিখিত সম্প্রদায় কর্তৃক 'শ্রীরামকৃষ্ণ' লীলাকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিপ্রহরে প্রায় ৪৫০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। বৈকালে এক জনসমাবেশে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর আলোচনা করেন স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ, স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ ও স্বামী পাবনানন্দ। সভার কার্য পরিচালনা করেন পূর্ব রেলপথের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীকৃপাল সিং।

শেষ দিনে ৩০শে মার্চ সোমবার সন্ধ্যায় আশ্রম-বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণী সভায় পৌরোহিত্য করেন জেলাশাসক শ্রীসুহাসরঞ্জন দাস মহাশয়। স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ ও সভাপতি মহাশয় 'ছাত্রদের দায়িত্ব ও কর্তব্য' সম্বন্ধে উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। পুরস্কার-বিতরণের পরে আনন্দোৎসবের পরিসমাপ্তি হয়।

মনসা দ্বীপ (২৪ পরগনা) : গত ২৭শে মার্চ শুক্রবার শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব বিশেষ আনন্দ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূজা, পাঠ, শোভাযাত্রা প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল।

অপরাহ্ণে আয়োজিত সভায় কৃষ্ণনগর দেবেন্দ্র বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক শ্রীত্রিলোকেশ মিশ্র এবং আশ্রমস্থ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীসুধীরকুমার মাইতি শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিলে পর সভাপতি স্বামী জীবানন্দ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ত্যাগ ও সেবার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শ কিভাবে গ্রহণ করা যায় তদ্বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন।

প্রায় ১৫০০ পল্লীবাসী পরিতৃপ্তির সহিত প্রসাদ গ্রহণ করিয়া রাত্রে প্রাক্তন ছাত্রগণ কর্তৃক অভিনীত 'বাঙালীর দাবি' যাত্রাভিনয় দর্শন করে।

তমলুক : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে বিগত ১০ই এপ্রিল শুক্রবার হইতে ১২ই এপ্রিল রবিবার পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব আনন্দপূর্ণ অনুষ্ঠান সহায়ে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উৎসবে ঊষাকীর্তন, শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচারে পূজা, হোম ও ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শ্রীশ্রীচণ্ডীর ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথির কথকতা করেন। তিন দিনে তিন হাজার নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

উৎসবের প্রথম দিনের সভায় স্বামী মিত্রা-

নন্দের বক্তৃতার পর সভাপতি শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ভাষণ দেন। দ্বিতীয় দিন মহকুমা-শাসক শ্রীএস্ কে. চৌধুরী সভায় পৌরোহিত্য করেন। এই দিন স্বামী পূর্ণানন্দের বক্তৃতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী অন্নদানন্দ উভয়দিনই সরল ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর তাৎপর্য বুঝাইয়া দেন।

উৎসবের শেষ দিন ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, তিনি শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে সহজ সংস্কৃত ভাষায় ভাষণ দেন। সন্ধ্যারতির পর আশ্রম সন্নিকটে জেলা গ্রন্থাগার-প্রাঙ্গণে তাঁহার রচিত 'শক্তি-সারদম্' সংস্কৃত নাটকটি ডক্টর রমা চৌধুরীর প্রযোজনায় প্রাচ্যবাণী মন্দিরের সদস্য-সদস্যাগণ কর্তৃক অভিনীত হয়।

টাকী : গত ২২শে হইতে ২৪শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব হয়।

প্রথম দিন মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা ও ভোগরাগাদি সম্পন্ন হয়। প্রায় ছয় সহস্রাধিক ভক্ত প্রসাদ পান। বৈকালে শ্রীঅচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, ভগবানের সহিত ভালবাসার মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করাই তাঁহার আরাধনার সহজ এবং সরল পন্থা। সন্ধ্যায় কলিকাতার শিকদার বাগান সঙ্গীত-সমাজ কর্তৃক 'নদীয়া-লীলা' অভিনীত হয়। প্রায় দশ সহস্র নরনারী প্রেম-ভক্তিমূলক লীলাভিনয়-মাধুর্য আস্বাদন করেন।

দ্বিতীয় দিন প্রাতে 'কথামৃত' পঠিত ও ব্যাখ্যাত হয়। অপরাহ্ণে শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভজন গান করেন। রাত্রে শ্রীশিবরাম মুখোপাধ্যায় 'দক্ষযজ্ঞ' পালা কথকতা করেন।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় স্বামী মহানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর বাণী আলোচনা করেন। তারপর পূর্ব দিনের মত 'কথকতা' হয়। রাত্রে আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ 'কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ' নাটিকা অভিনয় করে।

কিষেণপুর (দেরাদুন) : গত ১১ই মার্চ শহর হইতে পাঁচ মাইল দূরে আশ্রমে বিশেষ পূজা ভোগারতি হোম সহ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মতিথি পরিপালিত হয়, বৈকালে প্রায় ৬০০ ভক্ত প্রসাদ পান। এতদুপলক্ষে ২৭শে মার্চ শহরে টাউন-হলে এক জনসভায় দিল্লী রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ এক উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা দেন, তাঁহার বিষয়বস্তু ছিল : ধর্ম মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে বিকশিত করে।

সারগাছি (মুর্শিদাবাদ) : গত ২রা বৈশাখ অন্নপূর্ণাপূজা-দিবসে পূজাহোমাদি সহায়ে রাম-কৃষ্ণ মিশনের প্রকাশ্য সেবাব্রতানুষ্ঠানের ও আশ্রমস্থ মন্দির-প্রতিষ্ঠার শুভতিথি-স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিপ্রহরে প্রায় ৫০০ স্থানীয় জনসাধারণ ও শতাধিক শহরাগত ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালে একটি সভায় মালদহ আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী পরশিবানন্দ ও শ্রীসত্যেন্দ্র শর্মারায় স্বামী অখণ্ডানন্দের জীবনকথা ও সেবাব্রতের বাণী আলোচনা করেন।

ইহার পরদিন হইতে বহরমপুরে উৎসব শুরু হয়। কথা, কীর্তন, জনসভা, ছায়াচিত্র প্রভৃতি ইহার অঙ্গ ছিল। শনিবার বিশেষ-ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন এবং রবিবার স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। স্বামী পরশিবানন্দ সভাপতিরূপে যুবকদের স্বামীজীর ভাবে উদ্বুদ্ধ হইতে আহ্বান করেন। শ্রীশশাঙ্ক-শেখর সান্যাল, শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় এবং স্বামী নিরাময়ানন্দ বিভিন্ন দিক দিয়া আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

পূর্ব পাকিস্তান

ঢাকাঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

২৭শে ফাল্গুন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথিপূজা, ভজন ও ঠাকুর-স্বামীজীর জীবনী ও বাণী আলোচনা এবং সান্ধ্য আরাত্রিকের পর পালা-কীর্তন হয়। ২৮শে ফাল্গুন মধ্যাহ্ন হইতে রামায়ণ-গান ও সান্ধ্য আরাত্রিকের পর 'রামরসায়ন' কীর্তন হয়। ২৯শে ফাল্গুনও 'রাম-রসায়ন' কীর্তন হয়। মধ্যাহ্ন হইতে দরিদ্রনারায়ণ সেবায় ৫০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

৩০শে ফাল্গুন অপরাহ্নে ছাত্রসভায় আলোচ্য বিষয় ছিল: মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দ। সভাপতি—শ্রীবসন্তকুমার দাস (এডভোকেট, ঢাকা হাইকোর্ট), বক্তা—অধ্যাপক ব্রজেন্দ্র-কুমার দেবনাথ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ।

১লা চৈত্র অপরাহ্নে সাধারণ সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল : বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। সভাপতি ডাক্তার শৈলেন্দ্রকুমার সেন ও প্রধান অতিথি—মাননীয় বিচারপতি জনাব হামিদুর রহমান, ভাইস চ্যান্সেলার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ডক্টর গোবিন্দ-চন্দ্র দেব মিশনের কার্যবিবরণী পাঠ করেন। তিনি বলেন, সেবাধর্ম ও মনুষ্যত্ববোধ জাগাইয়া তোলার উপর মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ভাইস চ্যান্সেলার সাহেব মিশন বিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্র বিগত বার্ষিক পরীক্ষায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে এবং ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছে তাহাদিগকে পুরস্কার দিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষাদান ও সেবাকার্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পাক-ভারতে ও পাশ্চাত্য দেশের নানাস্থানে মিশনের বিবিধ কর্মধারার কথা অবগত হইয়া তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রামকৃষ্ণদেবের সমন্বয়-মূলক ধর্মীয় আদর্শের সারগর্ভ আলোচনা করেন। অধ্যাপক মোজাহারউদ্দিন আহ্‌মদ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া বলেন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গিতে ধর্মকে দেখিতে পারিলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

নারায়ণগঞ্জঃ গত ৪ঠা চৈত্র হইতে ৮ই চৈত্র রবিবার পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব মহাসমা-রোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

প্রত্যহ মঙ্গলারাত্রিক, ভজন, বিশেষপূজা, হোম এবং শাস্ত্রাদি পাঠ হয়। প্রথম দুই দিন অপরাহ্নে কুমিল্লা রামমালা ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ রামমোহন চক্রবর্তী সুললিত ভাষায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ও শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করেন। ৪ঠা, ৬ই ও ৭ই চৈত্র সন্ধ্যারাত্রিকের পর স্বামী শর্মানন্দ ছায়াচিত্রযোগে যথাক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনালোচনা করেন। প্রথম চার দিন রাত্রে শ্রীদিবাকর চক্রবর্তী রামায়ণ গান করেন।

৫ই চৈত্র কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের সহাধ্যক্ষ শ্রীজ্যোৎস্নাময় বসু সভাপতিত্ব করেন। ৬ই চৈত্র বৈকালে অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহের পৌরোহিত্যে এক ধর্মসভায় ১৯৫৮ খৃঃ কার্যবিবরণী পঠিত হইলে পর সভাপতি সাহেব 'ইস্‌লাম ধর্ম', শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী 'খৃষ্টধর্ম', শ্রীমদ্ প্রিয়ানন্দ ভিক্ষু মহাশয় 'বৌদ্ধধর্ম' ও পণ্ডিত রামমোহন চক্রবর্তী 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনালোকে হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভায় প্রায় চারি সহস্র শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল।

৭ই চৈত্র মহিলা-সভায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী সুন্দরভাবে আলোচিত হয়।

ফরিদপুর: শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ১১ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি সুচারুরূপে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ঐ দিন বিশেষ পূজা, হোম ও চণ্ডীপাঠ হয়। সন্ধ্যারতির পর শ্রীহরবিলাস সাহা স্বরচিত শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসঙ্গীত এবং শ্রীঅমূল্য চক্রবর্তী, শ্রীসুধাময় ঘোষ প্রভৃতি ভজন গান করেন।

১৩ই মার্চ আশ্রমে দশ সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। উক্ত দিবস যথারীতি শ্রীশ্রীঠাকুরের মঙ্গলারতি, পূজা ও হোমাদি করা হয় এবং বেলা তিন ঘটিকা হইতে রাত্রি দশ ঘটিকা পর্যন্ত স্থানীয় ও দূরাগত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করে।

বক্তৃতা সফর

আসামের ভক্তগণ কর্তৃক আহূত হইয়া গত এপ্রিল মাসে স্বামী মহানন্দ আসামের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বিষয়ে ইংরেজী ও বাংলায় বক্তৃতা দেন। নিম্নে স্থান, কাল ও বিষয় লিপিবদ্ধ হইল। অধিকাংশ বক্তৃতার বিষয় শ্রোতাদের নির্ণীত, বক্তৃতার শেষে বক্তা প্রশ্নাদির উত্তর দেন।

ডিগবয় ১৭ই এ ও সি ক্লাব—কেমন ক'রে জীবনযাপন করব?
ঐ ১৮ই রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম হলে—শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী ও বর্তমান জীবন
ঐ ১৯শে ঐ আলোচনা
ঐ ঐ হাইস্কুল হলে—শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের সভায় দুষ্টু ছেলেদের কি ক'রে সামলানো যায়?
ঐ ২০শে ঐ ছাত্রদের সভায়—'মানুষ হও'
ঐ ঐ রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম হলে মহিলা-সভায়—ভারতের নবজাগরণে নারীর কর্তব্য
তিনসুকিয়া ২১শে এ. ও. সি হলে—হিন্দুধর্ম ও বর্তমান পৃথিবী
নাহারকাটিয়া ২২শে অসমীয়া হলে—শিক্ষা ও ধর্ম
ঐ ঐ হাইস্কুল হলে (সর্বসাধারণের সভায়) শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম
মারগারিটা ২৩শে পাবলিক হলে—ধর্মে সমাজবাদ
ডিব্রুগড় ২৪শে পাবলিক হলে—বর্তমান পৃথিবীতে বেদান্ত
ঐ ২৫শে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে—ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর প্রয়োজনীয়তা
ঐ ২৬শে ঐ —শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের সার্থকতা।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে মতিলাল রায়

প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মতিলাল রায় চন্দননগরস্থিত প্রবর্তক আশ্রমে গত ১০ই এপ্রিল বেলা ৯-৪০ মিঃ ৭৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। সায়াহ্নে সেখানেই তাঁহার নশ্বর দেহের শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়।

১৮৮২ খৃঃ চন্দননগরে বিহারীলাল রায়ের কনিষ্ঠ পুত্ররূপে মতিলাল রায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের পূর্বপুরুষ 'চৌহান'-বংশীয় রাজপুত। বাল্যকালেই মতিলালের মধ্যে ধর্মানুরাগের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার পাঠানুরাগ ও সাহিত্যানুশীলন ছিল অসাধারণ।

স্বদেশী-আন্দোলনে শ্রীযুত রায় তাঁহার সকল শক্তি লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়েন। ১৯১০ খৃঃ শ্রীঅরবিন্দ বৃটিশ রাজ্য হইতে আত্মগোপনপূর্বক তদানীন্তন ফরাসী রাজ্য চন্দননগরে আসিলে মতিলাল রায় স্বগৃহে তাঁহার প্রায় একমাসকাল অজ্ঞাতবাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মতিলাল রায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন-বাণী লইয়া কয়েকটি নাটক ও পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ: আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী, স্বদেশীযুগের স্মৃতি, কানাইলাল, বেদান্তদর্শন, শ্রীরামকৃষ্ণের দাম্পত্য জীবন, যুগাচার্য বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ, যৌগিক সাধন, মুক্তিমন্ত্র, শক্তিপূজা, নারীমঙ্গল, কর্মের ধারা, শতবর্ষের বাংলা।

উৎসব-সংবাদ

চেতলা (কলিকাতা) : গত ২৭শে মার্চ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-মণ্ডপে শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসব চারিদিবসব্যাপী পূজা, পাঠ, ভজন, কীর্তন, কথকতা, পাঁচালি, ধর্মসভা ও প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মধ্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত শ্রীশ্রীঠাকুর ও মাতাঠাকুরাণীর দিব্যজীবন-কাহিনী ও উপদেশাবলী আলোচনা করেন। স্বামী ব্রহ্মেশ্বরানন্দ উৎসবের প্রয়োজনীয়তা বর্ণন প্রসঙ্গে বলেন, ভগবৎপ্রসঙ্গ-শ্রবণ অজ্ঞাতসারে শুভ সংস্কার গঠন করে ও মানুষকে ক্রমোন্নত জীবনের অধিকারী করে। তৃতীয় দিবস সন্ধ্যায় অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী ও স্বামী নিরাময়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবতার-বরিষ্ঠত্ব ও বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারার প্রভাব সম্বন্ধে বলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পাঠচক্র : গত ২৮শে মার্চ শনিবার শ্রীরামকৃষ্ণ-পাঠচক্র প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ আবির্ভাব-উৎসব মঙ্গলারতি, পূজা, হোম, ভোগরাগ, ভজন, কীর্তন, গীতা, 'লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'কথামৃত' পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে কলিকাতা পি, ৭৩এ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে সম্পন্ন হইয়াছে। স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্বামী সুশান্তানন্দ ও শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী সংক্ষেপে আলোচনা করেন।

দক্ষিণেশ্বরে স্বামী যোগানন্দ উৎসব : শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্ষদ ও ঈশ্বরকোটী শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দ মহারাজের শুভ-আবির্ভাব উপলক্ষে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার পূত জন্মস্থানে যোগানন্দ উৎসব-সমিতি কর্তৃক ষষ্ঠ বাৎসরিক উৎসব গত ২৮শে ও ২৯শে মার্চ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিশেষ পূজা, ভোগ, আরতি, চণ্ডীপাঠ, সংকীর্তনসহ তীর্থ-পরিক্রমা, লীলা-কীর্তন, ভজন, পাঠ, প্রসাদ-বিতরণ এই উৎসবের অঙ্গ ছিল। ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী লোকেশ্বরানন্দ এবং শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী যোগানন্দজীর অলৌকিক জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন।

নূতন পুকুর (২৪ পরগনা) : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৫ই এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব শান্ত পরিবেশে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যূষে মঙ্গলারতি ও ভজনাদি সহ আনুষ্ঠানিকভাবে উৎসব শুরু হয়। পূর্বাহ্নে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও চারিগ্রাম আশ্রমের রামকৃষ্ণ-কীর্তনে উৎসব-প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠে। মধ্যাহ্নে সহস্রাধিক ভক্ত নরনারী পরম তৃপ্তি সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন, অপরাহ্নে ভক্তি-রসাত্মক সঙ্গীতের পর বারাসত মহকুমা-সেবক (S D O) শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের পৌরোহিত্যে এক ধর্ম-সভায় স্বামী জীবানন্দ, স্বামী আপ্তানন্দ এবং সভাপতি মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

হুগলী-বাবুগঞ্জ : পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মতিথি-পূজা ও তৎসহ শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব বাবুগঞ্জে রথতলায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ পার্কে' হুগলী জেলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে গত ২৭শে ফাল্গুন হইতে পাঁচদিনব্যাপী পূজা, হোম, গীতা-চণ্ডী-ভাগবত-উপনিষদ্ পাঠ, আলোকচিত্রে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা প্রদর্শন, আরতি ও ভজন হয়। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে ধর্মসভায় স্বামী পূর্ণানন্দ 'জগতে স্বামীজীর দান' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

আরারিয়া (পূর্ণিয়া) : শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ২৭শে ফাল্গুন এবং ৬ই হইতে ৮ই

চৈত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূজা, পাঠ, ভজন, অষ্টপ্রহরব্যাপী নামসংকীর্তন, ভজন, আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা, নরনারায়ণ-সেবা ও ধর্ম-সভা উৎসবের অঙ্গ ছিল। স্বামী পরশিবানন্দ (সভাপতি) ও স্বামী অনুপমানন্দ বাংলা ভাষায় এবং স্থানীয় উকিল শ্রীহরিলাল ঝা হিন্দীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী আলোচনা করেন।

পিপড়াড়ি কোলিয়ারিঃ রামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব গত ২৭শে ফাল্গুন বুধবার পিপড়াড়ি কোলিয়ারিতে সুসম্পন্ন হইয়াছে। পূজা, কালী-কীর্তন ও শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠে সমবেত জন-গণ নির্মল আনন্দ লাভ করেন। ডাঃ ধনঞ্জয় দে বাংলা ভাষায় ঠাকুরের উপদেশ পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দেন।

ঢাকুরিয়া (কলিকাতা-৩১): শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৮শে ও ২৯শে চৈত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের সভায় যথাক্রমে শ্রীপুষ্পিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও স্বামী গম্ভীরানন্দ সভাপতিত্ব করেন। দ্বিতীয় দিন স্বামী দেবানন্দ 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

সিন্দ্রি (বিহার): গত ৪ঠা হইতে ৬ই এপ্রিল ৩ দিন ধরিয়া সহরপুরা রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব উষাকীর্তন, পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় স্বামী মহানন্দ ইংরেজীতে ও বাংলায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন, ছায়াচিত্রে 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রদর্শিত হয়।

জয়নগর-মজিলপুর (২৪ পরগনা): এই বৎসরও শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-উৎসব যথারীতি উদ্‌যাপিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত কবিগান ও পাঁচালি গান উৎসবের বিশেষ অঙ্গ ছিল। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী ভবানন্দ। আলোকচিত্রে 'যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ' পরিবেশিত হয়।

নাটশাল (মেদিনীপুর): শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৮ই চৈত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব মহা-সমারোহে সুসম্পন্ন হয়েছে। প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি সহ ভক্তমণ্ডলী ও জনসাধারণ এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করেন। তারপর পূজা, হোম, পাঠ, ভজন ও প্রসাদ-বিতরণ হয়। অপরাহ্ণে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী অচিন্ত্যানন্দ।

সংস্কৃত-নাট্যাভিনয়

সংস্কৃত প্রচারের দিক হইতে সংস্কৃত নাট্যা-ভিনয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া ১৯৪৩ খৃঃ হইতে কলিকাতাস্থ গবেষণা-মন্দির 'প্রাচ্যবাণী' এই বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থাবলম্বন করিয়াছেন।

বিগত এপ্রিল মাসে প্রাচ্যবাণীর সদস্য ও সদস্যাগণ কয়েকটি বিশেষ অনুষ্ঠানে নিম্নোল্লিখিত সংস্কৃত নাটকাভিনয় করিয়া সুনাম অর্জন করিয়াছেনঃ

(১) তমলুক রামকৃষ্ণ মিশনে অভিনীত শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবনী অবলম্বনে ডক্টর যতীন্দ্র-বিমল চৌধুরী বিরচিত 'শক্তি-সারদম্'।

(২) দিল্লী আকাশবাণী কর্তৃপক্ষের তত্ত্বা-বধানে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রথম সংস্কৃত নাটকাভিনয় ডক্টর চৌধুরী বিরচিত 'মহিমময়-ভারতম্' এবং ভাস-বিরচিত 'প্রতিমা-নাটকম্'।

(৩) কলিকাতা বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন-সমিতির উদ্যোগে বহু সুধীজনের উপস্থিতিতে শ্রীল হরি-দাস ঠাকুরের পুণ্য জীবনী অবলম্বনে ডক্টর চৌধুরী বিরচিত 'মহাপ্রভু-হরিদাসম্'।

দিল্লীতে লোকসভার অধ্যক্ষ শ্রীঅনন্তশয়নম্ আয়েঙ্গার নাটকের বিশেষ প্রশংসাপূর্বক অভি-নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দিত করেন। সঙ্গীতাংশে অংশগ্রহণ করেন শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক, শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সুবিখ্যাত শিল্পিগণ।

ভ্রম-সংশোধন

এই সংখ্যায় ২৫৭ পৃষ্ঠায় ২য় কলমে এই পঙ্‌ক্তি পড়িবেন: 'তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি'।

উদ্বোধন

গুরুমুখী সাধনা

বিচারণীয়া বেদান্তা বন্দনীয়ো গুরুঃ সদা।
গুরূণাং বচনং পথ্যং দর্শনং সেবনং নৃণাম্।

গুরুর্ব্রহ্ম স্বয়ং সাক্ষাৎ সেব্যো বন্দ্যো মুমুক্ষুভিঃ।
নোদ্‌বেজনীয় এবায়ং কৃতজ্ঞেন বিবেকিনা॥

যাবদায়ুস্ত্বয়া বন্দ্যো বেদান্তো গুরুরীশ্বরঃ।
মনসা কর্মণা বাচা শ্রুতিরেবৈষ নিশ্চয়ঃ॥

ভাবাদ্বৈতং সদা কুর্যাৎ ক্রিয়াদ্বৈতং ন কর্হিচিৎ।
অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু নাদ্বৈতং গুরুণা সহ॥

—শ্রীশংকরাচার্যকৃত তত্ত্বোপদেশ (৮৪-৮৭)

বেদান্তবাক্যই সর্বদা বিচার্য, গুরুই সর্বদা বন্দনীয়, গুরুদেবের বচন, শ্রীগুরুর দর্শন ও তাঁহার সেবা সাধকগণের পরম হিতকর।

গুরুই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। মুমুক্ষুগণ সর্বদা গুরুর সেবা ও বন্দনা করিবে। কৃতজ্ঞ বিবেকী সাধক কদাপি গুরুর উদ্‌বেগ জন্মাইবে না।

যত কাল আয়ু আছে, ততদিন বাক্য, মন এবং কর্মদ্বারা বেদান্ত, গুরু ও ঈশ্বরের বন্দনা করিবে। ইহাই শ্রুতি-সিদ্ধান্ত, ইহাই নিশ্চিত সাধনা।

অদ্বৈততত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণা দৃঢ় করিবার জন্য চিন্তা ও বিচারে সর্বদা অদ্বৈতভাব অভ্যাস করিবে, কিন্তু সাধনাবস্থায় কর্মব্যাপারে অদ্বৈত করিলে চলিবে না। স্বর্গে মর্ত্যে অন্তরীক্ষে সব কিছুর সহিত একাত্ম ভাবনা করিলেও গুরুতে কখনও অদ্বৈত বুদ্ধি করিও না। তাহা হইলে শ্রীগুরুর সেবা সম্ভব হইবে না। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা হইতেই জ্ঞান ভক্তি মুক্তি—সব লাভ হয়। 'গুরু বিনু নেহি বাট (পথ), কৌড়ি বিনু নেহি হাট।'

কথাপ্রসঙ্গে

সাধু ও সমাজসেবা

গত মে মাসের প্রথম সপ্তাহে নয়া দিল্লীতে 'ভারত সাধুসমাজ' নামক সংস্থার চারদিনব্যাপী তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের শেষ দিন রাজধানীতে 'সমাজে'র নূতন ভবনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন-কালে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন :

জনগণের সহিত সাক্ষাৎ সংযোগ থাকায় সাধুগণ জাতিগঠনের কাজ ত্বরান্বিত করিতে পারেন। বহু প্রাচীন কাল হইতে মন্দির ও ধর্মস্থানগুলি আমাদের দেশে শিক্ষাবিস্তারের অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে এবং সাধুগণ জনগণকে জ্ঞান দান করিয়া আসিতেছেন। সাধুগণ আমাদের দেশে বিপুল সম্মানে সম্মানিত, এবং তাঁহারা যদি জনগণের প্রকৃত নৈতিক নেতৃত্ব (moral leadership) গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলে সমাজে দুর্নীতি ও চোরা কারবার টিকিতে পারে না।

গ্রাম উন্নয়নের কার্যেও রাষ্ট্রপতি সাধুগণের সহযোগিতার জন্য আবেদন জানাইয়া পরিশেষে এই ভাব ব্যক্ত করেন: রাজনীতির প্রভাব সমাজের সর্বত্র বাড়িতেছে, একমাত্র সৎ-সমাজই সুদৃঢ় রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি প্রস্তুত করিতে পারে। মহৎ ভাবধারার উত্তরাধিকারী সাধুগণ সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করিলে সমাজ উন্নত ও উৎকৃষ্ট হইবে।

রাষ্ট্রপতির আবেদনে একদিকে যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে অর্থনীতি-কেন্দ্রিক রাজনীতির ব্যর্থতা-বোধ, অন্যদিকে তেমনই ব্যক্ত হইয়াছে—ধর্মমূলক নীতির ভিত্তিতে সমাজ উন্নয়নের আহ্বান। ডক্টর প্রসাদের মতে সাধুগণই এই উন্নয়নের কার্যে আগাইয়া আসিয়া নৈতিক ভাঙন হইতে দেশকে রক্ষা করিয়া বর্তমান সমাজ-সংকট হইতে মানুষকে উদ্ধার করিতে পারেন।

তিন বৎসর পূর্বে পরিকল্পনার কার্যসূচীতে জন-সংযোগে সাহায্য হইবে—এইরূপ বিশ্বাস লইয়াই পরিকল্পনা-মন্ত্রী শ্রী নন্দ 'ভারত সাধুসমাজ' গঠনের আহ্বান জানান এবং তাঁহার প্রচেষ্টা যে সফলতার পথে অগ্রসর হইতেছে, তাঁহার প্রমাণ 'সমাজে'র উত্তরোত্তর উন্নতি।

এই সম্মেলনের তৃতীয় দিবসের অধিবেশনে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু অভিযোগের সুরে বলিয়াছেন : বহুবার দেখা গিয়াছে হিন্দু মঠে-মন্দিরে মহান্তদের হাতে অর্থের অপব্যয় হয়। জনসাধারণের অর্থ ব্যক্তিগত ভাবে না হইয়া সাধারণের জন্য ব্যয়িত হওয়া উচিত, এই বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা আশু কর্তব্য।

এই প্রসঙ্গে এইটুকু বক্তব্য—আমাদের সেকুলার (ধর্ম-নিরপেক্ষ) রাষ্ট্রে এইরূপ আইন বিশেষভাবে হিন্দুদের জন্য না হইয়া ব্যাপক-ভাবে সকল ধর্মের জন্যই রচিত হওয়া উচিত কিনা বিবেচ্য।

শ্রীনেহরু সাধুদের দেশসেবায় আহ্বান করিয়া বলেন : যদি সাধুরা ধর্ম-জীবনে সহন-শীলতা ও কর্ম-জীবনে সহযোগিতার কথা প্রচার করেন—তবে তাহা প্রভূত সুফল প্রসব করিবে। সর্বশেষে তিনি সাধুসমাজকে সরকারের অর্থসাহায্য হইতে দূরে থাকিতে বলেন।

কথাগুলি মূল্যবান্ এবং সুচিন্তিত। সরকারী অর্থ-সাহায্যের ফাঁদে পড়িলে সাধুগণের স্বাধীনতা বিনষ্ট হইবে, এবং প্রকারান্তরে 'সাধুসমাজ' সরকারের একটি বিভাগে পরিণত হইবে, ফলে যে উদ্দেশ্যে 'সমাজ' গঠিত হইয়াছিল তাহাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সরকারী কর্মচারীদের মুখাপেক্ষী হইয়া তাঁহাদের নির্দেশ-মতোই সাধুদের চলিতে হইবে, ও তাঁহাদের ঐহিক কর্মসূচী রূপায়িত করিতে হইবে।

'সাধু-সমাজে'র অন্যান্য বিবৃতি ও প্রস্তাবে এরূপ আশঙ্কা এখনই দেখা দিয়াছে।

একদিকে প্রস্তাব করা হইয়াছে—দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য ঐহিক অগ্রগতি (materialistic progress) যথেষ্ট নয়, নৈতিক মান উন্নত করাও বিশেষ প্রয়োজন। অন্যদিকে বিদায়ী সভাপতি সন্ত তুকডোজী মহারাজ বলিতেছেন যে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা হইতে অর্থনীতির ব্যাপার পর্যন্ত সাধুগণকে দেখিতে হইবে।

আর একটি প্রস্তাবও বিস্ময়জনক। সকল সাধুকে এই নবগঠিত 'সমাজে' নাম রেজেষ্ট্রি করিতে হইবে, এ বিষয়ে সরকার যেন 'সমাজ'কে আইনসম্মত ক্ষমতা দেন। এখানেও আমাদের প্রশ্ন—সাধু বলিতে কি হিন্দু সাধু, না সকল ধর্মের সাধু? সেকুলার রাষ্ট্রে এরূপ প্রস্তাব শুধু বিস্ময়-জনক নয়, বিপজ্জনকও বটে।

শেষে একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, আমাদের এই দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোতে আধ্যাত্মিক বিকাশ ও আচরণের মানোন্নতি প্রয়োজন। ভেজাল, দুর্নীতি, ঘুষ, মাদকতাদোষ জাতীয় অগ্রগতির পথে বিশেষ বাধা, কোটি কোটি টাকা এই বাবদ খরচ হইতেছে। যদি এই সব কুক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করা যায়, তাহা হইলে শুধু যে আমাদের জাতীয় চরিত্র উন্নত হইবে তাহা নয়, প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকা বাঁচিয়া যাইবে, এবং তাহা দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

ভাবাবেগের দিক দিয়া কথাগুলি খুবই সুন্দর। কিন্তু সাধুগণ এসব ক্ষেত্রে কি করিবেন? ঐ সকল কার্য দমন করা কি প্রধানতঃ সরকারের এবং বিশেষভাবে পুলিশ বিভাগের কাজ নহে? এক্ষেত্রে সাধুরা প্রত্যক্ষভাবে কিছু করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইবারই আশঙ্কা। শুধু উপদেশ ও প্রতিশ্রুতি নিষ্ফল। 'অণুব্রত' আন্দোলন সফল হইলে অবশ্য সমাজ উপকৃতই হইবে।

সাধুরা সংসারত্যাগী, সেদিক দিয়া তাঁহারা সমাজে থাকিয়াও সমাজের বাহিরে থাকেন, তাই বলিয়া তাঁহারা সমাজত্যাগী নন। সমাজের উর্ধ্বে না হউক সমাজ হইতে দূরে নির্লিপ্ত ভাবে থাকিয়াই তাঁহারা সমাজের প্রকৃত সেবা করেন। সে সেবা ঐহিক বা নিছক আর্থনীতিক নয়, তাহার মূল ভাব আধ্যাত্মিক—মানবের অন্তর্নিহিত দেবত্বের জাগরণ। মনে হয় যত প্রকার সেবা আছে তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেবা—মানুষকে তাহার নিজ মহত্ত্ব সম্বন্ধে সজাগ করা। নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন কোন ব্যক্তি অন্যায় বা পাপ কার্য করিতে পারে না। পাপপুণ্য সম্বন্ধে আমরা মহাভারতের সংজ্ঞাই গ্রহণ করিতেছি—পরপীড়নই পাপ, বিপরীত ক্রমে পরোপকারই পুণ্য। আবার স্বামীজী বলিতেছেন, পরোপকারে নিজেরই উপকার। নিজের উপকার করিতে কে না চায়? কিন্তু অজ্ঞ মানুষ জানে না কিসে তাহার প্রকৃত উপকার? তাই স্বার্থসাধনে রত থাকিয়া সারা জীবন নিজের উপকার করিতে গিয়া সে পরপীড়ন করে, যাহা দ্বারা তাহার নিজের অপকারই হয় বেশী।

কর্মের কুটিলা গতি। কর্মফলবাদ ভারতীয় জীবন-দর্শনরূপে ভারতবাসীকে ধর্মভীরু করিয়া নৈতিক উন্নতির যে মান জগতের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিল, তাহা বিদেশীদের বিস্মিত করিয়াছে।

আমাদের আজ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে—কী প্রকার জীবন-নীতির ফলে, কোন্ সাধনার বলে ভারতের জনসাধারণ চুরি ও মিথ্যাকথা জানিত না, কেন ও কবে এই মহান্ ভাব নষ্ট হইয়া গেল, কিভাবে আবার উহা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা যায় ?

যখন বর্তমান বিজ্ঞানের কোন প্রচার-যন্ত্র ছিল না, তখন ভ্রাম্যমাণ সাধুগণই ভারত-ধর্মের মর্মবাণী কুটিরে কুটিরে পৌছাইয়া দিতেন। সমগ্র ভারত তাঁহারাই 'এক ধর্ম-রাজ্য-পাশে' বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে—সর্বত্র তাঁহারা উচ্চতম ভাবরাশি অনলসভাবে বিতরণ করিয়াছেন যথালব্ধ ভিক্ষান্নেই সন্তুষ্ট থাকিয়া। তাঁহাদেব কোন দাবি-দাওয়া নাই, কোন অভাব-অভিযোগ নাই।

উত্তরাখণ্ডের জনৈক সন্ন্যাসী যথার্থই বলিয়াছিলেন : সাধু ভগবানের চৌকিদার। তাহার দুই কাজ, জাগ্‌না ঔর জাগানা—নিজে জেগে থাকা ও অপরকে জাগিয়ে রাখা। সংসার-মোহনিদ্রা ত্যাগ ক'রে সাধু নিজে জেগে থাকবে, আর সুপ্তিমগ্ন গৃহস্থদেরও মাঝে মাঝে জাগিয়ে দেবে, যাতে না ঘরে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ রূপ চোর-ডাকাত এসে তার সর্বস্ব চুরি ক'রে নিয়ে যায়। চৌকিদারের ডাক শুনে গৃহস্থ নিশ্চিন্ত হয়ে গৃহে বাস করে, জানে—দেশে সরকার আছে, শাসন আছে। সাধুর কথাতেও মানুষ বোঝে—ভগবান্ আছেন একজন, দেখছেন এই জগৎ। চৌকিদার সরকারকে মনে করিয়ে দেয়, সাধু ভগবানকে। উভয়েরই কাজ উচ্চতর শক্তির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন। সন্ন্যাসী তাই পরে বলিয়াছিলেন : সাধুর তিন কাজ—জাগ্‌না, জাগানা ঔর যোগ্‌না। নিজে জাগা, অপরকে জাগানো এবং জীবাত্মা পরমাত্মার যোগসাধন।

সাধুর এই প্রকৃত স্বরূপ না জানিয়া যদি তাঁহাকে জোর করিয়া নিছক লৌকিক কর্মে নিযুক্ত করা হয়, তবে সুফল হইবে না। সাধুকে সৎ এবং সাধু (honest) মনে করিতে হইবে, তবেই তাঁহার নিকট হইতে কিছু পাওয়া সম্ভব। নতুবা যদি সাধুকে মনে করি অলস, সমাজের গলগ্রহ (parasite), সংসার-পলাতক (escapist) —তবে কেন বৃথা সেই 'অসৎ'কে শুভ কার্যে আহ্বান ? নিজের নিকটতম আত্মীয় স্বজনকে যে 'ফাঁকি' দিয়াছে, সে রাষ্ট্রকে সমাজকে—সকলকেই ফাঁকি দিবে, তাহাকে দিয়া কোন বড কাজেব পত্তন করিতে যাওয়া বোকামি। ভবঘুরেকে 'সাধু' আখ্যা দিয়া সাধুসমাজের অন্তর্ভুক্ত না করাই উচিত। বাহ্যতঃ সাধুর বেশ ধারণ করিয়া যাহারা গোপনে নানা অপকর্মে লিপ্ত থাকে, তাহাদের 'সাধু' আখ্যা দিয়া সমাজ নিজেকেই প্রতারিত করে। তাই 'সাধুসমাজে'র সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি ও কর্মবিস্তারের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া দেখিতে হইবে প্রকৃত সাধু ও সজ্জনের সংখ্যা কিভাবে বৃদ্ধি পায়।

ভারতীয় জীবন-পরিকল্পনার প্রথমেই ছিল যে ব্রহ্মচর্য আশ্রম—তাহাতেই নৈতিক স্বাস্থ্যবান্ শক্তিমান্ জীবনেব ভিত্তি রচিত হইত। দ্বিতীয় গৃহস্থ আশ্রম অন্য সকল আশ্রমের আশ্রয়, আধার, গৃহস্থের দায়িত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী। সদ্ গৃহস্থ না হইলে ভাল সমাজ হয় না। অন্যান্য তিন আশ্রমের ভাল-মন্দ উত্থান-পতন নির্ভর করে গৃহস্থ-আশ্রমের উপর। তবে গৃহস্থ আশ্রমকেই ভারত কোনদিন শেষ বা শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলে নাই, তাহার লক্ষ্য নিহিত সংসারের ঊর্ধ্বে। তাই সংসার-ত্যাগের প্রস্তুতি বানপ্রস্থের পর সন্ন্যাসের নির্দেশ। কোন আশ্রমই উদ্দেশ্য নয়, প্রত্যেকটি শ্রেয়োলাভের উপায় মাত্র।

সংসারত্যাগী প্রকৃত সাধু সমাজের বাহিরে থাকিলেও সমাজের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী। সৎচিন্তা সৎ কাজের মতোই শক্তিশালী। একটি মহৎ চিন্তা করিয়া যদি কোন মহাপুরুষ গুহামধ্যে নীরবে নির্জনে জীবন বিসর্জন করিয়া যান, তাঁহার সেই চিন্তার তরঙ্গ পৃথিবী আবেষ্টন করিয়া কোন উপযুক্ত সমানধর্মাকে আবিষ্ট করিবে এবং সেই চিন্তাকে কার্যে পরিণত করিবে। ঋষি ও মনীষিগণের মহাভাব এইভাবেই সমাজে কিছুটা রূপায়িত হইয়াছে ও হইতেছে।

বাহির হইতে দেখিয়া সাধুকে চেনা যায় না। কত সাধু আছেন যাঁহারা একেবারে অন্তর্মুখী, তাহারা আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন। তাঁহাদের ভাব না বুঝিয়া জোর করিয়া তাঁহাদের বাহ্য কাজে লাগানো ঠিক নয়, তাহার প্রয়োজনও নাই। তাঁহারা তাঁহাদের কল্যাণ-ভাবনা দ্বারাই জগতের মঙ্গল করিয়া যান। একটি বুদ্ধের আবির্ভাবে ত্রিজগৎ আলোকিত হয়। অর্থনীতির মানদণ্ডে তাঁহার জীবনের ও কাজের পরিমাপ কতটুকু? কিন্তু আজ পর্যন্ত সকল মানব তাঁহার নামে মাথা নত করে। কেন? তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া মানুষ নবজীবন লাভ করিয়াছে। এই নবজীবনের সাধনাই সাধুর জীবন-রহস্য। খৃষ্টও বলিতেছেন: Unless ye be born again ye cannot enter the kingdom of Heaven—তোমরা যদি ইহ-জীবনে আবার জন্মগ্রহণ না কর তো স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিবে না। কোথায় সেই স্বর্গ? The kingdom of Heaven is within you—ধ্বনিত হইল খৃষ্টের মুখে। সে স্বর্গরাজ্য আকাশে নয়, মেঘে নয়—তোমাদের হৃদয়ে, তোমাদেরই অন্তরে। এই অন্তর্জীবনের সাধনাই সাধুর সাধনা। ডলার বা টাকা দিয়া তাহার পরিমাপ হয় না, ভবন-নির্মাণে বা প্রতিষ্ঠান-স্থাপনে তাহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। সাধু নিজেই একটি স্থির বা চলমান প্রতিষ্ঠান, সাধু নিজেই অনন্তের উন্মুক্ত গ্রন্থ, সাধু সাগরাভিমুখী স্রোতস্বতী। যে নদী গভীর খাতে প্রবহমাণা তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার কি প্রয়োজন? তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব কি?

সমাজত্যাগী হইয়াও সাধু সমাজসেবী। সাধুই সেই Unsocial Socialist—অসামাজিক সমাজবাদী, যে সমাজে না থাকিয়াও সমাজের কথা ভাবে ও সমাজকে প্রভাবিত করে।

সংসারের দুঃখ-দুর্দশা স্বার্থ-দ্বন্দ্ব ও অনিত্যতা দেখিয়াই বৈরাগ্যযুক্ত সাধক সংসার ত্যাগ করেন। নিজের দুঃখ নিবৃত্ত না করিয়া তিনি কি করিয়া অপরের দুঃখ দূর করিবেন? নিজে শান্তি লাভ না করিয়া তিনি কি করিয়া অপরকে শান্তি দিবেন? জ্ঞানের আলোয় নিজের সংশয় দূর না হইলে তিনি অপরকে পথ দেখাইতে গিয়া কি উভয়েই অন্ধকূপে পড়িবেন? তাই শাস্ত্র সাধক সাধুকে নির্জনে নীরবে সাধনার জীবন যাপন করিতে বলিয়াছেন, যেমন করেন বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক গবেষকগণ। কেহ তাঁহাদের ধ্যান ভাঙায় না, আশা করে তাঁহার আবিষ্কার মানুষের অনেক অভাব দূর করিবে, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বর্ধিত করিবে। শত জনের মধ্যে একজন হয়তো চমকপ্রদ কোন আবিষ্কার করিয়া সমাজের কল্যাণ করেন। প্রকৃত সাধুদের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। বুদ্ধের ছয় বৎসর তপস্যা, খৃষ্টের চল্লিশ দিন উপবাস কি জগতে যুগান্তর আনে নাই?

তাঁহাদের জীবনালোকে উদ্ভাসিত পথেই এতদিন মানব জীবনের জয়যাত্রায় চলিয়াছে নির্ভীক নিশ্চিন্ত চিত্তে। তাঁহাদেরই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া সাধকগণ 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' আত্মনিয়োগ করিয়া ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনে উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু

কালক্রমে সকলই নষ্ট হইয়া যায়। তাই প্রয়োজন নূতনতর ব্যাখ্যার, নূতনতর আলোকের। সাধু ও সাধক কতটা সমাজসেবা করিবে, কিভাবে করিবে, তাহার নির্দেশ আমরা এ যুগে পাইয়াছি শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীতে, স্বামী বিবেকানন্দের ব্যাখ্যায়।

'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'ই সেই মহাবাণী, 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব' তাহারই ব্যাখ্যা। যেখানে মানুষের যা কিছু অভাব আছে, ঈশ্বরার্পিত সেবাবুদ্ধিতে তাহা দূর করার চেষ্টাই সাধনা। সেবাধর্মের এই প্রশস্ত পথের প্রশস্ততা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন স্বামীজী স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন: এ যুগে এক নতুন পথ দেখিয়ে গেলাম, হাজার হাজার লোক এখন এই পথেই চলবে।

কর্মমাত্রই উপাসনা বা সেবা, এই উচ্চতম ভাবের স্তরে উঠিতে গেলে আরও দুইটি স্তর অতিক্রম করিতে হয়: প্রথম—কর্ম এবং উপাসনা, দ্বিতীয়—উপাসনা-বুদ্ধিতে কর্ম, শেষ ও তৃতীয় স্তরে সকল কর্মই উপাসনা, এমনকি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতি স্বাভাবিক কর্মও তখন ঈশ্বরে সমর্পিত। সকল কাজ কর্ম এই আধ্যাত্মিক সেবাবুদ্ধিতে চলিলে তবেই তাহা সাধুর জীবন উত্তরোত্তর উন্নততর অনুভূতিতে আলোকিত করিবে, এবং এই আলোক সমাজেও প্রতিফলিত হইবে। নতুবা শুধু মাত্র ঐহিক কর্ম-বিস্তার এক প্রকার সূক্ষ্ম ভোগ-বিলাস। উহা সাধু ও সমাজ—উভয়কেই গভীরতর অন্ধকারে লইয়া যাইবে, যেখান হইতে প্রত্যাবর্তন অসম্ভব না হইলেও অতি কঠিন।

'ভারতের শেষ শিলা 'পরে—'

[আমেরিকা হইতে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত প্রথম পত্র]

** এই সব দেখে—বিশেষ দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না, একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম—Cape Comorin-এ (কুমারিকা অন্তরীপে) মা কুমারীর মন্দিরে বসে—ভারতবর্ষের শেষ পাথর টুকরার উপর বসে—এই যে আমরা এত জন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি, লোককে metaphysics (দর্শন) শিক্ষা দিচ্চি, এ সব পাগলামি। 'খালি পেটে ধর্ম হয় না।'—গুরুদেব বলতেন না? ঐ যে গরীবগুলো পশুর মত জীবন যাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা। ***

মনে কর, ** যদি কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ ক'রে বেড়ায়, নানা উপায়ে নানা কথা, map, camera, globe (মানচিত্র, ক্যামেরা, গ্লোব) ইত্যাদি সহায়ে আচণ্ডালের উন্নতিকল্পে বেড়ায়, তাহলে কালে মঙ্গল হতে পারে কিনা। এ সমস্ত প্ল্যান আমি এইটুকু চিঠিতে লিখতে পারি না। ফল কথা—If the mountain does not come to Mahomet, Mahomet must come to the mountain. (পাহাড় যদি মহম্মদের নিকট না আসে, মহম্মদ পাহাড়ের নিকট যাবে।) গরীবেরা এত গরীব, তারা স্কুল পাঠশালে আসতে পারে না, আর কবিতা ফবিতা পড়ে তাদের কোনও উপকার নাই।

We as a nation have lost our individuality and that is the cause of all mischief in India We have to give back to the nation its lost individuality and raise the masses (জাতি হিসাবে আমরা আমাদের ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছি, এবং সেইটিই হচ্ছে ভারতের যত অনিষ্টের কারণ। আমাদের কাজ হচ্ছে জাতিকে তার হারানো বৈশিষ্ট্য ফিরিয়ে দেওয়া এবং জনগণকে উন্নত করা।) * * *

Chicago, ১৯শে মার্চ ১৮৯৪

—বিবেকানন্দ

চলার পথে

'যাত্রী'

জগতে মানুষের প্রথম আবির্ভাব—কি ক'রে সম্ভব হ'ল, সে প্রশ্ন এখন নয়। তবে বুদ্ধির বিকাশ ছিল বলেই তার পক্ষে সম্ভব হ'ল এই পৃথিবীতে টিকে থাকা। তা না হ'লে প্রাগৈতিহাসিক মহাশক্তিশালী বৃহদাকার জন্তুদের মধ্যে এই নখ-দন্তহীন পেলব মানুষের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কোথায়? তার এই বুদ্ধি-বিকাশের পথ ধরেই একদিন আবার জাগল তার মনন-ধর্ম, তার 'সময়ের' জ্ঞান—'সময়'কে পরিমাপ করার পন্থাও।

মানুষের নিজের পদযাত্রা, কিংবা নদী ও মেঘের চলার গতি বা আকাশের সূর্য-চন্দ্র-তারকার পরিক্রমার মধ্যে কোন্‌টা যে মানুষের নিভৃত মনের সীমায় এসে তাকে 'সময়ে'র ধারণা ও তার গতির পরিমাপ করতে শিখিয়েছিল, তা আজ নিশ্চয় ক'রে বলা শক্ত। তবে সেই আদিম যুগের কোন এক মহা-'নিউটন্' যখন প্রথম চাকা বা চক্রের আবিষ্কার ক'রে বিজ্ঞান-সভ্যতার আলোক জ্বালল, তখন থেকেই চাকা যে নানান ভাবে গতি-পরিমাপের নির্দেশক হিসাবে ব্যবহৃত হ'তে লাগল, একথা ইতিহাসের আদি-প্রভাতের আলোক-স্বাক্ষরেই চিনতে পারা যায়।

'চক্র' আবিষ্কারের এই মহাবিস্ময়কে ভারত তার প্রাচীন লেখায় ও রেখায়, তার ভাবে ও ভাস্কর্যে চিরস্মরণীয় ক'রে এগিয়ে গেছে। এই অগ্রগমনে, চাকার সম্ভাবনার ঐশ্বর্যকে সাথী ক'রে এল রথ। এবং সেই রথে সে চড়াল সূর্যকে, দেবতাকে, নরপতিকে, সবাইকেই। তাইতো আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে ও পুরাণে, বাস্তবে ও কল্পনায় এত রথের ছড়াছড়ি, এত চক্রের বিবরণ।

এর পরে মানুষ তার দার্শনিক মন নিয়ে দেখা দিল। সে দেখল—এ জগতে সব কিছুই চলেছে, আর সব কিছুই আবার পরে ধ্বংস হ'য়ে যাচ্ছে। কেবল যে জিনিষের বা যে ভাবের উপর ভর ক'রে এই ধ্বংসের লীলা চলছে—সেই 'সময়ে'র কোন ধ্বংস নেই। আর ঐ 'সময়ে'র প্রতীক 'চাকার'ও তাই কোন ধ্বংস নেই। সেইজন্যই একদিন মানুষ তার ঐ চিরস্থির ভগবৎ কল্পনা বা বিশ্বাসকেও 'চাকা'র সঙ্গে বেঁধে দিল। ফলে উদ্ভব হ'ল নানা দেব-মহিমার। এই রকম এক দেবমহিমার ইঙ্গিতেই সৃষ্টি হয়েছে জগন্নাথের রথ।

এই নীলাচলনাথ দারুব্রহ্মকে কেন্দ্র ক'রেই রথযাত্রার মাহাত্ম্য ফুটে রয়েছে। অক্ষয় তৃতীয়ায় 'চন্দন যাত্রা', জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় স্নানাভিষেক, শুক্লা প্রতিপদে নেত্রোৎসব বা নবযৌবন এবং দ্বিতীয়া তিথিতে রথারোহণ ও রথযাত্রা—এই নিয়েই শ্রীক্ষেত্রের উৎসব-মহিমা মুখরিত হ'য়ে ওঠে। শুধু রথে জগন্নাথ দেখায় নয়, পুরুষোত্তম বা শ্রীক্ষেত্র-পুরীর জলে স্থলে আকাশে বিশ্বাসীর মুক্তি নিশ্চিত। তীর্থ মাহাত্ম্যের পুস্তকাদিতে আছে—দ্বারকায় জলে মুক্তি হয়, বারাণসীতে জলে এবং স্থলে, কিন্তু সর্ব-তীর্থসার শ্রীক্ষেত্রে জলে স্থলে ও আকাশে মুক্তি হয় (দ্বারাবত্যাং জলে মুক্তির্বারাণস্যাং জলে স্থলে। জলে স্থলে চান্তরীক্ষে মুক্তিঃ স্যাৎ পুরুষোত্তমে ॥)।

*　　*　　*　　*

শ্রীজগন্নাথ যে ঠিক কোন্ দেবতা, তা নিয়ে এক এক সম্প্রদায়ের এক এক মত। কেউ বলেন, এটি বিষ্ণুমূর্তি, কেউ বলেন, শক্তিমূর্তি, আবার কানিংহাম্ প্রমুখ পুরাতত্ত্ববিদদের মতে

ইহা বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের ত্রিমূর্তি। বৈদান্তিকদের মতে আবার ওঁকারের (অ+উ+ম) প্রতীক। জগন্নাথের প্রসাদকে 'মহাপ্রসাদ' বলায় এবং বিষ্ণুর কোন কোন ভোগে আদা ও মাষকলাই-এর পিঠা দেওয়ার রীতি চালু থাকায় শাক্তরা এঁকে শক্তিমূর্তি বলতে চান। শোনা যায় প্রথমে ব্রহ্মমন্ত্রে অর্চনা ক'রে পরে দক্ষিণাকালিকামন্ত্রে শ্রীজগন্নাথের, শিবমন্ত্রে বলভদ্রের এবং ভুবনেশ্বরীমন্ত্রে সুভদ্রার পূজা করা হয়। অনেকের মতে, বৌদ্ধ যুগে শক্তিমূর্তি নষ্ট হ'য়ে যাওয়ায় শ্রীশঙ্করাচার্য দারুমূর্তি তৈরী ক'রে গোবর্ধন মঠ স্থাপন করেন। এখানকার পুরাতন মন্দিরের ভগ্নাবশেষের উপর অনেক বারই মন্দির তৈরী হয়েছে। বর্তমান মন্দির তৈরী করান যযাতি কেশরী—মন্দিরে রক্ষিত 'মাদলা' পাঁজি সেইরূপ নির্দেশই দেয়।

সূর্যের বা সূর্যরথের দক্ষিণায়নে যাত্রাই অনেকের মতে রথযাত্রা-উৎসবের মূল কথা। আবার কতদূর সত্য জানি না, শোনা যায়—শ্রীবুদ্ধ বোধগয়ায় তপস্যার সময় একজন চাষীর বাড়িতে রোজ ভিক্ষান্ন গ্রহণ করতে যেতেন। এই চাষীর স্ত্রীকে তিনি নাকি সম্বোধন করতেন 'মাসী' ব'লে। বুদ্ধত্ব লাভের পর কয়েকদিন শ্রীবুদ্ধ তথায় ভিক্ষাগ্রহণে না যাওয়ায় ঐ চাষী তাঁর খোঁজে এসে তাঁকে গাড়ী ক'রে নিজের আবাসে নিয়ে যান। সেই থেকেই নাকি 'মাসীর বাড়ীতে যাওয়ার' বা রথযাত্রার আরম্ভ।

প্রাচীন ঋগ্‌বেদেও দারুব্রহ্মের কথা আছেঃ আদো (আদো) যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃ (সিংধোঃ) পারে অপুরুষং। তদালভস্ব (তদা রভস্ব) দুর্দানোতেন (দুর্হণো তেন) যাহি (গচ্ছ) পরমস্থলম্ (পরস্তরং) ॥ (ঋ ১০।১৫৫।৩)—অর্থাৎ দারুময় পুরুষোত্তমাখ্য দেবতার উপাসনা করলে যে পরমপদ লাভ হয়, একথা সায়ণাচার্য তাঁর ভাষ্যেও উল্লেখ করেছেন।

স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডে এবং ব্রহ্মপুরাণেও জগন্নাথদেবের আবির্ভাব-বিষয়ে নানা কথা আছে। শূদ্রমুনি সারদাদাস-লিখিত মহাভারতে আছে—শ্রীকৃষ্ণের শরীর যাওয়ার পর তাঁর পূতদেহ অর্জুন দাহ করতে অসমর্থ হন। তখন দৈববাণী শুনে ঐ দেহ সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলেন এবং সেই দেহই পরে জগন্নাথরূপে পূজিত হচ্ছেন। যামল-তন্ত্রশাস্ত্রে বর্ণনা পাওয়া যায়—বিমলা দেবী ও জগন্নাথ ভৈরব—(উৎকলে নাভিদেশশ্চ বিরজাক্ষেত্রমুচ্যতে। বিমলা চ মহাদেবী জগন্নাথস্তু ভৈরবঃ ॥)।

যাই হোক্, এতক্ষণ তো আম খেতে এসে ডালপালার হিসাব নিতেই কেটে গেল। কিন্তু এই হিসাবের মধ্যে এইটুকু অন্ততঃ জানা গেল—জগন্নাথদেবের আরাধনা অতি পবিত্র ও প্রাচীন। সেই প্রাচীনত্বের মহোৎসবে চল পথিক, আমরা আমাদের উপনিষদুক্ত মনোরথের দেবতাকে স্নান করিয়ে নিয়ে জ্যোতির্ময় পথের পাথেয় সঞ্চয় করি। এস পথিক, মনের জড়তা ঘুচিয়ে জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করি—'তোমার মাঝে আমার আপনারে দেখতে দাও।' জেনে রেখো বুদ্ধি-সারথিকে ঠিক রেখে মনোরথের ঐ বামনকে দেখলেই আর পুনর্জন্ম হবে না। চল পথিক, সেই রথের পথেই এগিয়ে চল। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

'শস্যমিব মর্ত্যঃ—

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

কবিগণ, ঔপন্যাসিক-শিল্পী-দার্শনিকগণ মানুষকে কত কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তুর সহিত তুলনা করিয়াছেন, কত ভাবে তাহার সৌন্দর্য অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার গুণ ও মহিমা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু কঠোপনিষদের নায়ক নচিকেতার কি বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল? সেই সব বিদগ্ধ উপমা ও কাহিনীর কোনটাই মনে পড়িল না, মুখ দিয়া বেপরোয়া ভাবে শুধু বাহির হইল—'শস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে...।' অর্থাৎ ভারী তো গুণপনা মানুষের। ধান বা যবের একটি ডাঁটা যাহা, মানুষও তাহাই। দুদিন মাথা তুলিয়া দাঁড়ানো, হাওয়ার স্পর্শে মাথা দোলানো, তিন দিনের দিন ঢলিয়া পড়া, চতুর্থ দিনে পচিয়া যাওয়া। কিন্তু লজ্জা নাই, 'শস্যমিবাজায়তে পুনঃ'। আবার বৎসরান্তে ঐ ধান-যব-তিল-সরিষার মতো উত্থান-পতন-পচনের ডামাডোল তুলিবার জন্য রঙ্গমঞ্চে পুনঃপ্রবেশ। এই তোমার মানুষ—তোমার শশাঙ্কবদন ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ সিংহবিক্রম সূর্যপ্রভ মহীপতি মানুষ! পুঁথির পর পুঁথি লিখিয়া মানুষকে যত প্রচারই কর, তুলির পর তুলি ভাঙিয়া তাহার ছবিতে যত রংই চড়াও—দিবাশেষে তাহার মাথা যাহাতে না ঢলিয়া পড়ে, সেই ব্যবস্থাটিই তো করিতে পারিলে না। এলাইয়া পড়া দেহটা যাহাতে পচিয়া না যায়—এমন কোন ফিকিরও তো জানা গেল না। তাহা হইলে তৃণগাছটির সহিত মানুষকে এক পর্যায়ে বসাইয়া ভুল করিয়াছি কি?

কঠোপনিষদের বর্ণনায় নচিকেতা একজন বালক। 'তং হ কুমারং...'—কুমার বয়স। শঙ্করাচার্য 'কুমার' শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—'অপ্রাপ্তপ্রজননশক্তিং'—বীর্য পরিপক্ক হয় নাই অর্থাৎ একেবারেই ছেলেমানুষ। বালকের মুখে মানুষ-সম্বন্ধে এত বড় একটা কটূক্তি শুনিতে ভাল লাগে না, মিষ্ট তো নয়ই। কিন্তু তবুও উপনিষদ্ এই বালক নায়কের মুখ দিয়া আমাদিগকে বক্তৃতা না শুনাইয়া ছাড়িবেন না। নায়কের সম্বন্ধে বলিতেছেন—'শ্রদ্ধা আবিবেশ।' ছেলেমানুষ হইলেও সে একটি আশ্চর্য গুণের অধিকারী ছিল। গুণটির নাম 'শ্রদ্ধা'। শ্রদ্ধার অর্থ আর যাহাই হউক উহাতে প্রগল্ভতা যে নাই, তাহা সুনিশ্চিত। যে শ্রদ্ধাবান্ সে হাস্য মন্তব্য করে না। তাহার কথার পশ্চাতে একটি দৃঢ় প্রত্যয়—একটি প্রগাঢ় বিশ্বাস নিহিত থাকে। ছেলেমানুষ হইলেও নচিকেতার ভিতর সত্যকারের শ্রদ্ধা ছিল—ইহা বলিয়া উপনিষদ্ যেন প্রমাণ করিতে চান যে 'শস্যমিব' কথাটি একটি চটুল বাক্য-বিন্যাস নয়। ছেলেমানুষের মুখ দিয়া গভীরতম জীবন-দর্শন বাহির হইয়া আসিয়াছে। মানুষকে যদি একটি জৈবিক প্রাণী-মাত্র মনে কর, তাহা হইলে এই সংসারের নাট্যমঞ্চে মানুষের নাচা-কোঁদা একটি ধান বা যব গাছের জীবন-চক্রের অতিরিক্ত কিছু নয়। একটি পুংবীজাণু এবং একটি ডিম্বাণুর সম্মিলন মানুষের জীবনের মূলে, ধান বা যব গাছটিরও মূলে। এই সম্মিলনের ফলে উৎপন্ন সেই আদিম জীবকোষটি হইতে শুরু করিয়া পর পর যাহা কিছু ঘটে তাহাদের উদ্দেশ্য মানুষের এবং তৃণের ক্ষেত্রে একটুও

আলাদা নয়। উদ্দেশ্য—জীবনের উৎস্ফূর্তি রক্ষা ও পরিবিস্তার।

বর্ষা কাটিয়া গেলে ঐ শস্যক্ষেত্রটির দিকে একবার চাহিয়া দেখ। লক্ষ লক্ষ ছোট গাছগুলি কী দুর্জয় আকাঙ্ক্ষা লইয়া তরতর করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে, প্রত্যেকটি তৃণদেহে কী উচ্ছল আবেগ, কী অক্লান্ত উন্মাদনা। সে মূক, কিন্তু কিছুক্ষণ চাহিয়া থাক—চোখ দিয়াই তাহার আনন্দোদ্বেল ভাষা শুনিতে পাইবে। সে যেন বলিতেছে: আমি আসিয়াছি বহুদিনের অসাড় নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়াছি, প্রাণ-প্রবাহে সঞ্জীবিত হইয়া নিজেকে বিকশিত করিয়াছি ও করিতেছি, এই বিকাশেই আমার আনন্দ। কতদিন বাঁচিব জানি না, জানিতেও চাই না। বাঁচিয়া যে আছি, ইহাতেই আমি ধন্য। জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত আমি প্রাণের পাত্রখানি পান করিয়া বিভোর। যখন মরিব, আমার বিলীয়মান প্রাণ অন্যরূপে রাখিয়া যাইব বীজের মধ্যে—আমার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার মধ্যে। অতএব মৃত্যুতেই বা দুঃখিত হইবার কি আছে?

মানুষ যেখানে একটি জৈবিক সত্তা, সেখানে তাহার অন্তরবাণী ইহাই, দেহে বাঁচিয়া থাকার আনন্দ, দেহকে পরিপুষ্ট সুস্থ পরিতুষ্ট রাখিবার আনন্দ এবং দেহ চলিয়া গেলেও দেহের নমুনা যাহাতে থাকিয়া যায় তাহা সম্পাদনের আনন্দ,—এই আনন্দগুলির নিবিড় উপলব্ধিতেই মানুষের সার্থকতা। মানুষের যত রূপ, যত শক্তি, যত উৎসাহ আবেগ, যত ব্যঞ্জনা সকলই এই জৈবিক লক্ষ্যকে কেন্দ্র করিয়া। যতক্ষণ মানুষ তাহার জৈবিক সত্তাকে অতিক্রম করিতে না পারিতেছে—ততক্ষণ তাহার বিদ্যাবুদ্ধি, কাব্য-সাহিত্য, কারুকলা, সংস্কৃতি-সভ্যতা—এ সবও ঐ জৈবিক লক্ষ্যের অধীন। প্রাণের এলাকায় মানুষ সত্যই ধানগাছ-সরিষাগাছের শামিল। আহার, নিদ্রা, ভয়, বংশবিস্তার—ইহাই প্রাণের রাজ্যে কর্মনীতি। এই নীতি মানিয়া, পূর্ণ করিয়া ঐ শস্যক্ষেত্রের লক্ষ লক্ষ উদ্ভিদের জীবন সার্থক হইতেছে। লক্ষ লক্ষ কীটপতঙ্গ পশু-পক্ষীও সহজ ও স্বাভাবিকভাবে এই নীতি গ্রহণ করিয়া জীবনের জয় ঘোষণা করিতেছে। দাম্ভিক মানুষ, তুমি কি বলিতে চাও তুমি ইহার ব্যতিক্রম? না, একটুও নও। তোমার শত শত শতাব্দীর মানসিক ক্রমবিকাশ, তোমার সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন সত্ত্বেও তুমি একান্তই একটি জৈবিক সত্তা। ক্ষুধা—বাঁচিবার এবং নিজকে বিস্তার করিবার অপ্রতিরোধ্য ক্ষুধাই তোমার স্বধর্ম। না, তোমাতে আর ধান-যব-কলাইগাছে, মশা-মাছি-কুকুর-বিড়ালে কোনও পার্থক্য নাই। প্রাণের পতাকা বহিয়া, প্রাণের জয়গান গাহিয়া জীবনযাপনই তোমাদের জীবন-লক্ষ্য। এই জীবন-লক্ষ্য যে প্রাণী যে পরিমাণে সফল করিতে পারে, সেই পরিমাণে সে আনন্দও লাভ করিতে থাকে। তৃণলতা-বনস্পতি-পশুপক্ষী-কীটপতঙ্গের জীব-সত্তা কাটাইবার কোনও প্রশ্ন নাই। জৈবিক জীবনই তাহাদের উপেয়, জৈবিক জীবনই তাহাদের উপায়। তাই তাহাদের আনন্দে কখনও কমতি নাই।

মানুষের ক্ষেত্রে একটু গোল বাধায় 'বিবেক' নামক একটি বস্তু। এ বস্তুটি যে কি তাহা বুঝিয়া উঠা মুস্কিল। তবে মানুষের রীতি হইল ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া। কবিরা দার্শনিকরা 'বিবেক' সম্বন্ধে কত কথাই না লিখিয়াছেন। অবশ্য 'বিবেক' মানুষের অহঙ্কারকে তো একটু পুষ্ট করেই, বিবেকের প্রেরণায় মানুষ বলে: আমি কেন গাছপালা-পশুপক্ষীর সমপর্যায়ে পড়িব? আমি মানুষ—মান হুঁশ,

অর্থাৎ আমার মানের—কিনা মহিমার হুঁশ হইয়াছে। আমি বিবেকী। আমার মন-বুদ্ধির উর্ধ্বতর বিকাশ আছে।—আমার কাব্য আছে, শিক্ষাদীক্ষা আছে, শিল্প-বিজ্ঞান আছে, পরিবার, সমাজ, জাতীয়তা, কৃষ্টি আছে। আমি কেন 'শস্যমিব' হইতে যাইব?

কিন্তু মানুষের এই অহঙ্কার যে কত ঠুনকা তাহার প্রমাণ মানুষেরই পুরাণ-ইতিহাসে কথা-কাহিনীতে ভূরিভূরি লিপিবদ্ধ আছে এবং লিপি-বদ্ধ হইতেছে। কত সহজেই না এক নিমিষে মানুষের শিক্ষা-সভ্যতার মুখোশ খসিয়া পড়ে এবং তাহার নগ্ন জৈবিক রূপটি প্রকাশ পায়। আমরা লজ্জিত হই, বলি—কী আশ্চর্য! অলক্ষ্যে সৃষ্টিকর্তা কিন্তু হাসেন। তিনি জানেন ইহা তো মোটেই আশ্চর্য নয়। ইহাই তো মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। মানুষ যে জীব। 'আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনে'র একনিষ্ঠ অধীনতার নামই তো জীবত্ব। মানুষ তাহার জীবন্ত দেহটার সহিত যতক্ষণ জড়াইয়া আছে, ততক্ষণ তাহার মুখে শিক্ষা-সংস্কৃতির বুলি একান্তই টিয়াপাখীর মুখে রামনামের মতো। শুনিতে ভালো, কিন্তু যতক্ষণ হুলো বিড়ালটি না আসে। সে আসিলে টিয়াপাখী রামনাম ভুলিয়া ভয়ে টঁ্যা টঁ্যা শুরু করে। জৈবিক প্রাণের একটি সবল হুঙ্কারে সংস্কৃতিমান্ সুসভ্য বিবেকী মানুষ যে আচরণ আরম্ভ করে, তাহা কখনও কখনও পশুপক্ষী-গাছপালাদের চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট। বালক নচিকেতা খাঁটি কথাই বলিয়াছেন—'শস্যমিব'।

* * *

দেহ—এই অতি প্রিয় জীবন্ত দেহটির সহিত যতক্ষণ আমি মিশিয়া আছি, ততক্ষণ প্রাণের ঝাণ্ডা বহন করিয়া উহার জিন্দাবাদ ঘোষণা করা ছাড়া আমার গত্যন্তর নাই। যত কবিতাই লিখি, যত ছবিই আঁকি, যত বক্তৃতাই দিই—তাহা শুধু শব্দবিন্যাস, বর্ণবিন্যাস। আসলে আমি একটি জৈবিক প্রাণী। স্থূল জৈবিক ক্ষুধার পরিপূর্তিই আমার ধর্ম। এই অপ্রত্যাখ্যেয় সত্যটি সহজভাবে স্বীকার করিয়া লইলে আমার অহঙ্কারে আঘাত লাগে বটে, কিন্তু আমি সমাজের একটি মহৎ কল্যাণ সাধন করি। কেননা যাহা স্পষ্ট তাহাতে বিপদ নাই। যাহা কুয়াসায় ঘেরা সেখানেই সংশয় সৃষ্টি। বাহিরে সভ্যতার মুখোশ লাগাইয়া বর্বর মানুষ মানুষের ইতিহাসে কত দুরপনেয় কলঙ্ক রাখিয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে, তাহা গুনিয়া শেষ করা যায় কি?

অসুরদেব রাজা বিরোচনকে বরং প্রশংসা করিতে হয়। পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপদেশ শুনিলেন, কিন্তু ঐ উপদেশের ব্যাখ্যা নিজের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে নিজেই করিয়া লইলেন: "আত্মৈবেহ মহয্য আত্মা পরিচর্য আত্মানমেবেহ মহয়ন্ আত্মানং পরিচরন্নুভৌ লোকাববাপ্নোতীমং চামুং চেতি।" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৮।৮।৪) —'এই দেহটিই মহনীয় পরম সত্য। ইহারই পরিচর্যা একমাত্র কর্তব্য। দেহকে মহিমান্বিত করিয়া দেহের সেবা করিয়া আমরা ইহলোক ও পরলোক—উভয় লোকে যাহা কিছু কাম্য সব লাভ করিব।' এই 'আসুর' দর্শনে কোনও অস্পষ্টতা নাই। যতক্ষণ দেহের অতিরিক্ত অন্য কিছু ধরিতে বুঝিতে না পারিতেছি ততক্ষণ এই দর্শনেই তো আমার হৃদয়-মনের সকল আকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। তাহা হইলে সহজভাবে ইহাকে স্বীকার করিতে লজ্জা কিসের? বিরোচনের কিছুমাত্র লজ্জা-সঙ্কোচ ছিল না। তিনি নিঃসংশয়ে তাঁহার অনুবর্তীদের মধ্যে ঐ দর্শন প্রচার করিয়াছিলেন। বিরোচনের সততায় সন্দেহ নাই। তাঁহার মধ্যে ভণ্ডামি ছিল না।

যদি বিরোচনের 'আসুর' দর্শনের প্রতিবাদ

করিতে হয়, তাহা হইলে শুধু কথার জাল বুনিয়া উহা সম্ভবপর নয়। দেহের আসক্তি ও আনন্দ এক তিল ছাড়িব না, আর মুখে বলিব মানুষ হেন, মানুষ তেন—ইহা মিথ্যাচার। আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুন ব্যতিরিক্ত মানুষের অপর কোন ধর্ম যদি আবিষ্কার করিতে হয়, তাহা হইলে সমস্ত জৈব প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিবার সাহস আনিতে হইবে। উপায়ান্তর নাই। '—এই বসুধার মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারংবার'—এই গান সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে অচল। মৃত্তিকার পাত্র পশুপক্ষীও ভরিতেছে, উদ্ভিদ্‌রাও ভরিতেছে—জৈব জীবনের আনন্দরস পান করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। মানুষ, তুমিও যদি তাহাই ভরিবে, বিবোচনের মতো খোলাখুলি ভরিয়া যাও, আপত্তি নাই। কিন্তু বালক নচিকেতা যদি কটূক্তি করে—'শস্যমিব', তাহা হইলে বেজার হইও না। বালক সত্যকথাই বলিয়াছে।

তবে সে তো বলে নাই যে মানুষের সম্বন্ধে ইহাই শেষ কথা। 'শস্যত্ব' জৈব মানুষের লক্ষণ, কিন্তু সত্য মানুষের পরিচয় নিশ্চিতই নয়। মানুষ 'শস্যত্ব'কে অতিক্রম করিতে পারে। 'শস্যত্ব' তাহার অজ্ঞান-দশার পরিচয়। মানুষ অজ্ঞানকে দূর করিয়া প্রাণাধীনতা কাটাইয়া উঠিতে পারে, নিজের এমন এক ভাস্বর স্বচ্ছ চিরন্তন সত্যে দাঁড়াইতে পারে, যেখানে সে আর 'জীব' নয়—'আহার-নিদ্রা-ভয় মৈথুন' যেখানে অনেক পিছনে পড়িয়া থাকে। নচিকেতার কটূক্তির উদ্দেশ্য মানুষের হৃদয়ে তাহার জীবত্বের বন্ধন সম্বন্ধে একটা সচেতনতা উদ্বুদ্ধ করা। দুদিনের জন্য বাঁচা, বাঁচিবার জন্য অজস্র প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম করা, আর তাহার পর চতুর্থ দিনে একটি অনির্জ্ঞাত বিস্মৃতির মধ্যে তিরোহিত হওয়া—এই চিরাচরিত জীবনচক্রের মধ্যে যে একটি ঘৃণাকর গ্লানি রহিয়াছে, কোন এক শুভ মুহূর্তে মানুষ তাহা বুঝিতে পারে। তখন সে প্রাণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দেহ মৃত্যুর অধীন, কিন্তু অপত্যের মধ্যে মানুষ তো বাঁচিয়া থাকে, অতএব গ্লানি কিসের? —এই অমরতার ভুয়া আশ্বাস তখন তাহাকে তুষ্ট রাখিতে পারে না। জৈবিক জীবনের সর্বতো-ব্যাপ্ত বন্ধন তাহার নিকট অসহ্য বোধ হয়। এই অসহ্যতার নাম বৈরাগ্য। বৈরাগ্য গৃহে ফিরিয়া যাইবার সঙ্গীত। এই সঙ্গীত জীবনে নামিয়া আসিলে মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতার আরম্ভ হয়।

মানুষ সত্যই শস্যের শামিল নয়, কিন্তু কোন্ পটভূমিকায়? দেহের পটভূমিকায় নিশ্চিতই নয়। মানুষের মহত্তর পরিচয় তাহার আত্মসত্যে। এই পরিচয়ে মানুষ তাহার জৈবিক প্রকৃতি হইতে বহুগুণে বড়। মানুষের আত্মা চিরদিন রহিয়াছে। পিতামাতার শুক্র-শোণিতের মধ্য দিয়া যে অস্তিত্ব-লাভ, জৈবিক প্রকৃতির নিয়মে সেই অস্তিত্বের যে ক্রমাভিব্যক্তি ও পরিবিস্তার তাহা যত মহিমান্বিতই হউক, তাহাতে যত আনন্দই থাকুক তাহা দেহের অস্তিত্ব—আত্মার জন্মহীন মৃত্যুহীন চিরন্তন অস্তিত্বের তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎকর। জীবপ্রকৃতিতে যে সৌন্দর্য, যে শক্তি, যে উচ্ছলতা দেখি তাহা আবির্ভাব-তিরোভাবের অধীন এবং মোহ-ভয়-সংশয়াবৃত, তাহাতে পরম কল্যাণ নিহিত নাই। পরম কল্যাণ আসে আত্মসত্য হইতে, আত্মসত্যে দাঁড়াইতে পারিলে বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত বিভব পৃথক্ পৃথক্ আয়ত্ত করিবার আর প্রয়োজন হয় না। আত্মার নাম ভূমা—বৃহৎ। আত্মাকে লাভ করা মানে—যেখানে যাহা কিছু আছে সকলকেই পাওয়া। মানবাত্মা শূন্য নন, পূর্ণ।

যে শিল্প, যে সাহিত্য, যে দর্শন মানুষের এই চিরন্তন সত্যের পরিচয় লাভ করিয়াছে তাহাই

প্রকৃতপক্ষে সার্থক। যে সংস্কৃতি মানুষের এই নিষ্কলঙ্ক মহিমার উপর প্রতিষ্ঠিত সেই সংস্কৃতিই ধন্য।

মানুষ যতক্ষণ নিজের চরম ভূমা সত্যকে জানে নাই, ততক্ষণ সে 'অল্প', তাহার জীবন *ততক্ষণ জন্মমৃত্যুময় 'অল্পে'র জীবন। পক্ষান্তরে* যখন সে নিজের শাশ্বত সত্যকে আবিষ্কার করে, তখনই সে যথার্থ মানুষ—পশুপক্ষী-তৃণ-বনস্পতি-লক্ষিত অখিল জীবপ্রকৃতির ঊর্ধ্বে অনন্ত মহিমার অধিকারী। তখন আর তাহার সম্বন্ধে বলা চলে না—'শস্যমিব পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ'। তখন তাহার গুণ ও ঐশ্বর্য বর্ণনা করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মাতা সরস্বতী পর্যন্ত কলম উঁচু করিয়া নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকেন। শ্রেষ্ঠ চিত্রকর তাহার সমস্ত কলা-*কৌশল ও রং-এর পুঁজি নিঃশেষ করিয়াও সেই* মানুষের ছবি আঁকিতে পারেন না।

সেই মানুষই এই পৃথিবীর দীপ্তি—অমর্ত্য অপূর্ব, অনুপম।

কে তুমি ?

শ্রীমতী উমারাণী দেবী

এ বিশ্বের দুঃখে সুখে বেদনা-বিষাদে,
কে তুমি ফিরিছ সদা সঙ্গোপনে সাথে
আমার জীবন ভরি' হৃদয়ে বাহিরে—
তোমারি পরশখানি সযতনে ঘিরে ?
কে তুমি দিবসে রাতে ধূসর সন্ধ্যায়—
বিজনে নির্জনে, ঘোর আঁধার অমায়,
আমারি কায়ার পাশে ছায়ায় ছায়ায়
ফিরিছ প্রিয় হে মোর, দরদী পরম ?
জীবন ঘিরিয়া আসে দুর্যোগ চরম,
সহস্র সংঘাত হায় চাহে বিনাশিতে,
কে তুমি আড়ালে থাকি করকমলেতে
আমারে ধরিয়া থাকো, বুঝি শুধু তাই।
পথ যবে মুছে যায়, যেদিকে তাকাই
দিগন্ত নিরাশা ঢাকা কুয়াশা গহন,
বিষণ্ণ বিচ্ছিন্ন হিয়া শ্রান্ত প্রাণমন,
চলিতে চাহে না পদ। কে তুমি আমার
অলখে লইয়া চল ঠেলিয়া আঁধার,
সে কোন্ আলোক পানে সম্মুখে সুদূর,
তোমারি আহ্বান শুধু—আহ্বান মধুর !

এ সংসার-প্রাঙ্গণের শত মায়াডোর
যতনে জড়ায়ে রাখি অন্তরেতে মোর,
নিবিড় প্রাণের আকর্ষণে। হেরি কোন্
নিঠুর খেলায় হায় সকল বন্ধন
ছিঁড়ে যায় একে একে। আকুল ক্রন্দন
ওঠে বক্ষ ভেদি', সর্বহারা বেদনায়
বিস্মিত বিহ্বল স্বরে—কে তুমি আমায়
অলখে দাঁড়ায়ে ডাকি' কহ স্নিগ্ধ স্বরে :
"ক্ষণিক সংসার কভু নহে তার তরে
হয় যে আমার। রিক্ত নিঃস্ব বিশ্বমাঝে
করিয়া তাহায়, আমি রহি তার কাছে।
আমি শুধু আছি ওরে, আর কিছু নাই।
চাহি এই সত্য শুধু বুঝাইতে, তাই
কাঁদাই তাহারে অহরহ। মোর পানে
চাহিলে চিনিবে জানি আপনার জ্ঞানে
স্বরূপ আমার। আমি অপরূপ, আমি
রূপে ও অরূপে শোন—আমি বিশ্বস্বামী,
অন্তরেতে অনাহত আহ্বান আমার—
সত্য শিব সুন্দরের 'সোহম্' ঝঙ্কার।"

বিশ্বজনীন সহনশীলতা

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায

নরেন্দ্রনাথ আঠারো বছরের যুবক। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। চেহারায় পুরুষোচিত সৌন্দর্য। যখন গান করেন কণ্ঠে সুধা ঝরে। তারুণ্যের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। এ হেন নবেন্দ্রনাথকে ঠাকুর প্রথম দেখলেন সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের গৃহে। তখন নভেম্বর মাস, ১৮৮১ খৃঃ। প্রথম দৃষ্টিতেই ঠাকুব চিনলেন নরেন্দ্রনাথকে। এই তো সেই সপ্ত ঋষির একজন—ধ্যানের মধ্যে ছিলেন ডুবে। সেই জ্যোতির্লোক দেবলোকেরও ঊর্ধ্বে। ধ্যানস্থ ঋষিদের পুণ্যচ্ছটায় দেবতাদের মহিমাও নিষ্প্রভ। মধুর কণ্ঠে ডেকে ডেকে এই ঋষিরই ধ্যান ভাঙিয়েছিলেন তিনি। সমাধিভূমি থেকে ঋষির মনকে নামিয়ে এনেছিলেন মর্ত্যলোকে। বলেছিলেন, 'আমি অবতীর্ণ হ'তে চলেছি। তোমাকেও যেতে হবে আমার সঙ্গে'। মধুব হাসি হেসে ঋষি সম্মতি জ্ঞাপন কবেছিলেন।

ঠাকুরের আহ্বানেই নরেন্দ্রনাথের আগমন। মানুষের দেহ নিয়ে যুগে যুগে ঈশ্বর আসেন পৃথিবীতে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে। 'ধর্ম' শুধু বিশ্বাসের ব্যাপার নয়, বিচার-বুদ্ধির ব্যাপার নয়, ধর্ম প্রত্যক্ষ অনুভূতিব বিষয়। ধর্ম হচ্ছে ঈশ্বরের মধ্যে আমাদেব যে অনির্বচনীয় আনন্দ রয়েছে, সেই আনন্দকে সরাসরি আস্বাদন করার ব্যাপার। যেখানে ভগবৎ-মাধুর্যরস আস্বাদনের ব্যাপার নেই—সেখানে পাণ্ডিত্য থাকতে পারে, নৈতিক চরিত্রবল থাকতে পারে, কিন্তু ধর্ম নেই।

ঠাকুর এসেছিলেন সেই আনন্দলোকের বার্তা বহন ক'রে—যেখানে মানুষের সমস্ত পিপাসার অবসান, সমস্ত দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি। তিনি তো শুধু ভারতের জন্যে আসেননি, তিনি এসেছিলেন সমস্ত মানবজাতির জন্যে। সকল দেশেব সকল সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্যে তাঁর হৃদয়ে ব্যাকুলতাব অন্ত ছিল না। সেই জন্যেই তো কোন পথকেই তিনি বাদ দেননি, পবমসত্যের শিখরদেশে আরোহণ করেছিলেন সাধনার বিচিত্র পথে। সাধনাব পথে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যে তাঁর গুরুর আসনে দেখা দিয়েছেন কখনও ভৈরবী ব্রাহ্মণী, কখনও তোতাপুবী। তোতাপুরীর পথ আর ব্রাহ্মণীর পথ এক নয়। কিন্তু সব পথ রামকৃষ্ণের পথ। তিনি কেবল ভারতবর্ষের নন, সমস্ত বিশ্বের। এই সত্যকেই ব্যক্ত করতে গিয়ে ভগ্নী নিবেদিতা লিখেছেন: But it is not true that he expresses the mind of India alone, or even chiefly. For in him meet the feeling and thought of all mankind, and he, Ramkrishna, the devotee of Kali, represents Humanity.—সমগ্র মানব-পরিবারের অনুভূতি আর চিন্তা মিলিত হয়েছে তাঁর মধ্যে। বামকৃষ্ণ মানবতার প্রতীক।

ঠাকুর বললেন, 'বিচার-বুদ্ধিতে বজ্রাঘাত হোক্।' অনন্ত ঈশ্বরকে কি বিচার ক'রে জানা যায়? দরকার কি 'ঈশ্বর সাকার, না নিরাকার' এই নিয়ে বাদানুবাদে? অবতারবাদ সত্য কি মিথ্যা—এই নিয়ে তর্কের ধূলি উড়িয়েই বা লাভ কি? দরকার ঈশ্বরকে পাওয়া নিয়ে। এই পাওয়ার জন্যে প্রয়োজন—ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকা। ঠাকুরের নিজের ভাষায়, 'তাঁতে বিশ্বাস

থাকা আর শরণাগত হওয়া, এ দুটি দরকার।' ধর্মের মর্ম কথাটি হ'ল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। ঈশ্বরকে নিরাকার ব'লে ধারণা থাকলেও এ অভিজ্ঞতা সম্ভব, সাকার ব'লে বিশ্বাস থাকলেও তা সম্ভব। ঠাকুর বলতেন, 'ব্যাকুল হয়ে সাকারবাদীর পথেই যাও, আর নিরাকারবাদীর পথেই যাও—তাঁকেই পাবে। মিছরির রুটি সিধে করেই খাও, আর আড করেই খাও—মিষ্ট লাগবে।' ঈশ্বরকে আস্বাদন করতে হ'লে অবতারবাদ যে মানতেই হবে, এমন কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। ঠাকুর ডাক্তার সরকারকে বলেছিলেন, 'তোমার ছেলে অমৃত অবতার মানে না। তাতে দোষ কি ?'

মিছরির রুটি সিধে ক'রে ধরা অথবা আড ক'রে ধরাটা বড কথা নয়। বড়ো কথা হ'ল মিছরির রুটি খাওয়া, অর্থাৎ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। 'কাশীর বিষয় পডা, কাশীর বিষয় শুনা, আর কাশী দর্শন অনেক তফাৎ।' ঠাকুর জোর দিয়েছেন কাশী-দেখার উপরে। বড়বাবুর সঙ্গে আলাপ দরকার। তাঁর ক-খানা বাডী, কটা বাগান, কত কোম্পানীর কাগজ, এ আগে জানবার জন্য অত ব্যস্ততা কেন ? ধর্মের রাস্তায় বিচারবুদ্ধিকে ঠাকুর অপরিহার্য পাথেয় ব'লে মনে করতেন না, বই-পড়া জ্ঞান বা পাণ্ডিত্যকে বিশেষ মূল্য দিতেন না। ঈশ্বর বিচারবুদ্ধির অনেক উর্ধ্বে। একসের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে ? মানুষের এক ছটাক বুদ্ধিতে অনন্ত ঈশ্বরকে জানতে যাওয়া ভুল। সুতরাং জ্ঞানবিচারে কাজ কি ? কাজ কি আমগাছের পাতা গুনে ? বাগানে যাও, আম খাও। 'আমার এক পাতকুয়া জলের কি দরকার ? এক ঘটি হলেই খুব হ'ল।' পিঁপড়ের তো চিনির পাহাড়ে দরকার নেই, একটা দুটো দানা হলেই হেউঢেউ হয়ে যায়। ঈশ্বরকে জানা নিয়ে এত ব্যস্ততা কেন ? তাঁকে ঠিক কে জানবে ? দরকার তাঁর মাধুর্য আস্বাদন করা।

ছটাকে বুদ্ধিতে যে অনন্ত ঈশ্বরকে জানা সম্ভব নয়, ঠাকুর তাই বলছেন : 'তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা জোর ক'রে বোলোনা যে তিনি এই হ'তে পারেন, আর এই হ'তে পারেন না।' ঠাকুরের এই মন্তব্যের মধ্যে সমস্তটাই লজিক। একসের ঘটিতে চার সের দুধ ধরে না, সীমাবদ্ধ বুদ্ধির আলোয় অসীমকে জানার যখন কোন উপায় নেই, তখন ঠাকুরের ভাষায় একমাত্র বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে : 'মতুয়ার (Dogmatism) বুদ্ধি কোরো না।'

এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ব'লেই কোন ধর্মবিশ্বাসের প্রতি ঠাকুরের কটাক্ষপাত নেই। ইংরেজী তিনি জানতেন না, বাংলা পুঁথিগত বিদ্যাই বা তাঁর কতটুকু ছিল ? কিন্তু কী মহৎ জীবনের অধিকারী ছিলেন তিনি। স্বামীজীর ভাষায় : Never a word of condemnation for any !—কাউকে মন্দ বলছেন না।

* * *

আজকের এই সমস্যা-কণ্টকিত পৃথিবীতে বিশ্বজনীন সহনশীলতার মহান ভাবটিই তো মানবজাতিকে আসন্ন প্রলয়ের হাত থেকে বাঁচাবার প্রথম অপরিহার্য সোপান। 'The Mission of the Vedanta' বক্তৃতায় স্বামীজী অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন :

No civilisation can grow, unless fanaticism, bloodshed and brutality stop. No civilisation can begin to lift up its head until we look charitably upon one another, and the first step towards that much needed charity is to look charitably and kindly upon the religious convictions of others.

অর্থাৎ ধর্মান্ধতা, রক্তারক্তি, নিষ্ঠুরতা—এ-সবের

অবসান ঘটাতেই হবে, যদি সভ্যতার বিকাশ আমাদের কাম্য হয়। যতদিন না আমরা অন্যের ধর্মবিশ্বাসকে সহানুভূতির চক্ষে দেখতে শিখি, ততদিন সভ্যতার উন্মেষই হ'তে পারে না। অপরের ধর্মমতকে শ্রদ্ধা করবার উদারতাই হচ্ছে আমাদের চিত্তকে প্রসারিত করবার প্রথম সোপান।

স্বামীজীর এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনি টয়েনবীর কণ্ঠে: টেক্‌নলজির দৌলতে ভৌগোলিক দূরত্বের অবসান ঘটেছে একথা সত্য, কিন্তু তা মানুষের সমস্যাগুলিকে আরও জটিল ক'রে তুলেছে। যারা পরস্পরের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, নিমেষে তাদের মুখোমুখী ক'রে দিতে পারে টেক্‌নলজির যাদু। কিন্তু শরীরকে শরীরের নিকটে আনা যত সহজ, অন্তরের সঙ্গে অন্তরকে মিলিয়ে দেওয়া—মনের সঙ্গে মনের পরিচয় ঘটানো নিশ্চয়ই তত সহজ নয়। অনেক সময় লেগে যায় আর একজনের মনকে ঠিকমতো বুঝতে, আর একজনের হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়কে মেশাতে। দূরকে নিকট বন্ধুতে পরিণত করা, পরকে আত্মীয় ক'রে তোলা—একি টেক্‌নলজির পথে সম্ভব ?

সবচেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন-অন্তরালে,
তার কোন পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
সে অন্তরময়,
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।

টেক্‌নলজি আনতে পারে physical proximity—শারীরিক নৈকট্য। কিন্তু মানুষ যে অন্তরময়। শারীরিক নৈকট্যের সঙ্গে পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতি যদি না আসে, তবে তো প্রেমের পরিবর্তে আসবে বিরোধ—মিলনের পরিবর্তে বিতৃষ্ণা। আজ তাই পৃথিবী যখন আগের তুলনায় অনেকখানি সঙ্কুচিত, যখন টেক্‌নলজির উন্নতির ফলে মানুষ মানুষের অত্যন্ত কাছাকাছি এসে পড়েছে, তখন পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবার প্রয়োজন যে কতখানি—তা বুঝতে খুব বেশী কল্পনাশক্তি প্রয়োগের দরকার হয় না। আর এই সহানুভূতির পথে প্রথম পদক্ষেপ হবে অপরের ধর্মবিশ্বাসকে সম্মান করতে শেখা। রলাঁর (Romain Rolland) বিবেকানন্দ-জীবনীর শেষ দিকে আছে:

> At this stage of human evolution, wherein both blind end conscious forces are driving all natures to draw together for 'co operation or death', it is absolutely *essential that the human consciousness* should be impregnated with it, until this indispensable principle becomes an axiom that every faith has an equal right to live, and that there is an equal duty incumbent upon every man to respect that which his neighbour respects.

—মানুষের ক্রমবিকাশের এই স্তরে নানা শক্তির ঠেলায় বিচিত্র প্রকৃতির মানুষ যখন অত্যন্ত কাছাকাছি এসে পড়ছে—হয় সহযোগিতা করতে, নয় মরতে—তখন একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এই অপরিহার্য নীতির মর্মকে মানবার জন্যে যে প্রত্যেক ধর্মবিশ্বাসেরই বেঁচে থাকবার সমান অধিকার আছে এবং প্রত্যেক মানুষেরই অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে—প্রতিবেশী যা কিছুকে সম্মান করে তাকে সম্মান করা।

এই দ্রুত-সঙ্কুচিত পৃথিবীতে টেক্‌নলজির অদ্ভুত সাফল্য দূরত্বকে যখন বিলুপ্ত ক'রে দিয়েছে (the annihilation of distance) তখন বিবেকানন্দের এবং রলাঁর প্রতিধ্বনি ক'রে পাশ্চাত্যের অন্যতম প্রথিতযশা মনীষী টয়েনবী বলছেন: I would say that, in our World today, the virtues that we most need to cultivate are, first, tolerance and then patience. আজকের

পৃথিবীতে যে দুটি গুণের অনুশীলন করা আমাদের পক্ষে প্রয়োজন তার প্রথমটি হ'ল পরমত-সহিষ্ণুতা এবং দ্বিতীয়টি হ'ল ধৈর্য। ব্যক্তিগত জীবনে পদে পদে এই সহনশীলতার প্রমাণ দিয়ে থাকি আমরা। আমাদের ভাই-বোন-ছেলে-মেয়েরা অনেক সময়ে নিজেদের আচরণের দ্বারা অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের নিক্ষেপ করে। তাদের ব্যবহার আমাদের মোটেই পছন্দ হয় না, উদ্দেশ্যও ভাল ব'লে মনে হয় না। তাই ব'লে তাদের নাকে তো আমরা ঘুসি মারি না। ঘুসি মারাটাকে পারিবারিক সমস্যা সমাধানের একটা সুষ্ঠু উপায় বলেও মনে করি না। যে-সহনশীলতা আমরা শিক্ষা করছি আমাদের পারিবারিক জীবনে, তার অনুশীলন করা আজ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে আমাদের বৃহত্তর জীবনে। কেন? কারণ যে-গ্রহে আমরা বাস করছি তা দ্রুত সঙ্কুচিত হওয়ার ফলে—বিভিন্ন দেশের মানুষ এক পরিবারের লোকদের মতোই কাছাকাছি এসে পড়েছে। না সহ্য ক'রে উপায় কি? টয়েনবী বলছেন: So I believe we have now to exercise in our public life the tolerance we have learned—or are taught by the law if we do not learn it by ourselves—to exercise in our private lives.

এর পরেই টয়েনবী আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন যার প্রতি উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করি। টয়েনবী বলছেন:

And here, I think, India may have a lesson to teach to the rest of the World. No doubt, it is easy for outsiders to point out blemishes in the civilisation of India. But in religion—and ultimately this question of tolerance is, I believe, a religious question—the Indian World is unlike the Christian-Jewish-Muslim World in having a much stronger tradition of tolerance. The Western religious tradition tends to be exclusive—to say that there is one way, one right way, one truth only. The Indians have the notion that there are more ways than one to the goal—more ways than one of attaining salvation. The West, has something to learn, I think, from the Indians about that.

—(*Democracy in Atomic Age*)

টয়েনবীর মতে: সহনশীলতার ব্যাপারে ভারতবর্ষ জগৎকে শিক্ষা দিতে পারে। বাহিরের লোকের পক্ষে ভারতীয় সভ্যতার খুঁত ধরা সহজ। কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে ভারতবর্ষীয় জগৎ খ্রীষ্টান-ইহুদী-মুসলিম জগৎ থেকে স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র এই অর্থে যে ভারতীয় ইতিহাসে পরমতসহিষ্ণুতার ঐতিহ্য অনেক বেশী জোরালো। পাশ্চাত্যের ধর্মীয় ইতিহাসের গতি সকলকে সহ্য ক'রে গ্রহণ করার বিপরীত দিকে। ওর কথা হ'ল—সত্যে পৌঁছানোর রাস্তা এক ছাড়া দুই নেই। ভারত বলে মুক্তি একাধিক রাস্তায় লাভ করা যায়। এইখানে পাশ্চাত্য ভারতবর্ষের কাছে ব'সে শিখতে পারে।

স্বামীজীও বলেছিলেন: Therefore the world is waiting for this grand idea of universal toleration. —পৃথিবী অপেক্ষা করছে বিশ্বজনীন সহনশীলতার এই গরিমা-ময় আদর্শের জন্যে—সকলকে সহ্য করবার মহাদর্শ! যুগাবতার রামকৃষ্ণের কণ্ঠে এই grand idea (মহান্ আদর্শে)-র অভিব্যক্তি, আর এই জন্যেই সারা জগতের সকল জাতির নরনারীর হৃদয়ে তাঁর আসন। তাঁর জীবদ্দশায়

এত বিভিন্ন মতের মানুষ যে দক্ষিণেশ্বরে আসত সেও তাঁর এই বিশ্বজনীন সহনশীলতার মহাভাব (grand idea of universal toleration)-এর জন্যে। ঠাকুরের নিজের ভাষায়ঃ 'আমি সব রকম করেছি—সব পথই মানি। শাক্তদেরও মানি, বৈষ্ণবদেরও মানি, আবার বেদান্তবাদী-দেরও মানি। আজকালকার ব্রহ্মজ্ঞানীদেরও মানি। এখানে তাই সব মতের লোক আসে।'

টেক্‌নলজির প্রসাদে দ্রুত-বিলীয়মান দূরত্বের যুগে সহনশীলতার প্রয়োজন যখন অনস্বীকার্য, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক প্রেমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হ'লে শারীরিক নৈকট্য যখন কল্যাণের পরিবর্তে সমূহ অকল্যাণ ঘটাতে পারে, তখনই নতুন ভাবাদর্শের আবির্ভাব দরকার সবচেয়ে বেশী। তাই মানুষের দেহ ধারণ ক'রে ভাবময় ভগবান এলেন মর্ত্যলোকে যাতে আদিম পাপ আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত হয়ে নরনারী প্রতিবেশীর ধর্মবিশ্বাসকে সম্মান দিতে শেখে।

এই বিরাট কাজ করবার জন্যে, রলাঁর ভাষায়ঃ He needed a strong body, arms to turn over the earth, legs to journey over it, a bodyguard of workers and the head to command them, in addition to his great heart charged with love for the whole world. —রামকৃষ্ণের প্রয়োজন ছিল এমন একজন যোগ্য শিষ্যকে যিনি সবল সুগঠিত দেহমন নিয়ে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াতে পারবেন একটা জ্বলন্ত সূর্যের মতো, যিনি ঠাকুরের ভাবধারার পতাকাবাহী সেনাবাহিনীর পুরোভাগে থেকে তাঁদের পরিচালক হবার যোগ্যতা রাখবেন, এ ছাড়াও যাঁর বিশাল হৃদয়ে থাকবে সারা পৃথিবীর জন্যে প্রেমের পরিপূর্ণতা। আচার্য অদ্বৈতের অন্তরের সুগভীর ইচ্ছা ঘনীভূত হয়ে মহাপ্রভুর রূপ নিল, ঠাকুরের জ্বলন্ত বিশ্বাস এবং আকাঙ্ক্ষা বিবেকানন্দের আবির্ভাবকে সম্ভব ক'রল। বিবেকানন্দের আবির্ভাব নিঃসংশয়ে প্রমাণিত ক'রল শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্দৃষ্টির স্বচ্ছতাকে। সারা জগতে ঠাকুরের পরমত-সহিষ্ণুতার মহান্ আদর্শকে এমন জোরের সঙ্গে বিবেকানন্দ ছাড়া আর কে প্রচার করতে পারত?

শান্তির জন্য চাই সহনশীলতা এবং সাম্য, সাম্যের জন্য চাই সামঞ্জস্য, সেজন্যও রামকৃষ্ণের প্রয়োজন ছিল বিবেকানন্দকে। ভারতবর্ষের জন-সাধারণের জীবন দারিদ্র্যের জগদ্দল পাথরের নিষ্করুণ চাপে নিষ্পেষিত। তারা বিশ্বজনীন চিন্তা করবে কেমন ক'রে? এদের সর্বপ্রথম দরকার অন্ন। নিরন্ন মানুষের অন্তরে স্বার্থশূন্য মহাজাগরণ আশা করা দুরাশা। তা ছাড়া, নিরন্নদের খাওয়ানোই বড় কথা নয়। তাদের শেখাতে হবে কি ক'রে অন্ন সংগ্রহ করা যায়, শেখাতে হবে অন্ন সংগ্রহ করতে হ'লে নিজেদের পরিশ্রম করা চাই।

এই কাজ ঠাকুরের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ভারতবর্ষ দারিদ্র্যের অনলে জ্বলছে—যেন জ্বলন্ত জতুগৃহ। অসংখ্য মানুষের দুঃখের সীমা নেই। এই দিগন্তপ্রসারী দারিদ্র্যের দুঃখ থেকে ভারতের ভাগ্যহত জনসাধারণকে উদ্ধার করবার জন্যে ঠাকুর রেখে গেলেন নরেন্দ্রনাথকে। অসংখ্য মানুষের ভিতর থেকে রামকৃষ্ণ বেছে নিলেন নরেন্দ্রনাথকে পদদলিত শোষিত ভারতের জন-সাধারণকে পাতালপুরীর অন্ধকার থেকে উপরের আলোতে টেনে তুলবার জন্যে। বিবেকানন্দকে রোমা রলাঁ তুলনা করেছেন ঈগলের সঙ্গে, আর এই তুলনা ঠিকই হয়েছে। ঈগলের মতোই স্বামীজী ছিলেন প্রাণশক্তির প্রতিমূর্তি (energy personified) জনগণের কাছে তাঁর বাণী ছিল

কর্মের বাণী। তাঁর কণ্ঠেই প্রথম ধ্বনিত হ'ল 'দরিদ্রনারায়ণ' এই যুগান্তকারী শব্দটি। বললেন: 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব।' —যারা সকলের নীচে, সকলের পিছে তারা হোক তোমার দেবতা। ভারতের ভাগ্যকে বিবেকানন্দ ফিরিয়ে দিলেন, তার চিন্তাধারাকে বইয়ে দিলেন নূতনতর খাতে, তার দৃষ্টিভঙ্গিতে আনলেন বৈপ্লবিক পরিবর্তন। 'দরিদ্রনারায়ণ' কথাটি মন্ত্রের কাজ ক'রল। এই যুগান্তকারী শব্দের সোনার কাঠির ছোঁয়া লেগে ভারতবর্ষের ঘুমন্ত আত্মা জেগে উঠল।

এইবার প্রবন্ধের উপসংহার করি। এতক্ষণ চেষ্টা করেছি শুধু এই সত্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে যে ঠাকুরের জীবনব্রত সেদিন পূর্ণ হ'ল যেদিন বিবেকানন্দ বৃহৎ মানবসমাজের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, তাকে শুভপথে পরিচালিত এবং ঐক্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে। তা ছাড়া রামকৃষ্ণ-সন্তানবাহিনীকে চালনা করবার জন্যেও কি বিবেকানন্দ একান্ত প্রয়োজন ছিল না? আর স্বামীজীকে ঠাকুর মনে করতেন 'a man better fitted than himself to guide mankind and to take over the command of the army'—ইংরেজী কথাগুলো রলাঁর।

শ্রীমধ্বাচার্য ও তাঁহার সম্প্রদায়

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

প্রস্তাবনা-স্তুতি

নমঃ শ্রীভক্তিদায়িনে।

মধ্বাখ্যাচার্যবর্যায় বায়ুদেবস্বরূপিণে।
শুদ্ধসত্ত্বায় পুণ্যায় পূর্ণপ্রজ্ঞায় নন্দিনে ॥ ১

আনন্দতীর্থনাম্নিনে নমো ভক্তিবিধায়িনে ॥

হরিঃ পরতরঃ সত্যং জগদিতি প্রচারিণে।
বিষ্ণোর্ভিন্নৌ জগজ্জীবৌ জীবসেবকবাদিনে ॥ ২

জীবা নীচোচ্চভাবা হি স্থিরসিদ্ধান্তদায়িনে।
স্বসুখাস্বাদনে মুক্তিভক্তি-সাধনমোদিনে ॥ ৩

প্রত্যক্ষাদিত্রয়স্যৈব প্রামাণ্যসংবিধায়িনে।
হরেরাম্নায়বেদ্যত্বং নব-সিদ্ধান্ত-ঘোষিণে ॥ ৪

নমঃ শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞায় বায়ুদেব-স্বরূপিণে।
আনন্দতীর্থ-নামিনে ॥

মধ্বাচার্য-কৃত গ্রন্থাবলী

(১) ঋগ্বেদ-ভাষ্য (আংশিক)
(২) ঈশ-কেন-কঠ-বৃহদারণ্যক-ছান্দোগ্য-ঐতরেয়-উপনিষদ্‌ভাষ্য
(৩) ব্রহ্ম-সূত্র-ভাষ্য ও অণু-ভাষ্য
(৪) ভগবদ্‌গীতাভাষ্য ও টীকা সহ ভগবদ্-গীতা-তাৎপর্য-নির্ণয়।
(৫) মহাভারত-তাৎপর্য-নির্ণয়
(৬) ভাগবত-পুরাণ-তাৎপর্য-নির্ণয়
(৭) মাতৃকা-নিঘণ্টু (৮) নরসিংহ-নখ-স্তুতি
(৯) ন্যায়-বিবরণ (১০) তত্ত্ব-সংখ্যান
(১১) উপাধি-খণ্ডন
(১২) সত্তত্ত্ব-রত্নমালাপ্রকাশিকা

উপরিলিখিত গ্রন্থ-নিচয়ের দিকে তাকালেই কোন্ কোন্ গ্রন্থের দ্বারা মধ্বাচার্য বিশেষ প্রভাবিত তা সহজে বোঝা যায়। মধ্বাচার্য

বেদ ও প্রস্থান-ত্রয় দ্বারা যেমন প্রোদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, ইতিহাস-পুরাণের দ্বারাও তেমনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। তন্মধ্যে মহাভারত ও ভাগবতের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সপ্তম থেকে গ্রন্থগুলি তাঁর নিজস্ব মতাবলী—যা পূর্বোক্ত গ্রন্থনিচয়ের ভাবে ও প্রভাবে প্রোদ্দীপ্ত।

এখানে বিশেষ বক্তব্য যে দাক্ষিণাত্যের 'মণি-প্রবাল' গ্রন্থে ও ভাষা-গ্রন্থসমূহে ভক্তি-বাদের যে চিন্তাধারা সুপ্রকট, তা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল নিশ্চয়। কঠোর অনুশীলন ব্যতীত—কোন্ কোন্ গ্রন্থ তাঁকে কতদূর প্রভাবিত করেছিল, তা বলবার উপায় নেই।

মধ্ব-মত

উপরের সংস্কৃত স্তুতিটিতে মধ্বাচার্যের নব সিদ্ধান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। সেগুলি যথাক্রমে এই: (১) হরিই সর্বোত্তম বস্তু, (২) জগৎ সত্য, (৩) জীব ও জগৎ বিষ্ণু থেকে ভিন্ন, (৪) জীব বিষ্ণুর নিত্য সেবক, (৫) বদ্ধ ও মুক্ত জীব পরস্পর ভিন্ন, (৬) স্বরূপের সুখানুভূতিতেই মুক্তি, (৭) এই মুক্তি-লাভের উপায় হচ্ছে ভক্তি, (৮) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই তিনটিই প্রমাণ, এবং (৯) শ্রীকৃষ্ণকে জানবার একমাত্র উপায় হচ্ছে শাস্ত্র।

মধ্বের মতে পদার্থ দুই প্রকার—স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র। পরতন্ত্র পুনরায় দশবিধ: দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সাকল্য, বিশেষ, বিশিষ্ট, অংশী, শক্তি, সাদৃশ্য ও অভাব। পুনরায় দ্রব্য দ্বিবিধ—চেতন ও অচেতন।

মধ্বাচার্যের মতে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ব্যতীত শাসন, জ্ঞান-দান, স্বরূপ-প্রকাশ, বন্ধ ও মুক্তি—এও ব্রহ্মেরই ক্রিয়া। ব্রহ্ম হচ্ছেন বিষ্ণু।

বিষ্ণুর নিত্যসহচরী লক্ষ্মী তাঁরই আশ্রিতা। তিনি অনন্তমূর্তিবিশিষ্টা এবং বিষ্ণুরই ক্রিয়া-শক্তির প্রতীক। লক্ষ্মীরই সহায়তায় বিষ্ণু প্রকৃতি থেকে জগৎ সৃষ্টি করেন। লক্ষ্মীই দেবতা-মনুষ্য-দৈত্যগণের বন্ধের হেতু।

মধ্ব কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি ব্যতীত ধ্যান ও ভগবৎ-প্রসাদকে মুক্তির উপায় ব'লে নির্ণয় করেছেন। তিনি অনন্ত নরকবাস স্বীকার করেন ও বায়ুদেবতার মধ্যস্থতায় ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভবপর ব'লে ঘোষণা করেছেন।

এভাবে চিৎ, অচিৎ ও ব্রহ্মের সঙ্গে জীব-জগতের সম্পর্ক এবং মোক্ষ, সাধনাবলী প্রভৃতি বিষয়ে মধ্ব নিজের একটি সুসঙ্গত দার্শনিক মত খ্যাপন করেছেন।

মধ্বের শিষ্য ও ভক্ত-পরম্পরা

মধ্বের সম্প্রদায় কর্ণাটে 'হরিদাস' সম্প্রদায় নামে খ্যাত। এই দাসকূটের ইতিহাস ও সময়-পরম্পরা পন্ধরপুরের দেবতা বিট্‌ঠলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

'হরিদাস'-সম্যাখ্যাত ভক্ত কবিদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে বিজয়দাস, জগন্নাথদাস, বেঙ্কটেশ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য—এঁরা শ্রীমধ্বের মতাবলী প্রপঞ্চনের জন্যই বিশেষভাবে গ্রন্থ রচনা করেছেন। দ্বিতীয় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা যায় ব্যাসরায়, গোপাল-দাস, সুব্বণ্ণদাস প্রভৃতিকে, যাঁরা মুখ্যতঃ ব্রাহ্মণ্য-ধর্মেরই প্রচার করবার জন্য লেখনী ধারণ করেছেন, তবে মধ্বই হচ্ছেন এঁদের আদর্শ। তৃতীয় শ্রেণীতে শ্রীপাদরায়, পুরন্দরদাস ও তাঁর পুত্র-গণ এবং কনকদাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য—তাঁরা সর্বকালের সর্বধর্মভুক্ত সকলের জন্যই গ্রন্থ রচনা করছেন, মূল ধর্মই এঁদের লক্ষ্যস্থল। অবশ্য বলা বাহুল্য—মধ্ব-প্রপঞ্চিত ধর্মই যে মুখ্য, সেটি তাঁরাও বলেছেন।

হরিদাস-সম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলী-পাঠে একটি বিষয় নিরন্তর মনে হতে থাকে—সেটি হচ্ছে

এঁরা চারিত্রিক সমুন্নতির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। পূজার্চা করণীয়, কিন্তু সেটি বহিরঙ্গ মাত্র। জগতের সকলেই মুক্তির পথে তর্ তর্ গতিতে অগ্রসর হোক্—এই তাঁদের আত্যন্তিক কামনা।

হরিদাস-সম্প্রদায়ের কয়েকজন গ্রন্থকারের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকটনের জন্য আমরা এখানে কয়েকজন লেখকের মত থেকে কিছু কিছু উল্লেখ করছি।

(১) নরহরি তীর্থ

ইনি মধ্বাচার্যের সমসাময়িক। মধ্বাচার্যের গঞ্জাম জেলায় ধর্মপ্রচার-কালে ইনি তাঁর বিশেষ সহায়তা করেন। কথিত আছে যে মধ্বাচার্যের সঙ্গে ভ্রমণে বহির্গত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে মধ্বাচার্য তাতে স্বীকৃত হননি। উড়িষ্যারাজের অধীনে তাঁর কার্যকালের অবকাশে তিনি উড়িষ্যা থেকে যে রাম ও সীতার মূর্তি উপহার পান, তাই তিনি উদীপিতে মধ্বাচার্যকে উপহার দেন। এখনও পর্যন্ত রাম ও সীতার দুটি মূর্তিই উদীপির মন্ত্রালয় মঠ এবং উত্তরাধিমঠে যথাক্রমে প্রতিদিন পূজা পাচ্ছেন। ১১৮৬—১২১৫ শক পর্যন্ত এঁর জীবন পরম স্ফূর্ত গতিতে ধর্মপথে চলতে থাকে। এঁর লেখনী-প্রসূত কয়েকটি কন্নড-সঙ্গীত মাত্র অবশিষ্ট আছে। একটি সঙ্গীতে তিনি শ্রীরামচন্দ্রের কাছে করুণভাবে আত্মনিবেদন করছেন—দুঃখ ক'রে তিনি বলছেন: যদিও আমি 'হরিদাস', তা কেবল নামেই, কাজে নয়। আসলে আমি জাগতিক সুখেরই দাস। গোপনে ভাবি ধনদৌলতের কথা, লোকের সম্মুখে ত্যাগ-বৈরাগ্যের কথা বলি। হরির সেবায় হই দ্বিধাগ্রস্ত, আর ভূমিপের সেবায় রয়েছি বদ্ধপরিকর। ধর্মের জন্য ব্যয়িত একটি পাইকে মনে করি এক কোটী টাকা; আর অসৎ কাজের জন্য ব্যয়িত এক কোটী টাকাকে মনে করি এক পাই। ধর্ম কাজের সময় আমি পরিক্লান্ত, কিন্তু অকাজ-কুকাজের জন্য পরিশ্রমের অবধি নেই।

আর একটি কবিতায় তিনি নিজেকে সাপুড়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন, তার উপসংহারে বলছেন, 'আমার স্ত্রীকে কেউ কিছু বললে, তা সহ্য করতে পারি না—মুখের উপর তাকে জবাব দিয়ে দিই, কিন্তু শ্রীপতির বিষয়ে কেউ কটূক্তি করলে আমি তা সহ্য করি।' আর একটি গানে তিনি বলছেন, 'হরি, তোমার একি বিধান! যে ভৃগু তোমাকে নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে পদাঘাত করলে, তাকেই কর তুমি রক্ষা। পাপী অজামিলকে তুমি উদ্ধার করলে। আমি তার থেকেও তোমার পর? প্রহ্লাদ কি তোমার নিকটতর আত্মীয় ছিলেন? অহল্যা তোমাকে এমন কি দিয়েছিলেন, যা আমি তোমাকে দিতে পারি না?'

(২) শ্রীপাদরায়

শ্রীপাদরায়ই প্রথম আচার্য, যিনি মঠে কন্নড় ভাষার প্রবর্তন করেন এবং সেই থেকেই দ্বৈত-মতবাদ বিশেষ ক'রে কন্নড় দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ফলতঃ তাঁর কন্নড়ভাষায় রচিত ভ্রমর-গীতা, বেণু-গীতা এবং গোপী-গীতা তাঁর সময়ে মঠে নিত্য গীত হ'ত।[১] কন্নডভাষার মাধ্যমে ধর্মপ্রচারের ফলে সমাজে তাঁর খ্যাতি বিশেষ বৃদ্ধি পায়, যার ফলে চন্দ্রগিরিরাজ সাল্ব-নৃসিংহ ১৪৯১ খৃঃ সিংহাসনে বসিয়ে তাঁকে 'কনকাভিষেকে' পূজা করেন। কথিত আছে যে তীর্থ-পরিভ্রমণ-কালে তিনি একবার কাশীতে পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাজিত করেন। এই ভক্ত পণ্ডিতের ভাব-

১ কর্ণাটক 'ভক্ত-বিজয়' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ৩১ পৃঃ দ্রষ্টব্য। এই প্রবন্ধে কবির মূল রচনা বিষয়ে নিম্নলিখিত কন্নড় গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে—বেলূর কেশবদাস কৃত কর্ণাটক 'ভক্ত-বিজয়', ১ম ও ২য় খণ্ড, নরসিংহাচার-কৃত কর্ণাটক 'কবি-চরিতে' ১—৩ খণ্ড।

সমৃদ্ধ রচনার স্বল্পমাত্র এখন পাওয়া যায়। তন্মধ্যেই স্বদোষ-স্বীকৃতি, ভাগবত বিভূতি, কর্ম-নিবন্ধন পুনর্জন্ম, শ্রীকৃষ্ণ-লীলা, আত্মসমর্পণ প্রভৃতি বিষয়ে কত কথাই না বলেছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার কি, এই বিষয়ে শ্রীপাদরায় বলছেন: বিভিন্ন বিশিষ্ট অলঙ্করণ কি? জিহ্বার পক্ষে শ্রীহরিনাম। পায়ের পক্ষে তীর্থস্থান। গৃহের পক্ষে তুলসীর বন বা বৃন্দাবন। কর্ণের পক্ষে কৃষ্ণনাম-শ্রবণ, হস্তের পক্ষে ভিক্ষা-দান, মানুষের পক্ষে আত্ম-সম্মান। তপোনিধির পক্ষে জ্ঞান। গৃহিণীর পক্ষে পতিভক্তি, চক্ষুর পক্ষে রঙ্গনাথ-অবলোকন। মস্তকের পক্ষে হরিপদে নতি। কণ্ঠের পক্ষে তুলসীমালা-ধারণ। কিন্তু হে রঙ্গ-বিট্‌ঠল! সকল ভূষণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভূষণ হচ্ছে তোমার নাম।

পুনরায়, 'ভক্ত বড়, না ভগবান্ বড়?' এই প্রশ্নের উত্তর-প্রসঙ্গে শ্রীপাদরায় বললেন: হে শ্রীহরি! কে বড়, তুমি না তোমার ভক্তগণ? বিভিন্ন দিক্ থেকে দেখলে মনে হয় যে তোমার ভক্তের কাছে তুমি ছোটই হয়ে গেছ। বেদে যদিও তুমি সর্বশক্তিমান্ পরম পুরুষ ব'লে স্তুতি লাভ ক'রছ, তথাপি যুধিষ্ঠির-অর্জুনের গৃহে তুমি নিরন্তর তাদের ইচ্ছানুক্রমে স্বকীয় গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ ক'রছ। তুমি ইচ্ছা করলে মোক্ষও দিতে পার। তাহলে তুমি বলিরাজের দ্বারে প্রহরী হও কেন? ভীষ্মদেব যখন তোমার কপালের দিকে বাণ ছুঁড়লেন, তুমি তুলে ধরলে তোমার সুদর্শন চক্র, কিন্তু সেই ভীষ্মই যখন তোমার নামের শরণ নিলেন, তখন তুমি পরাজয় স্বীকার করলে। ক্ষুদ্র একটি বালক প্রহ্লাদ—তাকে রক্ষা করবার জন্য প্রস্তর-স্তম্ভের মধ্য থেকে তুমি বের হয়ে এলে নৃসিংহ-আকার ধারণ ক'রে। কাজেই তুমি যখন পদে পদে ভক্তদের মনের কথার অনুগমন, অনুক্রমণ কর, তখন সত্যি বড় হ'ল কে?

(৩) ব্যাসরায় (১৪৪৭—১৫৩৯)

কর্ণাটকে ব্যাসরায়ই 'দাসকূট' নামক নব ভক্ত-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। বাল্যজীবনে ইনি ব্রাহ্মণ্যতীর্থের শিষ্য ছিলেন। উত্তর জীবনে ইনি শ্রীপাদরায়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। বিজয়নগরের চরম অভ্যুন্নতির দিনে শ্রীকৃষ্ণরায়ের উপদেষ্টা-রূপে ইনিই রাজসভার মধ্যমণি ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এঁর সংস্পর্শে আসেন, এবং মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায় ব্যাসরায়ের মঠের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

শ্রীব্যাসরায়ের সকল সৌভাগ্যের মধ্যে বড় হচ্ছে তাঁর শিষ্য-সৌভাগ্য। পুরন্দরদাস, কনকদাস, বিজয়েন্দ্র স্বামী ও বৈকুণ্ঠদাস এঁরই শিষ্য ছিলেন। বিজয়দাস স্বকৃত একটি গানে ব্যাসরায়ের জীবনী অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করেছেন। তদ্ব্যতীত চিঙ্গলেপেট জেলার সোমনাথ নামক জনৈক ভক্ত ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর জীবৎকালেই 'ব্যাসযোগি-চরিতে' নামক কন্নড়ভাষায় এক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ অতি উপাদেয়।

শ্রীপাদরায়ের গ্রন্থ 'তর্ক-তাণ্ডব', 'ন্যায়ামৃত' এবং 'চন্দ্রিকা' সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ্। তাঁর কন্নড়ভাষায় লিখিত গানগুলিও ঐ ভাষার এক বিশেষ সম্পদ্।

ব্যাসরায় ও তাঁর পূর্ববর্তীদের মতো তিনিও আত্মসমর্পণ, শরণাগতি, হরিনাম-মহিমা প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কথা বলেছেন। আদর্শ ভক্তের বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি একটি সঙ্গীতে বলেছেন: আদর্শ ভক্ত সর্বদা বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং দার্শনিক তথ্য ও তত্ত্বের অনুশীলন করেন, এবং সর্বদা মধ্বের নাম স্মরণে রাখেন।

মধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত শ্রীব্যাসরায় ভগবানের

কাছে প্রার্থনা করছেন যেন সকল ভবিষ্য জন্মেও তিনি মধ্বসম্প্রদায়ের যাবতীয় চিহ্নে ভূষিত এবং মাধ্ব দর্শনে জ্ঞানলাভে সমর্থ হন। তার প্রার্থনা : সকল ভবিষ্য জন্মে কপালে গোপীতিলক, শরীরে দ্বাদশ চিহ্ন, গলায় তুলসীমাল্য, দক্ষিণ বাহুতে সুদর্শন-চিহ্ন, এবং বাম বাহুতে শঙ্খচিহ্ন দিও। সর্বচিহ্ন-ভূষিত আনন্দ-বিপ্লাবিত বৈষ্ণব জীবনই আমি কামনা করি। এই বোধশক্তি যেন আমার জন্মজন্মান্তরে থাকে—এই দৃশ্যমান জগতের সর্বত্র স্তরভেদ আছে, পঞ্চ-ভেদ সত্য এবং রুদ্র ও অন্যান্য দেবগণ তোমার চরণে করেছেন আশ্রয়গ্রহণ। সমগ্র বিবুধ-সমাজ ও নরোত্তমদের প্রতি যেন থাকে আমার অজস্র প্রীতি এবং সুখতীর্থ মধ্বাচার্যকেই যেন গুরুশ্রেষ্ঠ বলে প্রতি জন্মে মনে করি। হে শ্রীকৃষ্ণ, মোক্ষদাতা তুমি, নিষ্কলুষ ও নবধা ভক্তি তুমি আমাকে দাও।

(৪) পুরন্দরদাস

পুরন্দরদাস পুণা জেলার অন্তর্গত পুরন্দরগড়ে ১৪৮৪ খৃঃ ধনী বণিক্ বরদপ্পার ও মাতা লক্ষ্মকার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। সংসারাশ্রমে তাঁর নাম ছিল শ্রীনিবাস নায়েক। শ্রীনিবাসের পত্নী সরস্বতী-অম্মা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা মহীয়সী নারী ছিলেন, যাঁর প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে ভগবান্ পাণ্ডুরঙ্গ নিজে ঘরে এসে একদিন দেখা দেন; এবং পত্নীর মাধ্যমে ভগবৎ-প্রসাদপ্রাপ্ত ব্যবসায়বুদ্ধি-সম্পন্ন গৃহী স্বামী সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করেন।

শ্রীনিবাসের 'পুরন্দরদাস' নাম গুরুদত্ত। গুরু ব্যাসরায় তাঁর উপর এত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে সঙ্গীতের এক জায়গায় তিনি বলেছেন : যদি কোনও দাস থাকে, তবে সে নিশ্চয় পুরন্দর-দাস। ব্যাসরায় ১৫২৫ খৃঃ শ্রীনিবাসকে 'পুরন্দর-দাস' আখ্যা দেন। কথিত আছে যে পুরন্দরদাস ৪,৭৫০০০ সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি 'দ্রৌপদী-বস্ত্রহরণ', 'সুদাম-চরিত', 'পরতত্ত্বসার' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা ক'রে গেছেন; এই গ্রন্থসমূহ এখনও মুদ্রিত হয়নি। পুরন্দর মহারাষ্ট্র-কবি একনাথের সমসাময়িক। বালকের শিক্ষার জন্যে তিনি 'পিল্লরি গীতে' রচনা করেন। তাঁর সমসাময়িক কনকদাসের মতো তিনিও ভক্তির ক্ষেত্রে বর্ণপ্রথা স্বীকার করতেন না।

পুরন্দরদাস সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ ক'রে পরিণত বয়সে বিজয়নগর নৃপতিদের আশ্রয়ে হাম্পিতে অবস্থান করেন। তাঁর মৃত্যুকাল ১৫৬৪ খৃঃ। তাঁর চারিপুত্র—বরদপ্পা, গুরুপ্পা, অভিনপ্পা, এবং মধ্বপতি—সকলেই দাসকূটের সঙ্ঘভুক্ত হন।

মহারাষ্ট্র-কবি রামদাসের মতো কর্ণাটের হরিদাস-কবিরাও 'মন'কে উদ্দেশ ক'রে রচনা করতে বিশেষ অভ্যস্ত। পুরন্দর তাঁর একটি আত্মতুষ্টি-বোধক সঙ্গীতে ভগবানকে 'মাতা-পিতা' রূপে পেয়েছেন ব'লে আনন্দ প্রকাশ করেছেন, বলেছেন, 'যখন মুচুকুন্দরাজের রক্ষক আমার মাতাপিতৃরূপে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, তখন আমার অন্য কিছুর কি প্রয়োজন আছে?' ফলতঃ, হরিদাস-কবিদের রচনায় কোথাও ভক্ত-ভগবানের মধ্যে প্রিয়-প্রিয়ার মধুর সম্পর্কের কোনও উল্লেখ বা নির্দেশ পাওয়া যায় না। সর্বত্রই একটা ব্যবধানের ভাব সুপ্রকট।

জ্ঞানের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে পুরন্দরদাস এক জায়গায় বলেছেন, মুক্তিলাভের দিক থেকে জ্ঞান যথেষ্ট।

সংসারে কি ক'রে বাস করা উচিত, সে বিষয়ে পুরন্দর একস্থানে বলছেন : কর্মানুসারে জীব সংসারে বাস করে। পাখী এলো, খালি স্থানে একটু ব'সে আবার উড়ে গেল। বালকেরা

খেলার ঘর তৈরী করে, অল্পক্ষণ পরেই বলে—খেলা সাঙ্গ হ'ল। হাটে কত লোকের সমাবেশ, কিছুক্ষণ পরে সকলেই স্ব স্ব পথে দূরে সরে গেল। সন্ধ্যার পথিক সকালে আর সে স্থানে নেই। হে পুরন্দর বিট্‌ঠল, এই সংসার-মায়া নাশপূর্বক তুমি আমাকে রক্ষা কর।

বর্ণপ্রথা অস্বীকার-পূর্বক পুরন্দরদাস কনক-দাসের মতোই বলেছেন: লোক—যে কোনও জাতেরই হোক্‌, তাতে কি? ভেতরের ভাগবত সত্তা যে অনুভব করতে পারে, সে যে কোনও জাতেরই হোক্‌, তাতে কি এসে যায়? ইক্ষুদণ্ড বক্র হ'লে কি রসও বেঁকে যাবে?' অন্যত্র তিনি বলেছেন যে জন্মের দ্বারা বর্ণ স্থিরীকৃত হয় না, চরিত্র দ্বারাই হয়।

মোক্ষের সহায়করূপে যোগের বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি এক জায়গায় বলেছেন: হে মানব! তোমার অন্তশ্চক্ষুর সাহায্যে বিশ্বেশ্বর শ্রীহরির দিকে তাকাও। ষট্‌-স্থানে ষট্‌-পদ্মের পরিস্ফুরণ পূর্বক ত্রিবিধ বাসনা জয় ক'রে সুষুম্নায় গমন কর। সেখানকার যবনিকা ভেদ ক'রে তুমি পরব্রহ্মের সঙ্গে মিলিত হও। নির্নিমেষে ঊর্ধ্ব দিকে তাকাও এবং শরীরের ভিতর বায়ু রুদ্ধ ক'রে রাখ, নিঃশ্বাস ফেলো না। দেহের মধ্যে তখন যে ধ্বনি শুনতে পাবে, তা উপভোগ কর, এবং জগতে ক্রীড়নশীল সূর্যমণ্ডলবর্তী নারায়ণের সম্মুখে নবধা ভক্তি প্রকটন ক'রে নৃত্য কর। দেখতে পাবে—কুণ্ডলিনীর উপর যিনি আছেন, তিনিই হচ্ছেন পুরন্দর বিট্‌ঠল।

আর এক স্থানে কবি বলছেন: হে মানব! অন্ন সঙ্গে নিয়ে চল। তাহলে তুমি যেখানে ইচ্ছা, সেখানেই যেতে পাবে। ধর্ম-পাত্রটি পবিত্র মন নামক গঙ্গাজল দিয়ে পূর্ণ ক'রে নাও। সুমন দিয়ে অগ্নি প্রজ্বালিত কর, স্থির মন দিয়ে অন্ন সিদ্ধ কর, জ্ঞানবস্ত্র বিস্তার ক'রে অত্যন্ত নিরাসক্ত ভাবে শ্রীহরির চরণে সমর্পণ কর। সঙ্গে রাখ জগৎস্রষ্ট্‌-রূপ পুরন্দর বিট্‌ঠলরূপী চরম সত্য এবং তা খেয়েই আত্মসংরক্ষণ কর।

পুরন্দরদাস অনেক স্থলেই অদ্বৈতদর্শন পরি-হার করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর মতে 'আমি তাঁর নিত্য দাস',—এই ভাবই মুক্তির হেতু। তাঁর বেশীর ভাগ গ্রন্থই এখনও অমুদ্রিত থাকায় তাঁর সম্বন্ধে খুব বিস্তৃততর ভাবে বলা সম্ভবপর নয়। জীবনের শেষ দিনে তিনি যে সঙ্গীতটি রচনা করেছিলেন, তাই আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি: 'আজকের দিনই সব থেকে মঙ্গলময় দিন, এই সপ্তাহ পুণ্য সপ্তাহ, আজকের নক্ষত্রও মঙ্গলময়, আজকের সংঘটনও মঙ্গলময়, সব থেকে মঙ্গলময় সেই দিন, যেদিন পুরন্দর বিট্‌ঠলের নাম কীর্তন করা হয়'।[২] (ক্রমশঃ)

[২] পুরন্দরদাসের মৃত্যু দিবস নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়। এ বিষয়ে কর্ণাটক কবি-চরিতে দ্বিতীয় খণ্ড ও কর্ণাটক ভক্তবিজয়, প্রথম খণ্ড, ২৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

The vast mass of Indian people are dualists. Human nature ordinarily cannot conceive of anything higher. We find that ninety per cent of the population of earth who believe in any religion are dualists. All religions of Europe and Western Asia are dualistic, they have to be.

This is the religion of the masses all over the world. They believe in a God who is entirely separate from them, a great king, a high, mighty monarch as it were.

—*Swami Vivekananda.*

ধর্মসংস্কারক রামমোহন

অধ্যাপক শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে রামমোহন রায়ের কীর্তি অবিস্মরণীয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে, বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিকাশে, সমাজ ও ধর্মসংস্কারে, রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষসাধনে রামমোহন রায়ের অবদানকে উপেক্ষা ক'রে এ যুগের কোনও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হ'তে পারে না। ঐতিহাসিক বিচারে রামমোহন শুধু একজন ব্যক্তি নন, তিনি একটি বিশিষ্ট ভাবধারার—একটি বিশিষ্ট আন্দোলনেব প্রতীক, এবং উনবিংশ শতাব্দীর যুগাদর্শের রূপায়ণে সেই ভাবধারা ও আন্দোলন যে একটি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে—একথা কোনমতেই অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে রামমোহনেব কীর্তিকলাপ নিয়ে শুধু উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রশংসা অথবা বিদ্বেষমূলক নিন্দা করার দিন বহুকাল গত হয়েছে। আজ পর্যন্ত এ ধরনের স্তুতি বা নিন্দা যা করা হয়েছে তার অধিকাংশের পশ্চাতেই রয়েছে সাম্প্রদায়িক মনোভাব। তা থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রামমোহনের কীর্তিকলাপের যথাযথ মূল্য নিরূপণের চেষ্টা আজ ইতিহাস-সচেতন বাঙ্গালী মাত্রেরই কর্তব্য। একটি প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে রামমোহনের প্রতিভার সম্পূর্ণ বিচার করা অসম্ভব। বর্তমান প্রবন্ধে শুধু তাঁর ধর্মসংস্কারক রূপটিরই কিছু আলোচনা করা হবে।

রামমোহনের জীবনী আলোচনা ক'রলে এ সিদ্ধান্তে কোনমতেই আসা যায় না যে প্রথম জীবন থেকেই ধর্মসংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার কোন বাসনা তাঁর মনে জেগেছিল। তাঁর বাল্য ও কৈশোর কালের কয়েকটি কাহিনী অবশ্য লোকমুখে প্রচলিত আছে, যা থেকে মনে হ'তে পারে যে অল্প বয়সেই তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের ধর্মে আস্থা হারিয়েছিলেন। ধর্মের ব্যাপারে পিতার সঙ্গে মনান্তরের ফলে তাঁর গৃহত্যাগ এবং বহু দেশ-পর্যটনের, এমনকি তিব্বত গমনের কাহিনীও লোকমুখে প্রচলিত। কিন্তু রামমোহনের আত্মজীবনী ব'লে যে রচনাটি বিলাতের Athenœum পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল (৫ই অক্টোবর, ১৮৩৩) এবং যাকে এই সকল কিংবদন্তীর প্রমাণরূপে গণ্য করা হয়, রামমোহনের জীবনীকার শ্রীমতী কলেট তাকে রামমোহনের রচনা বলেই স্বীকার করেন নি। আধুনিক যুগের ঐতিহাসিকদের মধ্যেও ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বহু গবেষণা ক'রে প্রমাণ করেছেন যে এই সব জনশ্রুতির পশ্চাতে সত্য খুবই কম। ব্রজেন্দ্রনাথের মতে প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত রামমোহন "সে যুগের সকল সমৃদ্ধ ভদ্রসন্তানের মত স্বগ্রামে থাকিয়া পিতার ও নিজের সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত ছিলেন। হয়ত বা তখন তাঁহার সাধারণ ভদ্রলোক অপেক্ষা ফার্সী ও সংস্কৃত জ্ঞান বেশী ছিল, কিন্তু তখনো তিনি দেশাচার বা প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে কোনরূপ বিদ্রোহ করেন নাই।" (*সাহিত্যসাধকচরিতমালা*—১৬, পৃঃ ৪১)।

১৭৯৬ খৃঃ বাইশ বৎসর বয়সে পারিবারিক বিগ্রহ-সেবার ভার-বহনের অঙ্গীকার ক'রে তিনি

পিতার নিকট হ'তে সম্পত্তি গ্রহণ করেন। ১৮০৩ খৃঃ পিতার মৃত্যুর পর রামমোহন কলকাতায় পিতৃশ্রাদ্ধও করেছিলেন। অবশ্য এর পূর্বেই রামমোহন যে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেছিলেন তার মধ্যে তাঁর ভবিষ্যৎ ধর্মমতের বীজ নিহিত ছিল, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। তা না হ'লে পঁচিশ বৎসর বয়সের রামমোহন এবং চল্লিশ বৎসর বয়সের রামমোহনের মধ্যে এতটা পার্থক্য কখনই সম্ভব হ'ত না। পঁচিশ বৎসর বয়সের ভিতরই রামমোহন সংস্কৃত, আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা করেছিলেন এবং মোটামুটিভাবে হিন্দু দর্শনশাস্ত্র, বিশেষতঃ বেদান্ত, স্মৃতি, তন্ত্র ও পুরাণ, কিছু বৌদ্ধ (মহাযান) ও জৈন দর্শন এবং ইসলাম ধর্মের মূল তত্ত্ব অধিগত করেছিলেন। স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পালের মতে তিনি মুসলমানদের ভিতর চিন্তাস্বাতন্ত্র্যের জন্য বিখ্যাত মুতাজিলা সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদও আয়ত্ত করেছিলেন।

১৭৯৭ খৃঃ হ'তে রামমোহন বৈষয়িক কার্যে কলকাতায় যাতায়াত আরম্ভ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই সদর দেওয়ানী আদালত ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে। কলকাতায় রামমোহন এক সম্পূর্ণ নূতন জগতের সন্ধান পান এবং এর পরেই তাঁর মনে সংশয় ও বিদ্রোহের সূচনা হয়। পরে ১৮০৫ হ'তে ১৮১৫ খৃঃ পর্যন্ত প্রায় দশ বৎসর ইংরেজ রাজকর্মচারী জন ডিগ্‌বীর সান্নিধ্যে বসবাসের ফলে তাঁর ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারা গ্রহণের সুযোগ ঘটে। ধর্মের ক্ষেত্রে যুক্তিবাদের আদর্শ এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে জাতীয়তার আদর্শ তাঁকে এই সময় হতেই প্রভাবিত করতে থাকে। একদিকে যেমন আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস ও বিখ্যাত ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ গঠনে সহায়তা করে, অপরদিকে তেমনি বেকন, লক্, হিউম্, গিবন্ ও ভল্‌টেয়ারের রচনাবলী তাঁকে দার্শনিক যুক্তিবাদের দিকে আকৃষ্ট করে। প্রথম দিকে এই পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে তিনি কিছুটা সংশয়বাদী হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু পরে আবার ভারতীয় বেদান্তদর্শনে তাঁর আস্থা ফিরে আসে। ১৮১২ হ'তে ১৮১৪ খৃঃ পর্যন্ত রঙপুরে প্রবাসকালে রামমোহন হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর সাহচর্যে হিন্দুদর্শনের—বিশেষতঃ তন্ত্রশাস্ত্রের রীতিমত চর্চা করেন। ১৮১৪ খৃঃ রামমোহন ডিগ্‌বীর চাকরি পরিত্যাগ ক'রে কলকাতায় স্থায়িভাবে বসবাস আরম্ভ করেন এবং এরপর হতেই তাঁর ধর্মসংস্কার প্রচেষ্টার সূচনা হয়। অর্থাৎ, রামমোহনের জীবনের প্রায় ষাট বৎসরের মধ্যে মাত্র শেষের কুড়ি বৎসর তিনি সম্পূর্ণভাবে ধর্মসংস্কারের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন।

রামমোহনের রচিত প্রথম দার্শনিক গ্রন্থ 'তুহ্ফাৎ-উল-মুয়াহিদ্দিন' ফার্সী ভাষায় (ভূমিকাটি মাত্র আরবীতে) প্রকাশিত হয় ইংরেজী ১৮০৩-১৮০৪ খৃঃ। পরবর্তীকালে প্রকাশিত তাঁর অন্যান্য রচনা থেকে এ গ্রন্থটি কিছুটা স্বাতন্ত্র্যের দাবি করতে পারে। রামমোহন তাঁর এই গ্রন্থে প্রচলিত সমস্ত ধর্মমতের এবং জগতের বিভিন্ন ধর্মগুরুর কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করেন। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে সব প্রত্যাদেশের কাহিনী এবং অলৌকিক বা অতিলৌকিক অংশ রয়েছে, সেগুলি সম্পূর্ণরূপে বর্জন ক'রে একমাত্র তাদের মূলতত্ত্ব—একেশ্বরবাদ গ্রহণের জন্য রামমোহন আবেদন জানান। পরবর্তীকালে তাঁর মতামতের এই তীব্রতা অবশ্য অনেকাংশে দূর হয়, যদিও একেশ্বরবাদে বিশ্বাস চিরদিনই রামমোহনের ধর্মমতের প্রধান অঙ্গ হয়েছিল।

১৮১৫ খৃঃ রামমোহন ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় আলোচনার জন্য কলকাতায় 'আত্মীয় সভা' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। আত্মীয় সভার অধিবেশনে শাস্ত্রীয় আলোচনা, বেদপাঠ ও ব্যাখ্যা, ব্রহ্মনীতি প্রভৃতি সবই হ'ত, এমনকি মধ্যে মধ্যে সে যুগের প্রধান সামাজিক কুসংস্কারগুলি এবং তাদের দমনের উপায় নিয়েও আলোচনা হ'ত। প্রথম প্রথম এই সভার অধিবেশনে কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসতেন। এঁদের মধ্যে জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ ঠাকুর, পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুর, টাকীর জমিদার কালীনাথ মুন্সী, ভূকৈলাসের জমিদার রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, রাজনারায়ণ বসুর পিতা নন্দকিশোর বসু এবং বৃন্দাবন মিত্র, ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরতন হালদার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই যে রামমোহনের ধর্মমত আন্তরিক ভাবে সমর্থন করতেন তা নয়, অনেকে রামমোহনের মতো প্রতিভাশালী ব্যক্তির আনুকূল্য লাভের জন্য এবং বৈষয়িক ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ গ্রহণের জন্যও সভায় যাতায়াত করতেন। ক্রমে ক্রমে যখন রামমোহনের ধর্মমত হিন্দুসমাজে বিপ্লবের সূচনা ক'রল তখন এঁদের অনেকেই ভয়ে রামমোহনের সঙ্গ ত্যাগ করেন। কয়েক বৎসর পরে রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'র অধিবেশন আপনা হতেই বন্ধ হয়ে যায়।

১৮১৫ খৃঃ রামমোহনের 'বেদান্ত গ্রন্থ' (ব্রহ্মসূত্রের অনুবাদ) প্রকাশিত হয় এবং ১৮১৬ হ'তে ১৮১৯ খৃঃ মধ্যে পাঁচটি প্রধান উপনিষদ্—ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্যের, বঙ্গানুবাদও তিনি প্রচার করেন। ১৮১৫ খৃঃ (মতান্তরে ১৮১৬) তাঁর 'বেদান্তসার' গ্রন্থও রচিত হয়েছিল। সে যুগে বাংলা দেশে বেদ, উপনিষদ্ প্রভৃতির চর্চা খুবই কমে এসেছিল। রামমোহন আবার নূতনভাবে বেদান্তচর্চার সূত্রপাত করেন। বাংলা ভাষায় তিনিই বেদান্তের সর্বপ্রথম ব্যাখ্যাতা, অবশ্য রামমোহন বেদান্তের কোন নিজস্ব বিশেষ ব্যাখ্যা দেননি, শঙ্করাচার্যকৃত বেদান্তের অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যাই তিনি প্রচার করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে তিনি হিন্দুদের প্রাচীন ও অতিসম্মানিত শাস্ত্র প্রকাশ ক'রে প্রমাণ ক'রে দেবেন যে হিন্দুধর্মে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাই শ্রেষ্ঠ ব'লে স্বীকৃত হয়েছে এবং পরবর্তীকালে সাকার উপাসনা ও বহু দেবদেবীর পূজার উপর প্রতিষ্ঠিত যে পৌরাণিক ধর্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়েছে, তাই ভারতীয় হিন্দুসমাজের অবনতির জন্য মূলতঃ দায়ী। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে পৌরাণিক ধর্মমতের বিচারে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গী ও পরবর্তী যুগের ব্রাহ্ম নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য ছিল। রামমোহন সাকার উপাসনার সমর্থন না করলেও এবং স্বার্থপর লোভী পুরোহিত-সম্প্রদায়কে এর বহুল প্রচলনের জন্য দায়ী করলেও এ-কে ধর্মক্ষেত্রে নিম্নস্তরের অধিকারীদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ব'লে স্বীকার করেছিলেন। বেদান্ত গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন: "অতএব এইরূপ পুরাণতন্ত্রের বর্ণন দ্বারা পূর্ব পূর্ব যে সাকার বর্ণন কেবল দুর্বলাধিকারীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত করিয়াছেন, এই নিশ্চয় হয়।" তাঁর রচিত ঈশোপনিষদের ভূমিকাতে রামমোহন পুরাণ ও তন্ত্রাদিকে শাস্ত্রের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হননি, কারণ "পুরাণ ও তন্ত্রাদিও পরমাত্মাকে এক এবং বুদ্ধি-মনের অগোচর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।" রামমোহনের এই উদারতা পরবর্তীকালের ব্রাহ্মনেতাদের মধ্যে একেবারেই দেখা যায় না।

রামমোহনের বেদান্ত-মতপ্রচারের চেষ্টাকে সে যুগের হিন্দুসমাজ আদৌ সমর্থন করেনি।

১৮১৭ খৃঃ পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বেদান্তচন্দ্রিকা' ইংরেজী অনুবাদ সহ প্রকাশিত হয়। মৃত্যুঞ্জয় তাঁর গ্রন্থে পৌরাণিক ধর্মমত, অর্থাৎ মূর্তিপূজা ও বহু দেবদেবীর পূজা সমর্থন করেন এবং ঐ মত যে বেদান্তবিরোধী নয়, তা শাস্ত্রীয় যুক্তিসহ প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রধান বক্তব্য ছিল: সগুণ ব্রহ্ম নিরাকার হলেও অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে আকার ধারণে সক্ষম। বেদান্তমতে ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ দুই-ই হওয়াতে দেবদেবী মাটিপাথরের পূজাতেও জগতের উপাদান কারণ ব্রহ্মেরই পরোক্ষভাবে পূজা করা হয়। প্রতিমাপূজা দ্বারা মানসিক চাঞ্চল্য দূর হ'লে সহজে উপাস্য বিষয়ে মনোনিবেশ হয়। লোকৈষণা বিত্তৈষণা প্রভৃতি কামনা-বাসনা মন হ'তে যতদিন না একেবারে দূর হয়, ততদিন অদ্বৈতজ্ঞানের সাধক হওয়া যায় না, তত্ত্বজ্ঞানের বীজও ততদিন জন্মে না, এবং যতদিন এই তত্ত্বজ্ঞান না হয়, ততদিন শাস্ত্রীয় আচার পরিত্যাগ করা কোনমতেই সমীচীন নয়। আপন দেহের মিথ্যাত্ব জ্ঞান না হ'লে দেববিগ্রহের মিথ্যাত্ব প্রচার করা অন্যায় এবং অশাস্ত্রীয়। মৃত্যুঞ্জয়ের যুক্তি কতদূর প্রমাণসহ দার্শনিকরাই তার বিচার করবেন, তবে দার্শনিক না হয়েও একথা বলা যায় যে ভারতীয় অদ্বৈতবাদের ইতিহাসে রামমোহনের যাঁরা পূর্বসূরী তাঁরা কেউই সম্পূর্ণভাবে প্রতিমাপূজার বিরোধী ছিলেন না। যে শঙ্করাচার্যের বেদান্তব্যাখ্যা রামমোহন মূলতঃ গ্রহণ করেছিলেন, তিনিও চরম আত্মোপলব্ধির পূর্বস্তর পর্যন্ত সাকার উপাসনার যৌক্তিকতা স্বীকার করেছিলেন। এ বিষয়ে যে রামমোহনের কিছুটা নূতনত্ব আছে, তা অস্বীকার করা চলে না। মৃত্যুঞ্জয়ের দু'একটি যুক্তির সঙ্গে আমরা পরবর্তী যুগের শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশের আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করি। মৃত্যুঞ্জয় একস্থানে বলেছেন: "মহারাজাধিরাজকে অতি ক্ষুদ্র লোকেরা শ্রদ্ধাভক্তিতে যৎকিঞ্চিৎ ফুলজল যদি দেয়, তবে তিনি কি তাহাতে আমোদ করেন না! ······পিতাকে বালকেরা মিষ্টান্ন বলিয়া মৃৎখণ্ড দিলে তিনি কি তৎপরিতোষার্থে হাতে লইয়া মুখ নাড়েন না।" (রামমোহন গ্রন্থাবলী: সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ: পৃঃ ১৪৬)। 'কথামৃতে'ও আমরা দেখি যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন: ছোট ছেলে বাবাকে বাবা ব'লে ডাকতে না পারলে বাবা কি তাকে কম স্নেহ করবে? (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত: দ্বিতীয় সংস্করণ : ৪র্থ ভাগ : পৃঃ ৯৩)। অবশ্য রামকৃষ্ণদেব মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন—একথা মনে করার কোন কারণ নেই। মৃত্যুঞ্জয়ের এই প্রতিবাদ-গ্রন্থের উত্তর হিসাবে রামমোহন ১৮১৭ খৃঃ তাঁর 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। রামমোহন তাঁর এই রচনায় বহু যুক্তির সাহায্যে অদ্বৈত মত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন, এবং সাকার উপাসনাকে গৌণ সাধনা হিসাবে স্বীকার করেও নিরাকার উপাসনাই যে শ্রেষ্ঠ সাধনা, এ কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। রামমোহন বলেন, আত্মোপাসনা কঠিন হলেও যথাসাধ্য তারই জন্য চেষ্টা করা উচিত, কারণ সাকার উপাসনাও যথারীতি অনুষ্ঠান করা প্রায় দুঃসাধ্য।

রামমোহন তাঁর বেদান্তসম্মত শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা সে যুগের রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন, বলা বাহুল্য, এত সহজেই তার নিবৃত্তি হয়নি। স্বমত প্রতিষ্ঠার জন্য রামমোহনকে আরও অনেক পণ্ডিতের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হতে হয়েছিল, এবং সে যুগে রচিত কয়েকটি পুস্তিকা আজও সেই বাদপ্রতিবাদের সাক্ষ্য বহন করছে। এই পুস্তিকাগুলির মধ্যে 'উৎসবানন্দ

বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার' (১৮১৬-১৭), 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৮ জুন), 'সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার' (১৮২০) 'কবিতাকারের সহিত বিচার' (১৮২০), 'চারি প্রশ্নের উত্তর' (১৮২২) ও 'পথ্যপ্রদান' (১৮২৩) উল্লেখযোগ্য। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সঙ্গে বিচার ১৮১৯ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে আত্মীয় সভার এক অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয়। এই বিচারে রামমোহন ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য বর্ণাশ্রমধর্মের অনুষ্ঠান প্রশস্ত—এ কথা স্বীকার করেন, কিন্তু বেদব্যাসের সূত্র উদ্ধৃত ক'রে প্রমাণ করেন যে বর্ণাশ্রমধর্মের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকেও ব্রহ্মজ্ঞানলাভ সম্ভব। উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশও রামমোহনের সঙ্গে বিচারে পরাস্ত হন এবং শেষ পর্যন্ত রামমোহনের জীবদ্দশাতেই ব্রাহ্ম সমাজের প্রার্থনাসভায় উপনিষদ্ পাঠের ভার গ্রহণ করেন। 'চারি প্রশ্নের উত্তর', 'পথ্যপ্রদান' ও 'গুরুপাদুকা' (১৮২৩) প্রতিপক্ষের আক্রমণ রোধ করার জন্য রচিত হয়েছিল। রামমোহন এই পুস্তিকাগুলিতে তাঁর উপর বিভিন্ন দিক হ'তে যে সব প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বর্ষিত হচ্ছিল, তাদের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেন। তিনি হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করেছেন কি না, এই মূল প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে বর্তমান যুগে শাস্ত্রের প্রতিটি ক্ষুদ্র নির্দেশ দৈনন্দিন জীবনে পালন করা অসম্ভব, এবং তিনি নিজে সেগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন না, এ কথা সত্য, কিন্তু হিন্দুধর্মের মূল কথা একেশ্বরবাদ এবং একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী মাত্রেই নিজেকে হিন্দু ব'লে পরিচয় দিতে পারে। ১৮১৬ খৃঃ মাদ্রাজী পণ্ডিত শঙ্কর শাস্ত্রী 'মাদ্রাজ কুরিয়ার' পত্রে রামমোহনের ধর্মমতকে আক্রমণ ক'রলে রামমোহন তার উত্তরে ১৮১৭ খৃঃ A Defence of Hindoo Theism নামে এক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। রামমোহনের শাস্ত্রজ্ঞান এ সব সনাতনপন্থী পণ্ডিতদের কারও চেয়ে কম ছিল না এবং নিছক তর্কের দিক থেকে বিচার ক'রলে তিনি প্রায় প্রতিবারই জয়ী হয়েছিলেন। ১৮১৮ খৃঃ রামমোহন 'গায়ত্রীর অর্থ' নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেন এবং ভগবদ্গীতারও একখানি পদ্যানুবাদ তিনি রচনা করেছিলেন ব'লে জানা যায়। ১৮২৫ খৃঃ পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে ভারতীয় বেদান্তদর্শন শিক্ষা দেবার জন্য তিনি কলকাতায় বেদান্তকলেজ প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি।

নূতন ধর্মমত প্রচারের জন্য রামমোহনকে একদিকে যেমন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হ'তে হয়, অপরদিকে তেমনি গোঁড়া খৃষ্টান পাদরিদের সঙ্গে তাঁর তর্কবিতর্ক বাধে। খৃষ্টান ধর্মশাস্ত্রের প্রতিও রামমোহনের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বাইবেলের 'ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট্' অংশ মূল ভাষায় পাঠের জন্য তিনি হিব্রু ভাষা শিক্ষা করেন। 'নিউ টেষ্টামেণ্ট্'-এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশের ব্যাপারেও তিনি শ্রীরামপুরের মিশনারিদের সাহায্য করেন। কিন্তু শীঘ্রই কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে মিশনারিদের সঙ্গে রামমোহনের বিবাদ বাধে। রামমোহন খৃষ্টের জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলীকেই খৃষ্টধর্মের সারতত্ত্ব ব'লে বিবেচনা করেননি এবং খৃষ্টের অবতারত্বেও তিনি সন্দিহান ছিলেন, যদিও তাঁকে একজন ঈশ্বরপ্রেরিত মহামানব ব'লে স্বীকার করতে কখনও কুণ্ঠিত হননি। রামমোহনের মতে খৃষ্টের উপদেশের মধ্যে মানুষের মন, চরিত্র ও ধর্মবুদ্ধি উন্নত করবার যথেষ্ট উপাদান রয়েছে এবং সেগুলিই খৃষ্টধর্মের মূল তত্ত্ব। ১৮২০ খৃঃ তিনি Precepts of Jesus নাম দিয়ে খৃষ্টের উপদেশের একটি সারসঙ্কলন

প্রকাশ করেন এবং এই সঙ্কলনকে উপলক্ষ্য করেই খৃষ্টান পাদরিদের সঙ্গে তাঁর তর্ক বাধে। শ্রীরামপুরের পাদরিরা তাঁদের Friend of India পত্রিকায় মন্তব্য করেন যে রামমোহন খৃষ্টধর্ম ভালভাবে না বোঝার ফলে তার সারাংশই বাদ দিয়েছেন। রামমোহন অত্যন্ত শান্তভাবে এই সমালোচনার উত্তর দেন তাঁর Appeal to the Christian Public নামে পর পর প্রকাশিত তিনটি পুস্তিকায় (১৮২০-'২৩)। তিনি বলেন যে খৃষ্টের জীবনের অলৌকিক ঘটনাগুলি তিনি ব্যক্তিগতভাবে অবিশ্বাস করেন না, কিন্তু প্রচলিত হিন্দুধর্মের মধ্যেও এই ধরণের অলৌকিক কাহিনী ও নরপূজার মনোভাব যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় এই সব কাহিনী দ্বারা হিন্দু-মনকে অভিভূত করা যাবে না, এবং তার দ্বারা খৃষ্টধর্ম প্রচারেরও কোন সুবিধা হবে না। এই কাহিনীগুলি খৃষ্টধর্মের মূল কথাও নয়, যার বহুল প্রচারের জন্য তিনি নিজে উদ্‌গ্রীব। রামমোহন তাঁর এই রচনাগুলিতে খৃষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদকেও (Doctrine of Trinity) আক্রমণ করেন এবং তার ফলে কলহ আরও তীব্র আকার ধারণ করে। এই বাদবিসংবাদের ফলে রামমোহন শেষ পর্যন্ত উইলিয়াম অ্যাডাম নামে এক পাদরিকে তাঁর পক্ষে আনতে সক্ষম হন। অ্যাডামের এই অপ্রত্যাশিত মত পরিবর্তনে বাংলাদেশের খৃষ্টান সমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পাদরিরা এই ঘটনাকে 'Fall of Second Adam' নামে অভিহিত করেন এবং কলকাতার তদানীন্তন বিশপ অ্যাডামকে ভারতবর্ষ থেকে কোন অছিলায় বিতাড়িত করা যায় কি না— সে বিষয়ে এটর্নি জেনারেলের পরামর্শ গ্রহণ করেন। অ্যাডাম প্রমুখ খৃষ্টান একেশ্বরবাদীদের (Unitarians) সহযোগিতায় রামমোহন ১৮২১ খৃঃ Unitarian Committee নামে আর একটি সভা স্থাপন করেন। এই সভার ধর্মমত খৃষ্টান ধর্ম হ'তে গৃহীত হয়েছিল ও সভাতে Unitarian খৃষ্টান মতেই উপাসনা করা হ'ত। পুত্র রাধাপ্রসাদ, অপর কয়েকজন আত্মীয় এবং তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব নামে দুজন শিষ্য সহ রামমোহন এই সভার প্রার্থনায় যোগ দিতেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সভাও খুব কার্যকরী হয়নি। অবশ্য রামমোহনের সঙ্গে অ্যাডামের সৌহার্দ্য আজীবন অটুট ছিল। ১৮২৩ খৃঃ 'রামদাস' ছদ্ম নামে রামমোহন ডাক্তার টিট্‌লার নামে জনৈক ত্রিত্ববাদীর উপর বিদ্রূপাত্মক আক্রমণ আরম্ভ করেন। ঐ বৎসরেই প্রকাশিত 'পাদরি ও শিষ্য সম্বাদ' নামে এক পুস্তিকাতেও আমরা এই ধরণের আক্রমণ লক্ষ্য করি; বলা বাহুল্য এই পুস্তিকাটিও রামমোহনের রচনা। ১৮২৩ খৃঃ রামমোহনের একটি ইংরেজী পুস্তিকা 'Humble Suggestions to his countrymen who believe in the One True God' প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নামে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকায় রামমোহন তাঁর অনুবর্তীদের ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান পাদরিদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ জানান। ১৮২৭ খৃঃ চন্দ্রশেখর দেবের নামে প্রকাশিত একটি রচনায় রামমোহন খৃষ্টান ত্রিত্ববাদকে হিন্দুর বহু দেবদেবী-পূজার নামান্তর ব'লে ঘোষণা করেন। খৃষ্টান পাদরিদের হিন্দুধর্মের উপর বিদ্বেষমূলক আক্রমণ রোধ করবার জন্য ১৮২১ খৃঃ রামমোহন শিবপ্রসাদ শর্মার ছদ্মনামে 'ব্রাহ্মণিক্যাল ম্যাগাজিন—ব্রাহ্মণ-সেবধি' নামে ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮২৩ খৃঃ পর্যন্ত এই পত্রিকার চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। আমেরিকার জনৈক বিশপ হেনরী ওয়্যারকে লিখিত কয়েকটি পত্রে (১৮২৩-২৭) রামমোহন ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম প্রচারের সম্ভাবনা খুবই অল্প ব'লে মত প্রকাশ

করেন। তবে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দানের সঙ্গে খৃষ্টান একেশ্বরবাদ কিছু পরিমাণে প্রচার ক'রলে তা ভারতীয়দের পক্ষে কল্যাণকর হবে ব'লে তিনি মনে করতেন।

অ্যাডাম প্রমুখ খৃষ্টান একেশ্বরবাদীরা হয়তো মনে করেছিলেন যে শেষ পর্যন্ত রামমোহন তাঁদের মতকেই নিজের ধর্ম-হিসাবে গ্রহণ করবেন। কিন্তু ১৮২৮ খৃঃ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা ক'রে রামমোহন তাঁদের একেবারে নিরাশ করলেন। এই নূতন সভা স্থাপনের প্রস্তাব প্রথম তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব করেছিলেন এবং রামমোহন তাঁদের এই প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেন। কারও কারও মতে অ্যাডামই নাকি প্রথম এই সভার পরিকল্পনা করেন, কিন্তু ১৮২৯ খৃঃ ২২শে জানুআরি ডাঃ টাকারম্যান্‌কে লিখিত এক পত্রে অ্যাডাম নিজেই বলেছেন যে শেষ পর্যন্ত যে আকারে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে তাঁর কোন সমর্থন ছিল না। সম্পূর্ণভাবে হিন্দু একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, খৃষ্টান একেশ্বরবাদের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক ছিল না। শুধু অ্যাডাম নয়, রামমোহনের আরও অনেক খৃষ্টান বন্ধু এই সভার প্রতিষ্ঠায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কলকাতার 'জন বুল' পত্রিকার সম্পাদক এই মর্মে দুঃখ প্রকাশ করেন যে রামমোহনের দ্বারা ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম প্রচারের যেটুকু আশা ছিল তা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হ'ল। যাই হোক, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ মুন্সী প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ১৮২৮ খৃঃ ২০শে আগষ্ট রামমোহন এই ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। সে সময় সাধারণ লোকে এই সমাজকে 'ব্রহ্মসভা' নামেই জানত। প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৭টা হ'তে ৯টা পর্যন্ত সভার অধিবেশন চ'লত। বাণ্ডজী নামে একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ বেদ এবং উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ্ পাঠ করতেন। পরে হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর সহোদর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বৈদিক শ্লোকের ব্যাখ্যা করতেন। সবশেষে ব্রহ্মসঙ্গীত হবার পর সভা ভঙ্গ হ'ত। ১৮২৮ খৃঃ রামমোহনের 'ব্রহ্মোপাসনা' ও 'ব্রহ্মসঙ্গীত' নামে দু'খানি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। অবশ্য 'ব্রহ্মোপাসনা'য় উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসারে এ সময়ে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা পরিচালিত হ'ত না। ১৮৩০ খৃঃ ২৩শে জানুআরি ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রায় পাঁচশত হিন্দু এখানে সমবেত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বহু ব্রাহ্মণও ছিলেন। মণ্টগোমারি মার্টিন নামে এক ইংরেজও সেদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক হন তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও প্রথম আচার্য হন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। সমাজে কিভাবে উপাসনা করা হবে—সে বিষয়ে রামমোহন একটি দলিলে (Trust Deed of the Brahmo Samaj) বিস্তারিত নির্দেশ দেন। তিনি বলেন :

ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা পালনকর্তা, আদি অন্ত-রহিত, অগম্য ও অপরিবর্তনীয় পরমেশ্বরই একমাত্র উপাস্য। কোন সাম্প্রদায়িক নামে তাঁহার উপাসনা হইতে পারিবে না। যে কোন ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত উপাসনা করিতে আসিবেন তাঁহারই জন্য জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, সামাজিক পদ নির্বিশেষে মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে। কোন প্রকার চিত্র, প্রতিমূর্তি বা খোদিত মূর্তি এই মন্দিরে ব্যবহৃত হইবে না। প্রাণীহিংসা হইবে না, পান ভোজন হইবে না, জীবই হউক বা জড়ই হউক, কোন সম্প্রদায়ের উপাস্যকে ব্যঙ্গবিদ্রূপের ভাবে উল্লেখ করা হইবে না। যাহাতে পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণার প্রসার হয়, প্রেম নীতি ভক্তি দয়া সাধুতার উন্নতি হয় এবং সকল সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়, এখানে সেই প্রকার উপদেশ, বক্তৃতা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইবে; অন্য কোনরূপ হইতে পারিবে না।"

ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস পরেই রামমোহন দিল্লীর বাদশাহের দূতরূপে বিলাত যাত্রা করেন এবং সেখানেই ১৮৩৩ খৃঃ ২৭শে সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। রামমোহন যতদিন বিলাতে ছিলেন, ততদিন তাঁর পুত্র রাধাপ্রসাদ দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহায়তায় সমাজের তত্ত্বাবধান করতেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর তাঁকে বৈষয়িক ব্যাপারে দিল্লী যাত্রা করতে হয় এবং কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর তিনি আর সমাজের বিষয় চিন্তা করেননি। তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব রামমোহনের অনুপস্থিতিতে বর্ধমান রাজসরকারে চাকরি গ্রহণ ক'রে কলকাতা ত্যাগ করেন। কিছুদিনের মধ্যে রামমোহনের বন্ধুরা একে একে সকলেই সমাজকে পরিত্যাগ করেন। শেষ পর্যন্ত কেবল দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশই সমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সমাজের এই ঘোর দুরবস্থা হ'তে তাকে অবশেষে রক্ষা করেন দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ, কিন্তু সে ঘটনা ঘটে আরও প্রায় দশ বৎসর পরে। [ক্রমশঃ]

দ্বন্দ্ব অবসান

শ্রীনুটবিহারী চট্টোপাধ্যায়

মত ও পথের গোলকধাঁধায়
গুলিয়ে ফেলি ঠিক বেঠিক।
মন যাহা চায় ত্যাজ্য তাহা
ক'রলে বিচার সকল দিক।

কেউ বা বলেন, পুরুষকার
ছাড়া যে আর নাইক পথ।
জ্ঞানের বিচার—অন্যমতে,
পুরায় সবার মনোরথ।

শাস্ত্র বলেন, অনাকাঙ্ক্ষী
কর্মে কাটায় কর্মভোগ।
আবার শুনি, কলিকালে
উপায় শুধুই ভক্তিযোগ।

ভোগের চেয়ে ত্যাগই বড
সকল শাস্ত্রে এমন কয়।
ভোগের লালস কাটেনি যার
তাহার তবে কি উপায়?

ব্রহ্ম সাকার কি নিরাকার
কোথায় বা এর সমাধান?
দ্বৈতাদ্বৈত কোনটি সত্য,
কোথায় পাব তার প্রমাণ?

মত ও পথের কুহেলিকায়
বাঁশের বনে ডোমের প্রায়—
বুদ্ধি বিবেক হার মেনে যায়
উপায় খুঁজে নিরুপায়।

দেখে ঠেকে এই বুঝেছি,
যতই থাকুক মতের ভেদ,
তুমিই আমার সত্য, প্রভু,
ঘুচাও সকল মনের খেদ।

গুরু, সখা, সহায় তুমি
লইনু শরণ তোমার ঠাঁই।
চালাও এ রথ, হে সারথি,
দ্বন্দ্ব দ্বিধার বালাই নাই॥

গীর্নার তীর্থ

স্বামী আপ্তকামানন্দ

[সৌরাষ্ট্রে গিরনার অতি পবিত্র পর্বত , ইহাই প্রসিদ্ধ রৈবত গিরি বা উজ্জয়ন্ত। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণলীলায় যাদবদের ইহা ক্রীড়াভূমি। ভগবান্ দত্তাত্রেয়ের এখানে নিত্যনিবাস। গোরক্ষনাথ প্রমুখ যোগিগণের ইহা তপোভূমি। আদিনাথ, নেমিনাথ প্রভৃতি জৈন তীর্থঙ্করগণের ইহা মোক্ষভূমি। সিদ্ধক্ষেত্র এই পুণ্য পর্বতের স্তরে স্তরে ভারতের বিভিন্ন যুগের ধর্মসাধনার শত চিহ্ন একত্র পড়িয়া আছে। গিরনার ভারতের মর্মবাণী ধর্মসমন্বয়ের প্রাকৃতিক একটি স্মৃতিস্তম্ভ। গিরিনগর 'গিরনার' , গীর্নার গীর্ণার প্রভৃতি বানানও প্রচলিত। উঃ সঃ।]

জুনাগড ষ্টেশন হইতে পাঁচ মাইল পূর্বে সুবিখ্যাত গীর্নার পর্বত, প্রাচীনকালেব তপোভূমি আজও স্বীয় শাশ্বত মহিমা বিস্তার করিয়া সগর্বে দণ্ডায়মান। দেশবিদেশেব পর্যটক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও হিন্দু সাধকগণের অভীপ্সিত লক্ষ্য, এবং জৈন বৌদ্ধ মুসলমান সাধকদেরও পবিত্র তীর্থ। দেবলীলাব পৌরাণিক স্মৃতি তার বক্ষে, বহুবিধ খনিজ দ্রব্যের আকর গীর্নার ভবিষ্যৎ ভারতের আশার প্রদীপ।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে শোভমান মৃগপক্ষি-সমাকুল সৌরাষ্ট্রে উজ্জয়ন্ত পর্বত—পুণ্যশৈল গীর্নারকে মর্ত্যের স্বর্গলোক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জরাসন্ধের পুনঃপুনঃ আক্রমণ হইতে দূরে নির্বিঘ্নে প্রজা পালনার্থে শ্রীকৃষ্ণ রৈবতক পর্বতে আশ্রয় লইলেন। প্রবাদ—গীর্নাবই রৈবতক। পর্বতশৃঙ্গ হইতে স্বর্ণরেখা নদী নির্গত হইয়া পাতালে প্রবেশ কবিযাছে, পাতাল হইতে পুনরায় বহির্গতা হইয়া গঙ্গারূপে প্রবাহিতা। পাহাড়ের চতুঃসীমায় পথে পথে বহু গ্রাম ও নগর পরিবেষ্টিত হইয়া সুপবিত্র বস্ত্রাপথক্ষেত্র। উহারই পশ্চিমে উন্নবিন্ধ গিরি—ভীম কর্তৃক উন্নক নামক অসুবের নিধনক্ষেত্র।

নব নব তীর্থ দর্শনের অদম্য পিপাসা যাত্রীকে দেশ হইতে দেশান্তরে, জলে স্থলে অরণ্যে, পর্বতে উপত্যকায় লইয়া যায়। দাক্ষিণাত্য, মহারাষ্ট্র ভ্রমণ করিয়া রাজকোটে উপনীত হইলাম। সপ্তাহকাল সেখানে বিশ্রামান্তে শ্রীভগবানের করুণা সম্বল করিয়া পরিব্রাজকের বেশে দ্বারকায় ও বেট-দ্বাবকার শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল দর্শন করিয়া আচার্য শংকর-প্রতিষ্ঠিত শারদামঠ-দর্শনে হৃদয়-মন আনন্দরসে আপ্লুত হইল। কত শত সাধুসন্ন্যাসী—কত পণ্ডিত এখানে শাস্ত্রালোচনায় কালাতিপাত করিয়াছেন, তাঁহাদের আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ এই স্থান। বর্তমানে সেই সকল মহাপুরুষ কোথায়?—ভাবিতে ভাবিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিতাম। অতীত ভারতের পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত দ্বারকা প্রবল পরাক্রান্ত যাদববীরগণের পদভরে কম্পিত হইত। পোরবন্দরে প্রাচীন সুদামাপুরী, জৈনমন্দিব, বিখ্যাত হাটকেশ্বর শিবালয, মহাত্মা গান্ধীজীর জন্মস্থান, ভেরাওয়ালে সোমনাথের মন্দির, সূর্যমন্দির, প্রভাসতীর্থ, শ্রীকৃষ্ণের যোগসমাধিতে তনুত্যাগক্ষেত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া দর্শন করিলাম।

গীর্নার পর্বতে কষ্টকর চডাইয়ের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শিহরিয়া উঠিলাম, আশা নিমিষে মিলাইয়া গেল। অকূল বারিধির কূলে উপবেশন করিয়া উদ্দাম উত্তাল তরঙ্গমালা নিরীক্ষণ করিতে করিতে হৃদয়োত্থিত বিরাটের ভাবে অভিভূত হইয়া অন্তহীন চিন্তায় দিক্‌হীন কূলহীন কল্পনা-সাগরে কাণ্ডারীহীন হইয়া ভাসিতেছি।

মেঘে মেঘে ঘর্ষণে বিদ্যুৎ-বহ্নি চমকিত, কম্পান্বিত পৃথ্বীতল ভীত, সচকিত। বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে, গর্জনের অপেক্ষা বর্ষণ নিতান্ত কম। যাত্রীবাহী গাড়ী ভেরাওয়াল ষ্টেশনে অপেক্ষমাণ, প্রতীক্ষালয়ে একাকী বসিয়া আছি, পরিশ্রান্ত দেহ বিশ্রামে নিমজ্জমান। ধীরে ধীরে ধারা ঝরিতেছে, ক্ষণস্থায়ী বারিধারা মানবের দৈনন্দিন কর্মসূচীর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যেন সমষ্টির কল্যাণ-কামনায় উৎসর্গীকৃত। নির্জন কক্ষে অল্পান্ধকারে ও কাহার পদশব্দ? অজ্ঞাতনামা সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ব্যক্তি, প্রফুল্লবদন, শ্রদ্ধা-ভালবাসায় অবনতমস্তক, সেবায় উন্মুখ, বিনয়নম্র বচনে নিবেদন করিলেন, "এই আপনার টিকিট গন্তব্যস্থানে আপনাকে পৌঁছাইয়া দিবে।" হৃদয়াবেগ সংবরণ করত ট্রেনের কামরায় গিয়া বসিলাম। ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে বংশীধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল কাঁপাইয়া সর্বাঙ্গ হেলাইয়া দুলাইয়া আমাদের বাহন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে। মানবমহত্ত্বে অভিভূত আমি! কতক্ষণ এ ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল বলিতে পারি না। সহসা বাহ্যচেতনায় প্রত্যক্ষ করিলাম—আকাশ নির্মেঘ, রৌদ্রকিরণে চারিদিক ঝকমক করিতেছে, আমি গীর্নারের পদপ্রান্তে উপনীত! লীলাময়ের লীলায় ইহা এক অনির্বচনীয় অঘটন ঘটনা।

নিরঞ্জনী আখড়ার নির্মল পরিবেশে আশ্রয় পাইলাম। তিন জন সাধু, প্রত্যেকেরই পৃথক গৃহে আসন, অতিথির নিমিত্তও অনুরূপ ব্যবস্থা। গবাক্ষপথে শৈলোপরি দৃষ্টি প্রসারিত, দেবপুরীর কল্পনায় বিভোর! কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালা স্বর্গপুরীর চতুর্দিকে সতর্ক প্রহরীর মতো ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল, অস্তায়মান দিনমণি অবকাশের সুযোগে ক্ষণকালের নিমিত্ত চারিদিক দেখিয়া লইলেন—আখড়ার আনাচে-কানাচে, বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় তখনও ম্লান রশ্মিচ্ছটা ছড়াইয়া রহিয়াছে। সন্ধ্যা-সমাগমে মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা মন্দিরা চিমটার ঝনাৎঝনাৎ ঝনঝন শব্দ উঠিতে লাগিল। শিবমূর্তির সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান ভক্তমণ্ডলী ও সাধুবৃন্দের 'শিবোঽহং' ধ্বনিতে স্থানটি মুখরিত। পূজারীর প্রাণ-ঢালা আরতি, ভোলানাথের ভাবে বিভোর আত্মবিলুপ্তি চিরকাল মনে থাকিবে। শুদ্ধ স্নিগ্ধ একটানা গুরুগম্ভীর স্বর হৃদয়ে ঝংকৃত হইয়া মন্দিরে আশ্রমে পর্বতের স্তরে স্তরে পরিভ্রমণ করিয়া সকলকে মাতাইয়া তুলিল। কালের জ্ঞান লুপ্তপ্রায়, মহাকালের ভাব সকলের মনে প্রাণে। আরতি ও কীর্তনের অবসানে নিথর নিস্তব্ধতা। নাম নামীতে লীন, নাদ ব্রহ্মে মিলিত, যেন 'অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যম্'ভাবে সকলে নিত্য সত্য পূর্ণ জ্ঞানে মহেশ্বর-ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

নিদ্রাভঙ্গে বহির্দেশে দৃষ্টি নিপতিত হইলে অনুভব করিলাম প্রাঙ্গণে ও অলিন্দে অরুণের মধুর কিরণমালা—প্রভাতের উদ্বোধন! প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্বক আসনে বসিলাম। টং টং করিয়া চারিটা বাজিল। বুঝিলাম ইহা অরুণাভাস নহে, জ্যোৎস্না-পুলকিতা যামিনীর বিদায়-বিলাস! বৃক্ষশাখায় বিহঙ্গগণের আনন্দ-নৃত্য, দোয়েল-কোয়েলের প্রভাতী রাগিণীর মধুর আলাপ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে আমিও ঐ সুরে সুর মিলাইয়া সুরের গভীরে ডুবিয়া গেলাম।

প্রাতঃকালে কুঠারী বলিলেন, 'আমাদের অন্য এক আশ্রমের মহান্ত আসিয়াছেন, তাঁহাকে উপরে পাহাড়-দর্শনে লইয়া যাইব, আপনিও সঙ্গে যাইতে পারেন।' সম্মতি জ্ঞাপনান্তে ভাবিলাম, সুযোগ তো মিলিয়া গেল, কিন্তু সামর্থ্যে কি কুলাইবে? শ্রীহরির অচিন্ত্য লীলার রহস্য-উন্মোচন মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য। তাঁহার কৃপায় পঙ্গু গিরি লঙ্ঘনে সমর্থ, মূকও বাগ্মী হইতে পারে, তাঁহার

কৃপা-কটাক্ষে মরুভূমিতে নির্মল-তোয়া স্রোতস্বতী প্রবাহিত হয়।

'জয় গীর্নার বিশালকী জয়' বলিয়া আমরা শুভলগ্নে গীর্নার দর্শনে যাত্রা করিলাম। গিরিনগর হইতে গিরনার বা গীর্নার নামের উৎপত্তি। প্রত্যেকের হস্তে দণ্ড, মস্তকে উষ্ণীষ, কটিতে উত্তরীয়ের শক্ত বন্ধন, নগ্ন পদ। পর্বতের আরম্ভে সিংহমূর্তি-চিহ্নিত প্রবেশদ্বার। সোপানেই যাত্রার প্রস্তাবনা। একের পর এক সোপান উঠিয়াছে, নামিয়াছে, এইরূপ আরোহণ অবরোহণ করিয়াই পর্বতের শিখরদেশে অভিযান। ক্রমে বস্ত্রাপথক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া আমরা উজ্জয়ন্ত বা গীর্নার পর্বতের অধিত্যকায় উপনীত। পথিমধ্যে বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে, সোপানাবলীর দক্ষিণে ও বামে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র বৃহৎ মন্দির—কোনটির মধ্যে গণেশজী, কোনটিতে শিবমূর্তি, কোথাও কালী, দুর্গা প্রভৃতি। বৃহৎ বৃক্ষরাজির অরণ্যমধ্যে মৃগপক্ষী, কোথাও খরগোশের দৌড়াদৌড়ি, কোনখানে প্রকাণ্ড দুরারোহ শিলা কাটিয়া নির্মিত গুহা—এমন কত যে গুহা তাহার ইয়ত্তা নাই, কোনটিতে সাধু ধ্যানস্থ, কোনটি বা জনশূন্য। বিচিত্র সৃষ্টির বিচিত্র লীলা অবলোকন করিতে ১৫০০ ফুট উপরে 'ভৈরো ঝম্পা' নামে একটি স্থানে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। এখান হইতে হাজার ফুট নীচে গভীর খাদে লম্ফ দিয়া পড়িয়া প্রাণ বিসর্জন করিলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়—এইরূপ কিংবদন্তী রহিয়াছে। সম্মুখে পশ্চাতে বহু যাত্রী চলিয়াছে, ক্লান্তিবোধ হইলে সমতলের দৃশ্যাবলীর সৌন্দর্য উপলব্ধি করিবার জন্য বসিয়া পড়িতেছে। সোপানের সমাপ্তি কোথায়? প্রতি পদক্ষেপে সোপান, সোপান বর্জন করিয়া পথ চলিবার উপায় নাই, অগণন অসংখ্য সোপান—দশ হাজার পর্যন্ত গণনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। ভাবিতে লাগিলাম—ইহাই কি স্বর্গের সিঁড়ি?

পর্বতোপরি বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। পাহাড় কাটিয়া নির্মিত তোরণ, উহা অতিক্রম করিলেই দুর্গের ন্যায় দুর্ভেদ্য প্রকারবেষ্টিত ষোলটি জৈন মন্দির—প্রস্তুত-প্রণালী অদ্ভুত, তন্মধ্যে নেমিনাথের মন্দিরই প্রধান। বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রটির নাম উপরকোট, উচ্চতা ২৩৭০ ফুট। কোট অর্থ দুর্গ। পরিখাগুলির গঠন-ভঙ্গিমা দৃষ্টে স্বতই মনে হয় এককালে এখানে দুর্গ ছিল। বহুমূল্য মণিমাণিক্য, রত্নাদিতে মন্দিরগাত্র বিভূষিত। তীর্থঙ্করদিগের মূর্তিগুলি প্রাণবন্ত—নির্জনে সদালাপ করিবার জন্য তাঁহারা যেন সদা উৎসুক। তন্ময় হইয়া মন্দির ও মূর্তি দর্শন করিতে করিতে সঙ্গীদের অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, খোঁজ পাইলাম না। প্রাচীন মহাপুরুষদের কীর্তির বিষয় স্মরণ করিয়া ভক্তিভরে বারংবার প্রণাম জানাইলাম। সুরম্য স্থানের ভাবধারা অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার ন্যায় স্বচ্ছ ও সাবলীল,—ধ্যানের পক্ষে প্রশস্ত, ব্রহ্মাণ্ডের একাত্মতা অনুভবের পক্ষে অনুকূল।

সঙ্গিদ্বয়ের অন্বেষণে তৎপর হইয়া উপত্যকা অধিত্যকা দেবালয়, অমল ধবল নবীন প্রাচীন প্রাকৃতিক সাংস্কৃতিক বৈভব পশ্চাতে ফেলিয়া অনিয়মিত বর্ষার বাধা অগ্রাহ্য করিয়া সংকীর্ণ পিচ্ছিল সোপানপথে চলিতে লাগিলাম, গীর্নার বিশালের আকর্ষণে দ্রুত পদসঞ্চারে ঊর্ধ্বে আরোহণকালে পথিপার্শ্বে এক সাধুর আখড়া দেখিলাম; মদীয় সাথী তথায় চা-পানে রত, আখড়াধীশ আমার দিকে দৃষ্টিপাত করত 'স্বাগত' সম্ভাষণে বসাইয়া চা পান করাইলেন। ধুনির সামনে সাধুর প্রসন্ন অম্লান মুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম, তাঁহার চিন্তাই মনে জাগিতে লাগিল। চা-পানে পরিতৃপ্ত করানো এমন কিছু বড় কথা নহে, কষ্টকর পার্বত্যপথে এক পেয়ালা চা কালিয়া-পোলাও

অপেক্ষা উপাদেয়। সামান্যতার মধ্যে অসামান্যতার স্পর্শ, মাধুর্যময় আতিথেয়তা—দুর্লভ বদান্যতা মনোজগতে মানুষকে অমর করে।

আখড়াটির উত্তরে অল্প ঊর্ধ্বে বানপ্রস্থী আশ্রম ও ধর্মশালা, নিম্নে চিরপ্রসিদ্ধ অম্বাজীর মন্দির—গীর্নারের প্রথম চূড়ার উচ্চতা প্রায় তিন হাজার ফুট। বস্ত্রাপথক্ষেত্রসহ সমস্ত পর্বতশৃঙ্গের খ্যাতি দেশবিদেশে পরিব্যাপ্ত। একদা কৈলাসে শিব ও গৌরী উপবিষ্ট, ভগবান্ বিষ্ণু—ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণ-সমভিব্যাহারে আশুতোষ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, 'ভগবন্! দৈত্যগণ আপনার বরে বলীয়ান হইয়াও দেহাত্মবুদ্ধিগ্রস্ত, মহামায়ার প্রভাবে শারীরিক ক্ষমতাকে একমাত্র জ্ঞান করিয়া মহা অনর্থের সৃষ্টি করিতেছে, এমনকি স্বর্গ মর্ত্য অধিকারে উদ্যত, এখন উপায়? সৃষ্টি রক্ষা হইবে কিরূপে, পালনকার্যই বা কিভাবে সম্ভব?' এই শ্লেষাত্মক বাক্যে মহাদেব যেন রোষাবেশে হঠাৎ অন্তর্হিত হইলেন। পর্বতারোহণের পথে পথে স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র ত্যাগ করিয়া তিনি অদৃশ্যভাবেই রহিলেন, বস্ত্র ত্যাগ করার জন্য এই স্থান 'বস্ত্রাপথক্ষেত্র' নামে পরিচিত। তখন হইতে বিষ্ণু রৈবতকে, পার্বতী অম্বা নামে উজ্জয়ন্ত গিরিশৃঙ্গে বিশেষভাবে বিদ্যমান রহিছেন বলিয়া সকলের বিশ্বাস। তীর্থসমাকুল ভারতে প্রভাস শ্রেষ্ঠ, প্রভাস অপেক্ষা বস্ত্রাপথ ও গীর্নার সমধিক।

পর্বতের দুই প্রকার রূপ—এক পাষাণময় বাহ্যরূপ: নানাবিধ বৃক্ষ, লতাগুল্ম ওষধি, খনি ও নদীর উৎস স্বরূপে অন্তর্নিহিত স্থাবর মূর্তি, ইহা শরীরের পুষ্টি ও তৃপ্তিবিধায়ক। গণনাতীতকাল হইতে মৃত্তিকা-প্রোথিত জীবদেহ ও তাহাদের অস্থিসমূহ প্রস্তরে রূপান্তরিত হইলেও পূর্বতন আকৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কালের অনন্তত্ব ও জগদ্ব্যাপ্তির অসীমতা নির্ণয় করে। আর একটি আধ্যাত্মিক রূপ: পর্বতের স্তবকে স্তবকে, আলো-ছায়ায় বায়ুমণ্ডলে, গহ্বরে মন্দিরে, প্রতি অণু-পরমাণুর মধ্যে ওতপ্রোত,—উহা সত্য জ্ঞান ও আনন্দের পথানুগামী।

অল্প অবতরণের পরে কেবলই আরোহণ করিতে করিতে আমরা পর্বতের শেষ প্রান্তে উপস্থিত, মুণ্ডিত মস্তকের ন্যায় পরিষ্কার স্থানটি—শৃঙ্গ বা মন্দিরের চিহ্নমাত্র নাই। গোরক্ষনাথের শ্রীচরণ চিহ্নের উপর মণ্ডপ, ইহাই গীর্নারের দ্বিতীয় চূড়া, উচ্চতায় ৩৬৬৬ ফুট। অপ্রতিহত সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি, উচ্চ নীচ পর্বতমালা, ক্ষুদ্র বৃহৎ বসতবাটী অট্টালিকা, নদী ঝরনা সরোবর, বিস্তৃত প্রান্তর, জলাশয় ও কৃষিক্ষেত্র চক্ষুর সম্মুখে ভাসিতেছে, একে অন্যের সহিত মিশিয়া গিয়া যেন একাকার প্রাপ্ত হইয়াছে, চতুর্দিকে অসংখ্য জলপ্রপাত নিম্নে সমতল ভূমিতে নদীর সহিত মিলিত হইয়া যেন সাম্যভাব লাভ করিতে উদ্‌গ্রীব। বৃষ্টি নামিল মুষলধারে। পথ তমসাবৃত—পাঁচ হাত দূরের মানুষ পর্যন্ত দেখা যায় না, সঙ্গিগণ কতদূরে চলিয়া গিয়াছেন, জানি না। একাই চলিতেছি, উৎরাইয়ের পর উৎরাই, অবিরাম গতি, লক্ষ্যহীন পথচলা। বৃষ্টিধারা অবিরত, কখনও বেগে কখনও ধীরে পতিত হইয়া বিপর্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। বারিধারা ক্ষীণতর হইলে আর এক বিপদের সম্মুখীন হইলাম—তাহা দমকা বাতাস। সংকীর্ণ পথ পাহাড়ের কোল ঘেঁষিয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই পথে গীর্নার-মাহাত্ম্য স্মরণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সংযোগস্থলে সংশয়াকুল মন গতি রুদ্ধ করিয়া দিল। দুইটি রাস্তা—একটি ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে, একটি নিম্নে নামিয়াছে, মহা সমস্যা, তদুপরি ঝড় তুমুলভাবে বহিতে লাগিল। ঝড়ের বেগে কখন কয়েক পদ উপরে চলিয়া যাই, কখন নিম্নে নামিয়া পড়িতে হয়। যে পথে আসিয়াছিলাম সেইদিক

লক্ষ্য করিয়া কিয়দ্দূর গমন করিয়া কাহারও সাক্ষাৎ পাইলাম না, প্রত্যাগত হইয়া হতাশ হৃদয়ে সঙ্গমস্থলে সিঁড়ির উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া ত্রিলোকনাথের উপর নির্ভর করিয়া আকুল প্রাণে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলাম। সহসা মনুষ্য-কণ্ঠস্বর শুনিয়া আশার আলোক-সঞ্চারে মনে সাহস পাইলাম। একদল যাত্রী শ্রেণী বাঁধিয়া বাক্যালাপ করিতে করিতে, সম্পূর্ণ-রূপে আর্দ্র হইয়া আমারই দিকে আসিতেছে। পথবিষয়ে তাহারাও অজ্ঞ। তথাপি তাহারা আমাকে দর্শন করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল, আমিও তাহাদের সাক্ষাতে অকূলে কূল পাইলাম। প্রবল ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া কাঠের সিঁড়ির মত খাড়া পাথরের অপ্রশস্ত সিঁড়ি বাহিয়া, অতি সাবধানতার সহিত হাতে পায়ে ভর রাখিয়া হামাগুড়ি দিয়া ঊর্ধ্বে—বহু ঊর্ধ্বে উঠিয়া যাই-তেছি, যাত্রীরা মরণপণ। ঘন ঘন অশনিপাত শৈলপ্রদেশ কাঁপাইয়া তুলিতেছে, উচ্চ ভূমির প্রতি বজ্রের আকর্ষণ অধিক বলিয়া বজ্রপাতের অবশ্যম্ভাবিতায় সকলে সন্ত্রস্ত। বজ্রাঘাতে মানব লীলাবসানের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত লোকমুখে শোনা যায়। কায়মনোবাক্যে বজ্রপাণির শরণ লওয়ায় তিনি আমাদের রক্ষা করিলেন।

ইহাই গীর্নারের সর্বোচ্চ শিখর—উচ্চতা পাঁচ হাজার ফুটেরও অধিক—অবধূত দত্তাত্রেয়ের তপস্যাক্ষেত্র। ভক্তই কেবল বহু বাধাবিপত্তি, ঝঞ্ঝা, মরণ অবহেলা করিয়া প্রেমাস্পদের আকর্ষণে সমীপাগত। উন্নত গিরিশৃঙ্গে যোগিবর বিশ্বহিত ধ্যানে মগ্ন। কোথায় বৈরাগ্যদীপ্ত বিমলকান্তি দত্তাত্রেয়? কোথায় তাঁহার মূর্তি? মন্দিরই বা কোন্‌খানে? ইহা তো শুধু অনাবৃত পর্বতের রূপচ্ছটা, চিররহস্যের অবগুণ্ঠনঢাকা সাধনা, কেবল পদাঙ্ক—দুইটি চরণচিহ্ন। উহারই সম্মুখে আমার সাথী সন্ন্যাসিযুগল তদ্গতচিত্ত। চরণচিহ্নের উপর ক্ষুদ্র একটি ছত্রমণ্ডপ সদা সতর্ক থাকিয়া রৌদ্রবৃষ্টি হইতে তাহা রক্ষা করিতেছে। ঐ প্রতীকোপাসনায় চিত্ত সমাহিত হইলে দত্তাত্রেয়ের প্রত্যক্ষ লীলার ভাব পরিস্ফুট হয়, ঐ শাশ্বতী স্থিতিই ভক্তের পরম আশ্রয়, একমাত্র আশ্বাস। পূজা করিতে করিতেই অনুভব হয় পাষাণ-চিহ্নে চিন্ময় স্বরূপ চিরভাস্বর। পূজারী আমাদের নারিকেল ও মিছরী প্রসাদ দিলেন, প্রসাদে শারীরিক ক্লেশ অন্তর্হিত হইল।

নিম্নে বহুদূর বিস্তৃত শৈলমালা, অদূরে চার অঙ্কের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট একটি হ্রদ—ব্রহ্মার কমণ্ডলু নামে খ্যাত। শুভ্র বলাকার ন্যায় জল-হারা মেঘ আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এবার মেঘ ও পাহাড়ের অপূর্ব শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে নিরুদ্বেগ চিত্তে ধীরে ধীরে অবতরণ। প্রায় হাজার ফুট নিম্নে সেই পরিচিত স্থান, যেখানে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া পড়িয়া-ছিলাম। আরও দুই ফার্লং নীচে জঙ্গলাকীর্ণ চূড়ায় ব্রহ্মার অধিষ্ঠান, গমনাগমনের রাস্তা নাই। ব্রহ্মার 'কমণ্ডলু হ্রদে'র উদ্দেশে নতজানু হইয়া প্রণাম করিলাম।

হ্রদের পার্শ্বগত তপোবন-সদৃশ স্থানে বৃদ্ধ নাগা সাধুর আশ্রম, প্রজ্বলিত ধুনির সন্নিধানে প্রেমিক সাধু উপবিষ্ট, দর্শনমাত্রে আমাদের অপ্যায়িত করিয়া বসাইলেন। প্রসাদ ও চা আসিতে আমরা গ্রহণ করিলাম। অন্ধকার কুটীরে প্রাচীর-গাত্রে হরগৌরীর মূর্তির বিনা নৈবেদ্যে, বিনা উপচারে পূজা চলিতেছে, ভক্তি-দীপশিখায় দেবতার বদন সমুজ্জ্বল, অবলোকন করিলাম—প্রেম-মদিরায় ঢুলু ঢুলু আনন, ভক্তের নিমিত্ত দেবতা প্রতীক্ষমাণ। আনন্দের পীঠস্থানে ধ্যানস্থ হইয়া পূর্ণ অমৃতঘটের পরমানন্দ আস্বাদন সৌভাগ্যেরই চিহ্ন। আমরা বিদায় লইয়া উঠিতেই অগ্রসর হইয়া হাত ধরি-

লেন, বলিলেন খাবার প্রস্তুত, না-খেয়ে কেমন করিয়া যাইবেন। এত আন্তরিকতা, এমন আপন-করা আকুলতা, কার সাধ্য এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে। যে কোন রকমের লোকই হউক না কেন, এই সাধুর আখড়ায় কিছু গ্রহণ না করিলে তাহার পরিত্রাণ নাই। সাধুর সদাব্রতের বিরাম নাই, সদা উন্মুক্ত। সংসারত্যাগী নিঃস্ব সন্ন্যাসীর আকাশজোড়া হৃদয়, মানুষের সেবাই তাঁহার সাধনা, তিনি নিষ্কাম সেবার ঘনীভূত জীবন্ত মূর্তি। সাধুর নীরব সাধনা কি নীরবেই শুকাইয়া যাইবে? সন্ন্যাসীর দুঃসহ তিতিক্ষা, কি অন্ধকারে ডুবিয়া যাইবে? কালের শাশ্বত বাণী দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করে—'না, না, না'।

বেলা প্রায় বারটায় আমরা জাগ্রতা দেবীর কালী-মন্দিরের দুর্গম বিপদসংকুল পথে পা বাড়াইলাম। আর একটি দল সাহস পাইয়া মেঘাচ্ছন্ন আকাশ মস্তকে ধারণ করিয়া আমাদের অনুগমন করিল। সঙ্গে একজন শিকারী, বন্দুকধারী। অবতরণ করিতে করিতে আমরা গহন অরণ্যের সম্মুখীন, মেঘদলের গর্জন ও বর্ষণ সমান তালে অবিরত ও অপরিমিত, যেন অমানিশার অন্ধকারে পথঘাট সমাচ্ছন্ন, নিবিড় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বারিধারা ও পাতার পত্ পত্ শব্দ, ঝরনার বিরামহীন ধারা সংগীতের লহরীর ন্যায় মনপ্রাণ মাতাইয়া তুলিয়াছে। নিরুপায় হইয়া শঙ্কিত হৃদয় মাতৃক্রোড়ে ঝম্পপ্রদানে কৃতসঙ্কল্প, এমন সময়ে শ্যামা মায়ের হাসির জ্যোতি আমাদের পথ দেখাইয়া দুঃসাধ্য দুর্লভ ধনের দর্শন মিলাইল। মন্দিরে গাঢ় তমের মধ্যে মাতৃমূর্তি প্রতিষ্ঠিত, অন্ধকারই ধ্যানের পক্ষে প্রশস্ততর বলিয়া মাতা সন্তানের জন্য ঐখানেই অপেক্ষা করিতেছেন। শক্তিসাধক মানব মা কালীর কৃপায় কালজয়ী, মৃত্যুর ছন্দই জীবনের জয়গান।

দূরে পিশাচমোচনের পঞ্চম চূড়ার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া প্রত্যাবর্তন পথে বর্ষাকালীন পর্বতের সবুজ সতেজ নবীন কলেবর, সংখ্যাতীত শৃঙ্গের দিব্যভাব, দেবদেবীর আকর্ষণ অক্ষুণ্ণ হৃদয়ে জাগিতে লাগিল। পিশাচমোচনে গমন করিবার কোন রাস্তাই নাই, পথ হিংস্রজন্তুসমাকুল দুরধিগম্য ও দুর্লঙ্ঘ্য। চলিতে চলিতে পাহাড় ভেদ করিয়া গোমুখীর অভ্যুদয় ও অবতরণলীলা আপন মনে উপভোগ করিলাম। গোমুখ কুণ্ডটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর ন্যায়, অল্প পরিসর ছয়টি গুহায় ছয়টি শিবলিঙ্গ, কুণ্ডের অপরদিকে আশ্রম। দর্শনমাত্রে এক ব্রহ্মচারী আমাদের বসাইলেন, কফি প্রস্তুত করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। ইঁহারাও নাগা-সম্প্রদায়ভুক্ত। নাগা সাধুগণের জটা, চিমটা ও ধুনি সাধনার অঙ্গ। নিষ্প্রয়োজন কথাবার্তায় সময় অতিবাহিত না করিয়া আমরা গাত্রোত্থান করিলাম। দেবদেবী দর্শনের নেশায় এতক্ষণ দেহের অবসাদ নামমাত্রও বোধ হইতেছিল না, দণ্ড আশ্রয় করিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে সোপানের পর সোপান অতিক্রম করিয়া নামিয়া আসা এখন অসম্ভব হইল। পা ফুলিয়া গিয়াছে, যন্ত্রণাও বাড়িতেছে, সঙ্গিগণ দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গিয়া কোথাও হয়তো বিশ্রাম করিতেছেন। শ্রান্ত অবসন্ন দেহ কোন প্রকারে বহন করিয়া একাকী পর্বতগাত্রের ঘূর্ণমান পথের একদিকে শুভ্র রজতসদৃশ রবিকিরণ, আর একদিকে লাল নীল সাদা পীত হরিত প্রভৃতি বর্ণের অপূর্ব সমাবেশে বিমুগ্ধ হইয়া সানুদেশে পৌঁছিয়া বোর-দেবীর মন্দিরে প্রণাম ও প্রার্থনা জানাইয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। দামোদর কুণ্ডের নিকটবর্তী ক্ষুদ্র পাহাড়ে অশোক, স্কন্দগুপ্ত ও রুদ্রদামার তিনখানি প্রাচীন শিলালিপি উৎকীর্ণ।

দিনমণি অস্তপ্রায়। বিশ্রামের প্রয়োজনে সেই নিরঞ্জনী আখড়ায় রাত্রি যাপন করিলাম। তাঁহাদের পরম আত্মীয়বোধে সেবা, শুশ্রূষা ও পরিচর্যায় দুই দিনেই সুস্থ হইয়া উঠিলাম। পশ্চাতের কোন টান নাই, আখড়াধারী ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট বিদায়কালে চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল, তাঁহারাও ক্রন্দনরত। আকাশস্পর্শী গীর্নার আকর্ষণ করিতেছেন।

জুনাগড় ষ্টেশনের দিকে পদব্রজে রওনা হইতেছি, এমন সময় সেই পরিচিত মুখ—সেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ ভক্তপ্রবর গাড়ী লইয়া উপস্থিত। তিনি আমায় দামোদরজীর মন্দির ও কুণ্ড, ধর্মশালা, বলদেবীর মন্দির, ক্ষমতাশালী নাগর ব্রাহ্মণদিগের শ্মশান মন্দির, মন্দিরের উপরিভাগে খোদিত পৌরাণিক মূর্তি, রেবতী কুণ্ড, প্রাচীন শিলালিপি ও বহু দেবদেবীর চিত্র, প্যারাবাবার মঠ, কৃত্রিম পর্বতগুহা, জুম্মা মস্‌জিদ, আদি চড়িবাব এবং নোথানকূপ প্রভৃতি দর্শন করাইয়া ষ্টেশনে লইয়া আসিলেন।

ট্রেন ছাড়িতে বিলম্ব থাকায় ভক্ত প্রতীক্ষালয়ে আমাকে বসাইয়া প্রস্থান করিতেই একজন যুবক কৌতূহলবশতঃ আমার কাছে ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল, ক্ষণপরে সাহসে ভর করিয়া আলাপে প্রবৃত্ত হওয়ায় বুঝিলাম তাঁহার মধ্যে বহু সদ্‌গুণবাজি বিদ্যমান। তাহারই প্রমুখাৎ শুনিলাম এখান হইতে কুড়ি মাইল দূরে প্রভাসতীর্থের পথে বিখ্যাত 'গীর' জঙ্গল—সিংহের আবাসভূমি, এবং উপল বহুল উচ্চভূমির গুহামধ্যে কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসীর বাস—উহারা আফ্রিকাবাসী নিগ্রোদিগের তুল্য।

ভক্তের পুনরাবির্ভাব—এক হস্তে আহার্যসামগ্রী, অন্য হস্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানি টিকিট। শ্রীভগবানের অচিন্ত্য করুণা প্রতি পদক্ষেপে অনুভব করিয়া যাত্রাশেষে তাঁহারই অনন্ত লীলাধ্যানে অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

গিরনারে দ্রষ্টব্য

পাদদেশে	চড়াইপথে	
১। বাঘেশ্বরী দেবী	৮। ভর্তৃহরি গুহা	১৬। পাণ্ডবগুহা
২। বামনেশ্বর শিব	৯। রাজুলজী গুহা	১৭। সীতামড়ী
৩। অশোকের শিলালেখ	১০। সাতপুড়া	১৮। ভরতবন
৪। মুচকুন্দ মহাদেব	১১। অম্বিকাশিখর	১৯। হনুমানধারা
৫। দামোদর কুণ্ড	১২। গোরক্ষ "	২০। জটাশংকর
৬। রেবতী কুণ্ড	১৩। দত্ত "	২১। ইন্দ্রেশ্বর
৭। হনুমানজী	১৪। নেমিনাথ "	
	১৫। মহাকালী "	

পরিক্রমা

প্রতিবর্ষ কার্ত্তিক শুক্লা একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত গিরনার পরিক্রমা হয়। হিন্দু ও জৈন উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তগণই সকল তীর্থ পরিক্রমা করেন।

দিনের শেষে

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী

দিনের শেষে সাঁঝ ঘনালো,
নয়ন-আলো গেল টুটে,
ক্লান্ত-তনু ধূলার 'পরে
ব্যথায় ভ'রে পড়লো লুটে।

আঁধার-পথে নাইক' সাথী,
আসে তিমিরময়ী বাতি।

এবারে কি তোমার আলো
সম্মুখে মোর উঠবে ফুটে?
দিনের শেষে সাঁঝ ঘনালো,
নয়ন-আলো গেল টুটে।

বুকের মাঝে যে শকতি
সারা জীবন ছিল জেগে,
তার প্রভাবে ভবের পথে
চলেছিলাম কতই বেগে।

চিত্তে ছিল চলার নেশা,
গতি ছিল নিরুদ্দেশা,

জীবন ছিল কর্ম-মুখর
নির্ভীকতার পরশ লেগে।
সেই শকতি কোথায় গেল—
যা ছিল মোর বক্ষে জেগে?

এ আঁধারে কোথায় যাব?
কোথায় নভে ধ্রুব-তারা?
হৃদয় আমার উঠছে কেঁদে,
আমি যে গো সকল-হারা।

দেখছি শুধু বিভীষিকা,
কোথায় তোমার জ্যোতির শিখা?

কে মুছাবে আজকে আমার
দুঃখ-দ্রব অশ্রুধারা
এবারে কি জাগবে তুমি
মোর নয়নের ধ্রুব-তারা?

নাই কেহ মোর, তুমিও গো আর
থেকোনাক' দূরে দূরে।—
অনুতাপের বহ্নি-দাহে
কত বা আর মরবো পুড়ে?

এবার আমার কাছে আসি',
বাজাও তোমার প্রেমের বাঁশী,

হৃদয় আমার দাও ভ'রে দাও
তোমার মধুর সুরে সুরে!
চরণ-তলে দাওগো শরণ—
এস আমার হৃদয়পুরে!

গীতিগুঞ্জ ঃ অতুলপ্রসাদ

অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

তখন সাঁওতাল পরগনায় ছিলাম; দেওঘর বিদ্যাপীঠে। ভোরবেলা প্রার্থনা-সভায় নানা ধরনের অধ্যাত্মভাবের গান হ'ত। সেই সব গানের মধ্যে একটি গান বিশেষ ভাবে আমার হৃদয় হরণ করেছিল—ভৈরোঁ রাগিণীতে গাওয়া:

কে হে তুমি সুন্দর,
অতি সুন্দর, অতি সুন্দর!

সে গানের উদাত্ত গম্ভীর সুর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে মুহূর্তে আমার কল্পনাকে ত্রিকূটের উদয়াচলের অভিমুখী ক'রে নিয়ে যেত—

কভু নবীন ভানু ভালে,
কভু ভূষিত নীরদমালে,
কভু বিহগকূজিতকুহক কণ্ঠে
গাহিছ অতি সুন্দর!

আজও মাঝে মাঝে জ্যোৎস্নারাত্রির বিমল প্রসন্নতার সঙ্গে মনে পড়ে:

কভু পুষ্পিত নভকুঞ্জে
তব নৈশ বংশী গুঞ্জে,
কভু পীত-জ্যোৎস্না-বসন শ্যাম—
মূরতি অতি সুন্দর!

সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিতে পরিব্যাপ্ত চিরসুন্দরকে সেই শৈশবে যাঁর রচনার মধ্য দিয়ে অনুভব করেছিলাম, বড় হয়ে জানলাম তিনি গীতিগুঞ্জের কবি অতুলপ্রসাদ সেন।

অধ্যাত্ম-অনুভবের কবিতা ও গান বাংলা কাব্যের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। আর এ অনুভবের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এ যুগে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি রজনীকান্ত সেন ও অতুলপ্রসাদকে আমাদের স্মরণ করতে হবে,—নইলে সাহিত্য-ঋণ অপরিশোধিত থেকে যাবে।

অতুলপ্রসাদ ভক্ত কবি। কিন্তু তাঁর ভক্তির মধ্যে এমন একটি প্রশান্ত আত্মসমর্পণের রাগিণী বেজে উঠেছে, যা জীবনের গভীরতম বেদনার উপলব্ধি ছাড়া কখনও এত সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। গীতিগুঞ্জের এই অমৃতময় গীতিসংগ্রহ পাঠ করতে করতে বারংবার মনে হয়েছে যে অন্তরের অন্তরে এ কবি ছিলেন চির-নিঃসঙ্গ। সেই একলা হৃদয়ের চিরসঙ্গতৃষ্ণা আকুল বাণীর মধ্য দিয়ে পরমবন্ধুকে খুঁজে ফিরেছে।

মিশ্র আশাবরীর এই গানটিতে সেই ব্যাকুলতা—

ওগো নিঠুর দরদী, এ কি খেলছ অনুক্ষণ!
তোমার কাঁটায় ভরা বন,
তোমার প্রেমে ভরা মন।

এই নিঠুর খেলার মধ্যেও সেই তো আমাদের একমাত্র স্মরণীয়, একমাত্র আশ্রয়। তাই ওই বেদনার দেবতার হাতেই কবি জীবনের বীণাখানি তুলে দিয়ে প্রার্থনা করেছেন:

তুমি গাও, তুমি গাও গো
গাহো মম জীবনে বসি, বেদনে বাঁধা জীবনবীণা
ঝংকারি বাজাও গো।
—তুমি গাও।
তোমার পানে চাহিয়া, চলিব তরী বাহিয়া
অভয়-গান গাহি ভয় ভাবনা ভুলাও।
—তুমি গাও।
দগ্ধ যবে চিত্ত হবে এ মরু সংসারে
স্নিগ্ধ করো মধুর সুরধারে।
তোমার যে সুরছন্দে, পাখিরা গাহে আনন্দে,
শিশু করি আমারে সে সংগীত শিখাও।
—তুমি গাও।

বেহাগের ব্যাকুলতায় ভরা এ গানখানি যিনি শুনেছেন, আর জীবনে ওই দগ্ধ সংসারমরু

অতিক্রম করেছেন—তিনিই এ গীতি-প্রার্থনাটি আপন অন্তরের অনুচ্চারিত বাণী ব'লে অনুভব করবেন।

অতুলপ্রসাদের গান ভাবে, ভাষায়, সুরে রবীন্দ্রনাথের একান্ত কাছাকাছি। কিন্তু পরিণত বয়সে রবীন্দ্রসঙ্গীত যতটা শিল্পময় হয়ে উঠেছে, অতুলপ্রসাদের গান তা হয়নি, আপন নিরলঙ্কার সরলতায় গভীর বৈরাগ্যে মগ্ন থেকেছে। অতুলপ্রসাদ প্রেমের গান লিখেছেন, স্বদেশপ্রীতিও তাঁর গানে আছে ('বল বল বল সবে'), কিন্তু তাঁর বেশির ভাগ গানে জীবনেশ্বরের সঙ্গে কবি-প্রাণের সুরের আলাপ। সে সুরে বাংলাদেশের বাউল গানের প্রভাব অনেক ক্ষেত্রেই সহজ সৌন্দর্যে প্রতিভাত। আর রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে নয়, স্বীকরণে অতুলপ্রসাদের গান মহিমোজ্জ্বল। অতুলপ্রসাদের জীবনদেবতা কবির একলা হৃদয়ের গোপন বেদনার অধীশ্বর। অথচ সে বেদনা যে আমাদেরও হৃদয়-বেদনা, সেকথা তাঁর গানের প্রতি আমাদের প্রাণের সমর্থনেই বোঝা যায়। তাঁর অধ্যাত্ম-প্রেরণার গানগুলির আড়ালে যেন নিঃশব্দ অশ্রুর অদৃশ্য প্রভাব সর্বক্ষণ অনুভব করি। অদৃশ্য— কিন্তু অশ্রুত নয়, কান পাতলেই সেই অশ্রু-নির্ঝরের অর্ধস্ফুট অথচ প্রগাঢ় ধ্বনি শ্রোতার হৃদয়ে ঝঙ্কার তুলতে থাকে।

ভোরের আলোর ছোঁয়া পেয়ে কবি-হৃদয় অনুভব করে—

সে ডাকে আমারে।
বিনা সে সখারে রহিতে মন নারে।—
প্রভাতে যারে দেখিবে বলি
দ্বার খোলে কুসুম-কলি,
কুঞ্জে ফুকারে অলি যাহারে বারে বারে…

জীবনের সব আশা-নিরাশার পারে আশ্বাস চায়—

সংসারে যদি নাহি পাই সাড়া,
তুমি তো আমার রহিবে!
বহিবারে যদি না পারি এ ভার
তুমি তো বন্ধু, বহিবে।
*　　*　　*
দুঃখেরে আমি ডরিব না আর,
কণ্টক হোক কণ্ঠের হার,
জানি তুমি মোরে করিবে অমল
যতই অনলে দহিবে।

কখনও বা "মহাসিন্ধুর ওপার" থেকে তাঁর বাণী ভেসে আসে, আর কবিপ্রাণও সেই মহাসিন্ধুর উদ্দেশে ডানা মেলে উড়ে চলে—

আমার পরাণ কোথা যায়, কোথা যায় উড়ে।
কে যেন ডাকিছে মোরে, দূর সাগর-পারে
বিরহবিধুর সুরে।

অতুলপ্রসাদ মাঝে মাঝে আপন হৃদয়কে সম্বোধন করেছেন 'ভোলা' 'খ্যাপা' 'পাগলা' 'বাউল' ব'লে। এ সম্বোধনগুলি অতুলপ্রসাদের চিত্ত-পরিচয়। বাইরের জীবনের পরিচয়ে আমরা মানুষের অন্তরের কতটুকু চিনি? কতগুলি আভিধানিক ভালো-মন্দের মার্কা দিয়ে মানুষকে শ্রেণীবদ্ধ ক'রে আমরা স্বস্তি অনুভব করি। কিন্তু বাইরের জীবনে ব্যবহারজীবী এই মানুষটি অন্তরে এমন বৈরাগী—এ কথায় সত্যি বিস্ময়ের কিছু আছে কি? মানুষের পরিচয় অন্তহীন।

অতুলপ্রসাদ তাঁর গানে ঘুরে ফিরে 'নিঠুর-দরদী'র কথা বলেছেন—আর বলেছেন মানুষের উদ্দেশ্যে তাঁর গভীর ভালবাসার কথা। মাঝে মাঝে ব্যথিতকণ্ঠে অনুযোগ করেছেন—

নিচুর কাছে হ'তে নিচু শিখলি না রে মন।
সুখী জনের করিস পূজা দুখীর অযতন—মূঢ় মন!

কবির অন্তরবাসী বাউল আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে—

বৃথা তোর কৃচ্ছ্র সাধন ; সেবাই নরের শ্রেষ্ঠ সাধন !
মানবের পরম তীর্থ দীনের শ্রীচরণ—মূঢ় মন।
মতামতের তর্কে মত্ত, আছিস ভুলে সরল সত্য ;
সকল ঘরে সকল নরে আছেন নারায়ণ—মূঢ় মন !

সব মানুষের মতো অতুলপ্রসাদও ভালবাসার অন্বেষণে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কিন্তু শেষ অবধি এই পরম উপলব্ধিতে এসে পৌঁছেছেন—

সবারে বাস্‌রে ভালো,
নইলে মনের কালো ঘুচবে না রে।
আছে তোর যাহা ভালো
ফুলের মতো দে সবারে।
করি তুই আপন আপন
হারালি যা ছিল আপন
এবার তোর ভরা আপণ
বিলিয়ে দে তুই যারে তারে।

* * *

সবাই যে তোর মায়ের ছেলে
রাখবি কারে, কারে ফেলে ?
একই নায়ে সকল ভায়ে
যেতে হবে রে ও-পারে।

নারদভক্তিসূত্রে ভগবৎ-তন্ময়তার একটি চরম পরিচয় আছে 'পরমবিরহাসক্তি' কথাটির মধ্যে। উদাহরণ দেওয়া হয়েছে ব্রজগোপীদের। নিত্যবিরহের মধ্য দিয়ে ব্রজগোপীরা ভগবানের সঙ্গে নিত্যমিলিত। বিরহের মতো এ তন্ময়তা আর কোন্ ভাবে ? অতুলপ্রসাদের গানেও সে তন্ময়তার স্পর্শ আছে। আন্তরিকতার বিচারে অতুলপ্রসাদের গান কেবলমাত্র ভগবৎ-প্রসঙ্গেই ক্ষান্ত নয়, ব্যাকুল হৃদয়ে সেই পরমবন্ধুর সঙ্গে চিরমিলনের জন্য তৃষিত। কিন্তু সারা জীবনের এই গানের আরাধনা সত্ত্বেও তিনি কি দূরেই রইলেন ? তাই এ অন্তহীন বিরহ-পারাবারের তীরে ব'সে অন্তরের তানপুরায় সাড়া জাগিয়ে প্রশ্ন করেছেন :

কত গান তো হ'ল গাওয়া
আর মিছে কেন গাওয়াও ?
যদি দেখা নাহি দিবে
তবে মিছে কেন চাওয়াও ?
যদি যতই মরি ঘুরে
তুমি ততই রবে দূরে
তবে কেন বাঁশির সুরে
তব তরে শুধু ধাওয়াও ?

* * *

বড়ো ব্যথা তোমায় চাওয়া,
আরো ব্যথা ভুলে যাওয়া ;
যদি ব্যথী না আসিবে,
এত ব্যথা কেন পাওয়াও ?

সাধক-হৃদয় তো জানে—তাঁকে পাওয়া না-পাওয়া তাঁরই কৃপা-নির্ভর। তাই ব'লে সাধনায় তার শিথিলতা ঘটে না—

আপন কাজে অচল হ'লে
চলবে না রে চলবে না।
অলস স্তুতি-গানে তাঁর আসন
টলবে না রে টলবে না।
হৃদ যদি তোর না হয় সচল,
বিফল হবে জলদ-জল,
ঊষর ভূমে সোনার ফসল
ফলবে না রে ফলবে না।

কোন বিশেষ দিনে নয়, সব দিনে সব মুহূর্তেই তাঁর উদ্দেশে প্রাণের আকুলতা জানাতে হবে। কাঁদতে ভয় পেলে তো সেই চিরব্যথার ব্যথী বন্ধুকে পাওয়া যাবে না। অপার অশ্রুসমুদ্রের পারেই সেই নিত্যপ্রেমিকের বাঁশী বেজে চলেছে। তাই কবি আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন :

থাকিস নে ব'সে তোরা সুদিন আসবে ব'লে,
কারো দিন যায় হরষে, যায় কারো বিফলে।
সুখের ছদ্মবেশে
আসে দুঃখ হেসে হেসে

জীবনের প্রমোদ-বনে ভাসায় আঁখিজলে।
যেথা আজ শুষ্কমরু,
যেথা নাই ছায়াতরু,
হয়তো তোদের নয়ন-জলে ভরবে ফুলে ফলে।

তারপর একদিন সব দুঃখসুখ দ্বিধাদ্বন্দ্বের পারে সকল সমর্পণের রাগিণী বেজে ওঠে। সাধক-হৃদয় নিঃশেষে সব কিছু তাঁর পায়ে উজাড় ক'রে দিয়ে 'সকল আঘাত সকল আশায়' তাঁকেই অনুভব করে। অতুলপ্রসাদের গানে সেই সকল সমর্পণের সুর ক্ষণে ক্ষণে বেজে উঠেছে। একটি উদাহরণ :

ক্ষমিয়ো হে শিব, আর না কহিব—
দুঃখ বিপদে ব্যর্থ জীবন মম।
মৃত্তিকা বলে মোরে, 'ওরে মূঢ় নর,
হৃদয়-আঘাতে তব কেন এত ডর?
দীর্ণ মম বক্ষ যত, আঘাত যত খর
শস্য সুফল তত, ততই শ্যাম মনোরম।
আকাশ বলে মোরে, 'আমি কাঁদি যবে
হাসে বসুন্ধরা ফুল্ল বিভবে
তোমারও নয়ন-বারি বিফল না হবে,
শুষ্ক জীবনে তব ফুটিবে ফুল অনুপম।

আধুনিক যুগে এই সরল ভগবৎ-তন্ময় কবিতার যথার্থ মূল্য কি স্বীকৃত হবে?—এমন প্রশ্ন পাঠকের মনে জাগতে পারে। কিন্তু বাংলা গানের জগতে আজ রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরেই অতুলপ্রসাদের গান। 'মতামত দর্শন বিজ্ঞান'—আমাদের যাই বলুক, আমাদের অন্তর-বাসী বহুদিনের বৈরাগী বাউলটি অতুলপ্রসাদকে প্রাণের অভ্যর্থনা আগেই জানিয়ে রেখেছে।

আধুনিক মনের জটিল প্রকাশ-পদ্ধতি অতুল-প্রসাদের গীতিকবিতায় একেবারে অনুপস্থিত। শুধু গান বলেই নয়, কবিতার বিচারেও তাঁর গানে ভাষার লঘুপক্ষ শুভ্র সৌন্দর্য লক্ষণীয়। অথচ এ গান আধুনিক মনেরও মর্মে বাসা বাঁধতে পারে। ভাবের মতো প্রকাশভঙ্গীও প্রত্যেক কবিরই নিজস্ব। তাই বর্তমান জীবনের অসঙ্গতি যদি কোন কবির কাব্যে বেদনাবিক্ষত মূর্তিতে দেখা দিয়ে থাকে, আমরা তাঁকে স্বীকার ক'রে নেব। আবার সব অসঙ্গতির আড়ালে কেউ যদি মহাজীবনের সুর-সঙ্গতি জাগিয়ে তুলতে পারেন, তাঁকেও সাগ্রহে বরণ ক'রে নেব। অতুলপ্রসাদের গানে আমাদের সেই আগ্রহ পরিতৃপ্ত।*

* গীতিগুঞ্জ ;—প্রকাশক : সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ২১১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

শ্রীরামকৃষ্ণ—মানব ও অতিমানব

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ

অগণিত সাধু-সন্ত মুনি-ঋষির জন্মভূমি ভারতবর্ষ পৃথিবীর যে কোন দেশের চেয়ে মহীয়ান্। যুগ-যুগ-ব্যাপী তার একটা নিজস্ব জীবনধারা আছে। এই ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই ভারত বিভিন্ন যুগের চাহিদা মেটাতে বহু শ্রেষ্ঠ মানব অর্ঘ্য দিয়েছে বিশ্বের বেদীতে। মানবজাতির এই অপরিমেয় সেবার জন্যই ভারত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারতের মহত্ত্বের ও শ্রেষ্ঠত্বের গোপন রহস্যটি হ'ল তার ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা। ধর্ম এদেশে একটি পরিণত বস্তু নয়, নিরন্তর সাধনার জিনিস, সীমায় আবদ্ধ নয়—অসীম। ধর্ম এখানে একটি অফুরন্ত ঝরনার মতো—যা কখনও শুকিয়ে যায় না, যা সম্প্রদায়-নির্বিশেষে শত সহস্র মানুষের জন্যে প্রতিদিন নিয়ে আসে সুমিষ্ট পানীয়ধারা। এ যেন একটি অনাদি অনন্ত গ্রন্থ, প্রতি যুগে যার একখানি ক'রে নতুন পাতা খোলা হয়, যা থেকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বর্ষিত হয় সত্যান্বেষীদের ওপর। আসলে এ সেই একই বই, শুধু লেখার পার্থক্য। এ সেই একই মানুষ চিরন্তন দেবমানব,—প্রত্যেক বার পুনরাগমনের সময় যিনি নিজেকে আরও একটু প্রকাশিত করেন। শুদ্ধ ভক্তের প্রেমের আকর্ষণে তিনি বারংবার মনুষ্য-শরীর ধারণ করেন।

পরিবর্তনের যুগ

ভারতের ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ এক যুগসন্ধি। ত্রিবিধ রূপান্তরের যুগ—রাজনীতি-ক্ষেত্রে, সমাজে ও ধর্মে পরিবর্তনের যুগ! এ সময়টিকে আলোকের যুগ বলা যায়, অন্ধকারের যুগও বলা যায়, ভালোর যুগ বলা যায়, মন্দের যুগও বলা যায়। বিপরীত শক্তিগুলি নিজ নিজ প্রাধান্য লাভের জন্য সচেষ্ট। এই কালে ভারতের পুণ্যভূমিতে বহু তেজস্বী ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁরা প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্য স্থাপন করতে, যা এ যুগের লক্ষ্য।

কিন্তু এঁদের মধ্যে কেউই কামারপুকুরের সেই ব্রাহ্মণবালক—দক্ষিণেশ্বরের সেই মহাপুরুষের মতো সাফল্যে ভূষিত হ'তে পারেননি। তিনি ছিলেন 'ত্রিশ কোটি মানুষের তিন হাজার বৎসরের সাধনার সিদ্ধি'। যদিও ৭০ বৎসর অতিক্রান্ত তাঁর দেহত্যাগের পর, তবু তাঁর জীবন লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন উদ্বুদ্ধ করছে। তাঁরই আত্মা বর্তমান ভারতের শুকনো হাড়ে প্রাণের স্পন্দন নিয়ে এসেছে। তিনি গান্ধীর মতো কর্মবীর ছিলেন না, রবীন্দ্রনাথের মতো কবিও ছিলেন না। তিনি বাংলার একটি পাড়াগেঁয়ে বামুন। সমসাময়িক রাজনীতির বা সামাজিক চাঞ্চল্যের বাইরে তাঁর বাহ্য জীবন ছিল নিতান্ত সাধারণ ও ক্ষুদ্র পরিবেশে সীমাবদ্ধ, কিন্তু তাঁর আন্তর জীবনে যত রাজ্যের মানুষের ও দেবতার মেলা। সেখানে সেই দিব্যশক্তির খেলা—বিদ্যাপতি ও রামপ্রসাদ যার গান গেয়ে গেছেন।

জড়বাদের যুগ

যখন রামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন তখন ছিল ইঙ্গভাবাপন্ন ঘোর জড়বাদের যুগ, পাশ্চাত্ত্যের চোখ-ঝলসানো সভ্যতায় সব ভেসে যাচ্ছিল। ভারতবাসীরা তখন ইওরোপের চোখ দিয়ে সব দেখতে শিখছিল। সকলকেই ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করবার আগ্রহে নানা প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত হচ্ছিল। কিন্তু রামকৃষ্ণে দেখা গেল একটি শক্তিশালী ব্যতিক্রম। তিনি যে শুধু বিদেশী হাবভাবের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করলেন তা নয়, প্রচলিত লেখাপড়াও শিখতে চাইলেন না। তবে তাঁর হৃদয় ব্যাকুল হ'ল—আর এক শিক্ষার জন্যে, যা মানুষের অন্তর্নিহিত পরিপূর্ণতাকে ফুটিয়ে তোলে, এবং আত্মজ্ঞান এনে দেয়। প্রকৃতির বই ছাড়া আর কোন্ বই তিনি পড়বেন?—যে বইএর অনন্ত পৃষ্ঠায় আছে অফুরন্ত জ্ঞানের বিষয়। তিনি ছিলেন প্রকৃতির শিশু, তাই বিশ্বপ্রকৃতিও তাঁর উপযুক্ত সন্তানের কাছে নিঃসংকোচে বিশ্বের সকল রহস্যের অবগুণ্ঠন মুক্ত ক'রে দিয়েছেন। শিল্পের মিথ্যা অনুকরণ তাঁকে মুগ্ধ করতে পারেনি, তাই তিনি আজ সহস্র মতের সহস্র সুরের সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐকতানরূপে বিশ্বের সম্মুখে বিকশিত। তাঁর জীবন এত বিরাট্ ও বিচিত্র যে তা বর্ণনার অতীত।

মানব ও মহামানব

সীমাবদ্ধ চকিত দৃষ্টিতেই যদি অসীমকে দেখতে ও বুঝতে হয়—তবে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনকে দু'দিক দিয়ে দেখা যায়—মানব ও অতিমানব। উভয় দিক দিয়েই তিনি অতুলনীয়। তাঁর দেব ও মানব—উভয় প্রকৃতিরই বিশেষ উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ছিল। তাঁর দৃষ্টিতে মানবত্বের বহিরাবরণে ভিতরের সারবস্তু দেবত্বই ক্রিয়াশীল ও প্রকাশশীল। তিনি জানতেন : ক্ষণভঙ্গুর মানুষ যতই ক্ষুদ্র ও দুর্বল হ'ক না কেন—তার একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে এবং মানবজাতির জ্ঞানোন্মেষের জন্য প্রত্যেকেই কিছু না কিছু সেবা করতে পারে। তাঁর প্রতিটি কাজ ও প্রতিটি কথা অমূল্য শিক্ষায় পরিপূর্ণ। যে কেউ তাঁর সংস্পর্শে আসার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছে, সেই অনুভব করেছে তাঁর সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণতা। নির্ভুল চিন্তা, অভ্রান্ত বাক্য এবং অমোঘ কার্যের মাধ্যমে তাঁর সরল অনাড়ম্বর জীবন মুমুক্ষু সাধকদের আলোর দিশারী। আধ্যাত্মিক সাধনার পথে তাঁর জীবন একটি জীবন্ত আদর্শ, সাধকদের শিক্ষা দিচ্ছে—কিভাবে তারা যা কিছু মহৎ ও শুভ, তার সাথে মিলিত হতে পারে এবং যা কিছু তার বিপরীত তাকে এড়াতে পারে। এই জীবনেই তিনি দেখিয়ে গেছেন—কিভাবে মানুষ বহুবিধ তপস্যার দ্বারা তার মনকে বশীভূত করতে পারে, ইন্দ্রিয়কে সংযত করতে পারে, কিভাবে সে তার বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করতে পারে। এমন কোন সাধনা হিন্দুধর্মের শাস্ত্রে নেই—যা তিনি তাঁর সাধকজীবনে সাধন করেননি এবং যাতে তিনি সিদ্ধিলাভ করেননি। তিনি আরও দূরে চলে গিয়েছেন—অন্যান্য প্রচলিত ধর্মের মূল ভাবগুলিও তিনি সাদরে গ্রহণ করেছেন, বিশেষতঃ ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্মের ভাব, এবং প্রত্যেকটিতে তিনি উচ্চতম অনুভূতি লাভ করেছেন। এই ভাবেই তিনি মানবত্বের কারাপ্রাচীর ভেঙে দিয়ে দেবত্বের রাজ্যে চরম ঐক্যের অবস্থায় পৌঁছে গেছেন।

দিব্যভাব

কিন্তু দর্শকদের চোখে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য-প্রকৃতি এত বড় হয়ে দেখা দেয় যে মানব অপেক্ষা অতিমানব-রূপেই তাঁরা তাঁকে মনে ক'রে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন দেব-স্বভাব। শত সূর্যের মতো জ্বলন্ত তাঁর দেবভাব চন্দ্রের মতো স্নিগ্ধ তাঁর মনুষ্যভাবকে ম্লান ক'রে দিত। মনুষ্যভাব অপেক্ষা দেবভাব তাঁর ছিল স্বাভাবিক, কখনও কখনও তাঁর মন এত উচ্চ স্তরে উঠে যেত যে তাঁর পক্ষে শরীর সম্বন্ধে সচেতন হওয়া সম্ভব হ'ত না, তিনি অসীম অনন্ত সত্তায় বিলীন হয়ে যেতেন এবং বলতেন, 'আমি ও আমার মা এক'। ধ্যানের শেষ ভূমি নির্বিকল্প সমাধিতে তাঁর দ্রষ্টা-দৃশ্য (আমি-তুমি)-

বোধও বিলুপ্ত হয়ে যেত। এই অবস্থায় দেশ-কাল কার্য-কারণ লয় পায়, বিশ্বজগৎ বিলুপ্ত হয়, দ্বৈত নিবৃত্ত হয়। 'অস্তিমাত্র' এই ভাবে আত্মা নিজেরই মাঝে নিজে হারিয়ে যায়।

যখন তিনি সমাধি-ভূমি থেকে নেমে আসতেন, তিনি অনুভব করতেন—যারা তাঁর কাছে এসেছে, তারা তাঁর মায়ের কাছেই এসেছে, তিনি যা বলছেন তা তাঁর মায়েরই কথা। তাঁর মুখ দিয়ে মা-ই কথা বলছেন। তিনি তাঁর মায়ের হাতে বাঁশী—যা থেকে বেরুচ্ছে অনন্তের সুর। অবশ্য দুর্বল মানুষকে বিনয় শেখাবার জন্যে তিনি নিজের শরীর দেখিয়ে বলতেন, 'আধ-ডুবো ভাঙা কাঠ'। দর্শকরা অবাক্ হয়ে দেখত—কিভাবে অনায়াসে স্বেচ্ছায় তিনি শরীরবোধ ফেলে দিয়ে জীবনের সীমা অতিক্রম ক'রে যান।

ত্যাগ ও সেবা

শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক সাধনার জীবন থেকে যে প্রচুর ফসল পাওয়া যাচ্ছে, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'ত্যাগ ও সেবা'—স্বামী বিবেকানন্দ যাকে বলেছেন ভারতের জাতীয় আদর্শ। বাস্তবকে আদর্শে উন্নীত করা এবং আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করা—এই হ'ল প্রকৃত সিদ্ধি। স্বামীজী তাই এই জাতীয় আদর্শকে বিশ্বব্যাপী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মর্মবাণী-রূপে দিয়ে গেছেন।

এই আশ্চর্য শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য—নারীজাতির প্রতি সম্মান। নারীর মধ্যে সাধারণ মানুষ দেখে সৌন্দর্য, কেউ তাদের হীন ভাবে দেখে, অন্য কেউ তাদের সমান ব'লে মনে করে, শ্রীরামকৃষ্ণের চোখে নারী—দেবী। তাঁর কাছে সকল নারীই মহামায়া জগন্মাতার মূর্ত প্রকাশ। তাঁর এই গভীর শ্রদ্ধা চরম রূপ নিয়েছিল—জগন্মাতা-জ্ঞানে তাঁর সহধর্মিণীকে উপাসনার মধ্যে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, মানবজাতির ইতিহাসে এ এক নতুন অধ্যায়।

উত্তুঙ্গ ব্যক্তিত্ব

শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব শারদ সূর্যের মতো মহিমোজ্জ্বল! সুদূর পূর্ব থেকে দূরতম পশ্চিমে পৃথিবীর সর্বত্র সমভাবে তাঁর অকৃপণ কিরণবর্ষণ! তাঁর আধ্যাত্মিক আলোকচ্ছটায় শুধু হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মন্দিরই আলোকিত হয়নি—খৃষ্টানদের গীর্জা, মুসলমানের মসজিদ—সবই যথারূপে প্রতিভাত। প্রকৃতপক্ষে তাঁকে হিন্দু, মুসলমান বা খৃষ্টান বলা যায় না, তিনি এ সবই ছিলেন, আরও বেশী কিছু ছিলেন। তাঁকে বৌদ্ধ, ইহুদী বা জরথুষ্ট্রীয় বলা যায় না; তিনি ছিলেন এ সবই এবং আরও কিছু বেশী। তাঁকে দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী বলা যায় না,—তিনি এ সব হয়েও আরও বেশী ছিলেন। তাঁর ধর্মকে কৃত্রিম ধর্মসমুচ্চয় বলা চলে না, সর্বতোভাবে তাঁর ধর্ম ছিল সমন্বয়ভাবমূলক, সর্ব ধর্মবিশ্বাসের অপূর্ব সামঞ্জস্য। তাঁর কাছে ধর্ম ছিল জীবন্ত বিশ্বাস—সর্ববিধ বিশ্বাসের, ভাবের ও মতবাদের গ্রহণ ও সহন। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকে বোঝবার সবচেয়ে বেশী সুযোগ পেয়েছিলেন, তিনি বলছেন: শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন অতীত ও বর্তমানের সকল ধর্মের মূর্ত বিগ্রহ এবং ভবিষ্যতের পরিপূর্ণতা। তাঁকে মানব বা অতিমানব বলা হোক, দেবমানব বা মনুষ্য-দেবতা—যে নামে অভিহিত করা হোক, একথা নিশ্চিত যে তাঁকে জীবনে গ্রহণ ক'রলে ইহকালে ও পরকালে মানুষ উপকৃত হবেই।

বিশ্বশান্তি

পৃথিবী আজ এক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছে। সকল জাতিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে—একক বা মিলিত ভাবে বিশ্বসমস্যার সমাধান ক'রে শান্তি স্থাপন করতে চাইছে—এ যুগের যা একান্ত

প্রয়োজন। আমরা জানি কিভাবে জেনেভায় 'লীগ অব নেশন' ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, কিভাবে বিভিন্ন বৃহৎশক্তির সঙ্গে বার বার প্যাক্ট ক'রে মিঃ কেলগের প্রচেষ্টা প্রহসনে পরিণত হয়েছে, আরও জানি শান্তির জন্য সযত্ন চেষ্টা সত্ত্বেও কিভাবে নিরস্ত্রীকরণ-সম্মেলন বিফল হয়েছে।

পৃথিবীতে শান্তিস্থাপন যদি সম্ভব হয়, তা পারেন শুধু বহুমুখীব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট একজন শ্রীকৃষ্ণ, যিনি আজও অনেকের কাছে রহস্য—পারেন একজন বুদ্ধ, যাঁর সেবার বাণী সকল মানুষের প্রাণে আবেদন জাগায়,—পারেন একজন খৃষ্ট, প্রেম ও আত্মোৎসর্গের জন্য যিনি পুজার পাত্র হয়ে রয়েছেন,—পারেন একজন মহম্মদ, যিনি ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা,—পারেন একজন শংকর যাঁর বিরাট প্রতিভা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে বিস্ময়ের বস্তু,—পারেন একজন রামকৃষ্ণ, একজন বিবেকানন্দ—যাঁদের বিশ্বজনীন ভালবাসা, শুভেচ্ছা ও সমন্বয়ের ভাব পৃথিবীর হৃদয় জয় করেছে।*

* ইংরেজী প্রবন্ধ 'Sri Ramakrishna—the Man and Superman'-এর ভাবানুবাদ।

ব্রহ্মানন্দ-স্মরণে

শ্রীমদনমোহন মুখোপাধ্যায়

[২৭শে বৈশাখ ১৩৬৬, ২৪ পরগনার অন্তর্গত বসিরহাট মহকুমার শিকড়া-কুলীনগ্রামে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্মস্থানে মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে]

এত দিন যাহা স্বপ্নের ছিল, ছিল যা কল্পনার,
বাস্তবে আজি পূর্ণ হ'ল তা খুলি মন্দির-দ্বার।
বাজিছে শঙ্খ, বাজিছে ঘণ্টা—কোলাহল-মুখরিত,
ভক্তকণ্ঠে তব জয়ধ্বনি উঠিতেছে অবিরত।
পরমহংসের মানসপুত্র শ্রীরাখাল মহারাজ!
সত্য তবে কি জন্মভূমিতে ফিরে এলে তুমি আজ?
বাঁধিতে পারেনি সংসারে পিতা পুত্ররে প্রিয়তম,
জগতের মহা কল্যাণ লাগি নিমাই-বুদ্ধ-সম
গিয়েছিলে ছাড়ি যে ব্রতের লাগি সার্থক তাহা আজ।
ভারতেই নয় বন্দিত তুমি সারা বিশ্বের মাঝ।
এ মহাতীর্থে, এ শুভ লগনে, আজি এ পুণ্য প্রাতে,
দিগন্ত হ'তে আসিছে ভক্ত প্রণাম রাখিয়া যেতে।
সকলের প্রাণে দাও হে শান্তি অন্তর দাও ভরি,
কল্যাণব্রতে তোমার আশিস্ পড়ুক নিয়ত ঝরি।
মানুষে মানুষে ঘৃণা হোক দূর, মিলুক ছোট ও বড়;
যারা দূরে আছে তারাও আসুক—মিলন মধুরতর।
সকলের মাঝে এক ঈশ্বর,—যত মত তত পথ!
ব্রহ্মানন্দ-নামেতে ভাসুক ব্রহ্ম জীব জগৎ।

সমালোচনা

হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা—স্বামী বিষ্ণুশিবানন্দ গিরি প্রণীত, সত্যাশ্রম, সারিয়া (হাজারিবাগ) হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৪৫১; মূল্য চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

হিন্দুধর্মের সম্পদ বিপুল ও বিরাট। শাখা-প্রশাখা সমেত হিন্দুধর্মের সম্বন্ধে সাধারণভাবে অভিজ্ঞ হইতেও বহু সময়, অধ্যবসায় ও গ্রন্থানুশীলনের প্রয়োজন।

একখানি গ্রন্থের মাধ্যমে লেখক হিন্দুধর্মের অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি যেভাবে পরিবেশন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। উদার অসাম্প্রদায়িক ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দশটি অধ্যায়ে তিনি বহু কঠিন বিষয় প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করিয়াছেন।

প্রথম অধ্যায়ে আর্যগণের বাসস্থান, ভারতাগমন ও অবদান আলোচিত; দ্বিতীয়ে হিন্দুর পরিভাষা, ধর্মের অর্থতত্ত্ব ও হিন্দুধর্মের স্বরূপ বিবৃত, তৃতীয়ে হিন্দুধর্মগ্রন্থ যথা বেদ, স্মৃতি-সংহিতা, ইতিহাস, পুরাণ, আগম, ষড়্‌দর্শন প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ও অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের মূল তত্ত্ব। পরের অধ্যায়গুলিতে অধ্যাত্মবাদ, জন্মান্তরবাদ, বর্ণাশ্রম-ধর্ম, সৃষ্টিতত্ত্ব, কালবিভাগ, বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতা, অবতার, হঠযোগ, রাজযোগ, জ্ঞান-ভক্তি-কর্মযোগ, বৈদিক পৌরাণিক তান্ত্রিক কর্ম ও উপাসনা, পরমেশ্বরের অন্তর্যামিত্ব, হিন্দুধর্মের পরধর্ম-সহিষ্ণুতা বিশ্বভ্রাতৃত্ব সার্বভৌমিকতা প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে আলোচিত।

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে প্রাথমিক পাঠ হিসাবে গ্রন্থখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা যাইতে পারে।

বুদ্ধজাতক—শ্রীমতী রাধা মিত্র প্রণীত, কোরাল পাবলিশিং, ১৬৮ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৪, পৃষ্ঠা—৫৪; মূল্য পঁচানব্বই নয়া পয়সা।

জাতক শব্দের অর্থ জন্মকাহিনী। বুদ্ধজাতক বুদ্ধদেবের পূর্ব পূর্ব জন্মের ইতিবৃত্ত। বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করেন, গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে বহুবার জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সকল জন্মে তাঁহাকে বলা হয় বোধিসত্ত্ব। বুদ্ধত্বলাভের পর ত্যাগ-তপস্যা শিক্ষা দিবার জন্য তিনি পূর্ব জন্মের কাহিনীগুলি গল্পচ্ছলে বর্ণনা করেন। এইগুলি 'জাতক' নামে প্রচলিত।

গল্পের মাধ্যমে সৎশিক্ষা মানুষের হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া যায়। বাইবেলের 'প্যার্যাব্‌ল্'-গুলির মতোই জাতক-কাহিনীগুলি অতি সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ।

লেখিকা বিভিন্ন জাতক হইতে ১৮টি কাহিনী নির্বাচন করিয়া বালক-বালিকাদের উপযোগী সহজ সরল ভাষায় পরিবেশন করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস এই সুখপাঠ্য পুস্তকখানি ছাত্রছাত্রীগণের মনোরঞ্জন করিবে এবং তাহাদের চরিত্রগঠনে সাহায্য করিবে।

পুস্তকে লিপিবদ্ধ কয়েকটি উৎকৃষ্ট কাহিনী: প্রিয়ভাষণ, কলহের ফল, চরিত্র-বিচার, ভিক্ষার দীনতা, নীচ সংসর্গ, উপকারীর ঋণ, রাজার ঐশ্বর্য।

বিবেকানন্দ ইন্‌স্টিটিউশন পত্রিকা—শ্রীসুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য কর্তৃক ১০৭ নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়া হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সুমুদ্রিত পত্রিকাখানি পূর্ব মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। ছাত্রদের কয়েকটি প্রশংসাযোগ্য রচনা: 'স্বামীজী ও নেতাজী' 'কানাই মাস্টার', 'গণিত শাস্ত্রে ভারতীয় দানের যৎকিঞ্চিৎ', 'পুল ও সাঁকোর টুকিটাকি।'

জয়তু সন্তদাস—স্বামী গুণেশ্বর দাস প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান, বাসুদেব আশ্রম, সোনামুখী, বাঁকুড়া। পৃষ্ঠা—৩২, মূল্য পাঁচ আনা।

প্রকৃত সাধু-মহাপুরুষদের চরিত্রানুধ্যান গঙ্গাস্নানের মতোই শরীর-মনকে পবিত্র করে। আলোচ্য পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পাঠকগণের এইরূপই ধারণা হইবে।

বইটি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে সন্তদাস বাবাজীর জন্ম ও বাল্যাবস্থা, কলিকাতায় পঠদ্দশা, ব্রাহ্মধর্ম-গ্রহণ, যোগী-সম্প্রদায়ে প্রবেশ, শ্রীহট্টে ওকালতি, হিন্দুসমাজে প্রত্যাবর্তন, কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন, কাঠিয়া বাবাকে গুরু-রূপে লাভ, সাধনা ও তপস্যা, সংসারত্যাগ ও আশ্রম-জীবন, তীর্থভ্রমণ ও দীক্ষাদান এবং দেহত্যাগ প্রভৃতি প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত। সাধুর শতবর্ষ-জয়ন্তীতে ভক্তগণের নিকট পুস্তিকাটি সমাদৃত হইবে।

বিদ্যামন্দির-পত্রিকা: (নবম বার্ষিক সংখ্যা—১৯৫৮) প্রকাশক—স্বামী তেজসানন্দ, অধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া। পৃষ্ঠা—১৫২

বিদ্যামন্দিরের সুমুদ্রিত ও সুসম্পাদিত পত্রিকাখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। প্রবন্ধগুলিতে যে চিন্তা ও মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে বিদ্যামন্দির যে তাহার যাত্রাপথে সাফল্যের সহিত আগাইয়া চলিয়াছে এই ধারণা সকলেরই হইবে।

প্রথমেই উপনিষদের প্রসিদ্ধ মন্ত্র, শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের নির্বাচিত অংশবিশেষ ও স্বামীজীর লেখা হইতে উদ্ধৃতি পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

শিক্ষাবিষয়ক নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলিতে প্রকৃত শিক্ষা ও শিক্ষা-সমস্যা বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে:

A Serious Problem of Education, Need of True Education, বহির্মুখীন শিক্ষা।

অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে সমালোচনা, চরিত্র-চিত্রণ, রম্য রচনা উল্লেখযোগ্য, 'শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র'—সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনীটি সুখপাঠ্য, কবিতা কয়েকটি মনোরম।

Annual Report—1958-59, বিদ্যামন্দির ছাত্র-পরিষদের কার্যবিবরণী, 'আমাদের কথা' ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিদ্যামন্দির সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অনেক কিছুই উল্লিখিত। —জীবানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

বরাহনগর : শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ৯ই হইতে ১৫ই মে বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব ও আশ্রমের বার্ষিক উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। ৯ই মে অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় শঙ্খধ্বনি সহকারে স্বামীজীর সাড়ে বার ফুট উচ্চ সুদৃশ্য প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে শান্তিপাঠ ও স্বস্তিবাচনে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। অতঃপর শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী 'ধন্য ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী' ও স্বামীজী-বিষয়ক দুখানি সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তৎপর স্বামী পুণ্যানন্দের সভাপতিত্বে ধর্মসভায় স্বামী মহানন্দ 'বর্তমান সমাজ ও স্বামীজীর প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে আলোচনা করেন। সভাপতি মহারাজ বলেন : আধ্যাত্মিকতাই আমাদের জাতীয় জীবনের ও জাতীয় সমাজের প্রাণ। ভারতবর্ষ ত্যাগকেই চিরদিন পূজা করিয়া আসিয়াছে। স্বামীজী সেই ত্যাগের বার্তাই বহন করিয়া আনিয়াছেন পুরাতন শাস্ত্র হইতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—এই তাঁর মন্ত্র। অতঃপর প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য ধ্রুপদ-সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

১০ই মে প্রাতে পূজা, হোম, তুলসীদাস-রামায়ণপাঠ এবং অপরাহ্ণে 'ছাতীবাগান দীনসংঘ' কর্তৃক কালীকীর্তন হয়। ৫-৩০ ঘটিকায় শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজী-বিষয়ক সঙ্গীতের পর স্বামী গম্ভীরানন্দের সভাপতিত্বে ধর্মসভায় স্বামী নিরাময়ানন্দ 'বর্তমান যুগের উপর স্বামীজীর ভাবধারার প্রভাব' সম্বন্ধে বলেন। সভাপতি মহারাজ তাঁহার চিন্তাশীল ভাষণে বর্তমান সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজীর কথা আলোচনা করেন। রাত্রে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী জয়জয়ন্তী-রাগে এবং সত্যেন ঘোষাল মালকোষ-রাগে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। পরিশেষে একটি ভজনগানে সঙ্গীতের আসর শেষ হয়। সঙ্গত করেন শ্রীবিশ্বনাথ বসু।

১১ই মে রাত্রে হাওড়ার আনন্দসমাজের 'নদের যাত্রা' যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। ১২ই মে ছাত্রদিবসের সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ সমাজশিক্ষা-বিভাগের প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিল-রঞ্জন রায়। ঐদিন সভার পূর্বেই তিনি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের একটি প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন এবং সভায় সরল ভাষায় স্বামীজীর জীবন ও আদর্শ ছাত্রদের সমক্ষে তুলিয়া ধরেন। শেষে 'মীরাবাঈ' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

১৩ই মে সন্ধ্যায় গীটার প্রভৃতি বাদনের পর ছাত্রদের অভিনীত 'কুশধ্বজ' নাটক সকলের প্রশংসা অর্জন করে। তৎপর 'নর-নারায়ণ' নাটক অভিনীত হয়। ১৫ই মে আশ্রমের বিদ্যালয়সমূহের পুরস্কার বিতরণ করেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার। তিনি ছেলেদের কুচকাওয়াজ ও ব্যায়াম প্রদর্শনের প্রশংসা করেন ও ছাত্রদের আদর্শপথে পরিচালিত হইতে উৎসাহিত করেন।

মালদহ : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ জন্মোৎসব এবং স্থানীয় মঠ মিশনের বার্ষিক অনুষ্ঠান ৬ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ৯ই জ্যৈষ্ঠ চার দিনে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। স্বামী নিরাময়ানন্দ ও কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীমা, ঠাকুর, স্বামীজী ও ভগবান বুদ্ধদেব

সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করিয়া প্রত্যহ ২।৩ সহস্র নরনারীকে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির পথে মানব-জীবনের পূর্ণতা-লাভে উৎসাহিত করেন। ভগবান বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব-সভায় শ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ বড়ুয়া (A. D. M.) সভাপতিত্ব করেন।

এতদ্ব্যতীত সারদা-সংঘ কর্তৃক সারদা-লীলাগীতি, ভ্রাতৃসংঘ কর্তৃক মাটির পুতুলে রামায়ণ-মহাভারত-প্রদর্শনী ও কলিকাতার কীর্তন-বিশারদ শ্রীশশধর অধিকারীর সুমধুর কীর্তন শ্রোতাদের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। শেষ-দিন ৯ই জ্যৈষ্ঠ বিশেষ পূজা ও হোমের পর ৫।৬ হাজার নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

কার্যবিবরণী

টাকী (২৪ পরগনা): শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৫৭ খৃঃ কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। এই আশ্রম স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষতঃ পল্লী-অঞ্চলের অধিবাসীদিগের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া শিক্ষা-বিস্তার-কার্যে রত। আলোচ্য বর্ষে এই আশ্রম কর্তৃক বালকদিগের জন্য একটি উচ্চ বিদ্যালয় (ছাত্রসংখ্যা—২৮৬) ও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় (ছাত্রসংখ্যা—২০১), বালিকাদিগের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় (ছাত্রীসংখ্যা—১৩১) এবং একটি মিশ্র প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হইয়াছে।

শারীরিক পরিশ্রম, উপাসনা, খেলা ও পড়াশুনার মাধ্যমে যাহাতে ছাত্রগণ সৎ নাগরিক হইতে পারে তজ্জন্য আশ্রমের পরিচালনাধীনে একটি ছাত্রাবাস আছে। আলোচ্য বর্ষে ছাত্রাবাসে ৪৭ জন ছাত্র ছিল।

পীড়িত জনসাধারণকে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসার জন্য আশ্রম একটি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় পরিচালনা করে। আলোচ্য বর্ষে ৭৮,৬৬০ রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মতিথি পূজা, নারায়ণসেবা ও আলোচনা-সভার মাধ্যমে যথারীতি প্রতিপালন করা হইয়াছে।

মাতৃভবন: ৭এ, শ্রীমোহন লেন (কলিকাতা-২৬)-এ অবস্থিত প্রসূতি-সেবা-সদনের ১৯৫৭-৫৮ খৃঃ কার্যবিবরণীতে প্রকাশ:

১৯৫৮ খৃঃ চিকিৎসিতের সংখ্যা বহির্বিভাগে: নূতন—২,২৪৮, পুরাতন—৮,৮৮৪, অন্তর্বিভাগে: ১,৬৯৮। বর্তমানে মাতৃভবনে ১৬টি শয্যা আছে, ইহার মধ্যে ৮টি ফ্রি—দরিদ্র রোগিণীগণের জন্য সংরক্ষিত। বহির্বিভাগে রোগিণীগণ বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা লাভ করিয়া থাকেন।

আলোচ্য বর্ষের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান—শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ কর্তৃক নূতন ব্লকের উদ্বোধন। নির্মীয়মাণ দ্বিতল ভবনটি সম্পূর্ণ হইলে ইহাতে ৩৬টি শয্যার ব্যবস্থা থাকিবে।

কানপুর: শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৫৭ এবং '৫৮ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই কেন্দ্র কর্তৃক (১) হাসপাতাল, (২) উচ্চ বিদ্যালয়, (৩) গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, (৪) ব্যায়ামাগার ব্যতীত ধর্মসভা ও ক্লাস পরিচালিত হয়।

হাসপাতালে রোগিসংখ্যা দৈনিক ৩০০ হইতে ৪০০ এর মধ্যে। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ের বিভিন্ন বিভাগে মোট রোগি-সংখ্যা যথাক্রমে ১,১১,৭৩৬ ও ৯৭,৪০৫। চক্ষু-বিভাগ এবং সার্জিক্যাল ক্লিনিক্যাল ও ইলেক্ট্রোথেরাপি বিভাগের কাজ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

উচ্চ বিদ্যালয়ে ৫ শতাধিক ছাত্র অধ্যয়ন করে। পরীক্ষা-ফল প্রশংসনীয়।

লাইব্রেরির গ্রন্থসংখ্যা ৫,১৪৯ এবং পাঠাগারের দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা ২০।

সর্বসাধারণের স্বাস্থ্যচর্চার সুবিধার জন্য আশ্রম-সংলগ্ন বিবেকানন্দ ইনষ্টিট্যুট এবং অনুন্নত

সম্প্রদায়ের জন্য নগরের উপান্তে বিবেকানন্দ ব্যায়ামশালা প্রতিষ্ঠিত। উভয় স্থানেই যথোপযুক্তভাবে স্বাস্থ্যচর্চা হইয়া থাকে। পূজা ও উৎসবাদি যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে।

পাটনা : রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৫৮ খৃঃ বার্ষিক কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি।

আলোচ্য বর্ষে আশ্রমের হোমিওপ্যাথিক ও অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে চিকিৎসিতের সংখ্যা যথাক্রমে ৭০, ৩৬২ (নূতন ৮,৪৩৮) এবং ৪৯,৪৯১ (নূতন ৭,২৪৯)

প্রধানতঃ অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছাত্রগণের জন্য স্থাপিত অদ্ভুতানন্দ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ছিল ১৬৯ জন। আশ্রম-ছাত্রাবাসে কলেজের ৭ জন ছাত্র ছিল।

গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ৫,১২৫ এবং পঠনার্থে প্রদত্ত পুস্তক-সংখ্যা ৫,৭৬২। পাঠাগারে ৬টি দৈনিক ও ৫৬টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়।

শনিবার বাদে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে আশ্রম-প্রাঙ্গণে ভক্তবৃন্দের সমাবেশে ধর্মবিষয় আলোচনা করা হইয়া থাকে।

ম্যাঙ্গালোর : কেন্দ্রের ১৯৫৮ খৃঃ বার্ষিক কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ম্যাঙ্গালোরে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ১৯৪৭ খৃঃ এবং মিশনের শাখা ১৯৫১ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

বর্তমানে এখানে একটি ছাত্রাবাস ও একটি দাতব্য অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসালয় পরিচালিত হইতেছে। আলোচ্য বর্ষের শেষে ছাত্রাবাসে স্কুলের ৩৪ এবং কলেজের ৪ জন বিদ্যার্থী ছিল। ১৯৫৮ খৃঃ চিকিৎসালয়ে মোট ৩১,৯১৯ রোগী (নূতন ২৩,৬৯৩) চিকিৎসিত হয়।

কাঁথি : শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৫৭ ও '৫৮ খৃঃ কার্যবিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই কেন্দ্র ইহার প্রতিষ্ঠাকাল ১৯১৩ খৃঃ হইতে ৪৬ বৎসর ধরিয়া জনকল্যাণে রত। বর্তমানে স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস, ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, সর্বসাধারণের জন্য দুইটি গ্রন্থাগার (একটি ভ্রাম্যমাণ) এবং একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় এই সেবাশ্রম কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে।

১৯৫৮ খৃঃ ছাত্রাবাসে ১০টি ছাত্র ছিল, চিকিৎসালয়ে ৩৯,৮৩৪ জন রোগী চিকিৎসিত হয়, বিদ্যালয়ে ৯৬ জন (বালিকা—৩৪) পড়াশুনা করে, গ্রন্থাগারের ১৬টি গ্রাম-কেন্দ্রের কাজ যথারীতি চলে; ইহা ছাড়া দুগ্ধবিতরণ, ছাত্র ও দুঃস্থব্যক্তিগণকে সাহায্য করা হয়। উৎসবাদি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

বলরাম-মন্দির : নিম্নোক্ত ক্রম অনুযায়ী প্রতি শনিবার পাঠ ও বক্তৃতাদি হইয়াছিল।

	বিষয়	বক্তা
ডিসেম্বর,'৫৮ :	শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত	স্বামী দেবানন্দ
	যীশুখ্রীষ্ট	স্বামী মহানন্দ
	প্রেমানন্দের জীবন ও বাণী	„ জীবানন্দ
জানুআরি, '৫৯ :	শ্রীশ্রীমা	„ মহানন্দ
	মহাভারত	শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী
	স্বামী বিবেকানন্দ	স্বামী জপানন্দ
	স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ	„ জীবানন্দ
ফেব্রুআরি :	জাতীয় জাগরণে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা	স্বামী প্রণবাত্মানন্দ
	স্বামী বিবেকানন্দ	শ্রীতামসরঞ্জন রায়
	গীতা	স্বামী সাধনানন্দ
	মহাভারত	শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী
	স্বামী ব্রহ্মানন্দ	স্বামী দেবানন্দ
মার্চ :	শ্রীরামকৃষ্ণ-কথকতা	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
	গীতা	স্বামী জীবানন্দ
	শ্রীরামকৃষ্ণ	„ নিরাময়ানন্দ
	শ্রীরামকৃষ্ণ	„ মহানন্দ

আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার

সেণ্ট লুই : বেদান্ত সোসাইটি—১৯৫৮ খৃঃ কার্যবিবরণী : কেন্দ্রাধ্যক্ষ—স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ।

(১) রবিবারের ধর্মালোচনা : সোসাইটির উপাসনা-মন্দিরে সারা বৎসর রবিবারে সর্বসমেত ৪৫টি বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। নানা ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান হইতে এবং ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়, মিসৌরী বিশ্ববিদ্যালয় ও লিনডেনউড কলেজ হইতে অধ্যাপকগণ সহ ছাত্রবৃন্দ যোগদান করেন। বোস্টন কেন্দ্র হইতে স্বামী অখিলানন্দ এবং নিউইয়র্ক কেন্দ্র হইতে স্বামী ঋতজানন্দ অতিথিরূপে যথাক্রমে মে ও জুলাই মাসে ভাষণ প্রদান করেন।

(২) ধ্যান ও কথোপকথন : প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ আগ্রহশীল ব্যক্তিগণকে ধ্যানাভ্যাস শিক্ষা দিতেন এবং 'শ্বেতাশ্বতর, কেন ও মুণ্ডক' উপনিষদের অধ্যাপনা ও ব্যক্তিগত প্রশ্নের সমাধানমূলক উত্তর প্রদান করিয়াছেন। মঙ্গলবারের ক্লাস-সংখ্যা—৪০।

(৩) সাময়িক বক্তৃতা ও আলোচনা : স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ আহূত হইয়া নিম্নলিখিত স্থানসমূহে হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন :
ফার্গুসন্ প্রেসবিটেরিয়ান চার্চ
কনকর্ডিয়া সেমিনারি (থিয়োলজিক্যাল কলেজ)
মিসৌরী ক্লেটন চ্যাপেল

এতদ্ব্যতীত হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু সমাগত ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন।

(৪) শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, শংকরাচার্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতির পুণ্য জন্মদিবসে এবং অন্যান্য উৎসব-দিনে (দুর্গাপূজা, বড়দিন, গুড্ ফ্রাইডে প্রভৃতি) বিশেষ ধ্যান, পূজা, ভজন, শাস্ত্রপাঠ ও জীবনী আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়।

(৫) গ্রীষ্মাবকাশ : এই সময়ে বেদান্তানুরাগী ভক্তবৃন্দ রবিবার ও মঙ্গলবারের সান্ধ্য প্রার্থনায় ও ধ্যানাদিতে যোগদান করিয়াছেন।

(৬) অতিথি ও পরিদর্শকবৃন্দ : এই বৎসর ৩০ জন বিশিষ্ট অতিথি সোসাইটি পরিদর্শন করেন। তাঁহাদের মধ্যে সন্ন্যাসী, কলেজের অধ্যাপক, পত্রিকা-সম্পাদক, সরকারী কর্মচারী প্রভৃতি ছিলেন।

(৭) ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী ৮২ জনকে সাধন-নির্দেশ দেন।

(৮) সোসাইটির সদস্যবৃন্দ ও বন্ধুবর্গ গ্রন্থাগারের পুস্তকসমূহের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিতেছেন। এই বৎসর শতাধিক পুস্তক পাওয়া গিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

মন্দির-প্রতিষ্ঠা

শিকড়া-কুলীনগ্রাম ঃ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের পুণ্য জন্মস্থান শিকড়া-কুলীনগ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রহ্মানন্দ আশ্রমে মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী আনন্দোৎসব হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজ ২৭শে বৈশাখ (১১ই মে), সোমবার অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমহারাজের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া মন্দিরের উদ্বোধন করেন।

প্রভাতফেরী, বেদপাঠ, বিশেষ পূজা, যাগ-যজ্ঞাদি, সপ্তশতী হোম, রামনাম-সঙ্কীর্তন, কালী-কীর্তন, 'রাখালরাজা' ও 'মঙ্গলচণ্ডী' যাত্রাভিনয় এবং 'ধ্রুব' ও 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব' ছায়া-চিত্র প্রদর্শনে উৎসব-প্রাঙ্গণ কয়দিন এক দিব্য-ভাবে পূর্ণ ছিল। বহু সাধু এবং বিভিন্ন স্থান হইতে আগত অগণিত ভক্তের সমাগমে যে অতুলনীয় পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা ভুলিবার নয়। বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জা উৎসব-মণ্ডপের শোভা বর্ধন করিয়াছিল।

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৭ই মে রবিবার বিশেষ পূজা ও কালীকীর্তনের পর ছয় হাজারের অধিক লোক বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণ সাড়ে চারি ঘটিকায় এক ধর্মসভায় স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ এবং সভাপতি স্বামী গম্ভীরানন্দ শ্রীশ্রীমহারাজের জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করেন। সন্ধ্যারতির পর আতসবাজি পোড়ানো হইলে সপ্তাহব্যাপী উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়। এই দিন ভোর হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি এগারটা পর্যন্ত লক্ষাধিক লোকসমাগম হইয়াছিল।

এই অভূতপূর্ব ব্যাপারে এতদঞ্চলের লোকের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছে। এখনও প্রতিদিন দূরদূরান্তর হইতে বহুলোক শ্রীমন্দির এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের আরাত্রিক দর্শন করিতে আসিতেছেন।

উৎসব-সংবাদ

সিঁথি (কলিকাতা-২): রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ২৬শে হইতে ২৯শে মার্চ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-উৎসব সিঁথি ডি, গুপ্ত লেনে বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। প্রতিদিনই সকালে পূজা পাঠ ও কীর্তনাদির ব্যবস্থা ছিল। বৈকালে ধর্মসভা ও কীর্তন, কথকতা ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল। স্বামী সাধনানন্দ, স্বামী সংশুদ্ধানন্দ, স্বামী সন্তোষানন্দ ও স্বামী মহানন্দ এবং অধ্যাপক বিনয়কুমার সেন বিভিন্ন দিনে ধর্মালোচনা করেন। পরে বিভিন্ন দিনে যথাক্রমে লীলাকীর্তন, লীলাভিনয় ও যাত্রায় পল্লীর সকলে বিপুল আনন্দলাভ করে। উৎসবের শেষ দিনে প্রায় ৫,০০০ হাজার নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বড় আন্দুলিয়া (নদীয়া): গত ১৮ই এপ্রিল কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে স্বামী নিরাময়ানন্দ নদীয়ার বড় আন্দুলিয়া গ্রামের লোকসেবা-শিবিরে এক মহতী জনসভায় ঠাকুর-স্বামীজীর উদার সাধনা ও সমন্বয়ের বাণী সম্পর্কে একটি ভাষণ দেন। সভায় চতুষ্পার্শবর্তী গ্রামাঞ্চলের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই জনসাধারণ যোগ দিয়াছিলেন। সভার পরে গ্রামের প্রধানেরা বক্তার সহিত আলাপ-আলোচনায় আনন্দিত হন।

কাটোয়া : শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ২রা জ্যৈষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। প্রাতে শোভাযাত্রা, পূজা, হোম ও প্রসাদ-বিতরণ উৎসবের অঙ্গ ছিল।

অপরাহ্ণে সেবাশ্রম-সংলগ্ন আম্রকাননে ডাঃ শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক জনসভায় স্বামী মিত্রানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

ভাঙ্গামোড়া (হুগলী) : গত ২৯শে চৈত্র তারকেশ্বরের নিকট ভাঙ্গামোড়া গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রাতে পূজা চণ্ডীপাঠ ও হোম, মধ্যাহ্নে প্রসাদ-বিতরণ হয়। অপরাহ্ণে ধর্মসভায় স্বামী জীবানন্দ 'শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী—জীবনে রূপায়ণ' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সন্ধ্যারতি ও সঙ্কীর্তনের পর স্থানীয় যুবকগণের উদ্যোগে যাত্রাভিনয় হয়।

ব্রাহ্মণপাড়া (হাওড়া) : গত ১৪ই চৈত্র, শনিবার ব্রাহ্মণপাড়া বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিন মন্দিরের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে পূজা, হোম ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় সহস্র নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে স্বামী শান্তিনাথানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। রাত্রে 'রামকৃষ্ণ-লীলাভিনয়' সকলকে আনন্দ দান করে।

খড়িবেড়িয়া (বজবজ, ২৪ পঃ) : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ২৫শে ও ২৬শে বৈশাখ উষাকীর্তন, কালীকীর্তন, পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, উপনিষদ্‌ব্যাখ্যার ব্যবস্থা হয়। ২৬শে বৈশাখ সান্ধ্য সভায় 'কথামৃত' ব্যাখ্যা করেন স্বামী জীবানন্দ এবং ভাষণ দেন শ্রীঅচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত।

বিজ্ঞান-সংবাদ

খাদ্য : খাদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের কৃষি-সংস্থা (F. A. O.) ডিরেক্টার জেনারেল শ্রী বি. আর. সেন গত ১৬ই মে লণ্ডনে বলিয়াছেন : যদি গবেষকগণ সমুদ্র হইতে খাদ্যসংগ্রহের পরীক্ষায় অধিকতর মন দেন তবে পৃথিবীর বহু দেশের খাদ্য-সমস্যার সমাধান হয়। পৃথিবীর উপরিতলের প্রায় দশ ভাগের সাত ভাগ অধিকার করিয়া আছে সমুদ্র এবং উহা প্রাণিজাত প্রোটিনে পরিপূর্ণ। কিন্তু মানুষের ব্যবহারের জন্য শতকরা একভাগও এখনও কাজে লাগানো হয় নাই। আরও কিছু গবেষণা চালাইলে সমুদ্রে ভাসমান লক্ষ লক্ষ টন প্ল্যাঙ্কটন (বৃহত্তর সামুদ্রিক জন্তুদের এক প্রকার-খাদ্য) হইতেও সরাসরি ভাবে বহু পরিমাণে মনুষ্য-খাদ্য পাওয়া যাইতে পারে। নদী, হ্রদ এবং পুষ্করিণী হইতেও খাদ্যসম্ভার বাড়ানো সম্ভব।

গবেষণা : ১৯৫০ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে জাতীয় গবেষণা-সংস্থা ১৮টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রায় ৪৪৭টি ছোট বড় আবিষ্কার করিয়াছে।

১৯৫৭-৫৮ খৃঃ তিনটি আবিষ্কার ব্যবসায়ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হইয়াছে, ১৭টি বিষয়ে লাইসেন্স লওয়া হইয়াছে। স্থানানুযায়ী আবিষ্কার-সংখ্যার একটি নির্বাচিত তালিকা :

স্থান	গবেষণা-প্রতিষ্ঠান	আবিষ্কার সংখ্যা
পুণা	রসায়ন	৬৩
মাদ্রাজ	চর্ম	৪২
বাঙ্গালোর	বিজ্ঞান (শিল্প)	৩২
„	বিজ্ঞান (সাধারণ)	৩০
মহীশূর	খাদ্য	২৬
করাইকুডি	বৈদ্যুত রসায়ন	২৫
হায়দ্রাবাদ	(আঞ্চলিক)	২৫
কলিকাতা	কাচ ও সেরামিক	২২
নঈ দিল্লী	পদার্থ বিজ্ঞান	১৮
„	শিল্প	১৮
দেরাদুন	বন	১৮

উদ্বোধন

শুভ্র শিবের সমীপে

গাত্রং ভস্মসিতং সিতঞ্চ হসিতং হস্তে কপালং সিতং
খট্বাঙ্গঞ্চ সিতং সিতশ্চ বৃষভঃ কর্ণে সিতে কুণ্ডলে।
গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেশ্চন্দ্রঃ সিতো মূর্ধনি
সোঽয়ং সর্বসিতো দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং সর্বদা॥

—শংকরাচার্য

তুষারমণ্ডিত ধ্যানগম্ভীর রজতগিরি যাঁহার স্মরণ প্রতীক, জীবন-কোলাহল সমাপ্ত হইলে যিনি তাঁহার সন্তানগণকে স্বীয় শান্তস্বরূপে লীন করিয়া লন, সর্ববর্ণের লয়স্থান সর্বাধারস্বরূপ সেই শুভ্র শিবের ধ্যান করি।

*　　*　　*

গাত্র যাঁহার শুভ্র ভস্ম দ্বারা রঞ্জিত, হাসি যাঁহার শিশুর মতো সরল সুন্দর ও শুভ্র, হস্তে যাঁহার নরকপাল ও খট্বাঙ্গ শুভ্র, যাঁহার বাহন শুভ্র বৃষভ, কর্ণে যাঁহার শুভ্র রৌপ্যকুণ্ডল, গঙ্গার উচ্ছল ফেনে যাঁহার জটা শুভ্র, এবং যে পশুপতির মস্তকে নিষ্কলঙ্ক শুভ্র চন্দ্র সেই সর্বশুভ্র শিব আমাদিগের কালিমাময় জৈব পশুভাব—সর্ববিধ পাপতাপ বিনষ্ট করিয়া সর্বদা আমাদিগকে দিব্য ঐশ্বর ভাবে পূর্ণ করুন।

*　　*　　*

শ্রাবণের প্রতিটি দিন, বিশেষতঃ শ্রাবণের পুণ্য পূর্ণিমায় আমরা স্মরণ করি সেই শান্ত শুভ্র শিবকে—যিনি জগতের কল্যাণ-ধ্যানে যুগে যুগে যোগমগ্ন—যিনি জগতের সকল দুঃখ গরলজ্বালা নিজে একা ভোগ করিয়া বিশ্ববাসীর জন্য বর্ষণ করিতেছেন অমৃতের শান্তিধারা।

কথাপ্রসঙ্গে

বিশ্বমৈত্রীর তিনটি সূত্র

অ্যাটম-বম্ব ও স্পুটনিকের মতো 'বিশ্বমৈত্রী' কথাটিও আজকাল সকলের মুখে মুখে, তবে দুঃখের বিষয় ব্যাপারখানা কি বুঝাইয়া বলিতে বলিলে প্রায় সকলেই অন্য কথা পাড়েন। কিভাবে অ্যাটম বোমা ফাটে, কিভাবে স্পুটনিক চলে, তাহা জনসাধারণের জানিবার কথা নয়, যদিও কাগজে পত্রে একরূপ বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহাতে কৌতূহল নিবৃত্ত হইলেও প্রকৃত তত্ত্ব অজানাই থাকিয়া যায়।

আর 'বিশ্বমৈত্রী'? বিবদমান বিশ্বে আজ বিশ্বমৈত্রীই যে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়—একথা সকলে বুঝিলেও বিশ্বমৈত্রীর স্বরূপ কি, কিভাবে উহা মানব-সমাজে রূপায়িত হইবে—এ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণার একান্ত অভাব। অথচ একথা সর্বজনস্বীকৃত যে বিশ্বমৈত্রী অথবা বিশ্ব-ধ্বংস—মানুষ আজ এই দুই বিকল্প অবস্থার সম্মুখীন। নিজের ধ্বংস কেহই চাহে না, অতএব আত্মরক্ষার জন্যই আজ বিশ্বমৈত্রীব প্রকল্প গ্রহণ করিতে হইবে। আলোক এবং অন্ধকার যেমন বিকল্প নহে, আলোকের অভাবই অন্ধকার, তেমনই এখানেও মৈত্রীর অভাবই হিংসা। বিশ্বমৈত্রী দেখা দিলে বিশ্বধ্বংসের ভাব তিরোহিত হইবে।

মনুষ্যজাতির এই সংকটকালে সর্বপ্রযত্নে আজ 'বিশ্বমৈত্রী' শব্দটির যথার্থ অর্থ বুঝিতে হইবে, এবং জীবনের সর্বস্তরে—ব্যক্তিগত, জাতিগত ও সর্বমানবিক ক্ষেত্রে মৈত্রী সাধনার ও মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা করিতে হইবে। এই মৈত্রী সাধনার তিনটি সূত্র: ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম নিজের প্রতি শ্রদ্ধা, দ্বিতীয়—অপরের প্রতি শ্রদ্ধা, তৃতীয়—বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সকলের মধ্যে একত্ব-দর্শন।

জাতিগত ক্ষেত্রে—সর্বপ্রথম স্বীয় জাতির শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে এবং নিজস্ব কৃষ্টির উপর শ্রদ্ধা রাখিতে হইবে। কৃষ্টি একটি জাতির বৈশিষ্ট্য—কৃষ্টি যেন একটি জাতির 'ব্যক্তিত্ব'। স্বীয় কৃষ্টির উপর শ্রদ্ধাহীন জাতিকে মৃত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অপর যে কোন জাতি এই আত্ম-সম্মানহীন জাতিকে পদদলিত করিতে পারে এবং করেও। এ ক্ষেত্রে দাসত্বই সম্ভব, মৈত্রী নয়। মৈত্রীর জন্য তাই প্রথম প্রযোজন নিজের প্রতি শ্রদ্ধা, সঙ্গে সঙ্গে প্রযোজন অপরের প্রতি শ্রদ্ধা, ঘৃণা বা বিদ্বেষের দাবদাহে মৈত্রী অঙ্কুরিত হয় না। কোন জাতির সহিত মৈত্রীস্থাপন করিতে হইলে তাহাকে সন্দেহ করিলে চলিবে না, তাহাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবিলেও চলিবে না, তাহাকে সহযোগী ও সহযাত্রী মনে কবিতে হইবে,তাহার গুণগ্রাহী হইতে হইবে, এক কথায় তাহার সম্বন্ধে—তাহার জীবনাদর্শ বা কৃষ্টি সম্বন্ধে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে হইবে। সর্বোপবি বুঝিতে হইবে, শত বিভিন্নতা—সহস্র বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সকল জাতিই এক মনুষ্য জাতি।

বিশ্বমৈত্রীর তাত্ত্বিক রূপটি আশা করি কিছুটা পরিস্ফুট হইয়াছে। এখন প্রয়োজন একটি ব্যবহারিক রূপরেখা। ব্যবহারের অভাবে অথবা ব্যবহার সম্ভব না হইলে বহু তত্ত্ব তত্ত্বই থাকিয়া যায়; বর্তমান যুগে তাহার বিশেষ মূল্য নাই। অতএব আমাদের দেখিতে হইবে বিশ্বমৈত্রীর এই আদর্শ

আমরা কিভাবে কাজে লাগাইতে পারি বা বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারি।

প্রীতি ও মৈত্রীপূর্ণ ব্যবহারের পরীক্ষা দ্বারা ব্যক্তিগত জীবনের পরিধি ক্রমবর্ধিত করা যায়, ইহা প্রত্যেকেরই অনুভূতির ও আয়ত্তের মধ্যে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। ব্যক্তিরই সমষ্টি জাতি, ব্যষ্টিতে যাহা সম্ভব, সমষ্টিতেও তাহা সম্ভব, ব্যক্তিকে বাদ দিয়া বা উপেক্ষা করিয়া—বিশ্বমৈত্রী স্থাপিত হইতে পারে না। বহু লোক ব্যক্তিগত মৈত্রী সাধনায় সিদ্ধ হইলে তবেই আমরা পরবর্তী স্তরে জাতিগত মৈত্রী স্থাপনার জন্য প্রস্তুত হইতে পারি, নতুবা দুই জাতির মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইতে পারে, মৈত্রী নয়। দুই দেশের সেনাপতির মধ্যে যুদ্ধবিরতির চুক্তি-স্বাক্ষর বা দুইটি রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে 'সৌহার্দ্যপূর্ণ' করমর্দন ও শুভেচ্ছাপূর্ণ পত্রবিনিময়কে দুইটি জাতির মৈত্রী বলা যায় না।

আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায় ব্যক্তি উপেক্ষিত, অবহেলিত, সমষ্টির নামে ব্যষ্টি বলিপ্রদত্ত। কিন্তু মৈত্রী-সাধনায় এই ব্যক্তিকে আনিতে হইবে সর্বাগ্রে। ব্যক্তির স্ফুরণের ভিতর দিয়াই জাতির স্ফুরণ হয়। ব্যষ্টির সিদ্ধিই সমষ্টির সিদ্ধি আনিয়া দেয়।

জাতিগত আলোচনার স্তরে এখন সাধারণ হইতে বিশেষে আসিয়া আমরা দেখিতে চাই ভারতের ক্ষেত্রে এই বিশ্বমৈত্রীর সাধনা বর্তমানে কিভাবে সম্ভব।

ভারতবর্ষ একদিন ব্যক্তির অন্তর্বিকাশের সাধনা করিয়াছিল, তাহাকে আবার সেই সাধনাই করিতে হইবে। আত্মবিস্মৃত হইয়া সে কিছুদিন জীবন্মৃত হইয়াছিল, আজও নিজের ব্যক্তিত্বে সে সন্দিহান, নিজের কৃষ্টির উপর শ্রদ্ধাহীন; তাই আজও তাহার দুর্দশার অবসান হইল না, আজও সে সর্ববিষয়ে পরনির্ভর।

আধুনিক কালের পরিপ্রেক্ষিতে তাহার সমগ্র কৃষ্টির মূল্য আজ তাহাকে বুঝিতে হইবে, তবেই দূরীভূত হইবে প্রাদেশিকতার মোহ ও প্রান্তিকতার ভ্রান্তি! স্বাধীনতালাভের পর ভারতে ঐক্য না আসিয়া কেন ভাঙন আসিয়াছে, উদারতা না আসিয়া কেন সংকীর্ণতা আসিয়াছে, ত্যাগের ভাবাদর্শের স্থান কেন স্বার্থপূর্ণ ভোগবাদ অধিকার করিতেছে?—তাহার একটি মাত্র উত্তর, ভারত তাহার নিজ কৃষ্টি ভুলিয়া অপরের অন্ধ অনুকরণ করিতেছে, নিজের উপর শ্রদ্ধা হারাইয়া সে অপরের অনুসরণ করিতেছে। এক্ষেত্রে অপরের সহিত তাহার বন্ধুত্ব সম্ভব নয়, নিজেকেও ঠিক রাখা দুরূহ।

ভবিষ্যৎ ভারত গড়িতে গেলে অতীত ঐতিহ্যের ভিত্তির উপরই গড়িতে হইবে। বিশ্বসভায় কোন্ পরিচয়পত্র লইয়া সে দাঁড়াইবে? ব্রিটিশের শৃঙ্খলমুক্ত ভারতবর্ষ—পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণকারী ভারতবর্ষ? না, নানা জাতির উত্থান-পতনের সাক্ষী ভারতবর্ষ,—জ্ঞানবিজ্ঞান-দর্শনের দ্রষ্টা মহাভারতবর্ষ? প্রাচীন গৌরবময় উত্তরাধিকার বিসর্জন দিয়া কে কবে কোথায় নিজেকে অজ্ঞাতকুলশীল বলিয়া পরিচয় দিয়াছে?

শত শত সন্ত-সাধকের মাধ্যমে প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা ভারতে চিরদিন অব্যাহত আছে। রাজনীতিক ক্ষেত্রে তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকিলেও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ভারত কোনদিন নিদ্রিত হয় নাই, সেখানে ভারত-পুরুষের অতন্দ্র চেতনা তাহার সাধনার ধারা বর্তমান ইতিহাসের ধারার সহিত মিশাইয়া দিয়াছে।

যেখানে জাতি সর্বাপেক্ষা সচেতন—বুঝিতে হইবে সেইখানেই তাহার প্রাণ, সেইখানেই তাহার প্রতিভার স্ফুরণ! এক এক জাতির প্রাণ-কেন্দ্র এক এক বিষয়ে। ভালোর জন্যই হউক, মন্দের জন্যই হউক—ভারতের প্রাণকেন্দ্র ধর্মে, ভারতের

প্রতিভার সার্থক স্ফুরণ আধ্যাত্মিক স্তরেই। তাই সর্বপ্রথম নিজ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাহাকে সচেতন হইতে হইবে। নিজের উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিলে কি করিয়া সে অপরের শ্রদ্ধা মৈত্রী আশা করিতে পারে?

কিন্তু এইটুকুই সব নয়! এই বিরাট বিচিত্র সংসারে 'আমি' ছাড়া আরও অনেকে আছে, তাহারাও আমারই মতো। নিজের সম্বন্ধে সচেতন হওয়া—সশ্রদ্ধ হওয়া এক জিনিস, আর নিজেকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করা অন্য জিনিস! যখন কোন জাতি বা ব্যক্তি নিজেকে সর্ব শ্রেষ্ঠ মনে করে—তাহার প্রবর্তিত জীবনধারা বা ধর্মমতই একমাত্র পথ এবং সকলের অবলম্বনীয় মনে করে, সে তখন নিজের ও অপরের অমঙ্গল টানিয়া আনে, শান্তির নাম করিয়া সে তখন জগতে অশান্তি ছড়াইতে থাকে। আত্মশ্রদ্ধা ও অহংকার এক নহে, কত না জাতি, কত না ব্যক্তি স্বীয় জীবন দিয়া প্রমাণ করিয়াছে—অহংকার পতনের মূল। অপরের প্রতি অশ্রদ্ধা 'বুমেরাং'-এর মতো ঘুরিয়া আসে, আমাকেই ঘিরিয়া ফেলে আত্মঘৃণার নাগপাশে। গতকাল যাহা ভারতের পক্ষে সত্য হইয়াছে, আগামীকাল তাহা যে ইওরো-আমেরিকার পক্ষে সত্য হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

তাই অপরকে অশ্রদ্ধা করিয়া নয়—অপরের কৃষ্টিকে শ্রদ্ধা করিয়া আজ আমাদের অগ্রসর হইবে বিশ্বমৈত্রীর সাধনায়। দেশে ও কালে পৃথিবী আজ সংকুচিত, শুধু যে শত শত মাইল আজ সংকুচিত হইয়াছে তাহা নয়, শত শত শতাব্দীও আজ এই বিংশ শতাব্দীতে ভিড় করিয়াছে। অপরের সহিত না মিলিয়া না মিশিয়া—শম্বুকবৎ আত্মকেন্দ্রিক আত্মরক্ষা-পরায়ণ জীবন এখন অসম্ভব। আজ স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়—একজনের জীবন অপর জনের সহিত জড়িত। একস্থানের আঘাত শত স্থানে প্রতিহত। অতএব আজ অপরকে দূরে না রাখিয়া, তাহাকে ঘৃণা না করিয়া, তাহার সম্বন্ধে অজ্ঞ না থাকিয়া তাহার সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞাতব্য জানিয়া লইয়া, তাহার বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিয়া তাহাকে যথাযথ মর্যাদা দিতে হইবে, ও তাহার সহিত নিজের ভাবের আদান-প্রদান করিয়া উন্নততর সভ্যতার পথ প্রস্তুত করিতে হইবে।

পাশ্চাত্যের বহু সদ্‌গুণরাশি আজ ভারতকে মুগ্ধ করিয়াছে, প্রভাবিত করিতেছে। কিন্তু বিনিময় তো একমুখী নয়, ভারত-কৃষ্টির বহু সূক্ষ্ম ধারা পাশ্চাত্য চিন্তায় সঞ্চারিত হইতে শুরু করিয়াছে। এবং আগামী যুগের আধ্যাত্মিক অখণ্ড মানবের বিশ্বকৃষ্টি এই ভাববিনিময়ের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এক জাতি ও অপর জাতি—এই থীসিস ও অ্যান্টিথীসিসের মাধ্যমেই আমরা মনুষ্যজাতি-রূপ সমন্বয়ে বা সিন্থেসিসে উপনীত হই। কৃষ্টি ও ধর্ম ব্যাপারেও এইরূপ সম্ভব। সংঘাত ও সংঘর্ষের পর যদি মিলন ও সমন্বয় না হয়, তবে বুঝিতে হইবে প্রকৃতির এই পরীক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে। নূতনতর সংঘাত সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। এই প্রকার উন্মুক্ত মনোভাবের অধিকারী হইতে পারিলে আমরা অধ্যয়ন করিব—শুধু ভারত বা প্রাচ্যকৃষ্টি ও গ্রীক বা পাশ্চাত্য কৃষ্টি নয়, আমরা অধ্যয়ন করিব—সমগ্র মানবজাতির কৃষ্টি, এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া। তখনই আমরা বুঝিব—প্রত্যেক জাতির কৃষ্টি, ধর্ম, দর্শন কেন পৃথক হয়। পলিনেশিয়ার সাগরতটে অথবা মধ্য আফ্রিকার ঘন জঙ্গলে আমরা তখন মানুষকেই দেখিতে শিখিব—যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে। রেড ইণ্ডিয়ান ও কালো ভারতবাসীর জীবনা-

দর্শের অন্তর্নিহিত ঐক্য তখনই আমরা খুঁজিয়া পাইব।

দেশকালের ভূভঙ্গকোটিতে—ইতিহাস ও ভূগোলের পরিস্থিতিতে মানুষের উত্থান-পতনের গতিরেখা দেখিয়া কখন আমরা মুগ্ধ হইব, কখন ভীত হইব, তাহার মুহুর্মুহু রূপান্তরের গতিভঙ্গীর মাঝেও অপলক নিশ্চল নেত্রে দেখিতে থাকিব 'তরঙ্গ লীলার তলে অতল সাগর'। অনন্ত মানব সত্তায় হারাইয়া যায় ক্ষুদ্র মানবতা, অনন্ত জীবন স্রোতে ভাসিয়া যায়—জন্ম-মৃত্যুর ওঠাপড়া। এই অনন্তত্বের ধারণাই দূরীভূত করে সকল সীমা ও সংকীর্ণতা, সকল স্বার্থবোধ ও বিদ্বেষবৃত্তি, তখনই সঞ্চারিত হয় সমবেদনা ও সহানুভূতি, তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রদ্ধা, প্রীতি ও বিশ্বমৈত্রী।

* * *

বিশ্বমৈত্রীর যে তিনটি সূত্র এখানে আলোচিত হইল, বিস্তারিত ভাবে সেইগুলি সম্বন্ধে আলোচনার ও গবেষণার প্রয়োজন। বিশ্বব্যাপী দৃষ্টি সহায়ে 'বৈচিত্র্যে একত্ব দর্শন'-নীতির ভিত্তিতে মানব-কৃষ্টির তুলনামূলক অধ্যয়নই তাহার পথ প্রশস্ত করিবে।

* * *

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর পর হইতে রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিট্যুট অব্ কালচার (কৃষ্টি প্রতিষ্ঠান) এতদুদ্দেশ্যে গত ২১ বৎসর ধরিয়া আলোচনা, বক্তৃতা, গ্রন্থাগার-পরিচালনা, প্রকাশনা প্রভৃতির মাধ্যমে যে বৃহত্তর কার্যের ভিত্তি রচনা করিয়াছে—আজ তাহা একটি পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করিতে চলিয়াছে।

আগামী শীতকালে UNESCO-সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠানের নবনির্মিত বিশাল ভবনে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্র বসিবার কথা। বিশ্বের মনীষিবৃন্দ এখানে দুইটি ধারায় আলোচনা চালাইবেন: প্রথমতঃ কিভাবে বিভিন্ন জাতি পরস্পরের কৃষ্টিকে শ্রদ্ধা করিয়া বিশ্বদৃষ্টি (World-perspective)-লাভের পথে অগ্রসর হইতে পারে, দ্বিতীয় এই কৃষ্টি-প্রতিষ্ঠান তাহার আদর্শের সার্থকতার জন্য কি প্রকার কর্মসূচী গ্রহণ করিবে।

যুগান্তরের সন্ধিক্ষণে আমরা এই একান্ত প্রয়োজনীয় উদ্যোগকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। প্রার্থনা করি—প্রাচ্য-পাশ্চাত্য মনীষার সমবেত মহৎ প্রচেষ্টা সার্থকতায় সমুজ্জল হইয়া বিশ্বমৈত্রী স্থাপনের সূত্র ধরিয়া আগামী পূর্ণাঙ্গ কৃষ্টির বিশাল ভিত্তি রচনা করুক। *

* ইন্‌স্টিট্যুট প্রকাশিত আদর্শ-নির্দেশক পুস্তিকা 'Threefold Cord' দ্রষ্টব্য।

For a complete civilization the world is waiting, waiting for the treasures to come out of India, waiting for the marvellous spiritual inheritance of the race.

* * *

A great moral obligation rests on the sons of India to fully equip themselves for the work of enlightening the world on the problems of human existence.

—*Swami Vivekananda*

চলার পথে

'যাত্রী'

এল বর্ষা। এল তার বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা নিয়ে। গ্রীষ্মের অনলে এতদিন যা লক্ষ অতৃপ্তির অন্তরালে জ্বলে যাচ্ছিল তাকেই আবার শ্যামলিমার স্বপ্ন-সমারোহে আবিষ্ট ক'রে এল বর্ষা। এই আগমনের নিবিড় বর্ণাঢ্যে কেমন এক শাশ্বত এষণার স্বর্গস্বাদ মাখানো রয়েছে। চিরপিপাসিত ধরিত্রী আজ তার অনাহত আবাহনে এই স্বভাব-দুলাল বর্ষাকে ডেকে এনেছে তার মৃত্যুঘেরা নগ্নতাকে আবার প্রাণলীলায় সমুচ্ছল ক'রে তুলতে। পৃথিবীর মঙ্গল-তৃষাই পেরেছে এই চির যাযাবর বর্ষাকে কিছুদিনের জন্যও আমাদের স্বপ্নালু বিভাসের সাথী করতে। বর্ষা তাই সকল ঋতুর এক জীবন্ত প্রতিভূ॥

বর্ষা এসেছে। তাই জেগেছে পৃথিবী-দেহে সবুজ ঘাসের লোমহর্ষণ। বনে বনে জড়িয়ে গেছে কেমন এক বর্ণালী উদ্‌ভ্রান্তি। কলাপীর কেকারবে উর্দ্ধায়িত হয়েছে নিখিলের অন্তর্লীন স্বর-বিতান। নীপের শিহরণে বিনাবিত কোটি বিভঙ্গ মধুরিমা। দাদুরীর অশ্রান্ত ঝঙ্কারে নবারুণ-রাগের সমুদ্বেল আবাহন। কেতকী তার কণ্টকিত বিরহের কঠিন নির্মোক খুলে দিয়ে শুষ্ক অশ্রুর সুরভি ছড়িয়ে দিয়েছে দিগ্‌বলয়ের সীমায় সীমায়। চারিদিকের উছল নদী-তড়াগের মধ্যেও কেমন এক রহস্যমদির চাঞ্চল্য। মানুষের মনেও সেই সঙ্গে কে যেন দিব্যদর্শনের অবগুণ্ঠন উন্মোচন ক'রে দিয়েছে। সবই আজ তাই স্বাদে সৌরভে গানে লীলায়িত।

বর্ষাকে দেখে মানুষের মন তার বিচিত্র ভাষার ও ভাবের ডালি সাজায়। কখন সে বলে : 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মত নাচেরে'। আবার বলে—'কেন পান্থ, এ চঞ্চলতা, কোন্ শূন্য হতে এল কার বারতা?' কখন বা বলে, 'গগনে গগনে আপনার মনে কী খেলা তব, তুমি কত বেশে নিমেষে নিমেষে নিতুই নব।' আবার শুনি, 'বাদল-হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে যূথীবনের বেদন আসে, ফুল ফোটানোর খেলায় কেন ফুল-ঝরানোর ছল, ও তুই কী এনেছিস বল্।' পর মুহূর্তেই ঐ ভাব বদলে গিয়ে গান ওঠে—'বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা আষাঢ়, তোমার মালা, তোমার শ্যামল শোভার বুকে বিদ্যুতেরই জ্বালা।' তার পর মুহূর্তেই আবার শুনি, 'আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার, দিনের আকাশ মেঘে অন্ধকার—'।

বর্ষা ভারতের পঞ্চভাব সাধনের সমন্বয়ে গাঁথা এক অপরূপ ভাবময় রসাস্বাদন। এর মধ্যে দেখি, সকল রসের সার্থক সমাবেশ। এরি মাঝে শান্তরসে উদ্ভাসিত হ'য়ে সাধক তার 'তৃষ্ণা ত্যাগ' করে, দাস পায় তার আরাধ্য সেব্য ও প্রভুকে, সখা পায় তার নিবিড়তর সখাকে সকল 'অসম্ভ্রমের' স্বাদে জড়িয়ে, সন্তান পায় তার মমতাময়ী মাকে, মা পায় তার সন্তানকে, আর বিরহ-কাতর দয়িতা তার মধুর আত্মদানের মাধ্যমে দয়িতের রভস-প্রোজ্জ্বল গোমুখীর উৎস-ধারাকেও করে আবিষ্কার।

ঐ শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য ও মধুর রূপের মুক্তাটি বুকে রেখেই বরষা আমাদের হৃদয়-সাগরে রত্ন আহরণের আবাহন জানায়। যখনই প্রবল বর্ষণের পর মেঘমেদুর আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়ে নীলিমার অভ্রস্রতাকে আমাদের চোখের সুমুখে খুলে ধরে, তখনই তার মাঝে শান্ত-রসের প্রতীককে পাই খুঁজে। এই উদার, অদ্ভুত, ভাবময় দৃশ্য দর্শন ক'রে ধরিত্রীর তখনকার ঐ তন্ময়তার মাঝেও থাকে না আর কোন তিতীর্ষু তৃষ্ণা। শান্তরসের অপূর্বতায় তখন সে সমাহিত। তখন তার আর কোন চাওয়া-পাওয়া নেই।

আবার বনানীর তৃষিত অধরে বাৎসল্যের রস সিঞ্চন ক'রে বর্ষা যখন তাকে অজস্র আদরে লাবণ্যময় ক'রে তোলে, তখন তার মাঝে ফুটে ওঠে বাৎসল্য-জনয়িত্রীর স্নেহাস্পদ নিদর্শন।

কলাপী যখন মেঘ দর্শন ক'রে নাচতে থাকে, কিংবা মত্ত দাদুরী মাতে আনন্দ-ঝঙ্কারে, তখন তাদের সেই উষা-কামনার মাঝে যে গীত উৎসারিত হয় তার সুরে লেখা থাকে—'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার।' সখ্যভাবের এইটিই তো সত্যকারের ছবি।

আবার যখন ধরার শুষ্ক পত্রের সম্ভার সরিয়ে, ধূলি-জঞ্জাল অপসৃত ক'রে, বদ্ধজল নদী-তড়াগের নবপ্রবাহে তাদের অঙ্গ-সৌষ্ঠব বর্ধিত ক'রে সদাই-ব্যস্ত সেবক-মেঘকে ঐ অম্লান সেবার শ্রী ফোটাতে দেখি তখনই দাস্যভাব প্রসন্ন হ'য়ে ওঠে।

অন্যদিকে আবার, যখন ঐ বর্ষারই নবানুরাগের সীমাহারা মেঘে ঝরে অঝোর ক্রন্দন, যখন বিরহবেদনায় চারিদিকে আঁধার ঘনিয়ে আসে তখন মানবমনের চিরন্তন বিরহ-বিধুরা রাধিকা মধুর ভাবের অনুধ্যানে শ্যামময় হয়ে ওঠে। প্রেমের দেবতাকে কাছে পাবার আশায় রাধিকার সেই আঁখি-যমুনার উছলিত ধারায় যে অশ্রুবিন্দু কুসুমিত হয়ে ওঠে, তার ভাষায় তখন ক্রন্দন ওঠে—'বলে দে, বলে দে সখী, কোথা মোর কালা। সহে না সহে না মোর বিরহের জ্বালা, এই ঝর ঝর বরষায়।' প্রকৃতির সকল দিক ভরেই তখন সুর ঝরে—'এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর।'

চল পথিক, 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' আমরাও আমাদের নিজ নিজ ভাবের মূর্তিকে জাগিয়ে তুলে সাধনায় মেতে উঠি। আমাদের সর্বাত্মক বিপুল প্রার্থনার মাঝে বর্ষার এই আহ্বানকে আপন ক'রে নিই। আমাদের অন্তরের মহাসাধনা বর্ষার ঐ স্পর্শমণি-স্পর্শে সোনা হয়ে উঠুক। প্রকৃতির মর্মে অনুস্যূত প্রকাশময়ী শিখাকে আমাদের অন্তর-প্রদীপে জ্বালিয়ে নিয়ে চল চিরন্তনের দুয়ারে উপনীত হই। আর দেরী নয়, চল, চল। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

মেঘে মেঘে মোর মনে পড়ে যায়

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

চেরাপুঞ্জির বর্ষণধারা দেখিনি কখন চোখে,
তৃষ্ণাকাতর গোবি-সাহারার শুনিনি আর্ত রব।
কার যেন প্রিয়-বিয়োগব্যথায় রজনী কাঁদিছে শোকে
অন্ধকারের মালা গেঁথে কে গো করিছে বিরলে জপ ?

প্রতি মানুষেরে মনে হয় সদা বিশাল গ্রন্থ সম,
সেই গ্রন্থের অধ্যায়গুলি এমন দিনেতে ল'য়ে
পড়িবার সাধ রয়েছে মরমে—সাধ্য নাহিক মম,
বাদলের গান শুনিতেছি বসে সঙ্গী-বিহীন হয়ে।

মেঘে মেঘে মোর মনে প'ড়ে যায় মেঘমল্লার স্বর,
আকাশের পানে চেয়ে চেয়ে ভাবি কাজল রাতের কথা।
বর্ষায় ভরা গিরিতটিনীর কল্লোল সুমধুর
কানে আসে আর নুয়ে নুয়ে দোলে পান্থপাদপলতা।

চিত্তচয়ন করেছিনু কার হৃদয়বীথিকা হ'তে
স্মরিতে তাহারে চোখে আসে জল,—জোনাকিরা জলে বনে,
সংসার হ'তে ভেসে যায় দিন অনাদিকালের স্রোতে
গুণ্ঠিত প্রভা প্রোজ্জ্বল হ'ল দীপ নিভিবার ক্ষণে।

মোর বাসনার নগ্ন শিশুরা খেলা করে মন-মাঝে,
কথার অতীত সুরে যে আমার ভাবনার সমারোহ,
কেকার ডাকেতে নেমেছে বাদল, তাহারি নূপুর বাজে,
ইন্দ্রজালের পরিবেশে কেন রহে মোর মায়া মোহ ?

বন্যকুসুমসৌরভ মেখে বাতায়নে বহে বায়ু
ইতিহাস-হারা দীঘল পথের স্মরণতিথির ঘ্রাণে।
বরষে বরষে বরষার রূপ হেরিতে হেরিতে আয়ু
ফুরায়ে আসিছে, তবুও পুলক কেন জাগে আজো প্রাণে ?

আত্মার সন্ধানে মানুষ

স্বামী নিখিলানন্দ

[নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ]

স্মরণাতীত কাল থেকে কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে যোগী, দার্শনিক ও ধর্মবেত্তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে 'মানুষ'। উপনিষদের ঋষিরা বলেছেন, 'আত্মানং বিদ্ধি', সোক্রাতেসও উৎসাহ দিচ্ছেন, 'নিজেকে জানো'। জন রাস্কিনের মতে প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ মানুষের মনে তিনটি প্রশ্ন ওঠে: কোথা থেকে এসেছি? আমি কি? কোথায় চলেছি? বর্তমান বিজ্ঞানও জানতে চাইছে—বিশ্বজগতের প্রকৃতি ও তার মধ্যে মানুষের স্থান কোথায়? নবজাগরণের পর থেকে ইওরোপের ধর্ম ও দর্শনের চিন্তা ও ধারণা মানবতা-বাদের দ্বারা সমধিক প্রভাবিত।

আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদ্, বৈজ্ঞানিক, ধর্মতত্ত্ববিদ্ ও দার্শনিকেরা মানুষের বিভিন্ন বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রধানতঃ মানুষের বাইরের দিকটা জানতেই ব্যস্ত। এইরূপে লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যেই পাশ্চাত্যদেশে সম্ভব হয়েছে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে মানুষের অগ্রগতি।

পাশ্চাত্যের মতে—মানুষ হচ্ছে শরীরটা, আর তার একটা আত্মা থাকতেও পারে। শরীর ছাড়া সে একটা কল্পনার ছায়ামাত্র। ভারতীয় দর্শন-মতে মানুষ হচ্ছে আত্মা, তার একটা শরীর আছে। এইভাবেই ভারতীয় দার্শনিকেরা আত্মার রহস্য ভেদ করেছেন।

পাশ্চাত্য তার অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা এমন এক আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, যার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে একটি মণিমঞ্জুষার—যাতে মহামূল্য মণিটি নেই। অপরপক্ষে ভারতে হিন্দুরা আবিষ্কার করেছে কতকগুলি মহামূল্য বস্তু, কিন্তু সেগুলি তারা রেখেছে জঞ্জালের স্তূপের মধ্যে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনুসন্ধান-লব্ধ সিদ্ধান্তগুলির সামঞ্জস্য-বিধানই সর্বত্র মানুষের পক্ষে কল্যাণকর হবে, এবং মানুষকে চরম উপলব্ধির দিকে নিয়ে যাবে।

বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে যাঁরা জড়বাদী তাঁরা মনে করেন মানুষ জড় প্রকৃতিরই অংশ, এবং অন্যান্য পদার্থের মতো মানুষও পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন-বিজ্ঞানের নিয়মাবলী মেনে চলে। মানুষের আকৃতি আছে, ওজন আছে, বর্ণ আছে। শ্বাস-প্রশ্বাসে, খাদ্য-পরিপাকে, এবং বিভিন্ন গ্রন্থির প্রক্রিয়ায় (glandular action) মানুষের মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটছে। জড়বাদী ও যান্ত্রিক দৃষ্টিতে এই হ'ল মানুষের রূপ।

প্রাণতত্ত্ববিদের মতে—মানুষ হচ্ছে পৃথিবীতে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ প্রকার জীব-জন্তুর মধ্যে এক প্রকার প্রাণী। জীবকোষের প্রধান উপাদান অঙ্গার, উদজান, অম্লজান, যবক্ষারজান, গন্ধক, সোডিয়ম, ক্যালশিয়ম ও ম্যাগ্নেশিয়ম। এই জীবকোষই হ'ল প্রাণিশরীরের মূল আকর (unit of life)। বিশেষ পরিবেশে জড় থেকে জীবসৃষ্টি সম্ভব। অন্যান্য জন্তুর মতো মানুষও আহার করে, বৃদ্ধি পায়, বংশবিস্তার করে ও ঘুরে বেড়ায়, মানুষ প্রতিক্রিয়াশীল ও অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করে। অন্যান্য জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের আরও মিল আছে, যথা—(১) বাঁচার তীব্র ইচ্ছা। (২) শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অংশবিশেষের সঙ্গে সম্বন্ধ, অথচ তা থেকে স্বতন্ত্র,

যার জন্যে আহত হ'লে বা অঙ্গহানি হলেও মানুষ আবার সেরে উঠছে, (৩) অভিজ্ঞতা থেকে শেখবার শক্তি, (৪) বয়ঃপ্রাপ্তি, (৫) স্বীয় জাতির বিস্তার ও সংরক্ষণ, (৬) পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন, (৭) নিদ্রা, কাজকর্ম, বিশ্রাম ও যৌনক্রিয়ার একটা নিদিষ্ট নিয়মানুবর্তিতা।

ফ্রয়েড মানুষের ব্যাখ্যা করেছেন কামশক্তির (libido) দিক দিয়ে, আর কার্ল মার্কস্ করেছেন অর্থনীতির দিক দিয়ে। আধুনিক সংকটবাদীদের (existentialists) কেউ কেউ বলে থাকেন—মানুষ কাজকর্মে প্রধানতঃ চালিত হয় অকারণ অযৌক্তিক এক শক্তি দ্বারা। সাম্যবাদী (communism) দর্শন মানুষকে মনে করে মৌচাকের এক একটি ঘর—বা যন্ত্রের একটি অংশরূপে, মানুষ রাষ্ট্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, যার কোন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নেই।

অতএব দেখা যাচ্ছে বৈজ্ঞানিকরা বিভিন্ন দিক থেকে মানুষকে নিয়ে আলোচনা করেছেন—কখনও জড় পদার্থরূপে, কখনও স্পন্দনরূপে—প্রতিক্রিয়াশীল প্রাণরূপে, কখনও প্রাণী-রূপে—জটিল একটি জন্তুরূপে, আবার কখনও সামাজিক একটি সমস্যারূপে। এঁদের অনুসন্ধান আমাদের দিয়েছে মানুষের বিশেষ বিশেষ দিকের মূল্যবান্ তথ্যরাশি, তবে অনেক সময় তাতে আসল মানুষটি হারিয়ে গেছে, অথবা তার শুধু অস্পষ্ট ছবিটি ধরা পড়েছে। মানুষ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার অনেকটা যেন মানচিত্রে আঁকা রাস্তাঘাটের মতো, তাতে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু পথিপার্শ্বের রূপ-রস-গন্ধ-শব্দের মাধুর্য সেখানে নেই। মানুষ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান নির্ভর করে—তিনি কি জানতে চান ও তিনি কতটুকু জানবার শিক্ষালাভ করেছেন, তার ওপর। তাঁর জ্ঞান পরিমাণগত, গুণগত নয়। মানুষের সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয়ে বিজ্ঞান অতি প্রখর আলোকপাত করে, কিন্তু আশে-পাশে গভীর অন্ধকার। বিজ্ঞানের অনুসন্ধান বড় পরিসংখ্যানমূলক, গড়পড়তার হিসাবে আসলের সন্ধান পাওয়া যায় না। ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য এখানে অবহেলিত।

ধর্মতত্ত্বের দৃষ্টিতে মানুষের স্বরূপ কি জানতে গিয়ে আমরা দেখি ইহুদী-খৃষ্টান ধর্মে 'মানুষ ঈশ্বরসৃষ্ট' এই ভাবটির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বর নিজের মতো করেই মানুষ সৃষ্টি করেছেন, এবং ঐ এক ভাব থেকেই মানুষকে বুঝতে হবে। ঈশ্বরকে না জানলে মানুষ কখনও নিজেকে জানতে পারে না। ঈশ্বরকে জানলে তবেই মানুষ প্রকৃত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়। এই ব্যক্তিত্বই পাশ্চাত্য কৃষ্টির ও গণতন্ত্রের ভিত্তি।

হিন্দুধর্ম-মতে প্রকৃত মানুষ হচ্ছে আত্মা, আত্মা এক নিত্যমুক্তশুদ্ধবুদ্ধ ভাব—শরীর ইন্দ্রিয় ও মন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। স্ব-স্বভাবে মানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা সুখদুঃখ নেই। মানুষের এই স্বধর্মের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে বেদ-বেদান্তের মহাবাক্যগুলিতে—'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম'। মানুষ যে আত্মা—ঋষিদের প্রত্যক্ষ অনুভূতিই এই সত্যের ভিত্তি, বেদাদি মহান্ শাস্ত্রে তা সুরক্ষিত আছে। তা ব'লে হিন্দুধর্মে বা দর্শনে আধুনিক বিজ্ঞান কর্তৃক উপস্থাপিত মানুষের যান্ত্রিক, প্রাণতাত্ত্বিক, জৈবিক বা সামাজিক ব্যাখ্যাগুলি অস্বীকার করা হয় না। এইগুলি মানুষের বহিঃপ্রকৃতির ব্যাখ্যা, তার অপরিহার্য স্বরূপের ব্যাখ্যা নয়। মানুষ যতক্ষণ এই প্রাকৃতিক জগতের অংশ, ততক্ষণ এই অপরা প্রকৃতিই তার প্রাণস্বরূপ, এ-কে অবহেলা করলে চলবে না। এই অংশের অবহেলা করার জন্যই ভারত আজ পিছিয়ে পড়েছে—বিশেষতঃ শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থার দিক থেকে।

বেদে প্রকৃত মানুষকে তুলনা করা হয়েছে জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্যের সঙ্গে। হঠাৎ একখানি মেঘ আসে, বিভিন্ন তার স্তর, সূর্য ঢেকে যায়, সূর্যরশ্মি তাতে ভেঙে যায়, মেঘের মধ্য দিয়েই তখন আলো দেখা যায়। হিন্দুদর্শনে এই 'আবরণ ও বিক্ষেপ'-এর কারণ মায়া। বেদান্ত—মায়ার পাঁচটি স্তরকে পঞ্চকোষ-রূপে বর্ণনা করেছে।

প্রথম অন্নময় কোষে মানুষের যে অংশটি ধরা ছোঁয়া যাচ্ছে—সেটি তার ত্বক্ অস্থি রক্ত মাংস ও শরীরের অন্যান্য উপাদান। অন্ন দ্বারাই এর সৃষ্টি, অন্নেই এর স্থিতি, অন্নের অভাবেই এর ধ্বংস। মানুষের এই অন্নময় কোষ নিয়েই পদার্থবিদ্ ও রাসায়নিকের গবেষণা, যার প্রয়োজন ভারতীয় ঋষিরা বার বার স্বীকার করেছেন, তবে তাঁদের মতে এটি উদ্দেশ্য নয়,—উপায়মাত্র।

দ্বিতীয় প্রাণময় কোষ, এর মধ্য দিয়ে ক্রিয়াশীল আত্মা জীবন্ত প্রাণী-রূপে প্রতিভাত—প্রাণাভিমানীই আহার করে, বৃদ্ধি পায়, বিচরণ করে ও অবস্থানুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে।

তৃতীয় মনোময় কোষ: এখানে মানুষ তার চারদিকে যা ঘটছে তার দর্শকমাত্র নয়, সে প্রতিক্রিয়াশীল, সে চিন্তা করে—সন্দেহ করে, সুখ দুঃখের পার্থক্য বুঝতে পারে, 'অহং' ও 'অনহং' এর বৈচিত্র্য দেখতে পায়।

এই স্তরেই মানুষ কথা বলে, ভাষা ব্যবহার করে এবং অন্যান্য ইঙ্গিত-সহায়ে অপরের সহিত মনোভাবের আদান-প্রদান করতে পারে, এই স্তরেই মানুষ যন্ত্র আবিষ্কার করে এবং কৃষ্টির সূচনা করে। মনোময় কোষের সহিত জড়িত মানুষই সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণার বস্তু। এই কোষও জড়,—আত্ম-চৈতন্যে আলোকিত।

অতঃপর বিজ্ঞানময় কোষ: মন সংশয় তোলে, মনকেই যে 'আমি' মনে করে, সেও নিজের সম্বন্ধে বা পরিবেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে নিশ্চয় নয়। নিশ্চয়-বুদ্ধির জন্য মানুষ ব্যবহার করে বিজ্ঞানময় কোষ। এখন সে একটি ব্যক্তি, এখানেই তার ব্যক্তিগত কর্তব্যবোধ, দায়িত্ব এবং আধ্যাত্মিক সাধনার সংকল্প। দ্বৈতবাদী ধর্মগুলি এই স্তরের মানুষকে নিয়েই আলোচনা করেছে।

সর্বশেষে ভারতীয় দার্শনিকেরা বলেন আনন্দময় কোষের কথা, এর সঙ্গে তাদাত্ম্য হ'লে (আনন্দময় কোষই আমি—এই বোধ হ'লে) মানুষ ক্ষুদ্র 'অহং' বা ব্যক্তিত্ব অতিক্রম করে। আনন্দময় কোষের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল—আরাম বা বিশ্রাম এবং চেষ্টাশূন্যতা, যা অনেক সময় কবি ও শিল্পীরা অনুভব ক'রে থাকেন, সাধারণ মানুষও তা অনুভব করে স্বপ্নশূন্য নিদ্রার (সুষুপ্তির) মাঝে।

এই পঞ্চকোষ মানুষের পাঁচটি অংশ—তার জড় আবরণ, বিভিন্ন এদের ঘনত্ব। মানুষ এগুলির ব্যবহার করে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য। অন্নময় কোষ পার্থিব অস্তিত্বের ভিত্তি। প্রাণময় কোষ অন্নময় শরীরে প্রাণ সঞ্চার করে। মনোময়কোষ-সহায়ে মানুষ বহির্জগৎ অনুভব করে। বিজ্ঞানময় কোষের সঙ্গে একীভূত হয়ে মানুষ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়। আনন্দময় কোষের মাধ্যমে মানুষ ভোগ করে বিশ্রাম ও আনন্দ। এই পঞ্চকোষ অতিক্রম ক'রে তবে মানুষ আবিষ্কার করে তার প্রকৃত স্বরূপ—আত্মা।

মানুষের আত্মা অশরীরী, এক ও অদ্বিতীয়। আত্মা ভয়শূন্য, নিঃসংশয় ও গোপনতা-বর্জিত। আত্মাই শক্তি ও জ্ঞানের উৎস, প্রেম ও করুণার প্রস্রবণ। অতএব স্বরূপতঃ মানুষ সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে এক। তার তথাকথিত ব্যক্তিত্ব একটি মুখোসমাত্র, যা তার স্বরূপ লুকিয়ে রাখে।

পৃথিবীর ব্যাধি দূর করতে আত্মজ্ঞানের আজ বড় প্রয়োজন। এরই সাহায্যে মানুষ পারে নিজেকে ঘৃণা, সংশয় ও অশুভ ইচ্ছার হাত থেকে মুক্ত ক'রে বিশ্বশান্তির পথ প্রস্তুত করতে। যুদ্ধের আতঙ্ক দূর করবার বিভিন্ন প্রচেষ্টা তখনই সফল হবে, যখন আমরা মানুষের অন্তর্নিহিত একত্ব ধারণা করতে পারব। শরীরের বা বুদ্ধির স্তরে এ ধারণা সম্ভব নয়—এটি একটি আধ্যাত্মিক অনুভূতি। অদ্বৈতভাবে প্রতিষ্ঠিত মানুষ দ্বৈত দেখতে পাবেন, কিন্তু জীব জগৎ ও ঈশ্বরের অন্তর্নিহিত ঐক্য কখনও তাঁর অনুভূতি থেকে লুপ্ত হয় না। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা খুশী তা কর।' আত্মার অমরত্ব জেনে জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে কর্তব্য সম্পাদন ক'রে বিচরণ করতে হয়।*

* কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিট্যুট অব কালচারে ২৯.৩.৫৯ তারিখে প্রদত্ত (Man in search of the Soul) বক্তৃতার ভাবানুবাদ। [বৈশাখের 'উদ্বোধনে' ২২০ পৃষ্ঠায় এই দিনের সভার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।]

আদান-প্রদান

['My master' বক্তৃতার প্রথমাংশ হইতে সংকলিত]

পাশ্চাত্য দেশে ইন্দ্রিয়বেদ্য জগৎ যেমন সত্য, প্রাচ্য দেশে আত্মিক জগৎ সেইরূপ সত্য। বস্তুতঃ অধ্যাত্মরাজ্যেই প্রাচ্য জনগণ দেখিতে পায় তাহাদের যাহা কিছু আশা আকাঙ্ক্ষার বিষয়, যাহা কিছু তাহাদের জীবন সার্থক করিতে পারে। পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে তাহারা স্বপ্নবিলাসী, আবার প্রাচ্য দৃষ্টিতে পাশ্চাত্য জনগণই স্বপ্নাচ্ছন্ন—কতকগুলি ক্ষণস্থায়ী খেলনা লইয়া তাহারা পুতুলখেলায় মত্ত। ভাবিতে তাহাদের হাসি পায় যে প্রাপ্তবয়স্ক পাশ্চাত্য নরনারী, যাহা আজ হউক কাল হউক ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এমন এক মুঠা ধূলা লইয়া এত মাতামাতি করিয়া বেড়াইতেছে। ………মানবজাতির অগ্রগতির জন্য পাশ্চাত্য আদর্শের মতো প্রাচ্য আদর্শেরও প্রয়োজন রহিয়াছে, বোধ হয় সে প্রয়োজন আরও বেশী।

অতএব জগতে যখনই কোন আধ্যাত্মিক সমাধানের প্রয়োজন হয়, উহা স্বভাবতঃ প্রাচ্য দেশ হইতেই আসিয়া থাকে। প্রাচ্য জনগণ যদি যন্ত্রতত্ত্ব শিখিতে চায়, তবে তাহাদিগকে অবশ্যই পাশ্চাত্য দেশবাসীর পদতলে বসিয়া উহা শিক্ষা করিতে হইবে। আর পাশ্চাত্য জনগণ যদি পরমাত্মা, জীবাত্মা, ঈশ্বর এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য ও তাৎপর্য সম্বন্ধে জানিতে চায়, তবে তাহাদিগকে প্রাচ্য দেশবাসীর পদতলে বসিয়াই ঐ শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

* * * * *

আমাদের এই পৃথিবী শ্রমবিভাগ-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। একজনের হাতে সবকিছুর অধিকার থাকিবে, একথা বলার কোন অর্থ হয় না। পার্থিব ক্ষমতায় শক্তিশালী ভাবিয়া বসে ……যে জাতির বিত্তলালসা নাই, ঐহিক প্রতাপ নাই, সে জাতি বাঁচিয়া থাকার অযোগ্য, তাহার জীবন নিরর্থক। পক্ষান্তরে অন্য কোন জাতি নিছক জড়বাদী সভ্যতাকে একান্তই নিরর্থক মনে করিতে পারে।

একদা প্রাচ্য ভূখণ্ড হইতে ঘোষিত হইয়াছিল : কোন ব্যক্তি পৃথিবীর সমগ্র ঐশ্বর্যের অধীশ্বর হইয়াও যদি আধ্যাত্মিক জ্ঞানবর্জিত হয়, তাহা হইলে বৃথাই তাহার জীবন। এইটিই প্রাচ্য দৃষ্টিভঙ্গী, অপরটি পাশ্চাত্য। প্রত্যেকটিরই নিজস্ব গুরুত্ব ও মহিমা আছে। এই দুই আদর্শের সংমিশ্রণে সামঞ্জস্য বিধান করাই বর্তমান যুগ সমস্যার সমাধান।

নিউ ইয়র্ক, ফেব্রুআরি, ১৮৯৬। —স্বামী বিবেকানন্দ।

জন্মান্তর-কথা

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ, কারণদেহ ও জীবাত্মার সমষ্টিকে একটি প্রাণী বলা হয়। স্থূলদেহ জড়বস্তু, সহজেই ধ্বংসশীল, সূক্ষ্মদেহ ও কারণদেহ জীবের যতদিন পর্যন্ত না আত্মজ্ঞান হয়, ততদিন পর্যন্ত স্থায়ী। জীবাত্মা চেতন পদার্থ—পরমাত্মার প্রতিবিম্ব-স্বরূপ, ব্যষ্টি-জীব আত্মজ্ঞান লাভ করলে বিম্ব-স্বরূপ পরমাত্মার সহিত একত্ব লাভ করেন। অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত বা অবিদ্যাসৃষ্ট বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত জীবকে অণুচৈতন্য বা অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মতো পরমাত্মার অংশও কেউ কেউ ব'লে থাকেন। আত্মজ্ঞানবিহীন কোন জীব যখন দেহ ত্যাগ করেন, তখন জীবাত্মা সূক্ষ্মদেহ-বিজড়িত হ'য়ে চ'লে যান এবং ঐ সূক্ষ্মদেহে অবস্থিত কর্ম-সংস্কার যেরূপ ক্ষেত্রে রূপায়িত হবার সুযোগ পান, সেরূপ ক্ষেত্রে জীবাত্মা পুনরায় স্থূলদেহ ধারণ করেন। এই প্রণালীকে জন্মান্তর-গ্রহণ বলা হয়। গীতায় এ সম্বন্ধে আর্য-দর্শনের চরমসিদ্ধান্ত এইরূপে প্রকাশিত হয়েছে :

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।

—অর্থাৎ জাতব্যক্তির মৃত্যু যেরূপ নিশ্চিত, মৃত ব্যক্তির জন্মও সেইরূপ নিশ্চিত। এবং

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।

গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥

—অর্থাৎ বাতাস যেমন পুষ্পাদি আধার হ'তে গন্ধটুকু গ্রহণ ক'রে অন্যত্র চলে যায়, সেইরূপ ঈশ্বর অর্থাৎ জীবাত্মা যখন এক দেহ ত্যাগ ক'রে অন্য দেহ আশ্রয় করেন, তখন মন বুদ্ধি ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমষ্টি যে সূক্ষ্মদেহ সেইটুকু সঙ্গে ক'রে নিয়ে যান। জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক, সূক্ষ্ম কর্মেন্দ্রিয়পঞ্চক, পঞ্চ বায়ু এবং মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়বযুক্ত দেহকে সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ বলে। লিঙ্গ শরীরযুক্ত জীবাত্মা যতদিন পর্যন্ত ঐ দেহ হ'তে নিষ্কৃতি না পান, ততদিন তাঁর মুক্তি নেই।

প্রথমেই একটা প্রশ্ন উঠছে : আত্মা বা জীবাত্মা ব'লে কিছু আছে কি না? এই প্রশ্নের মীমাংসা এই যে—স্থূলদেহটি জড় পদার্থ, চেতনের সংস্পর্শ ব্যতীত উহা কোন কাজ করতে সক্ষম হয় না, যেমন একটি যন্ত্র একজন চেতন পরিচালক ব্যতীত ক্রিয়াশীল হ'তে পারে না। যন্ত্রের উপাদানগুলি যন্ত্রকে চালিত করতে পারে না, সেইরূপ দেহের রক্ত, মাংস, হাড় প্রভৃতি উপাদান মিলিত হ'য়ে দেহকে ক্রিয়াশীল করতে পারে না। যদি বলা যায় যে ঐ গুলির মিলন সাধিত হ'লেই দেহ আপনা হ'তে কাজ করতে সক্ষম হয়, যেমন যন্ত্রের আগুন জল কলকব্জা প্রভৃতি সম্মিলিত হ'লে যন্ত্রটি আপনা হ'তেই চলে—তাও নয়। কারণ—আগুন, জলাদির সংযোগসাধন যেমন একজন চেতন ব্যক্তি ব্যতীত সম্ভব হয় না, সেইরূপ হাড়, মাংস, রক্ত প্রভৃতির সংযোগসাধন হলেই তাদের দ্বারা কোন কার্য সিদ্ধ হ'তে পারে না, যদি না চেতন জীবাত্মা দেহে মূল পরিচালকরূপে থাকেন। অতএব জীবাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ স্থূলবুদ্ধির পরিচায়ক। জীবাত্মা চেতন, নিরাকার ও জ্ঞানস্বরূপ, তার অসীম ও অনন্ত অস্তিত্ব থাকতে পারে; কিন্তু যা আকৃতিবিশিষ্ট, অজ্ঞান ও অচেতন, তার অস্তিত্ব অনুভূত হ'লেও তার কোন স্থিরতা নেই, তার অস্তিত্ব আগে ছিল না, পরেও থাকবে না, তা অচিরস্থায়ী।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে দেহ যেমন সৃষ্ট পদার্থ, জীবাত্মাও সেইরূপ প্রতি দেহভেদে একটি একটি হিসাবে সৃষ্ট বস্তু হবেন না কেন? মানুষ যখন ম'রে যায় তার সঙ্গে সঙ্গে ঐ জীবাত্মারও মৃত্যু হোক না কেন? এইরূপ সংশয়ের উত্তর এই যে জীবাত্মা জড় বস্তুর ন্যায় সৃষ্ট পদার্থ নন। যার সৃষ্টি হয়, তারই ধ্বংস অনিবার্য, অবশ্য এই ধ্বংস শব্দের অর্থ অবস্থান্তর-প্রাপ্তি বা শেষ পর্যন্ত কারণ-অবস্থায় প্রত্যাবর্তন। জীবাত্মা চেতন-বস্তু, চেতনের আত্যন্তিক ধ্বংস সম্ভব নয়। আর জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন দেহে একটি একটি হিসাবে বহুও নন। একই পরমাত্মা অসংখ্য অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় বহু ব'লে মনে হয়, বস্তুতঃ আত্মা এক ও অদ্বিতীয়, আত্মাই পরমাত্মা। অখণ্ড অসীম আকাশ, বিভিন্ন ঘটে ঐ এক ও অদ্বিতীয় আকাশের কিছু কিছু যেন খণ্ডাকারে অবস্থিত ব'লে মনে হয়। কিন্তু আকাশকে খণ্ড খণ্ড করা কি সম্ভব? তা হয় না। ঘটটি নষ্ট হ'লে ঘটাকাশ যেমন মহাকাশের সঙ্গে এক হ'য়ে যায়, মহাকাশের সত্তা পায়, সেইরূপ 'আমি স্বতন্ত্র জীব' এইপ্রকার বুদ্ধিরূপ ঘট বিনষ্ট হ'লে, ব্যক্তি-চেতনা লুপ্ত হ'লে জীবাত্মা পরমাত্মার সত্তা পায় বা পরমাত্মার সহিত একত্ব লাভ করে। এ-কেই শাস্ত্রে মুক্তি বা মোক্ষ বলে।

আবার যদি বলা হয় যে জীবাত্মার অস্তিত্ব না হয় স্বীকার করা গেল, কিন্তু একথা তো বললেই চলে যে এক জীবাত্মা এক দেহকে এই প্রথম ও এই শেষ বারের জন্য গ্রহণ করলেন। কোন কোন ধর্মে এইরূপ মতবাদই স্বীকৃত। আত্মা আর আসবেন না, আর দেহ ধারণ করবেন না ও পূর্বেও করেননি? এই প্রশ্নের উত্তরে আত্মার জন্মান্তর-গ্রহণের পক্ষে যুক্তিগুলি আমাদের আলোচনা করতে হবে। 'একোঽহং বহু স্যাম্' এই শ্রুতি-বাক্য হ'তে আমরা বুঝি যে এক সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মা তাঁর মায়া-শক্তিকে আশ্রয় ক'রে অনাদি কাল হ'তে সংখ্যাতীত বুদ্ধিদর্পণে প্রতিবিম্বিত হ'য়ে অর্থাৎ বুদ্ধি বা অন্তঃকরণকে আশ্রয় ক'রে সংখ্যাতীত ব্যষ্টি-জীব-রূপে জগতে সুখদুঃখ ভোগ করছেন। এই ব্যষ্টি-জীব ক্ষুদ্রতম কীটাণুর শরীর থেকে ক্রম-বিকাশের নীতি অনুসারে প্রাণিশ্রেষ্ঠ মনুষ্য-দেহ ধারণ করেন। পূর্ব জন্মের কর্ম ও সংস্কার অনুসারে তিনি বর্তমান জীবনে সুখদুঃখ ভোগ করেন ও তাঁর মনে নতুন সংস্কার গঠিত হয়। আমরা এই মুহূর্তে যেরূপ মনোভাবাপন্ন তা নিশ্চয়ই আমাদের অতীত চিন্তার ও কর্মের ফলস্বরূপ। অতীতের সত্তা স্বীকৃত না হ'লে বর্তমানের সত্তা স্বীকার করা যায় না। অতীত বর্তমানকে উৎপন্ন করছে। অতীত কারণ, বর্তমান কার্য। অতএব এই সিদ্ধান্তে আমাদের আসতে হচ্ছে যে আমরা পূর্বে ছিলাম, এবং যেহেতু আমরা পূর্বে ছিলাম, সেহেতু আমরা পরেও থাকব, অতএব আমরা অনাদি কাল হ'তে আছি ও অনন্তকাল পর্যন্ত থাকব। আত্মা বলতে তাই বুঝায় যা অনাদি ও অনন্ত, কোন কালে যাঁর সত্তার ব্যতিক্রম হয় না। আমরা যে বর্তমানে সুখ ও দুঃখ ভোগ করছি, তা নিশ্চয়ই আমাদের অতীত জীবনের কার্যের ফলস্বরূপ।

এই কার্যকারণ-সম্বন্ধকে বাদ দিলে কোন মীমাংসায় পৌছানো যায় না। জন্মমাত্র শিশু যে সুখদুঃখ ভোগ করে, তা নিশ্চয়ই তার এই জন্মের কোন কৃতকর্মের ফল নয়, পূর্বজন্মের কোন কর্মের ফলস্বরূপ, কারণ এ জন্মে তার এমন বয়স হয়নি, যে বয়সে ঐ ফল-লাভের উপযোগী কোন কর্ম সে নিজের ইচ্ছায় বা চেষ্টায় করতে পারে। কোন কারণ নেই, অথচ শিশুটি দারুণ দেহকষ্ট ভোগ করছে বা পরমসুখে কাল কাটাচ্ছে, কোন মতেই তা স্বীকার করা যায়না। এ সিদ্ধান্ত স্বীকার করলে

যে দোষ হয়, তাকে বলে 'অকৃতের অভ্যাগম'। অর্থাৎ কোন কারণ নেই অথচ ফল এসে উপস্থিত হ'ল। আবার ঠিক মৃত্যুর প্রাক্কালে কোন ব্যক্তি হয়তো বিশেষ পুণ্যজনক বা উৎকট পাপজনক কোন কাজ ক'রল, মৃত্যুর সঙ্গেই যদি সব ফুরিয়ে যায় তো ঐ পুণ্য বা পাপ কাজের কোন ফলই উৎপন্ন হবার সম্ভাবনা থাকে না। এরূপ হ'লে যে দোষ হয়, তাকে বলে 'কৃতনাশ'—অর্থাৎ কাজ করা হ'ল, কারণ হ'ল, কিন্তু তার কোন ফল উৎপন্ন হ'ল না। অতএব যুক্তির শুভ্র আলোকে স্পষ্টই প্রতিভাত হচ্ছে যে কর্ম ও বাসনাসংস্কারসমষ্টি-বিশিষ্ট সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীর-বিজড়িত জীবাত্মা পূর্ব পূর্ব জন্মে অনুষ্ঠিত কর্মের ফল ভোগ করার জন্য পূর্বসংস্কার-অনুরূপ মনোবৃত্তি নিয়ে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রারব্ধ কর্ম ও সংস্কার ব্যতীত মানুষের যে 'অহং' বা 'আমি' বুদ্ধি আছে তার সাহায্যে তিনি বর্তমান জন্মের পুরুষকার প্রয়োগ করেন ও তার ফলে সংস্কার বা মনোবৃত্তির উন্নতি সাধন করতে পারেন, এমনকি তাঁর সঞ্চিত কর্মকে বিনষ্ট করতেও সক্ষম হন। যখন তাঁর সঞ্চিত কর্মসমষ্টি বিনাশ পায়, তখন তিনি 'জীবন্মুক্তি' অবস্থা অর্জন করেন, তবে প্রারব্ধকর্ম ভোগ-ব্যতীত বিনষ্ট হয় না, এই কারণে তাঁর দেহ ততদিন থাকে, যতদিন না ঐ প্রারব্ধকর্মের ভোগ শেষ হয়। জীবন্মুক্ত পুরুষ প্রবল প্রারব্ধ-জন্য যে সকল কর্ম করেন, তার আর ফল উৎপন্ন হয় না। সঞ্চিত কর্ম যা থাকে তা যেন তূণস্থ বাণ, ইচ্ছা করলে ফেলে দেওয়া যায়। কিন্তু প্রারব্ধকর্ম ধনুর্মুক্ত বাণের ন্যায়, উহার গতি রোধ করার কোন উপায় নেই। তবে ঐ কর্মেরও বেগ গুরু-কৃপায় কিছু প্রশমিত হ'তে পারে, যেমন হয়তো উপর থেকে হঠাৎ পতিত কোন পদার্থের সংঘর্ষ-জন্য, বায়ু বা বৃষ্টিহেতু ধনুর্মুক্ত বাণের গতি মন্দীভূত হ'য়ে গেল।

দেখা যায় একই সময়ে জাত, একই পরিবারে একই পরিবেশের মধ্যে প্রতিপালিত দুটি শিশুর সংস্কার বা মনোবৃত্তি দুই প্রকার। একটি সরল, দয়ালু, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, সঙ্গীতপ্রিয়, অপরটি তার বিপরীত সংস্কারসম্পন্ন। এই পার্থক্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে গেলে বলতে হবে—পূর্ব জন্মের কর্মফল। মনোবৃত্তি হঠাৎ গঠিত হয় না, অভ্যাসের দ্বারা গঠিত হয়। যে প্রকার চিন্তা ও কাজ মানুষ করে ও দীর্ঘদিন করতে থাকে, তদনুযায়ী মনোবৃত্তি গঠিত হ'য়ে যায়। এই অভ্যাসটি পরে স্বভাবে পরিণত হয়। পূর্ব জন্মে জীবাত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ-বিষয়ে মানব-চরিত্রের বৈচিত্র্য একটি প্রবল যুক্তি। পূর্বের অস্তিত্ব স্বীকৃত না হ'লে মানুষের কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভও সম্ভব হয় না। হঠাৎ কোন বিষয় সম্বন্ধে কেহ জ্ঞানলাভ করতে কখনও সক্ষম হয় না। কারণ কোন বিষয়ে যখন কেহ জ্ঞানলাভ করে, তখন সে তার পূর্বলব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে তা মিলিয়ে নিয়ে পরে ঐ জ্ঞান সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এই সকল প্রবল কারণ-বশতঃ পূর্বজন্ম স্বীকার না ক'রে উপায় নেই।

মানব-চরিত্রের বৈচিত্র্য ও সংস্কারের বিভিন্নতার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে কেহ কেহ বলেন পিতামাতা বা পূর্বপুরুষগণের মনোবৃত্তির পার্থক্য-জন্য সন্তানগণের সংস্কারের পার্থক্য ঘটে থাকে। কর্মফল সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাবে জাতকদের মধ্যে কেহ সুখী, কেহ বা দুঃখী হয়। এই দুটি যুক্তির কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয়। পিতামাতা প্রভৃতি হ'তে উত্তরাধিকার-সূত্রে শিশু মনোবৃত্তি লাভ করেছে যদি বলা যায়, তো তার উত্তরে এই কথা জিজ্ঞাসা করা যায়: যমজ শিশুদ্বয়ের জীবন ও চরিত্র

পৃথক হয় কেন? কোন বিশেষ শিশুই বা ঐরূপ পিতামাতার ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ ক'রল কেন এবং অপরেই বা ক'রল না কেন? তাদের ঐরূপ জন্মলাভের নিশ্চয়ই অন্য কারণ আছে, যা শিশু তার পূর্ব পূর্ব জন্মে স্বয়ং অর্জন করেছে। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্বন্ধেও এই একই প্রশ্ন করা যায়। অতএব পিতামাতা কর্মফল-ভোগের সহায়ক মাত্র এবং গ্রহনক্ষত্রও শিশুর ভাবী জীবনের সুখদুঃখের পূর্বাভাস দেয় মাত্র। অর্থাৎ এগুলি জীবের মনোবৃত্তি (বা সংস্কার) ও সুখদুঃখের হেতু নয়।

মানুষ দেহ-সাহায্যে সুখ-দুঃখাদি ভোগ করে। আসল ভোক্তা পাশবদ্ধ জীবাত্মা, কারণ দেহ জড় পদার্থ, তার উপলব্ধিশক্তি থাকতে পারে না। দেহের মাধ্যমে জীবাত্মাই সুখদুঃখ ভোগ করেন। তবে কোন্ কর্মের ফলে কোন্ সুখটি উপস্থিত হ'ল ও কোন্ কর্মের ফলে কোন্ দুঃখটি উপস্থিত হ'ল, তা সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝবার কোন উপায় নেই। একমাত্র যোগিগণ—যাঁরা তাঁদের পূর্বজন্ম সম্বন্ধে যোগবলে জ্ঞানলাভ করেছেন, তাঁরাই নিজেদের সম্বন্ধে উক্ত প্রশ্নের উত্তরদানে সমর্থ। মহাপুরুষগণ অপরের জীবনের অতীত বিষয়াদিও ইচ্ছা করলে অবগত হ'তে পারেন। অতএব আত্মার জন্মান্তর-গ্রহণ একটা কল্পনামাত্র নয়, উহা অনুভূত এবং বাস্তব সত্য।

কেহ কেহ বলেন—এত তর্ক-বিচারের প্রয়োজন কি? বললেই তো হয় যে যিনি সৃষ্টি-কর্তা সেই ঈশ্বরই কাকেও সুখী করেছেন, কাকেও বা দুঃখী করেছেন, কাউকে তিনি অন্ধ বা খঞ্জ করেছেন, আবার কাউকে চক্ষুষ্মান্ ও পদযুক্ত করেছেন। এই মতকেও সঙ্গত বলা যায় না। ঈশ্বর পরমপ্রেমস্বরূপ, তিনি সকলের প্রতি সমান কৃপালু। জীবের মধ্যে পার্থক্য-সৃষ্টির জন্য তাঁকে যদি দায়ী করা যায়, তো তাঁকে বলতে হয় নিষ্ঠুর ও পক্ষপাতিত্ব-দোষদুষ্ট। কিন্তু তিনি ঐ দুই দোষে দুষ্ট নন ও তিনি খামখেয়ালীও নন। অতএব স্বীকার করতেই হবে যে জীবই তার অদৃষ্টের গঠনকর্তা, যে যেমন কাজ করে, সে সেইরূপ ফলভোগ করে। ঈশ্বর কেবল কর্মফলদাতা মাত্র। জীবের সুখ-দুঃখের জন্য তিনি দায়ী নন, জীব নিজেই দায়ী—এই মতবাদ স্বীকার করলে মানুষই তার ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে, এ অদৃষ্টবাদ নয়।

জন্মান্তরবাদই জীবনের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারে, জন্মান্তর স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সভ্যতার আদিজননী ভারতে সুপ্রাচীন কাল হ'তে এই ন্যায়ানুমোদিত অকাট্য মতবাদ সকল দ্বন্দ্বের নিরসন জন্য স্থির সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হ'য়ে আসছে। যুক্তি-পরিষ্কৃত বুদ্ধি ব্যতীত এই সূক্ষ্ম রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। যোগজ দৃষ্টি ব্যতীত দেহাতীত আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অনুভূতিও অসম্ভব।

'শ্রীম'-সকাশে

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ সেন

১৫ই জুন, ১৯৩১—মাষ্টার মহাশয় তখন ৫০, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে মর্টন ইনস্‌টিট্যুশনে চার তলার উপরের ঘরে থাকেন। সেখানকার ছাদ হইতে আশে-পাশের কোনও স্থান দৃষ্টিগোচর হয় না। উপরে অনন্ত নীলাকাশ, আর সামনে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ। সন্ধ্যার একটু আগে পৌঁছিয়া দেখি মাষ্টার মহাশয় ছাদে বেড়াইতেছেন। প্রণাম করিলে তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন: দেখুন—ভক্তদেব ঠাকুর বলতেন, 'ভাগবত, ভক্ত, ভগবান', তিনি ভাগবত শাস্ত্র, তিনিই ভক্ত. আবার তিনিই ভগবান হয়েছেন। গীতায় আছে—হাজার অন্যায় করেও যদি কেউ অনন্যচিত্ত হ'য়ে তাঁর ভজন করে তা হ'লে তার সমস্ত পাপ খণ্ডন হ'য়ে যায়।

শ্রীভগবান আরও বলেছেন,—'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।' ভক্ত কি কম জিনিস? ভক্ত কত বড—তা সে নিজে জানে না।

একজন ভক্ত—না জানাই ভাল, জানলে আবার অহঙ্কার হবে।

শ্রীম—তা হবার জো নেই। যে ভক্ত, তার অহঙ্কার হয় না, ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিতেন পোড়া দড়ির, দেখতে দড়ির মতো, কিন্তু ফুঁ দাও, উড়ে যাবে।

—আহা। আজ দুপুর বেলায় মেঘের কি চমৎকার শোভাই না হয়েছিল। একজন সাধু মেঘ দেখে কেবল নৃত্য করতেন। কেননা, তিনিই সব হ'য়ে রয়েছেন কিনা,—'খং বায়ুর্জ্যোতিরাপ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী।'

আর একটি সাধু হিমালয়ের একটি জলপ্রপাত দেখে বলেছিলেন, আহা। কি জিনিসই করেছ। জলপ্রপাত দেখে তাঁর ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়েছে।

আজ একটি মেম ভক্ত দারজিলিঙ থেকে এক চিঠি লিখেছেন, "I wish you would enjoy the cold weather here." ওদেশের লোক কিনা—তাই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ক'রে সারা হয়। আমাদের দেশের লোক জানতে চায়, পাহাড় দেখে কেমন উদ্দীপন হয়। ঠাকুর তখন কাশীপুরের বাগানে, একটি ভক্ত দারজিলিঙ থেকে ফিরে এলে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিগো, উদ্দীপন হয়েছিল তো? শিলিগুড়ি থেকে যখন গাড়ী উপরে উঠছিল, তখন ভক্তটির চোখ দিয়ে আপনা আপনি জল পড়েছিল। কেন যে জল পড়ছে সেকথা সে বুঝতে পারেনি। ঠাকুর যখন জিজ্ঞাসা করলেন উদ্দীপনের কথা—তখন তার মনে হয়েছিল, ও। এই কারণে চোখে জল পড়েছিল। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, "যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ।" তিনিই হিমালয় হয়ে রয়েছেন। —লঙ্কা না জেনে খেলেও ঝাল লাগে।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। তিনি বলিলেন, আসুন সব আমাদের ঘরের ভিতরে আসুন—আমাদের সব 'Gods' দেখে যান। এই বলে ভক্তদের ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও কুম্ভমেলা হইতে আনীত সব ছবি দেখাইলেন। ঘর হইতে বাহির হইবার পথে দেওয়ালে রক্ষিত একটি কীর্তনের খোলে দু-একটি টোকা মারিয়া, ছাদে আসিয়া উত্তর দিকে টবে সাজানো তুলসীতলায় প্রণাম করিয়া একটু ধ্যান করিতে বসিলেন। ভক্তেরাও তাঁর পাশে বসিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রায় অর্ধ ঘণ্টা পরে মাস্টার মহাশয় বলিতেছেন:

"তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ"

—তিনিই সূর্য-রূপে তাপ দেন, তাপ দিয়ে পৃথিবীর সব জল শোষণ ক'রে নেন, পরে বর্ষায় আবার সেই জল ঢালেন।

এই দেখুন না, গরমেতে একেবারে সব হাহাকার প'ড়ে গেছল—আবার কেমন বর্ষা প'ড়ে গেল। এখন আবার কেমন ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে। একেবারে সোজাসুজি না রেখে, কেমন পৃথিবীটিকে একটু বাঁকাভাবে রেখেছেন, যার ফলে সব ঋতুর পরিবর্তন হচ্ছে। গ্রীষ্মের পর বর্ষা, তারপর শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত আসছে।

এ তো গেল সব বাইরের কাণ্ডকারখানা—তারপর ভেতরের কাণ্ডকারখানাটি একবার দেখুন। মানুষ বা অন্যান্য জীবজন্তু তৈরী করেছেন, বাহিরে হাত, পা, কান, নাক, চোখ আবার শরীরের ভিতরে—heart, spleen, liver, nervous system, consciousness, perception নিঃশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবো বলে আগে থেকে তিনি কেমন বাতাস তৈরী করেছেন, একবার তিনি হাওয়াটা টেনে নিন দেখি, তারপর আমাদের free-will (স্বাধীন ইচ্ছা) কোথা থাকে দেখা যাবে।

এই তো গেল হাওয়ার কথা। তারপর খাদ্য। সকালবেলায় ব্রেকফাষ্ট, তারপর লাঞ্চ, পরে আবার বড় খাওয়া 'ডিনার' আছে। এই সব করলে তবে দেহ থাকবে। তবে গোঁফে চাড়া দেওয়া চ'লবে। না হ'লে কোথায় কি থাকবে?

আবার নিদ্রা করেছেন। সমস্ত দিন পরিশ্রম ক'রে— শরীর অবশ হ'য়ে প'ড়ল, রাত্রে নিদ্রা। অমনি সকালবেলায় refreshed (সতেজ)।

সকালে উঠে দেখি রাস্তার ফুটপাথে সারি সারি লোক ঘুমুচ্ছে। পুলিশ বা মিউনিসিপ্যালিটির লোক যায়, কেউ কিছু বলে না, কারণ জানে সকলেই ঘুমের বশীভূত।

আবার দেখুন, সূর্য সকাল বেলায় পূর্ব দিকে ওঠেন। এইটিই কি একটি কম miracle (আশ্চর্য) না কি? রোজ রোজ এ ব্যাপারটা ঘটে বলে তত কিছু আশ্চর্য মনে হয় না। আচ্ছা, যখন সূর্য প্রথম দিন ওঠে সেদিনের অবস্থা একবার ভাবুন দেখি।

* * *

গুরুবাক্যে বিশ্বাস থাকা চাই।

মা বলে দিয়েছেন ছোট ছেলেকে ও তোর দাদা। ছেলের এমন বিশ্বাস হ'ল যেন মার পেটের ভাই। তার সঙ্গে এক পাতেই খেতে ব'সে গেল। তা সে কামারই হোক বা অন্য কোনও জাতেরই লোক হোক। সাধনের সময় যে যা বলেছে সরল বিশ্বাসে ঠাকুর তাই করেছেন।

একজন ভক্ত—তিনি বলতেন, আগে কিছু কর না কেন, তারপর কেউ বলে দেবে, 'এই এই।'

মাষ্টারমশাই—তার মানে ও নয়। তিনি যে ভাবে বলেছিলেন, তার মানে তখন বুঝতে পারা যায় নাই, 'এই এই' মানে হচ্ছে তিনি নিজে, সেই বাক্যমনের অতীত যিনি—তিনিই রূপ ধারণ ক'রে এসেছেন সেই মূর্তিতে। এই হচ্ছে মানে। বিশ্বাস করলে আর বিচারবুদ্ধি আসে না।

আমরা এক গল্প শুনেছি তাঁর কাছে: 'এক জন মেয়ে নিজেকে ব্রহ্মজ্ঞানী মনে করতেন। ছিল উঁচু জুতা পরেন, মোজা পরেন, দেবদেবী মানেন না। এমন মায়ের ছেলের খুব অসুখ হয়েছে। প্রথমে সিভিল সার্জনকে দেখানো হ'ল। তারপর ভাল হোমিওপ্যাথী ডাক্তার, শেষে কবিরাজীও বাদ গেল না। ছেলের কিন্তু অসুখ সারবার নাম নেই। বরং ক্রমশঃ খারাপই হ'তে লাগল। তখন তাঁর এক আত্মীয়া বললেন, 'দিদি, তুমি এত ডাক্তারপাতি তো দেখালে, এক কাজ করতে পার? একবার ৺তারকেশ্বরে হত্যা দিতে পার? আমার মনে হয় তোমার ছেলে সেরে উঠবে।' তখন সেই ব্রহ্মজ্ঞানী মা জুতা-মোজা ফেলে তারকেশ্বরে হত্যা দিতে ছুটলেন। আর বিচার এল না। ৺কৃপায় ছেলে সেরে উঠল।

ঐ রকম বিশ্বাস হ'লে তবে তো হবে। বিশ্বাস করতে হবে, 'গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ'রূপে তিনিই রয়েছেন সকলের হৃদয়ে।

ধর্মসংস্কারক রামমোহন

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায়

রামমোহনের ধর্মমত সম্বন্ধে আলোচনা করতে হ'লে প্রথমেই আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে পরবর্তী যুগে একটি বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতারূপে পরিচিত হলেও তিনি নিজে কোন দিন এ দাবি করেননি যে হিন্দুসমাজ হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কোন সম্প্রদায় তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। একমাত্র গায়ত্রী-মন্ত্রের সাহায্যেই তিনি ব্রহ্মোপাসনার বিধান দিয়েছিলেন। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের ভিতর সর্বাধিক সম্মানিত বেদান্তকেই তিনি তাঁর দার্শনিক মতবাদের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছিলেন, এবং বেদান্তের ভাষ্যরচনায় নিজস্ব কোন ব্যাখ্যা উপস্থাপিত না ক'রে অদ্বৈতবাদী শঙ্করের ব্যাখ্যাই তিনি অনুসরণ করেছিলেন। অবশ্য তাঁর রচিত 'তুহ্ফাৎ-উল্-মুয়াহিদ্দিন্' ও ব্রাহ্মসমাজের দলিলপত্র পাঠে সন্দেহ হতে পারে যে অদ্বৈতবাদের চেয়েও একেশ্বরবাদের প্রতিই তিনি বেশী আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু অদ্বৈত-বাদীর পক্ষে চরম আত্মজ্ঞান লাভ না করা পর্যন্ত একেশ্বরবাদী হওয়া হিন্দুদর্শন অনুসারে অযৌক্তিক বা অস্বাভাবিক নয়। রামমোহনের একেশ্বরবাদে বিশ্বাস যে অন্ততঃ আংশিকভাবে ইসলাম ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, এ কথা স্বয়ং শিবনাথ শাস্ত্রী স্বীকার করেছেন। খৃষ্টধর্মের প্রতিও রাম-মোহনের শ্রদ্ধা ছিল গভীর। বিশেষতঃ খৃষ্টের উপদেশাবলীর মধ্যে যে নীতিকথা রয়েছে, মানুষের চরিত্র ও ধর্মবুদ্ধি উন্নত করার পক্ষে তার উপযোগিতা তিনি চিরকাল মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। অবশ্য প্রচলিত খৃষ্টধর্ম হতে তাঁর ব্যবধান প্রচলিত হিন্দুধর্ম হতে ব্যবধানের মতই ছিল দুর্লঙ্ঘ্য। এমনকি খৃষ্টান একেশ্বর-বাদও তিনি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেননি। ১৮২৯ খৃঃ ২২শে জানুআরি অ্যাডাম ডাঃ টাকারম্যান্‌কে এক পত্রে লেখেন :

"The conviction has lately gained ground in my mind that he (Rammohon) employs *Unitarian Christianity* as an *instrument* for spreading pure and just notions of God without believing in the divine authority of the Gospel"

জগতের সব কয়টি প্রধান ধর্মের মূল কথা একেশ্বরবাদ—রামমোহন এ সত্যে বিশ্বাসী ছিলেন। এই একেশ্বরবাদ ভিন্ন অন্য যা কিছু বিভিন্ন ধর্মে স্থান পেয়েছে, সেগুলি তাঁর মতে ধর্মের বহিরঙ্গ। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির নিজস্ব প্রয়োজনে সেগুলির সৃষ্টি হয়েছে বলে তিনি মনে করতেন। এই একেশ্বরবাদের ভিত্তিতেই যে জগতের বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে মিলন ও পারস্পরিক আদানপ্রদান সম্ভব, তা তিনি বুঝেছিলেন। এ বিষয়ে রামমোহনের দৃষ্টি ছিল সুদূরপ্রসারী। রামমোহন ছিলেন যুক্তিবাদী, সব সময়েই তিনি যুক্তিকে সংস্কারের উপর স্থান দিতেন। অবশ্য মানুষের যুক্তি যে সব সময় অভ্রান্ত নয়, একথা তিনি মানতেন এবং যুক্তি ও শাস্ত্রের মধ্যে সমন্বয়-সাধনই যে বিবেকী ব্যক্তির কর্তব্য—একথাও তিনি কেনোপনিষদের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় বলেছেন। বিলাতপ্রবাস-কালে রামমোহনের কর্মসচিব ছিলেন স্যাণ্ডফোর্ড আর্নট। ১৮৩৩ খৃঃ নভেম্বর মাসে এশিয়াটিক জার্নাল পত্রিকায় প্রকাশিত রামমোহনের এক

জীবনীতে আর্নট লিখেছেন : শেষজীবনে রামমোহনের মনে সন্দেহ জেগেছিল—শুধু যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন ধর্মমত সমাজের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে কিনা। রামমোহনের প্রথম যুগের রচনায় যে সামান্য সংশয়বাদের চিহ্ন দেখা যায়, পরবর্তীকালে তা একেবারেই চলে গিয়েছিল। শেষজীবনে তিনি মনে করতেন, অতিরিক্ত অবিশ্বাসের চেয়ে বরং অন্ধ বিশ্বাস সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। স্বদেশে এবং ইংলণ্ডে নাস্তিক যুবকবৃন্দের উচ্ছৃঙ্খল কাযকলাপ লক্ষ্য ক'রে তিনি বিচলিত হয়েছিলেন। কলকাতার সরকারী হিন্দু কলেজে ছাত্রদের ধর্মশিক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থা না থাকায় তিনি স্কটিশ মিশনের নেতা আলেকজাণ্ডার ডাফ্‌কে 'জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ্‌ ইন্‌ষ্টিটিউশন' নামে এক নূতন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে উৎসাহিত করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল কোন ধর্মশিক্ষা না পাওয়ার চেয়ে ছাত্রদের বরং খৃষ্টধর্ম শিক্ষা পাওয়া ভাল। সকল ধর্মের মধ্যেই কিছু লৌকিক অনুষ্ঠান থাকা প্রয়োজন—এ কথাও রামমোহন স্বীকার করতেন, কিন্তু সে সব অনুষ্ঠান যতদূর সম্ভব সরল হওয়া উচিত, এই ছিল তাঁর বক্তব্য। আর নিষ্ঠাবান বৈদান্তিক হিসাবে প্রতিমা-উপাসনাকে তিনি জীবনে কোনদিনই গ্রহণ করতে পারেননি। জাতিভেদ-প্রথা ও পুরোহিত-তন্ত্রের নিন্দায় রামমোহন চিরদিন ছিলেন মুখর। জাতিভেদ-প্রথার বিরোধী একটি সংস্কৃত গ্রন্থ 'বজ্রসূচী'র বঙ্গানুবাদও তিনি প্রকাশ করেন ১৮২৭ খৃঃ। কিন্তু সমাজের সংস্কার করতে হ'লে সমাজের ভিতরে থাকা যে একান্তই প্রয়োজন, তা রামমোহন বুঝেছিলেন। সেইজন্যই মৃত্যুর সময়েও তাঁর স্কন্ধে ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত অটুট ছিল এবং মৃত্যুর পরে যেন খৃষ্টান মতে তাঁর সমাধি না দেওয়া হয়, সে বিষয়ে তিনি বারবার নির্দেশ দিয়ে যান। ফরাসীরাজ লুই ফিলিপ তাঁর সম্বর্ধনার জন্য যে দুটি ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন রামমোহন তাতে উপস্থিত থেকেও কোন 'অভক্ষ্য' ভক্ষণ করেননি। ব্রাহ্ম-সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা-সভায় যে স্থানে বেদপাঠ হ'ত সেস্থানে শূদ্রের প্রবেশাধিকার তিনি দেননি, কারণ তাহলে সমাজে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হতে পারে—এ আশঙ্কা তাঁর ছিল। অবশ্য তাঁর উপদেশ ও আচরণের মধ্যে এই অসঙ্গতি যে কিছু পরিমাণে তাঁর আন্দোলনকে দুর্বল ক'রে দিয়েছিল, সে কথাও অস্বীকার করলে চলবে না। ব্রাহ্ম উপাসনা সভায় শূদ্রদের যে বেদপাঠ শ্রবণের অধিকার ছিল না—বিদেশী 'জন বুল' পত্রিকার দৃষ্টিতেও তা ধরা পড়েছিল—(জন বুল—১৮২৮, ২৩শে আগষ্ট)

ধর্মসংস্কারক হিসাবে রামমোহনের প্রকৃত স্থান কি এবং তাঁর সাফল্যের পরিমাণ কতটুকু, এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মসংস্কারের ইতিহাসে রামমোহনের প্রধান কৃতিত্ব বাংলাদেশে বৈদান্তিক হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় বেদান্তের ব্যাখ্যা প্রচার করেন। তাঁর বেদান্তের ভাষ্যগুলি অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজী ও হিন্দুস্থানী ভাষাতেও অনূদিত হয়েছিল এবং এই সব ধর্মগ্রন্থ তিনি বিনামূল্যে বিতরণ করেন। অবশ্য এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা উচিত যে বাংলাদেশে কোন দিনই বেদান্তের চর্চা একেবারে লোপ পায়নি। ১৮২৪ খৃঃ জানুআরি মাসে প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজেও প্রথম হতে প্রায় কুড়ি বৎসর বেদান্ত অধ্যাপনার জন্য একটি পৃথক শ্রেণী ছিল। আরও স্মরণ রাখা উচিত যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এ দেশে বেদ-